বাংলা নাটকের ইতিহাস : ঔপনিবেশিক প্রেক্ষিত ও কিছু প্রশ্ন

সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস, ক্যালকাটা (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) -এর

অধীনে

পি. এইচ. ডি. (আর্টস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

গবেষক

তূর্ণা দাশ

তত্ত্বাবধায়ক

ডঃ তৃণা নিলীনা ব্যানার্জী

অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কালচারাল স্টাডিজ

সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস, ক্যালকাটা

কলকাতা-৭০০ ০৯৪

২০২৪

Certified that the Thesis entitled

বাংলা নাটকের ইতিহাস : ঔপনিবেশিক প্রেক্ষিত
ও নব্য প্রেক্ষক

Re- submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Dr. Trina Nileena Banerjee, CSSSC, Cultural Studies and that this thesis is a **revised version** of the one submitted on 27.12.2021.

It is certified further that neither this thesis nor any part of it has been submitted for any degree or diploma elsewhere.

Countersigned by the

Supervisor : Trina Nileena Banerjee

Dated : 10/7/24

Assistant Professor
CENTRE FOR STUDIES IN
SOCIAL SCIENCES, CALCUTTA

Candidate : Turna Das

Dated : 11.07.2024

মুখবন্ধ

বাংলা নাটকের ইতিহাস অন্বেষণ করলে জানা যায়, আজ যে আর্ট ফর্মটিকে 'নাটক' হিসেবে আমরা স্বীকৃতি দিয়েছি, সেটা অনেকটাই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির প্রভাবে তৈরি একটি আর্ট ফর্ম। বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে এভাবে ওতপ্রোত জড়িয়ে থাকা 'থিয়েটার' ফর্মটির সুবিস্তৃত ইতিহাস আজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। বিশ শতকের গোড়া থেকেই এই বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস রচনার একটা উদ্যোগ নেওয়া শুরু হয়। ক্রমাগত ইতিহাস রচনা করে আর সেই রচনার পুনরাবৃত্তি করে আজ বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসটি একটি সুপরিচিত অবয়ব পেয়ে গেছে। সেই নাট্য ইতিহাসটিই এখন শিক্ষাক্ষেত্রের বিদ্যাশৃংখলায় স্থান পেয়েছে এবং গবেষকদের গবেষণার প্রাথমিক স্তর হিসেবে সেই প্রতিষ্ঠিত কাঠামোটিই ধরা দেয়। কিন্তু সেই সুলিখিত, সুপ্রচারিত, সুগঠিত ইতিহাসে কি কোনো কোনো ফাঁক লক্ষ্য করা যায়? এই ইতিহাস আখ্যানে মূল কী কী বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে? ইতিহাসকারদের সামাজিক অবস্থান, জাতি, শ্রেণির ও শ্রেণিগত বৈশিষ্ট্যের ধারণাগুলি কি প্রচলিত এই আখ্যানটি বহন করে? এই ন্যারেটিভে কি শোনা যায় বিজিতের নিজস্ব স্বর? বাংলা নাট্য ইতিহাসে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয় কি অবনত ও শোষিত শ্রেণির দিক থেকে দেখা ইতিহাসকে আখ্যানটিকে?

এই রচনা সন্দর্ভটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস, ক্যালকাটায় পি. এইচ. ডি. উপাধির জন্য লিখিত হয়েছে। এই গবেষণা প্রকল্প নির্মাণে ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশন ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি টেস্টের জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ আমাকে আর্থিক সাহায্য করেছে। বাংলা নাট্য ইতিহাসের সামগ্রিক ইতিহাস আখ্যানকে এই গবেষণায় বিচার করা হয়নি। বরং নাট্য ইতিহাসের টুকরো টুকরো কিছু অধ্যায়কে কেন্দ্র করে বর্তমান গবেষণার প্রবাহকে গতি দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ডঃ তৃণা নিলীনা ব্যানার্জীর কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এই গবেষণার অভিমুখ নির্ধারণে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রতিটি অধ্যায়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও আলোচনায় তিনি আমায় যে অভিভাবকত্ব দিয়েছেন, তা আমার সারাজীবনের পাথেয় হয়ে থাকবে। বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই অধ্যাপক পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে। গবেষণাটি নিয়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অভিমত আমাকে সমৃদ্ধ করেছেন। প্রণাম জানাই অধ্যাপক আনন্দ লাল ও শ্রী শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তাঁদের ব্যস্ততার ফাঁকেও গবেষণা বিষয়ক দিকনির্দেশ আমাকে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ করেছে।

এছাড়া গবেষণা চলাকালীন নানা জটিল সমস্যার সময়ে পাশে থাকার জন্য সেন্টার ফর স্টাডিজের শ্রীমতী নন্দিতা ভট্টাচার্য্য ও শ্রীমতী কবিতা ভাওয়ালকে আমার আন্তরিক প্রণাম জানাই। তাঁরা পাশে না থাকলে আজ এই গবেষণার কাজ সম্পূর্ণ হত না। যদুনাথ ভবন মিউসিয়াম অ্যান্ড রিসোর্স সেন্টার, নাট্যশোধ সংস্থান, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি, সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস, ক্যালকাটা লাইব্রেরী, রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অফ কালচার লাইব্রেরী ও ন্যাশনাল লাইব্রেরী, কলকাতা কর্তৃপক্ষের কাছে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

অবশ্যই আলাদা করে ধন্যবাদ জানানো দরকার, আমার মা শ্রীমতি অঞ্জলি দাশ ও বাবা ডঃ রঞ্জিত দাশ-কে। তাঁদের ধৈর্য্য ও সহযোগিতা ছাড়া এই গবেষণা সম্পূর্ণ হওয়া অসম্ভব ছিল। সবশেষে গবেষণা চলাকালীন আমার জীবনে আসা এক নতুন বন্ধু আমার কন্যা দরিয়া দাশ পালোধীকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও আদর জানাই।

কলকাতা, ২০২১ **তূর্ণা দাশ**

সূচিপত্র

মুখবন্ধ		৩
ভূমিকা	বাংলা নাটকের ইতিহাসঃ ঔপনিবেশিক প্রেক্ষিত ও কিছু প্রশ্ন	৭
অধ্যায় এক	অভিনেত্রীর বিশুদ্ধিকরণঃ উনিশ শতকীয় ‘সভ্য’ থিয়েটারে অভিনেত্রীর অনুপ্রবেশ	৭৬
অধ্যায় দুই	নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইনঃ একটি বিকল্প পাঠ	১৩৮
অধ্যায় তিন	বাংলা ঐতিহাসিক নাটকে জাতীয়তাবাদ	১৭৫
অধ্যায় চার	বাংলা নাটকের মঞ্চসজ্জাঃ বিকল্প ইতিহাস রচনার সম্ভাবনা	২২০
সিদ্ধান্ত	একটি বিকল্প পদ্ধতির সন্ধান	২৮২
সংযোজনী ১	১৮৭৬-এর নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন	২৯৯
সংযোজনী ২	‘সুরেন্দ্র-বিনোদিনী’ মামলার রায়	৩০২
সংযোজনী ৩	Lt. Col. Mark Wood-এর আঁকা কলকাতার মানচিত্র	৩০৭
সংযোজনী ৪	উইলিয়াম প্রিন্সেপ (১৭৯৪-১৮৭৪)-এর আঁকা চৌরঙ্গি থিয়েটার	৩০৮
গ্রন্থপঞ্জী		৩০৯

ভূমিকা

বাংলা নাটকের ইতিহাস : ঔপনিবেশিক প্রেক্ষিত ও কিছু প্রশ্ন

‘... যে-সময়কে আমরা অভিজ্ঞতায় পাই, তার চরিত্র বহতা নদীর মতো নয় (ঐতিহাসিক কালক্রম বলতে যা বোঝেন), টান করে ধরা ফিতের মতোও নয় সে, বরং তা যেন কুণ্ডলী পাকানো একটি গ্রন্থির মতো’ (D. Chakraborty, *Monorather Thikana* 216)।

বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস নিয়ে কাজ করতে শুরু করার মূল প্রতিবন্ধকতা হল, এই ইতিহাসের একটি প্রতিষ্ঠিত জনপ্রিয় সুপরিচিত আখ্যান বা ন্যারেটিভ আছে। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে কবে কোন নাটক কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল কে কোন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, নাট্য প্রযোজনা দর্শকের পছন্দ হয়েছিল কিনা, নাটকটি সমাজে কী কী প্রতিক্রিয়া ফেলেছিল ইত্যাদি সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়ে নাট্য ইতিহাসে বর্ণনা আছে। দীর্ঘকাল ধরে সেই নির্দিষ্ট বর্ণনাগুলিই প্রচলিত, প্রচারিত ও চর্চিত হয়ে এসেছে। নতুন গবেষণার বেশিরভাগ কাজ সেই প্রতিষ্ঠিত বর্ণনা বা আখ্যানকে মেনে নিয়েই কাজে এগিয়েছে। ব্রিটিশ আমল থেকেই বাংলা মঞ্চের ইতিহাস নথিকরণ করার কাজটি শুরু হয়ে গেছিল। ফলে আজকের কোনো নতুন গবেষক বাঙলার নাট্য ইতিহাসের কালপঞ্জি বা বাঙালির নাট্য সাহিত্যের বিশ্লেষণ নিয়ে তেমন কোনো নতুন কথা বলার অবকাশ পায় না বললেই চলে। বিশ শতকের শুরু থেকেই অমরেন্দ্রনাথ দত্তের ‘রঙ্গমঞ্চ’ পত্রিকায় বিশিষ্ট অভিনেতা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফির পুত্র ব্যোমকেশ মুস্তাফি বঙ্গ নাট্যশালার গোড়ার কথা লেখা শুরু করেন। ইংরেজরা এ দেশে আসার পর থেকে কিভাবে ধীরে ধীরে নাট্যসংস্কৃতি গড়ে উঠল সে ব্যাপারে একেবারে গভীর অনুসন্ধানের ফসলস্বরূপ এই প্রবন্ধগুলি নাট্য পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। ব্যোমকেশ মুস্তাফির পাশাপাশি আরও অনেক বিশিষ্ট নাট্য অনুরাগী মানুষ এই কাজে তাঁর যোগ্য সঙ্গ দিতে থাকেন। ফেলে আসা অতীতকে যথাসম্ভব দ্রুততায় সংরক্ষণ করার তাগিদ থেকে এবং সেই সময়কার নাট্যধারাকে ঐতিহাসিক জ্ঞানতত্ত্বের গণ্ডিতে সম্মানীয় স্থানে প্রতিষ্ঠিত করার আন্তরিক প্রয়াস থেকেই ব্যোমকেশ ও তাঁর সমসাময়িকরা এই উদ্যোগ নেন, এ কথা অনুধাবনযোগ্য। ফলে বোঝা যাচ্ছে, বাংলা নাটকের ঘটনাবলীকে ইতিহাসকরণের কাজটি শুরু হয়ে গেছে ব্রিটিশ আমল থেকে।

এই ইতিহাস নথিকরণের বিবরণীগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নাট্য প্রযোজনাগুলির প্রতিবেদনমূলক। কবে কোথায় কোন নাটক উপস্থাপিত হয়, কোন চরিত্রে কে অভিনয় করেছিলেন ইত্যাদি নানান তথ্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠত এই ইতিহাস। যেমন- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বা পরবর্তীকালের ইতিহাসকার শঙ্কর ভট্টাচার্যের গবেষণাগুলি অতি নিষ্ঠার সঙ্গে এই ধরনের অসংখ্য তথ্য আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। এই ইতিহাস নথিকরণের পদ্ধতি ছিল নানান রকমের। কিছু ক্ষেত্রে ইতিহাস লেখার পদ্ধতি হল জীবনী-নির্ভর; নাট্যক্ষেত্রে কোনো একবিশিষ্ট ব্যক্তির কর্মকাণ্ডকে লিখে রাখার মাধ্যমে নাট্য ইতিহাস লিখে ফেলা। ইতিহাস সংরক্ষণের এই জনপ্রিয় পদ্ধতিটিকেও অবলম্বন করেছেন বহু নাট্য ইতিহাসবিদ্। যেমন- হায়াৎ মামুদ গেরাসিম লেবেদফের জীবনী লেখার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা থিয়েটারের গোড়াপত্তনের ইতিহাসটিকে দেখার চেষ্টা করেছেন; উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লিখেছেন অভিনেত্রী বিনোদিনী, তারাসুন্দরী ও তিনকড়ির জীবন কাহিনী; অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন গিরিশচন্দ্র ঘোষের জীবনী। এছাড়াও, নাট্যকর্মীরা নিজেদের নাট্যজীবনের বর্ণনা করে আত্মজীবনী রচনার মাধ্যমেও বাংলা নাটকের ইতিহাসকে পরিরক্ষণ করতে চেয়েছেন। যেমন- বিনোদিনী দাসী, অমৃতলাল বসু বা অহীন্দ্র চৌধুরীর আত্মজীবনী থেকে তৎকালীন নাট্য ইতিহাসের একটি বিস্তারিত চিত্র পাওয়া যায়।

এভাবেই বাংলা নাটকের ইতিহাস নিয়ে একটি নির্দিষ্ট আখ্যান বারবার চর্চিত হতে হতে আজ যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। বাংলা নাট্য ইতিহাস সম্বন্ধে একটি প্রথাগত সুবর্ণিত কাঠামোবদ্ধ ধারাবিবরণী জ্ঞানজগতে সংস্থাপিত হয়ে আছে। সবটা সবার যেন জানা। সবটা যেন নির্দ্বিধায় গৃহীত। বারংবার সেই একই আখ্যানের পুনরাবৃত্তি করে আজ সেই আখ্যান যেন সর্বসম্মত ভাবে প্রচলিত। এই প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসটিকে ভিত্তি করেই আজকের গবেষকের কাজ শুরু হয়। নাট্য ইতিহাস বিষয়ে নতুন কিছু সংযোজনের প্রায় কিছুই নেই। এই Existing History বা প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসের ভিত্তিটিকে মান্যতা দিয়েই শুরু হয় আজকের গবেষকের কাজ।

কিন্তু আজকের ইতিহাস চিন্তকরা এই প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসকে ভেঙ্গেচুরে দেখার প্রয়াস করতে চাইছেন। প্রথাগত ইতিহাস সাধারণত কতগুলি প্রচলিত ধারণার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। সেই ধারণাগুলোকে আমরা স্বতঃসিদ্ধ বা যেকোনো প্রশ্নের উর্দ্ধে বলে ধরে নিই। দীপেশ চক্রবর্তীর ভাষায়, 'কলেজপাঠ্য ইতিহাস কতকগুলি প্রচলিত ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই ধারণাগুলি সাধারণত স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নেওয়া হয়, মেনে না নিলে 'ইতিহাস' রচনা বা পড়ানো কোনোটাই হয় না' (*Monorather Thikana* 167)। সেই প্রচলিত ধারণাগুলিকেই আজ প্রশ্ন করতে চাইছেন

আধুনিক ইতিহাসবিদরা। দীপেশ খেয়াল করাচ্ছেন, দীর্ঘদিন স্বতঃসিদ্ধ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করার সঙ্গে সঙ্গে নিঃসন্দেহ চিত্তে মনে করা হয়, মানুষের ইতিহাস আসলে প্রগতির ইতিহাস। অবিশ্রান্ত একমুখী তার ধারা। প্রাচীনের ‘পিছিয়ে পড়া’ থেকে মুক্ত হয়ে নবীনের ‘এগিয়ে যাওয়া’র এক এবং একটিমাত্র আখ্যানই হল, মানুষের ‘সভ্যতা’র ইতিহাস। এটাই ইতিহাস গবেষকেরা ধরে নেন। এটাই হল ‘আধুনিক’ ইতিহাসবিদের ইতিহাস-চেতনা।

অর্থাৎ ইতিহাস রচনার যে ভিত্তি বা foundation, তার স্বরূপ উদ্ঘাটনেই বেশি মনোযোগ দাবী করেছেন তাঁরা। এই সূত্রে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বা দীপেশ চক্রবর্তীর মতো বুদ্ধিজীবীরা প্রথাগত ইতিহাসকে নিয়ে অনেক গভীর সমালোচনা ও বিতর্ক করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। সেই পথ ধরেই আমার এই গবেষণার প্রয়াস।

ফলে এতদিন ধরে তৈরি করা, এত বছর ধরে গড়ে ওঠা নাট্য ইতিহাস নিয়ে কাজ করতে গিয়ে বিশ্লেষণাত্মক মননটি প্রায়শই অনুপস্থিত হয়ে পড়ে। অতীত কর্মকাণ্ডের গরিমা-বর্ণনাই হয়তো বাংলা নাট্য ইতিহাসের মূল ভূমিকা হয়ে দাঁড়ায়। তাই বাংলা নাট্য ইতিহাস সংক্রান্ত অধিকাংশ রচনাই বাঙালির নাট্য চর্চার গৌরবের দিকটিকেই আলোকিত করতে চেয়েছে। প্রয়োজনে কিছু তথ্যকে একেবারেই আলোচনা না করে বা নামমাত্র উল্লেখ করেই বাংলা নাটকের ইতিহাসকে সুরক্ষিত রাখতে চেয়েছে। অবশ্য কিছু ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এর ব্যতিক্রম আছে। সুবীর রায়চৌধুরী বা রিমলি ভট্টাচার্যের মতো কিছু নাট্য গবেষক নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাস বিশ্লেষণের চেষ্টা করলেও তা রয়ে গেছে ব্যতিক্রমী প্রয়াস হিসেবেই। মূল প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসে তাই বাদ পড়েছে অনেক বিষয়, অনেক সময়েই মূল ঘটনা থেকে খানিক সরে এসেছে ইতিহাস। মিথ্যা হয়তো নয়; কিন্তু অতিকথিত সত্যের প্রাধান্য হয়তো আছে এই ইতিহাস রচনায়, এমনটা মনে করার কারণ আছে বলেই মনে হয়। যদিও ‘সত্য’ বলতে ঠিক কী বোঝায় সে সম্পর্কেও প্রশ্নের অবকাশ আছে। গবেষণা প্রশ্ন সংক্রান্ত পরিসরে সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।

এইখানেই বর্তমান গবেষকের ভূমিকা। এই একটি নির্দিষ্ট ইতিহাস কাঠামো তৈরি করে, তাকেই একটি সম্পূর্ণ ইতিহাস হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রক্রিয়াটিকে আমি দেখতে চাইব। ‘অখণ্ড’ ইতিহাস হিসেবে প্রচলিত যে ইতিহাস তার ভেতর-আঙিনায় চোখ রাখাটাই আমার উদ্দেশ্য। দীপেশ চক্রবর্তী লিখছেন, ‘‘সমগ্র জাতি’র একটি অখণ্ড ইতিহাস আছে ভাবলে যে-ইতিহাস তৈরি হয়, তা এলিটিস্ট। তাতে কৃষকের কল্পনা, মজুরের কল্পনা বা সমাজের অন্যান্য নিপীড়িত মানুষের কল্পনার জগৎকে উচ্চবর্গের তথা রাজনীতির পক্ষে আত্মসাৎ করতে হয়’ (*Monorather Thikana* 179)। দীপেশের এই সতর্কবাণীটিকে মাথায় রেখেই বর্তমান সন্দর্ভটি অগ্রসর হবে। নতুন কোনো

বর্ণনাত্মক ইতিহাস রচনা নয়; প্রতিষ্ঠিত Dominant ইতিহাসে যে যে বিষয়গুলি স্থান পেয়েছে, সেগুলির স্বরূপের দিকে নজর করা, আবার যে যে বিষয়গুলি এই ইতিহাসের পাতায় স্থান পায়নি, সেগুলির অনুপস্থিতির কারণগুলিকেও লক্ষ্য করা আমার কাজ।

প্রসঙ্গত, বাংলা নাট্য ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত Dominant মূল ধারার ইতিহাসের পরিসরটা খানিকটা আলোচনা করা দরকার। 'তথাকথিত' রেনেসাঁসের প্রভাবে ইউরোপীয় সংস্কৃতির আলোয় বাংলার বুদ্ধিজীবী মহল উনিশ শতক থেকে সমাজের সমস্ত উপকরণের নবচেতনায় ব্যাখ্যা শুরু করলেন। কলকাতার শিক্ষিত বাঙালি মহল নিজেদের জীবনের নানা উপকরণ, যেমন ইতিহাস, সংস্কৃতি, সমাজচেতনা, ধর্মচেতনা ইত্যাদি সমস্ত কিছুকেই নতুন করা ব্যাখ্যা করতে চাইলেন। নিজেদের সংস্কৃতির সঙ্গে ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সংঘর্ষে গড়ে তুলতে চাইলেন তাঁদের জীবন ও সংস্কৃতির নতুন পরিচয়। আর তারই ফলাফল স্বরূপ, লোকসমাজের উপকরণগুলিকে বাতিল করার প্রবণতা শুরু হল। অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদের ব্যাখ্যায়, '...the Bengali scholars, having acquired Euro-centric faculty, generally rejected most of indigenous scholarship and arts as decadent. The rise of proscenium theatre in Calcutta itself is a case to prove the point' (*Acinpakhi* 344-345)।

আহমেদ আরও বলছেন, বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসের আদি পর্ব হিসেবে ধরে নেওয়া হয় কলকাতায় ব্রিটিশদের রুচিসম্মত থিয়েটার প্রতিষ্ঠার সময়টিকে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময়ে ব্রিটিশরা যে নাট্যশালা গড়ে তুলেছিল কলকাতায়, সেই সময়টিকেই ভারতের থিয়েটারচর্চার 'শুরু' হিসেবে ধরা হয়। ফলে নাট্যতাত্ত্বিকরাও সেই ঐতিহ্য বজায় রেখে দেশীয় সাংস্কৃতিক উপস্থাপনাগুলিকে মোটেই থিয়েটারের আলোচনায় স্থান দিতে চান না। আর সেই কারণেই 'যাত্রা' ছাড়া আর কোনো দেশীয় পার্ফর্মেন্সের তেমন কোনো বিস্তারিত বিবরণী খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের সংস্কৃতিচর্চার আলোচনায় আহমেদের অভিমত, 'Since the indigenous theatre in Bangladesh does not regard the above as essential, theoreticians and theatre practitioners either reject it as non-dramatic or are extremely hesitant about regarding it as 'real' theatre. Therefore, there is hardly any detailed account of any of the forms of indigenous theatre except Yatra' (*Acinpakhi* 20)।

আহমেদের ব্যাখ্যায় এই ঐতিহ্যের প্রবহমানতা আজও বাংলাদেশের নাট্য তথা সংস্কৃতি ক্ষেত্রে দুইটি স্পষ্ট বিভাজন দেখা যায়; ইউরোপ-কেন্দ্রিক শহুরে নাট্যশালা এবং লোকনাট্য সংস্কৃতি। তাঁর বিশ্লেষণে জানা যায়, শহুরে প্রসেনিয়াম নাট্য সংস্কৃতি যেমন শহরের মানুষদের চাহিদা পূরণের একটা বড় সহায় হয়ে উঠেছিল, পাশাপাশি লোকনাট্য আঙ্গিকের উপস্থাপনাগুলো বিপরীত পরিস্থিতির মুখোমুখি হল। ধর্মীয় নাট্যগুলি ভীষণ রকম অলৌকিক বিমূর্ত ঐশ্বরিক শক্তির প্রতি সমর্পিত ছিল, ধর্ম-নিরপেক্ষ নাট্যগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রেম ও রোম্যান্সে ভরপুর থাকল। আবার ব্যঙ্গনাট্য আঙ্গিকগুলো সমাজের অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তুললেও অতীন্দ্রীয় শক্তির প্রতি আনুগত্য থেকে বেরোতে চাইলো না। আর এভাবেই বাংলাদেশের লোকনাট্যগুলো বিশ শতকের সমাজের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হতে থাকল। তিনি আরও খেয়াল করাচ্ছেন, বাঙালি ‘ভদ্রলোক’ সম্প্রদায়ের পশ্চিমী প্রভাবে উদবুদ্ধ জীবনধারা এই লোকনাট্যগুলিকে মূল ধারার সংস্কৃতি থেকে একেবারে দূরে সরিয়ে দিল। তার ফলেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই সাংস্কৃতিক আঙ্গিকগুলি আর বিবর্তিত হওয়ার সুযোগ পেল না, প্রসারিত হওয়ার পৃষ্ঠপোষকতা পেল না, নব যুগের চাহিদা পূরণের পরিসর পেল না; টিঁকে রইল জীবাশ্মের মতো (Ahmed *Acinpakhi* 345)। যদিও আহমেদের ব্যাখ্যায় এই ঘটনা যে সর্বত্র ঘটেছে তা নয়। মনসা, চণ্ডী, শিব-কালী সম্পর্কিত অভিনয়গুলি বা মদরপীরের গান, বড় পীর সাহেবের পালা, লীলা কীর্তন, যোগীর গান এরকম নানান লোকপরিবেশনার উদাহরণ তুলে ধরছেন লেখক। আর সেই লোককলার পারস্পরিক বিশ্লেষণ করে আহমেদ মনে করছেন, ‘The network reveals how the people resisted, assimilated and acculturated each other's world-views in order to establish their identity’ (*Acinpakhi* 346)। অর্থাৎ, এই লোককলাগুলির মধ্যে সমাজ ও পৃথিবী সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংঘাত, সংযোগ, বোঝাপড়ার মাধ্যমে গড়ে উঠেছে তাদের নতুন পরিচয়, নতুন অস্তিত্ব। আহমেদ আরও বলছেন, ‘By dealing with the deep-seated questions of the members of the cults, the indigenous theatre validated the existence of the adherents. This function gave theatre its importance and relevance in the society’ (*Acinpakhi* 346)।

আর এই কারণেই বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস রচনার প্রয়াসে হয়তো লোকসংস্কৃতির এই বিভিন্ন ধারাগুলির মধ্যেকার পারস্পরিক আদানপ্রদানের এই বিশ্লেষণ হওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে বলে মনে হয়। অনুমান করা যায় এই লোককলাগুলির মধ্যে ছিল একটি বিকল্প শক্তি যা তৎকালীন সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার সহায়ক হয়ে উঠতে পারে। আর

তাই সেগুলি সমাজ ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ার সম্ভাবনা রাখে। প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস গ্রন্থের মাঝে যে লাইনগুলো অদৃশ্য হয়েও রয়ে গেছে, বা 'উচ্চারিত' বর্ণনায় উপস্থিত রয়েছে 'অনুচ্চারিত' স্বর, গবেষক সেই দিকে খুঁটিয়ে দেখতে চাইবে। যদিও সমগ্র নাট্য ইতিহাস নিয়ে এই স্বল্প পরিসরে কাজ করা সম্ভব নয়। তাই বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসের নির্দিষ্ট কতগুলি টুকরো টুকরো বিভাগকে ধরে আমার গবেষণা এগোবে। এই গবেষণাটি কোনো নতুন তথ্যনির্ভর নিবন্ধ হয়ে উঠতে চাইবে না। এটি প্রতিষ্ঠিত তথ্যের ওপর দাঁড়িয়ে একটি পদ্ধতিমাত্র হয়ে ওঠার সম্ভাবনা বহন করবে।

বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস বলতে কী বুঝছি?: পূর্ববর্তী গবেষণাসমূহ ও তথ্যসামগ্রীর হদিশ

বর্তমান গবেষণাটি উনিশ বিশ শতকের নাট্য প্রযোজনাগুলি নিয়ে ধারাবাহিক বিবরণী নয়, সে কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। প্রচলিত নাট্য ইতিহাসের ওপর অবিচ্ছিন্ন আলো ফেলে সামগ্রিক ইতিহাসকে এক সূত্রে গ্রথিত করাও এই গবেষণার উদ্দেশ্য নয়। তাই এই গবেষণায় আমি বাংলা থিয়েটারের সুবৃহৎ ইতিহাস কাণ্ডের আপাত-বিচ্ছিন্ন কিছু আলাদা আলাদা অধ্যায়কে বেছে নিয়ে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস করেছি। **বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসের আকরগ্রন্থগুলিতে যে যে বিষয়গুলিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে, যে ঘটনা নিয়ে প্রচুর লেখালেখি, তর্ক-বিতর্ক, প্রচার বা আলোচনা করা হয়েছে, সেই রকম কিছু বিষয় নিয়ে গবেষণার প্রথম তিনটি অধ্যায়ে কাজ করা হয়েছে। পাশাপাশি, চতুর্থ অধ্যায়ে এমন একটি বিষয় আলোচনায় আনা হয়েছে, যে বিষয়ে বাংলা নাট্য ইতিহাস একেবারে নিশ্চুপ থাকতে চেয়েছে বা বলা ভালো ইতিহাসের মতো একটি মহান বিস্তারিত আখ্যানের পরিমণ্ডলে এই বিষয়টির স্থান হওয়ার কোনো কারণ আছে বলেই মনে করেনি বলে মনে হয়।** অর্থাৎ অতি-আলোচিত ও অনালোচিত—দুই ধরনের বিষয়কে নিয়ে একই গবেষণা পদ্ধতিতে একটা প্রতিতুলনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই কাজে সবচেয়ে বড় সহায় হয়ে উঠেছে আমার গবেষণার পূর্ববর্তী বিশিষ্ট প্রণম্য গবেষণা কর্মগুলি। সেই কাজগুলি একটি সুগঠিত ইতিহাস রচনার কাজে উদ্যোগ না নিলে আমার এই কাজ সম্ভব হত না।

আমার গবেষণার কাজে একটা বড় অংশ প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস ক্ষেত্রকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে। উনিশ-বিশ শতকের থিয়েটার নিয়ে পুরাতন কাল থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা নাটকের ইতিহাস নিয়ে যা যা গবেষণা বা চর্চা হয়েছে, যা যা আলোচনা করা হয়েছে এবং আর্কাইভে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে যে যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, সবটাই এই সূত্রে প্রয়োজনীয়। আবার আমার গবেষণার বেশ খানিকটা কাজ এই সুনির্দিষ্ট ইতিহাস চর্চার বাইরেও অবস্থান করবে।

বিভিন্ন আলাদা আলাদা ভাবে প্রতিষ্ঠিত ডিসিপ্লিন বা বিষয়গুলির মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্কের ওপর আমার গবেষণার দ্বিতীয় ভাগ কাজের ক্ষেত্রটি আবর্তিত হবে। অর্থাৎ এ কথা অনুমেয়, আর্কাইভ বা সংগ্রহশালায় প্রাপ্ত তথ্যাদি আমার গবেষণার একটি বড় অংশ নিয়ে থাকবে, আবার প্রথাগত আর্কাইভের বাইরের রেপার্টয়্যারের বিশাল ক্ষেত্রটি সম্পর্কেও বর্তমান গবেষক সচেতন থাকার চেষ্টা করবে।

প্রাথমিক তথ্যসামগ্রীর সীমাবদ্ধতা

যে সময়টিকে নিয়ে আমার গবেষণার কাজ, সেই সময়কার নাট্য প্রযোজনাগুলো দেখার উপায় নেই। সেই সময়কার সমাজ ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকেও আমার দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ফলে আমার গবেষণার বিশ্লেষণাত্মক জটিলতা নিঃসন্দেহে অনেক বেশি হয়ে পড়বে। প্রযোজনাগুলি সম্পর্কে কোনো মৌলিক তথ্যসামগ্রী কিংবা কোনো মৌলিক রেকর্ডিং ইত্যাদি পাওয়ার কোনো উপায় নেই। এক্ষেত্রে উনিশ-বিশ শতকের পত্র-পত্রিকা, সংবাদপত্রের রিপোর্ট ও কিছু প্রকাশিত গ্রন্থাদিকেই আমার প্রাথমিক সামগ্রী হিসেবে গ্রহণ করতে হয়েছে। যেমন, ‘রঙ্গমঞ্চ নাট্য পত্রিকা’, ‘নাচঘর পত্রিকা’, উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের রচিত জীবনী গ্রন্থটি, অসংখ্য সংবাদপত্রের রিপোর্টিং- এগুলিই মূল উপজীব্য। একটি জীবন্ত শিল্পমাধ্যমের প্রাথমিক তথ্যসামগ্রী হিসেবে এই লিখিত নথিগুলি নিঃসন্দেহে গবেষণাকর্মে সমস্যা আনে। অভিকরণ শিল্প (performing arts)-কে যদি একটি জীবন্ত শিল্প ধরা হয়, রোজকার মঞ্চ উপস্থাপনাকে যদি এক একটি নতুন পরিবেশনা ধরা হয়, তাহলে অন্য কোনো ভাবে তার কোনো প্রতিস্থাপনা চলে কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন এসে যায়। এখানেই archive ও repertoire-এর দ্বন্দ্বের বিষয়টি সংক্ষেপে উল্লেখ করা দরকার।

একটি Performance-এর Performative নিয়ে আলোচনায় Embodiment (বা মূর্তপ্রকাশ), Presence (বা উপস্থিতি), Experience (বা অভিজ্ঞতা)-এই কথাগুলি ভীষণভাবে চলে আসে। এই বিষয়গুলি Discursive পরিমণ্ডলে বা খাতায়-কলমে লিপিকরণ করাটা সমস্যাজনক একটি কাজ। পার্ফর্মেন্স নিয়ে কাজ করতে সরাসরি ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে গবেষণা করাটা জরুরি হয়ে পড়ে। কিন্তু বর্তমান গবেষণার কাজে সেই সময়ের সমাজ ও সংস্কৃতিকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় আনা অসম্ভব। অথচ, যে তথ্যসামগ্রীর ওপর ভরসা করে আমার কাজটি সংঘঠিত হবে, সেগুলিও একই সমস্যায় জর্জরিত। বর্তমান আলোচনায় Archive ও Repertoire-এর বিতর্কটি উঠে আসতে বাধ্য। সেই বিতর্ক থেকে প্রশ্ন আসে, গবেষক বা ঐতিহাসিক রচনাকার একটি ঘটনার সরাসরি

অভিজ্ঞতা হয়তো লাভ করার সুযোগ পেল। কিন্তু সেই অভিজ্ঞতাকেও শব্দবন্ধনের মাধ্যমে যথাযথভাবে লিপিকরণ করা কি আদৌ সম্ভব? ধরা যাক, একজন গবেষক সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষদের নাচ নিয়ে গবেষণা করতে গেল। সে তাদের একটি নৃত্যানুষ্ঠানে অংশও নিল, তার যথেষ্ট অভিজ্ঞতাও হল। কিন্তু নাচ চলাকালীন তার শরীরের তাল-লয়-ছন্দ-অনুভূতিকে সে কিভাবে লিপিকরণ করবে? নাচ করার সময় তার মনের ও শরীরের আসল অবস্থা ঠিক কী ছিল, সহশিল্পীদের সঙ্গতে নৃত্যানুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার অভিজ্ঞতাটি ঠিক কেমন ছিল, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা শব্দের মাধ্যমে লিখে রাখা কি আদৌ সম্ভব? শব্দ কি সত্যিই বক্তা বা লেখকের গভীর সূক্ষ্মতম অনুভূতির সম্পূর্ণ প্রকাশ করে উঠতে পারে? যা বলতে চাই, যা লিখতে চাই, তার হুবহু প্রতিফলন কি শব্দ আনতে পারে?

এই কারণেই Performance-এর Performative-এর আলোচনায় Repertoire-এর গুরুত্ব অনেক বেশি হয়ে যায়। একটি পার্ফর্মেন্সের Video বা Audio Recording সংক্রান্ত আলোচনায় তৃণা নিলীনা ব্যানার্জির বিশ্লেষণ:

> If ‘performance’ is something that can never be replicated exactly for each subsequent occasion and the elusive quality of ‘liveness’ is something that is formed uniquely at every instance of performance in a network of temporary, brief, contractual but social relationships, between the performers and the particular audience that night, then the hope that a recording (especially of a performance that is not produced for a live audience) will contain the qualities of a complete archival document for analysis and ‘thick description’ seems inadequately founded. (*Performing Silence* 39)

এই উক্তি থেকে বোঝা যাচ্ছে, একটি পার্ফর্মেন্সের ভিডিও বা অডিও রেকর্ডিং-এ তার ‘জীবন্ত’ থাকার উপকরণগুলি হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এই বিশ্লেষণ থেকে আমার নাট্য গবেষণার বিষয়ে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক উঠে আসে। আমার গবেষণার বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্যাবলির ‘প্রাণবন্ততা’ বা ‘liveness’-এর বৈশিষ্ট্যগুলি হারিয়ে গেছে, এই ব্যাপারে সচেতন থাকা প্রয়োজন। এই বিষয়ে Peggy Phelan তাঁর ‘Ontology of Performance: representation without reproduction’ রচনার শুরুতেই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন:

> Performance's only life is in the present. Performance cannot be saved, recorded, documented or otherwise participate in the circulation of representations of representations; once it does so, it becomes something other than performance... becomes itself through disappearance... The document of a performance then is only a spur of memory, an encouragement of memory to become present. (146)

অর্থাৎ, বর্তমানেই পার্ফর্মেন্সের অস্তিত্ব সীমাবদ্ধ থাকে। পার্ফর্মেন্সকে সংরক্ষণ করা যায় না, লিপিকরণ করা যায় না। যদি তা করা হয়, তাহলে তা পার্ফর্মেন্স না হয়ে অন্য কিছু হয়ে যায়। পার্ফর্মেন্স শেষ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে হারিয়ে যায়, হারিয়ে যাওয়ার মধ্যে দিয়েই বেঁচে থাকে, বেঁচে থাকে চেতনায়, বেঁচে থাকে স্মৃতিতে। সেই স্মৃতি, সেই অভিজ্ঞতা, সেই হারিয়ে যাওয়া অনুভূতিটুকুই পার্ফর্মেন্স বিষয়ক আকর তথ্যসামগ্রী। এই document-এর কোনো সংরক্ষণ হয় না; এই document মিশে থাকে দর্শক বা উপভোক্তার অস্তিত্বে। Phelan ও ব্যানার্জীর মত অনুসরণ করলে Embodiment, Presence ও Experience-এর ভাবনাগুলো আমাদের অনেক কিছু বিষয়েই Archive-এর চিরাচরিত নির্ভরশীলতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে ও Repertoire-এর ধারণাগুলো আমার গবেষণার ভাবনাকে উদ্বুদ্ধ করার সম্ভাবনা রাখবে। (এই বিষয়ে পরবর্তী 'পার্ফর্মেন্স, থিয়েটার, নাটক, অভিনয়ঃ আন্তর্সম্পর্ক, ব্যাখ্যা, বৈশিষ্ট্য' অংশে আরও বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।)

কিন্তু এই স্মৃতি বা অভিজ্ঞতার বিষয়টিও আমার গবেষণা কাজে অনুপস্থিত। Phelan-এর কথা অনুসারে নাটক শেষ হওয়ার পর তার আর কোনো শারীরিক অস্তিত্ব থাকে না। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে নাটক নিয়ে কিছু লেখাটাই খুব দ্বন্দ্বের হয়ে যায়। তার ওপর আমার কাজ সেই বায়বীয় অস্তিত্বের ইতিহাস রচনায়। ফলে তা আরও অনেক বেশি জটিল আবর্তে বেঁধে যায়, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এই কারণে, গতানুগতিক ইতিহাস চর্চায় যাকে Primary Material বা Secondary Material বলে নির্দেশ করা যায়, আমার কাজের ক্ষেত্রে তাদের সংজ্ঞা বদলে যেতে থাকে। যে সময় নিয়ে আমার কাজ সেই সময়ের নাট্য প্রযোজনা দেখার আমার উপায় নেই বা সেই সময়কার কোনো নাট্যব্যক্তিত্ব বা দর্শকের সান্নিধ্য পাওয়ারও আমার উপায় নেই। তাই সেই সময়ের যে যে নাট্যপ্রযোজনা নিয়ে আমার কাজ, সেগুলির সমসাময়িক লেখালেখি বা সেই প্রযোজনার সঙ্গে যে নাট্যব্যক্তিত্বরা যুক্ত ছিলেন, কিংবা কোনো

দর্শকের স্মৃতিচারণার বিবরণীই আমার গবেষণার প্রাথমিক তথ্য বা Primary Material হিসেবে গ্রহণ করতে আমি বাধ্য।

এছাড়া, কিছু ক্ষেত্রে মূল নাট্য টেক্সটগুলি সমসাময়িক ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করতে আমার কাজে এসেছে। এক্ষেত্রে আবার তৃণা নিলীনা ব্যানার্জির পর্যবেক্ষণটি উল্লেখযোগ্য। Phelan-এর পথ ধরে তৃণা নিলীনা ব্যানার্জী বলেন, 'The play as literary text is only one source of the performance and its interpretation in a particular production creates only a source performance text that is re-produced, but never repeated, at every instance of its performance' (*Performing Silence* 40)। অর্থাৎ, নাটকের যে মূল টেক্সটটিকে ভিত্তি করে আমার কাজ করেছি, সেটি আসলে একটি সাহিত্যিক টেক্সটমাত্র। সেই নাটকটি মঞ্চে অভিনীত হওয়ার সময় কীভাবে পাল্টে যেত, তা আমার জানা নেই। শুধু সংলাপ পাল্টানো বা অভিনয়ের ধরন পাল্টানোর কথা নয়; গোটা নাটকটি মঞ্চে অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় তার ড্রামাটিক টেক্সট থেকে পার্ফর্মেন্স টেক্সট হয়ে ওঠার যে বিবর্তন, সেটি আমার অভিজ্ঞতার বাইরে। এমনকি, এক নাটকের একেক দিনের অভিনয় একেক বিশিষ্টতায় উন্নীত হত। সামাজিক, রাজনৈতিক, পারিপার্শ্বিক, ব্যক্তিগত নানান কারণে একই নাট্য প্রযোজনা রোজ আলাদা হয়ে যায়। আর্কাইভ থেকে পাওয়া মূল টেক্সটটি আমায় সেই বিভিন্নতায় ভরা পার্ফর্মেন্স ইতিহাসের খবর দেয় না। আমার হাতে তুলে দেয় একটিমাত্র স্থায়ী কঠোর অনড় টেক্সট। খুব বেশি হলে সেই টেক্সটের দুই বা তিনটে সংস্করণ মিলতে পারে। কিন্তু মূল মঞ্চের পার্ফর্মেন্সের গতিশীলতার অভিজ্ঞতায় নিয়ে যেতে পারে না আর্কাইভ। আমার গবেষণা হয়ে পড়ে দূর থেকে দেখা ইতিহাসের ঘটনার সীমাবদ্ধ, খণ্ডিত, আংশিক কিছু বিশ্লেষণ মাত্র।

তথ্যসামগ্রীর হদিশ

শুরুতেই বলে রাখা ভালো, এই গবেষণায় বারবার 'ঐতিহ্যবাহী' এবং 'আধুনিক' এই ক্যাটেগরিগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলা নাট্য ইতিহাসের বিশ্লেষণে 'ঐতিহ্যবাহী' ও 'আধুনিক', এই দুইটি ক্যাটেগরির মধ্যেকার যে পারস্পরিক আদান-প্রদান বা সংঘর্ষ, সেই বিষয়ক আলোচনায় 'ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি' ও 'আধুনিক সংস্কৃতি' নিয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে (ভূমিকার মধ্যে বাঙালির থিয়েটারের উৎপত্তির সময় অংশে)। বর্তমান অংশে এই বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দিতে চাইছি। সৈয়দ জামিল আহমেদের গবেষণার সূত্র ধরে এই সূত্রে বলা যায়, '... 'tradition' as a shorthand denoting the artistic inheritance from pre-colonial native past, and the 'modern'

to artistic works that arose in consequence of the disjunction from tradition resulting from the British colonization' ('Footprints of the' 62)। পূর্ব-ঔপনিবেশিক সময়কার দেশীয় শিল্প ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারকে বলা হচ্ছে 'ঐতিহ্যবাহী' এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সময়ে 'ঐতিহ্য' থেকে সরে এসে যে নতুন শিল্পসংস্কৃতির প্রচলন হল, তাকে বলা হচ্ছে 'আধুনিক'। কোনটা 'ঐতিহ্যবাহী' ও কোনটা 'আধুনিক', এই বিশিষ্টতা নিয়ে বিতর্ক অনেক। কিন্তু আমার কাজের সুবিধের জন্য জামিলবাবুর বিশ্লেষণটিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

এর পাশাপাশি 'থিয়েটার', 'নাটক', 'বাংলা থিয়েটার', 'প্রসেনিয়াম থিয়েটার', 'পার্ফর্মেন্স' এই শব্দগুলোও বহু সময় ব্যবহৃত হয়েছে। এই সূত্রে আবারও উল্লেখ্য, সৈয়দ জামিল আহমেদের ব্যাখ্যা, ' ... 'theatre' denotes any artistic creation presented by live performers in the presence of live spectators in any three-dimensional space' ('Footprints of the' 62)। অর্থাৎ 'থিয়েটার' হল এমন একটি জীবন্ত শিল্পসৃষ্টি যা একটি থ্রি-ডাইমেশনাল জায়গায় জীবন্ত অভিনেতা দ্বারা ও জীবন্ত দর্শকের সামনে পরিবেশিত হয়। জামিলবাবুর ব্যাখ্যার সঙ্গে আর একটি মাত্র বৈশিষ্ট্য আমার গবেষণায় চিহ্নিত করা হয়েছে। আমার কাছে বাংলা নাট্য ইতিহাস আলোচনায় 'থিয়েটার' হল, এমন এক জীবন্ত উপস্থাপনা যা বিশেষভাবে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক 'থিয়েটার' কাঠামোর অনুসরণে 'গড়ে তোলা' এক শিল্পমাধ্যম। এই বিশেষ ধরনের শিল্পমাধ্যমটিকে 'গড়ে তোলা' হয়েছে। 'ব্রিটিশ থিয়েটার' ও 'দেশজ সাংস্কৃতিক উপস্থাপনা'গুলির মিশেলে 'গড়ে তোলা' এই 'আধুনিক' বাংলা 'থিয়েটার'। অর্থাৎ, 'থিয়েটার', 'নাটক', 'বাংলা থিয়েটার', 'প্রসেনিয়াম থিয়েটার'-এই শব্দগুলো মূলতঃ 'আধুনিক' (আধুনিক, অর্থাৎ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সময়ে 'ঐতিহ্য' থেকে সরে আসা নতুন শিল্পসংস্কৃতি) জীবন্ত উপস্থাপনা, যা একটি ত্রিমাত্রিক স্থানে জীবন্ত দর্শকের সামনে উপস্থাপিত।

বাংলা নাট্য ইতিহাসের আকরগ্রন্থগুলি

পরবর্তী অংশে আমি বেশ কিছু গবেষণা গ্রন্থের আলোচনা করব। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস বলতে যে প্রচলিত কাঠামোটিকে বোঝায়, এই গ্রন্থগুলিতে সেই বিষয়গুলিকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়েছে বলে মনে হয়।

বাংলা থিয়েটারের সামগ্রিক ধারাবাহিক রচিত ইতিহাস গ্রন্থ হিসেবে দর্শন চৌধুরীর লেখা *বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস* ও *উনিশ শতকের নাট্যবিষয়* এই বই দুইটি খুব কাজে লেগেছে। প্রথম গ্রন্থটিতে বাংলা থিয়েটারের গোড়ার

কথা থেকে গণনাট্য আন্দোলন বা তারও পরবর্তী নাট্য প্রবাহের বিস্তৃত ইতিহাস বিবৃত করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় গ্রন্থে উনিশ শতকের নাট্যচর্চা সংক্রান্ত কিছু বিশেষ বিষয় নিয়ে আলাদা আলাদা কিছু প্রবন্ধ আছে। অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ ভঙ্গিতে বাংলা নাটকের ধারাবাহিক ইতিহাসটি বর্ণিত হয়েছে এই গ্রন্থগুলিতে। প্রতিটি অধ্যায়ে বিষয় ভাবনার পাশাপাশি বেশ কিছু তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যা আমার গবেষণার কাজে খুবই গুরুত্বপূর্ণ জায়গা নিয়েছে।

মূল এই বই দুইটির সঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরেকটি নাট্য ইতিহাস গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য সেটির নাম হল, *বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস*। এই বইটিতে ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে গেরাসিম লেবেদফের নাট্য পরিকল্পনা থেকে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের নাট্যচর্চার ইতিহাসটি লিপিকরণ করা হয়েছে। এই বইটিতে ১৭৯৫ থেকে ১৮৭৬ সাল পর্যন্ত বাংলা নাটকের যাবতীয় কর্মকাণ্ড চলেছে, তার নথিকরণের কাজ করা হয়েছে; এই গ্রন্থে ঘটনার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের তুলনায় বাংলা নাট্য সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশনেই বেশি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ব্রজেন্দ্রনাথের এই গ্রন্থটিকে বাংলা নাট্য ইতিহাসের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আকরগ্রন্থ ধরা যায়।

বিষ্ণু বসুর লেখা *বাবু থিয়েটার* নামের সংক্ষিপ্ত বইটিতে বাংলা থিয়েটারের গোড়ার দিকে উচ্চবিত্ত বাবু সম্প্রদায়ের মানুষদের থিয়েটার উদ্যোগের গভীর বিবরণী আছে। *বাবু থিয়েটার* বইটি বিষ্ণু বসু মহাশয় কর্তৃক মূলত কলকাতার বাবুদের উদ্যোগে যে নাট্যধারার প্রচলন হয়েছিল সে বিষয়ে লিখিত হয়েছে; এই বইটিতে শুধু ঘটনা পরম্পরা নয়, বিষ্ণু বসু বাংলা থিয়েটারের সুবৃহৎ ইতিহাসের শুরুর দিকে ঘটনাবলীকে তাঁর সুনিপুণ রাজনৈতিক লেখনিতে সংক্ষেপে বিশ্লেষণও করেছেন।

বাংলা থিয়েটারের উৎস থেকে ধীরে ধীরে বিবর্তনের ইতিহাসটি সংক্ষেপে অথচ তথ্যনির্ভর করে বিবৃত হয়েছে সুবীর রায়চৌধুরীর *বিলাতি যাত্রা থেকে স্বদেশী থিয়েটার* বইটিতে। লেবেদফের সময় থেকে গণনাট্য আন্দোলন পর্যন্ত নাট্য ইতিহাসকে বিচার বিশ্লেষণ করে লিখিত হয়েছে এই বইটি। ধারাবাহিক ইতিহাস না লিখে এই বইটি বাংলা নাটকের স্বরূপ ব্যাখ্যা করার প্রয়াস করেছে, যা আমার গবেষণায় অত্যন্ত জরুরী একটি প্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এছাড়াও হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের *The Indian Stage* নামের চার খণ্ডে সমাপ্ত বইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একেবারে ঋক্‌বেদের সময় থেকে আধুনিক বাংলা থিয়েটারের সামগ্রিক ইতিহাসটিকে এই গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে। এই বইটি বাংলা নাট্য ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করার ক্ষেত্রে একেবারে মৌলিক তথ্যাবলীর সন্ধান দেয়। ফলে আমার কাজের জন্য এই বইটির ভূমিকা অপরিসীম।

এর পরের গুরুত্বপূর্ণ বইটি হল সুশীল মুখার্জীর রচনা, *The Story of Calcutta Theatres: 1753 to 1980*। এই বইতে ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে কলকাতার ব্রিটিশ অধিবাসী মহলে নাট্যচর্চার ইতিহাস থেকে স্বাধীনতা পরবর্তী সময় ও তারও পরে বিশ শতকের আটের দশক পর্যন্ত নাট্য ইতিহাসের এক বিস্তৃত ধারাবিবরণী আছে। দু'শো বছরের বেশি সময় ধরে বয়ে চলা নাট্য প্রবাহকে অনুধাবন করতে এই গ্রন্থটি ভীষণ সাহায্য করে।

এছাড়াও বিশিষ্ট নাট্য গবেষক শংকর ভট্টাচার্যের *বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান* বইটি নাট্য ইতিহাসের ধারাবাহিক তথ্যাবলীগুলিকে অনুসরণ করতে অত্যন্ত দরকারি হয়েছিল। কিরন্ময় রাহার রচনা *Bengali Theatre* গ্রন্থটিও এই ধারাবাহিক ইতিহাসটিকে বোঝার জন্য ভীষণ বড় ভূমিকা নিয়েছে।

উপরিউক্ত নাট্যগ্রন্থগুলির পাশাপাশি *বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস,* অজিতকুমার ঘোষ (ভারতীয় নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা ও উনিশ শতকীয় সমাজে উল্লেখযোগ্য নাট্যপ্রবাহ নিয়ে আলোচনা রয়েছে এই গ্রন্থে); *উনিশ শতকের নাট্য বিষয়,* দর্শন চৌধুরী (উনিশ শতক থেকে ধারাবাহিকভাবে যে থিয়েটার কলকাতায় গড়ে উঠেছে তার অবস্থা, নীতি, আদর্শ, নাট্যদল, নাট্যাধ্যক্ষ, দর্শক, সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাস ইত্যাদি নিয়ে সামগ্রিক আলোচনার প্রয়াস রয়েছে এই গ্রন্থে); *একশো বছরের নাট্য প্রসঙ্গ,* দেবনারায়ণ গুপ্ত (বাংলা তথা কলকাতা থিয়েটারের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার প্রয়াস লক্ষিত হয় এই গ্রন্থে)।

পূর্ববঙ্গের থিয়েটার সম্পর্কিত বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে, পূর্ববঙ্গের লেখকদের লেখাগুলি। এই সূত্রে উল্লেখ্য, নৃপেন্দ্র সাহা সম্পাদিত *বাংলাদেশের থিয়েটার* বইটি। এই বইতে আমি বাংলাদেশের থিয়েটারের আদিলগ্ন থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত সময়ের একটি বিস্তারিত ছবি পেয়েছি। এই বইতে হায়াৎ মামুদ, মুনতাসীর মামুন, সৈয়দ জামিল আহমেদ –এর মতো বিশিষ্টজনেদের রচনা আমার বাংলা নাট্য ইতিহাস সম্বন্ধীয় নানা তথ্যের জোগান দিয়েছে এবং নাট্য ইতিহাস রচনার প্রক্রিয়া নিয়ে আমার চিন্তাপদ্ধতিকে দিশা দেখিয়েছে।

রথীন চক্রবর্তী সম্পাদিত *বাংলা পেশাদারি থিয়েটারের একটি ইতিহাস* পত্রিকায় ঢাকা ও কলকাতা থিয়েটার সম্পর্কে যে প্রবন্ধাবলীর সন্ধান পেয়েছি সেগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। উনিশ শতকের শেষ পর্যায় থেকে কলকাতা ও ঢাকায় যেরকমভাবে পেশাদারি থিয়েটারের বিবর্তন ঘটেছে এবং তার গতিপ্রবাহে যে টানাপোড়েন, সংগ্রাম, বিশিষ্টতা লক্ষিত হয়েছে, তার নিবিড় বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই গ্রন্থে। বিশেষ করে এই গ্রন্থের প্রথম পর্বের প্রবন্ধগুলি আমার

গবেষণা বিষয়ের সঙ্গে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ হিসেবে আমায় উপকৃত করেছে। উক্ত গ্রন্থে মুনতাসীর মামুন, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতকুমার ঘোষের রচনাগুলি আমায় নতুন তথ্য ও বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ করেছে।

মৌলিক নাটক ও গ্রন্থাবলী

এর পাশাপাশি বেশ কিছু মৌলিক নাটক ও গ্রন্থ আমার গবেষণায় খুব কাজে লেগেছে। যেমন-

গেরাসিম লেবেদফের লেখা *কাল্পনিক সংবদল* নাটকটির দুইটি সংস্করণ আমার গবেষণায় প্রভূত কাজে লেগেছে। পাশাপাশি তাঁর রাশিয়ায় ফিরে গিয়ে লেখা *A Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialects* বইটিও লেবেদফের নাট্যচর্চার ইতিহাসটিকে জানতে বিশেষ জরুরী হয়ে উঠেছিল।

এছাড়া, কলকাতার ব্রিটিশ অধিবাসীদের নাট্যসংস্কৃতিটিকে বুঝতে Lt. Col. Mark Wood-এর আঁকা কলকাতার ম্যাপটি ও তার গায়ে লেখা বিবৃতিগুলি খুব কাজে লেগেছে। এই ম্যাপটি গবেষণার 'সংযোজনী ৩' অংশে সংযুক্ত করা হয়েছে। এই সূত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে ব্রিটিশ লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত J. P. Losty-র *Calcutta: City of Palaces* বইটি। এই বইটিতে আঠারো শতকের কলকাতার স্থাপত্যশিল্প ও সেই বিষয়ে লস্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণী আমার খুব কাজে লেগেছে।

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে 'বেঙ্গল থিয়েটার'-এ যে চারজন অভিনেত্রী মঞ্চে উঠেছিলেন, তাঁদের একজন ছিলেন সুকুমারী দত্ত ওরফে গোলাপসুন্দরী। পরবর্তীকালে এই গোলাপসুন্দরী একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক লেখেন বলে জানা যায়। যদিও নাটকটি সত্যিই সুকুমারীর লেখা কিনা সে নিয়ে দ্বিমত আছে। সুকুমারী দত্তের নামে প্রকাশিত সেই *অপূর্ব্বসতী নাটক* নামের নাটকটির মূল টেক্সটটি আমার গবেষণায় কাজে লেগেছে।

এছাড়াও উপেন্দ্রনাথ দাসের লেখা *শরৎ সরোজিনী* নাটক ও *সুরেন্দ্র বিনোদিনী* নাটক দুইটির মূল রচনা ও তাদের ভূমিকা অংশগুলিও খুব তাৎপর্যপূর্ণ।

তাছাড়া মধুসূদন দত্তের লেখা *রিজিয়া* নাটকের মূল টেক্সটটি নিয়ে অধ্যাপক আনন্দ লালের নবতম গ্রন্থটি খুবই উল্লেখযোগ্য।

পাশাপাশি উনিশ বিশ শতকের বিখ্যাত নাটক গিরিশচন্দ্র ঘোষের *সিরাজদ্দৌল্লা* বা *মীর কাশিম* বা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের *মেবার পতন* বা দীনবন্ধু মিত্রের *নীলদর্পণ* নাটকগুলি আমার গবেষণায় কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে।

এছাড়া নানান আত্মজীবনী বা জীবনীমূলক গ্রন্থগুলি গবেষণার কাজে সহায়তা করেছে। হায়াৎ মামুদের *গেরাসিম লিয়েবেদেফ্* বইটি লেবেদফের জীবনী নিয়ে লেখা। অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের *গিরিশচন্দ্র ঘোষ* নামের জীবনী গ্রন্থটিও সেই সময়ের নাট্যচর্চার গতিপ্রকৃতিকে বুঝতে খুব জরুরী ছিল বা বিনোদিনী দাসীর *আমার কথা* ও *আমার অভিনেত্রী জীবন* রচনা দুইটি বিনোদিনীর আত্মজীবনী মূলক ইতিহাস জানতে কাজে লেগেছে। সঙ্গে অমৃতলাল বসুর বিস্তৃত আত্মকথা ও ধর্মদাস সুরের অতি সংক্ষিপ্ত প্রায় সূত্রাকারে লিখিত আত্মজীবনীটিও আমার গবেষণায় বিশিষ্ট জায়গা নিয়েছে। উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের লেখা তিনকড়ি, বিনোদিনী ও তারাসুন্দরীর জীবনী গ্রন্থটিও এই সূত্রে উল্লেখ্য। এর পাশাপাশি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির নাট্য প্রবাহকে বুঝতে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *জোড়াসাঁকোর ধারে* বা *ঘরোয়া*, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের *জীবনস্মৃতি*, সরলা দেবী চৌধুরাণীর *জীবনের ঝরাপাতা*, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর *রবীন্দ্রস্মৃতি* ইত্যাদি বইগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

এর সঙ্গে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কনশিল্পের গতিটি বুঝতে একাডেমি অফ ফাইন আর্টস্ প্রকাশিত *Gaganendranath Tagore Souvenir Volume*-টি খুবই দরকারী ভূমিকা নিয়েছে।

আলোচ্য অংশে আরও একটি বিভাগ উল্লেখ্য। মধুসূদন দত্তের নাট্য কর্মকাণ্ডের সময়কালীন বেশ কিছু চিঠিপত্র আমার সেই সময়ের সমাজ ও পরিস্থিতিকে বুঝতে সাহায্য করেছে। এই সূত্রে নাট্যপ্রবর কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা মধুসূদন দত্তের চিঠিগুলি উল্লেখ্য। সমসাময়িক সময়ে বেলগাছিয়া নাট্যশালার স্বত্বাধিকারী ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ কেশবচন্দ্রকে যে চিঠিগুলি পাঠিয়েছিলেন সেগুলিও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই সময়ে কেশবচন্দ্রও মধুসূদনকে অনেকগুলি চিঠি লেখেন বলে জানা যায়। যদিও তার মধ্যে একটিমাত্র চিঠি আমি খুঁজে পেয়েছি। *কৃষ্ণকুমারী* নাটক লেখার প্রসঙ্গে এই চিঠিটিও খুব জরুরি ভূমিকা নিয়েছে। পাশাপাশি এই সময়ের স্মৃতি নিয়ে কেশবচন্দ্রের স্মৃতিকথাটিও খুব দরকারি। আমার গবেষণায় এই সব কয়টি চিঠি ও রচনা অনস্বীকার্য ভূমিকা নিয়েছে।

সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন বা সমালোচনা

এর পরে আমার কাজে বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছে উনিশ শতকীয় অসংখ্য সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন বা সমালোচনাগুলি। এই সূত্রে বর্তমান গবেষণার আরও একটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা প্রয়োজন। এই গবেষণার একটা বড় তথ্যসামগ্রী উৎস হল, উনিশ শতকীয় কলকাতার মুদ্রণসংস্কৃতি বা বলা ভাল, এই গবেষণার প্রধান ও মূল ভিত্তিটি স্থাপিত হয়ে রয়েছে এই নাট্য ইতিহাস বিষয়ক মুদ্রিত তথ্যাবলীর ওপর। এই মুদ্রণ শিল্প ও তার সঙ্গে পুঁজিবাদী

কাঠামোর যে লেনদেন ও সম্পর্ক, সেই বিষয়েও আমার গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক নির্ভর করে থাকবে। আঠেরো শতক থেকেই ইউরোপের বুর্জোয়া সংস্কৃতি তৈরিতে যেমন এই মুদ্রণশিল্পের বিরাট ভূমিকা, তেমনই থিয়েটারের ভূমিকা ছিল। প্যারিস, ভিয়েনা, লণ্ডন, হামবার্গ, মিলান-এর মতো বড় শহরগুলির বুর্জোয়ারা থিয়েটার দেখত, নাটক পড়ত, কফি হাউসে বসে সেগুলো নিয়ে আলোচনায় অংশ নিত। সংবাদ পত্র ও থিয়েটারের পারস্পরিক প্রভাব ইউরোপের চেতনা ও জনমত গঠনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেছিল (Zarrilli 271)।

বর্তমান গবেষণার স্বার্থে রাষ্ট্র কাকে বলে, কবে থেকে তার উৎপত্তি বা নেশন-স্টেটের ভাবনাটির সঙ্গে সেই সময়কার মুদ্রণ শিল্পের আন্তঃসম্পর্কটি ঠিক কেমন ছিল, এই বিষয়েও যথেষ্ট ওয়াকিবহাল থাকার দরকার আছে। এই সূত্রে উল্লেখ্য, আমাদের চেতনায় নেশনের ভাবনাটি ঠিক প্রাকৃতিক ভাবে আসেনি। দেশের মানুষের অস্তিত্বে এই নেশনের বোধটিকে ভীষণ ভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। এক সূত্র, এক দেশ, এক চেতনায় বাঁধতে হয়েছে সমগ্র দেশবাসীকে। নেশন-স্টেট, জাতীয়তাবাদ ও আজকের আধুনিক সমাজের মধ্যেকার এই সম্পর্ক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসন। তাঁর বই *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* বইয়ে তিনি 'Print Capitalism' বা 'মুদ্রণ পুঁজিবাদ' তত্ত্বটিকে উপস্থাপন করেন। তিনি দেখাতে চান, পূর্বে মানুষ মূলত নিরক্ষর ছিল এবং আলাদা আলাদা ভৌগলিক অবস্থানে আলাদা আলাদা ভাষার মারফত তারা একত্রিত হত। কিন্তু মুদ্রণশিল্প বা প্রেসের আবিস্কারের ফলে বিচিত্র ভাষাভাষির বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মানুষকে একই ভাষার চর্চা ও শিক্ষার অধীনে নিয়ে আসা সহজতর হয়। ইউরোপের জাতীয়তাবাদের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অ্যান্ডারসন বলেন, ইউরোপের নেশন-স্টেটের গঠন প্রক্রিয়ায় সেখানকার মুদ্রণশিল্পে ব্যবহৃত ভাষার একটা গভীর ভূমিকা আছে। সংবাদপত্র, বই, পাঠ্যপুস্তক, মানচিত্র, সরকারি বা বেসরকারি নানান নির্দেশনামা, দলিল-দস্তাবেজ—এই সবই মুদ্রণশিল্পের বিশাল আওতার মধ্যে পড়ে। অ্যান্ডারসন বলছেন, কোটি কোটি আপাত বিচ্ছিন্ন মানুষ একই মুদ্রিত সামগ্রীর উপভোক্তা হয়ে ওঠায়, তাঁরা সকলে নিবিড় সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে পড়ে। তাঁদের এই আন্তঃসম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁরা নিজেরাও ওয়াকিবহাল নন। একই সংবাদপত্র, একই ঘটনা, একই সাংস্কৃতিক খবরাখবর, একই আচার-আচরণের বর্ণনা করে মুদ্রণশিল্প এক বিশাল জনগোষ্ঠীকে এক সূত্রে বেঁধে ফেলে। আপাত ভাবে আলাদা স্থানে থাকা দুইটি জনগোষ্ঠীর মানুষ একই মুদ্রিত উপাদানটি আস্বাদনের ফলে তারা একইভাবনা, চর্চা ও একই জাতীয়তাবোধে বাঁধা হয়ে পড়ে। আমার গবেষণার মূল উৎস সামগ্রী এই মুদ্রিত সামগ্রিকে ভিত্তি করেই, যার মাধ্যমে

কলকাতার উচ্চ ও মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর রুচি, মূল্যবোধ ও জাতীয়তাবাদী চেতনাটি নির্মাণ করা হয়েছিল। সে কারণে এই মুদ্রণ-পুঁজিবাদ সংক্রান্ত ঐতিহাসিক নিরীক্ষণকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে আমার গবেষণার কাজ এগোনোর চেষ্টা করেছি।

উনিশ শতকের এই মুদ্রণশিল্পের এক অন্যতম উপাদান হল সংবাদ পত্র ও নানান পত্র পত্রিকা। সেই সময়ের বিভিন্ন সংবাদপত্রে নাট্যানুষ্ঠানের বিস্তৃত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হত। সেই বিজ্ঞাপনগুলির বিশ্লেষণ করলে অসংখ্য তথ্য ও প্রশ্ন উঠে আসে। *অমৃতবাজার পত্রিকা, সমাচার চন্দ্রিকা, হিন্দু পেট্রিয়ট, হিন্দু পাইয়োনিয়ার, এডুকেশন গেজেট, ক্যালকাটা গেজেট, ঈস্ট ইণ্ডিয়ান, এশিয়াটিক জার্নাল, দ্য স্টেস্টসম্যান, দ্য ইংলিশম্যান* এরকম বিভিন্ন সংবাদপত্র ও পত্রিকায় প্রকাশিত নাটকের বিজ্ঞাপন ও সমালোচনাগুলি আমায় গবেষণার কাজে খুব সাহায্য করেছে। এছাড়াও বিশ শতকের শুরুর দিকে বেশ কিছু থিয়েটার বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশিত হত। আমার গবেষণায় সেগুলিও খুব জরুরী জায়গা নিয়েছে। এই সূত্রে *নাচঘর, রঙ্গমঞ্চ, ছায়া ও ছবি* নামের পত্রপত্রিকাগুলি উল্লেখ্য।

বাংলা নাট্য ইতিহাস সংক্রান্ত বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থাবলী

বর্তমান গবেষণাটি করার জন্য আমি পূর্ববর্তী বেশ কিছু প্রাজ্ঞ সমাজতাত্ত্বিক ইতিহাসবিদ ও চিন্তকদের রচনাগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে বিচার করেছি। এঁদের রচনাগুলি কখনো আমায় বিচার করতে শিখিয়েছে, কখনো প্রশ্ন করতে শিখিয়েছে, কখনো অনুপ্রাণিত করেছে। বিষয়ভেদে এই গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি।

রিমলি ভট্টাচার্যের গবেষণা, গ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলিও আমার খুব কাজে লেগেছে। *Public Women in British India: Icons and the Urban Stage* বইটি ও বিনোদিনী দাসীর আত্মজীবনীর ইংরেজি অনুবাদটি এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এছাড়াও উনিশ শতকের বাংলা থিয়েটার সমাজ ও নারীর স্থান বিষয়ক নানান প্রবন্ধগুলি আমার গবেষণাকে সমৃদ্ধ করেছে।

সৈয়দ জামিল আহমেদ লিখিত *Acinpakhi Infinity: Indigenous Theatre of Bangladesh* বইটি আমার গবেষণায় এক নতুন মাত্রা দিয়েছে। বাংলাদেশের লোকনাটকের ইতিহাস ও গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে আধুনিক সমাজবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে লেখকের যে জ্ঞান, বিশ্লেষণ ও ধ্যানধারণা এই গ্রন্থে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা আমার গবেষণা কাজে পথ প্রদর্শন করেছে। বাংলাদেশের লোকনাট্যগুলির বিস্তারিত বর্ণনা, সেগুলির বিশ্লেষণপদ্ধতি এবং সেই অভিনয়কলাগুলি সামাজিক আবেদন নিয়ে জামিলবাবুর আলোচনা আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এই সূত্রে সৈয়দ জামিল আহমেদের আরেকটি গবেষণা নিবন্ধের নাম উল্লেখ্য। 'Female Performers in the Indigenous Theatre of Bangladesh' নিবন্ধে তিনি প্রাচীন সময়ের ভারতীয় নাট্যপ্রবাহে নারীচরিত্র ও সেই চরিত্রগুলির অভিনয়ের ইতিহাস নিয়ে তাঁর পর্যালোচনা সত্যিই চমকপ্রদ। পরবর্তী সময়ে মুসলমান শাসক ও বৈষ্ণব যুগের অভিনয়ধারা ও সেই সময়ের মেয়েদের অভিনয়ে অংশ নেওয়ার প্রতিবন্ধকতার বিষয়ে বিতর্ক নিয়ে তাঁর আলোচনা বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখে।

পাশাপাশি সৈয়দ জামিল আহমেদের আরও একটি প্রবন্ধ 'Footprints of the 'Outliers': Female Performers in Colonial Eastern Bengal' বিশেষ উল্লেখ দাবী করে। এই প্রবন্ধে ঐতিহ্যবাহী অভিনয়ধারার সমাজতাত্ত্বিক ইতিহাসভাবনা আমার ব্যক্তিগত ইতিহাসচেতনাকে নতুন ভাবে ভাবতে সাহায্য করেছে। এর পরে এই প্রবন্ধে ব্রিটিশ আমলের নাট্যাভিনয়ে কলকাতা ও ঢাকায় মেয়েদের অভিনয় করার গতিপ্রকৃতি নিয়ে আলোচনাটিও আমার গবেষণার কাজে ভীষণ জরুরি ভূমিকা নিয়েছে।

এর পাশাপাশি শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী, তৃণা নিলীনা ব্যানার্জির *Performing Silence: Women in the Group Theatre Movement in Bengal* বইটি এবং 'Text and Present: Thinking about 'Liveness' in Performance Studies' গবেষণা নিবন্ধ ও আলাপচারিতা, সর্বাণী গুপ্তর বেশ কিছু লেখা, আনন্দ লালের গবেষণা, Veena Oldenberg, সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায় বা তপতী গুহ ঠাকুরতার রচনা প্রমুখ বিশিষ্ট আধুনিক সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞদের কর্মকাণ্ডগুলি আমার গবেষণার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। এই সাংস্কৃতিক ইতিহাসের গবেষণাগুলি আমার হাতে তথ্য সরবরাহের কাজ শুধু করেনি। বরং তথ্যের বিচার ও বিশ্লেষণের পদ্ধতি নিয়েও আমার মতো গবেষককে পথ দেখিয়েছে।

সমাজ, রাজনীতি, ইতিহাস সংক্রান্ত তাত্ত্বিক আলোচনা সমৃদ্ধ গ্রন্থাবলী

এরপরের বিশাল অংশ জুড়ে আছে, আমার গবেষণার তাত্ত্বিক ক্ষেত্রটি। সেই কাজে বেশ কিছু বই বা প্রবন্ধ বা গবেষণা নিবন্ধ আমার গবেষণাটির তাত্ত্বিক পরিসরটির ভিত্তি মজবুত করেছে। বর্তমান অংশে সেই গ্রন্থগুলির আলোচনা না করলে আমার কাজটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। প্রথমেই বলতে হয় অধ্যাপক পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সমাজ, রাজনীতি ও ইতিহাস চেতনা নিয়ে বিস্তৃত কর্মকাণ্ড আমার গবেষণার বিচারধারাকে পরিশীলিত করতে খুব সাহায্য করেছে। ইতিহাস সম্পর্কিত নব্য চেতনা ও যুক্তিপম্পরার পদ্ধতিটি নিঃসন্দেহে আমার কাজের গতিমুখ নির্ধারণ করতে

শিখিয়েছে। তাঁর বাংলা ও ইংরেজি গ্রন্থ ও নিবন্ধগুলি উনিশ শতকীয় সমাজ, তার স্বকীয়তা, রক্ষণশীলতা, প্রগতির উৎসাহ—সমস্ত বিষয়ে নির্মোহ আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করতে খুবই সাহায্য করেছে। তার *ইতিহাসের উত্তরাধিকার*, *Nation and its Fragments*, *জন প্রতিনিধি*, *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, *প্রজা ও তন্ত্র* ইত্যাদি বইগুলি ও পাশাপাশি আরও অসংখ্য প্রবন্ধাবলী আমার কাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সহায় হয়ে উঠেছে।

এছাড়াও সুমন্ত ব্যানার্জীর *Dangerous Outcast: The Prostitute in Nineteenth Century Bengal, The Parlour and the Streets: Elite and Popular Culture in Nineteenth Century Calcutta, Under the Raj: Prostitution in Colonial Bengal, উনিশ শতকের কলকাতাঃ সরস্বতীর ইতর সন্তান* ইত্যাদি বইগুলি বাঙালির সংস্কৃতির ইতিহাস ও বিবর্তনকে বুঝতে সাহায্য করেছে। সুমন্ত ব্যানার্জির উনিশ-বিশ শতকীয় কলকাতার সাংস্কৃতিক বিবর্তনের গবেষণা নিবন্ধগুলির (যেমন- *'The 'Beshya' and the 'Babu': Prostitute and Her Clientele in 19th Century Bengal.', 'Marginalisation of Women's Popular Culture in Nineteenth-century Bengal'*) প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এই গবেষণা কার্যগুলি আমার চিন্তাশক্তিকে সমৃদ্ধ করেছে, ইতিহাস বিচারের পদ্ধতি পরিবেশন করেছে এবং নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে দেখার প্রেরণা জাগিয়েছে।

পার্ফর্মেন্স, থিয়েটার, নাটক, অভিনয়ঃ আন্তর্সম্পর্ক, ব্যাখ্যা, বৈশিষ্ট্য

বর্তমান গবেষণায় 'থিয়েটার', 'নাটক', 'অভিনয়', 'পার্ফর্মেন্স'-শব্দগুলি বারে বারে ব্যবহৃত হয়েছে। কাকে থিয়েটার বলব, কাকে পার্ফর্মেন্স ধরব, নাট্য ও নাটকের মূলগত পার্থক্য কী, লোকনাটকের অভিনয়কে নাট্যাভিনয় বলব নাকি টোটাল পার্ফর্মেন্স বলব, এ ব্যাপারে বিশ্বব্যাপী প্রভূত আলোচনা হয়েছে, আজও হয়ে চলেছে। বর্তমান গবেষণার প্রয়োজনে এই গবেষণা নিবন্ধে সূত্রাকারে অত্যন্ত সংক্ষেপে পার্ফর্মেন্স সংক্রান্ত মতামতগুলি খানিক ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন মনে করছি।

প্রথমেই রিচার্ড শেখনারের বক্তব্য উল্লেখ্য। তাঁর মতে, আজ যাকে 'থিয়েটার' বলে বুঝি, তা আসলে 'পার্ফর্মেন্স' বলতে যে বিশাল পরিসরকে বোঝায়, তার মধ্যেকার একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশমাত্র (17)। তাঁর মতে, খেলা, ধর্মীয় আচার, রোজকার জীবনের কাজকর্ম, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, সামাজিক নানান কর্মকলাপ, মিছিল ইত্যাদির মধ্যেও পার্ফর্মেন্স মিশে থাকে। এই সমস্ত কার্যাবলীগুলি কখনোই আগে থেকে তৈরি করা কোনো নির্দিষ্ট স্ক্রিপ্ট মেনে

অনুষ্ঠিত হয় না। যদিও দীর্ঘদিনের অনুষ্ঠানের অভ্যাসে এগুলির অনেক সময়েই একটি সাংস্কৃতিক স্ক্রিপ্ট তৈরি হয়ে গিয়ে থাকে।

এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী অংশে (ভূমিকার মধ্যে 'প্রাথমিক তথ্যসামগ্রীর সীমাবদ্ধতা' অংশে) এই বিষয় নিয়ে Peggy Phelan ও তৃণা নিলীনা ব্যানার্জীর পর্যবেক্ষণ কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে । তাই এই মুহূর্তে এই বিষয়ে বেশি ব্যাখ্যা করা হল না। শুধু এ কথা বলা দরকার, বর্তমান গবেষক পার্ফর্মেন্স শব্দটিকে একটি কঠোর, সীমাবদ্ধ, আর্কাইভভুক্ত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে শুধু ভাবতে চায়নি; আর্কাইভের বাইরে যে বিরাট জগত, যার কোনো গণ্ডিভূক্ত সীমা নেই, যার নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা নেই, অনেকটাই খোলামেলা যার পরিসর, অনেক শরীরী (embodied) যার বিশিষ্টতা, সেই রেপের্টয়্যারের একটি ক্ষণস্থায়ী প্রকাশ হিসেবে গ্রহণ করতে চেয়েছে। ফলে জীবন্ত শিল্প-আঙ্গিকের ইতিহাস আলোচনায় বারবার উক্ত শিল্প পরিবেশনার সময়কার সমাজ নিরীক্ষণ, তাৎক্ষণিকতা ও জীবন্ত বৈশিষ্ট্যের অভাব বোধ করেছে।

এই সূত্রে তৃণা নিলীনা ব্যানার্জী তাঁর রচনায় খেয়াল করাচ্ছেন, পার্ফর্মেন্স-এর এই জীবন্ত বৈশিষ্ট্যটি গবেষককে এক সমস্যার মুখোমুখি করে তোলে। পার্ফর্মেন্সের এই জীবন্ত অথচ ক্ষণস্থায়ী ও অনিশ্চয়তার বৈশিষ্ট্য গবেষক কীভাবে মুখোমুখি হবেন সেই বিষয়ে তাঁর পর্যবেক্ষণ। তৃণা নিলীনা ব্যানার্জী লক্ষ্য করছেন, 'How is one, as a scholar or a historian, meant to grapple with this particularly elusive, fragile and ultimately contingent quality of live performance, given that conventional archival and documentary sources can hardly ever be enough to capture its contextual and living complexity? ('Text and Present' 208)। একজন ইতিহাস গবেষক জীবন্ত একটি পার্ফর্মেন্সের এমন একটি ক্ষণস্থায়ী, মায়াবী, অনিশ্চিত বৈশিষ্ট্যকে কি সত্যি মহাফেজখানার তথ্যসামগ্রীর মধ্যে পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেন? এই সূত্রে Peggy Phelan বলছেন, রেকর্ডেড পার্ফর্মেন্স হয়তো মূল অভিনয়ের স্মৃতি সম্পর্কে এক ধরনের সেকেন্ড হ্যান্ড ধারণা দিতে পারে, কিন্তু সেই অভিনয়ের 'জীবন্ত' হয়ে ওঠার যে বৈশিষ্ট্য, সেটির ধারণা থেকে দূরে থেকে যায়। যে পার্ফর্মেন্স পুনর্নির্মিত (reproduce) হয়, সেটি পার্ফর্মেন্স নয়, অন্য কিছু হয়ে ওঠে (Phelan 146)।

Marvin Carlson-এর মতে 'পার্ফর্মেন্স' সত্যিই কী এ ব্যাপারে কোনো সরল উত্তর পাওয়া মুশকিল। 'পার্ফর্মেন্স' শব্দটা অনেক ব্যাপক, অনেক বিস্তারিত। Carlson বলছেন, '...our lives are structured according

to repeated and socially sanctioned modes of behavior raises the possibility that all human activity could potentially be considered as 'performance,' or at least all activity carried out with a consciousness of itself' (4-5)। 'পার্ফর্মেন্স' হল সচেতনভাবে কৃত একটি ক্রিয়া যেটি অন্য যে মানুষ সেই কাজটি দেখবে, তার ওপর কিছু প্রভাব ফেলবে। অর্থাৎ একটি সাধারণ ক্রিয়া যেটি একটি সাধারণ স্থানে ঘটছে, সেটি পার্ফর্মেন্স নয়। কিন্তু সেই সাধারণ ক্রিয়াটিই যদি একটি 'বিশেষ' স্থানে ঘটে যেখানে সেই ক্রিয়াটিকে কেউ 'বিশেষ'ভাবে দেখছে, একটি বিশেষ ফ্রেমের মধ্যে দিয়ে দেখছে, লক্ষ্য করছে এবং তার ওপর সেই ক্রিয়াটির কিছু প্রভাব পড়ছে, সে ক্রিয়াটিকে কোনো না কোনো ভাবে ব্যাখ্যা করতে চাইছে এবং যে মানুষটি ক্রিয়াটি করছে তাকেও সচেতন করে রাখছে, তাহলে সেই ক্রিয়াটি হয়ে উঠবে পার্ফর্মেন্স। তাঁর মতে, 'সচেতন'তার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে একটি ক্রিয়াকে পার্ফর্মেন্স হিসেবে গড়ে তুলতে। ক্রিয়াটি যে করছে এবং ক্রিয়াটি যে বিশেষভাবে দেখছে দুইজনেই সচেতন থাকছে। একটি সাধারণ ক্রিয়া যদি কেউ সচেতনভাবে একটি বিশেষ ফ্রেমের মধ্যে দিয়ে না দেখে, তাহলে সেটা পার্ফর্মেন্স হচ্ছে না। কিন্তু কেউ সচেতনভাবে এই সাধারণ ক্রিয়াটিকে দেখছে এবং বিশ্লেষণ করছে, এই সচেতনতা একটি ক্রিয়াকে পার্ফর্মেন্স করে তুলছে। এই হিসেবে ভাবলে নৃত্য, নাটক সবই যেমন পার্ফর্মেন্স, তার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক জীবনে রোজকার দিনযাপনের মধ্যে সবসময়েই পার্ফর্মেন্স ঘটে চলেছে। সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে Marvin Carlson জানাচ্ছেন,

> The function of performance within a culture, the establishment and use of particularly designated performative contexts, the relation of performer to audience and of the reporter of performance to performance, and the generation and operations of performance drawing upon or influence by several different cultures—all of these cultural concers have contributed importantly to contemporary thought about what performance is and how it operates. (29)

অর্থাৎ, একটি সংস্কৃতির মধ্যে পার্ফর্মেন্সের কার্যকারিতা, বিশেষভাবে গঠিত পার্ফর্মেটিভ বৈশিষ্ট্যের প্রতিষ্ঠা ও তার ব্যবহার, দর্শকদের বা প্রতিবেদকদের সঙ্গে পার্ফর্মেন্সের সম্পর্ক, এবং পার্ফর্মেন্সের ওপর বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাব—

এই সব কিছু আধুনিক যুগের পার্ফমেন্স নিয়ে আলোচনায় জায়গা করে নেয়। এবং এই অসংখ্য বিষয়গুলিই নির্ধারণ করে 'পার্ফর্মেন্স' কী এবং তার ক্রিয়াপদ্ধতি।

তত্ত্বের গভীর বিশ্লেষণে না গিয়ে খুব সাধারণ অর্থে 'পার্ফর্মেন্স' বলতে আমরা শিল্পকলার জগতে এমন এক দৃষ্টান্তকে বুঝি, যেখানে যেকোন ধরনের শৈল্পিক উপস্থাপনা করা হচ্ছে এবং যার মধ্যে নৃতাত্ত্বিক থেকে শুরু করে ভাষাতাত্ত্বিক দর্শন এবং আরও নানান বিদ্যাশৃংখলার শাখাগুলি পরস্পর সম্পৃক্ত ভাবে দেখা দিচ্ছে। 'পার্ফর্মেন্স' বলতে কোনো একটি বিশেষ ডিসিপ্লিনের অন্তর্ভুক্ত কঠোর কোনো সংজ্ঞায়িত বিষয়কে বোঝানো হয়তো যাবে না। 'পার্ফর্মেন্স' বা অভিকরণ শিল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি অনেকটাই অনির্দিষ্ট, বহুস্বরিক। 'পার্ফর্মেন্স' নিয়ে আলোচনায় বারবার উঠে আসে তার প্রক্রিয়া, তাৎক্ষণিকতা, শারীরিক বা মৌখিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ইত্যদি নিয়ে আলোচনা, যা জীবন্ত, সেই মূহূর্তে ঘটা কোনো ঘটনা। আর তাই পৃথিবীর কোনো পার্ফর্মেন্সকে তার জীবন্ত বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে বিচ্যুত করা যায় না। Diana Taylor তাঁর Translating Performance প্রবন্ধে সংক্ষপে 'পার্ফর্মেন্স' শব্দটির যে বিস্তার ও শক্তি সেটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন,

> *Performance* carries the possibility of challenge, even self-challenge, within it. As a term simultaneously denoting a process, a praxis, an episteme, a mode of transmission, an accomplishment... The problem of untranslatability, as I see it, is actually a positive one, a necessary stumbling block... (49)

অর্থাৎ 'পার্ফর্মেন্স' শব্দটি একটি চ্যালেঞ্জের সম্ভাবনাকে বহন করে, এমনকি সে নিজেকেও প্রশ্ন করে। এই একটি শব্দ দিয়ে বোঝানো যায়-একটি প্রক্রিয়াকে, একটি অভ্যাসকে, একটি বৌদ্ধিক জ্ঞান। এই শব্দের ব্যাখ্যা করা দুরূহ কাজ, আর সেটাই একটি ইতিবাচক দিক।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'নাটক', 'থিয়েটার', 'পার্ফর্মেন্স'-এর আলোচনা বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিল্পী ও শিল্পকে একত্র সন্নিবিষ্ট করে তোলে। যে কোনো পরিবেশনা, যদি তা কোনো ছোটো ঘরের ভেতরেও পরিবেশিত হয়, তা হলেও তা একাধিক মানুষের হাত ধরে কোনো না কোনো উপভোক্তার উদ্দেশ্যেই প্রদর্শিত হয়। আর এভাবেই সেই পরিবেশনা হয়ে ওঠে জীবন্ত। এই সূত্রে উল্লেখ্য, এই গবেষণায় কিছু ক্ষেত্রে লোকনাটক বা ঐতিহ্যবাহী নাটকের সঙ্গে শহুরে ঔপনিবেশিক মঞ্চ-পরিবেশনাগুলির পারস্পরিক সংঘাত ও সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা এসেছে। সেক্ষেত্রে অনেক সময়েই 'লোকশিল্প',

'থিয়েটার', 'পার্ফর্মেন্স', 'নাটক'-এই শব্দগুলি পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। বর্তমান গবেষণায় আলোচনার শুরুতে এই অংশে তাই এ কথা বলে রাখা জরুরি, যদিও কোন্ বিষয়টি থিয়েটার আর কোন্ বিষয়টি তার বাইরের উপস্থাপনা-এই বিতর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; তবু, এই গবেষণা কাজে সুবিধের জন্য মূলত, 'থিয়েটার' বলতে বাংলা নাট্য ইতিহাস আলোচনায় এমন এক জীবন্ত উপস্থাপনাকে বোঝানো হয়েছে, যা বিশেষভাবে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক 'থিয়েটার' কাঠামোর অনুসরণে 'গড়ে তোলা' এক শিল্পমাধ্যম। পাশাপাশি লোকজ, দেশজ 'ঐতিহ্যবাহী', পূর্ব-ঔপনিবেশিক সময় থেকে প্রচলিত হয়ে আসা শিল্পমাধ্যমগুলিকে 'দেশজ', 'ঐতিহ্যবাহী' শিল্পমাধ্যম বা 'পার্ফর্মেন্স হিসেবে গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়েছে। এ কথা বলে রাখা ভালো, 'থিয়েটার' বা 'ঐতিহ্যবাহী শিল্পমাধ্যম' এই দুই ক্যাটেগরির কোনো স্থিরীকৃত বিভাজনকে মান্যতা দেওয়া এই গবেষণার উদ্দেশ্য নয়। এই গবেষণা কাজে সুবিধের জন্য এই বিশ্লেষণটি নেওয়া হয়েছে একটি গবেষণা-পদ্ধতির কৌশল হিসেবেমাত্র।

বর্তমান গবেষণার সীমারেখা

বাংলা নাট্য ইতিহাস নিয়ে কাজ শুরু করার আগেই ভারতবর্ষের ইতিহাস চেতনা বিষয়ে দুই এক কথা বলা জরুরি। আজকের স্কুল-কলেজ পাঠ্যে 'ইতিহাস' বলতে যে বিষয়টিকে বোঝানো হয়, তা ব্রিটিশদের হাত ধরে এদেশে এসেছে। দীপেশ চক্রবর্তীর সহজ ব্যাখ্যা, 'ইংরেজ যে-ধরনের রাষ্ট্রগঠন ভারতে করেছিলেন, যে-ধরনের ক্ষমতাবিন্যাস করেছিলেন, যে-ধরনের আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক জীবনের জন্ম দিয়েছিলেন (যা আমাদের বর্তমান ধনতন্ত্রের ও রাষ্ট্রের অন্যতম ভিত্তি)—তারই ফল নথিপত্র, অভিলেখ্যাগার ও কার্য-কারণ সম্পর্কের সূত্রে গাঁথা কাহিনিমালা, যার নাম 'ইতিহাস' (169)। প্রচলিত ইতিহাসের এই স্বরূপটি সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার।

এই ইতিহাসের পরিমণ্ডলটিকে গ্রাহ্যতা দিয়েই বাংলা নাট্য ইতিহাস নিয়ে রচনার শুরুতেই সময়ের সীমারেখাটা স্পষ্ট করার দায় থেকে যায়। কোন সময় নিয়ে আমার কাজ? কাদের ঘিরে আমার কাজ? কোন রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে আমার কাজ, সে ইতিহাস স্পষ্ট না হলে গবেষণার ভিতটি শক্ত থাকে না। ঠিক সেই প্রয়াসেই নাট্য ইতিহাস সংক্রান্ত সামান্য কিছু বই খুলে বসার সুযোগ পাই। *বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস,* অজিতকুমার ঘোষ (ভারতীয় নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা ও উনিশ শতকীয় সমাজে উল্লেখযোগ্য নাট্যপ্রবাহ নিয়ে আলোচনা রয়েছে এই গ্রন্থে); *উনিশ শতকের নাট্য বিষয়,* দর্শন চৌধুরী (উনিশ শতক থেকে ধারাবাহিকভাবে যে থিয়েটার কলকাতায় গড়ে উঠেছে তার ইতিহাস নিয়ে সামগ্রিক আলোচনা রয়েছে এই গ্রন্থে);

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৯৫ থেকে ১৮৭৬ সাল পর্যন্ত বাংলা নাটকের যাবতীয় কর্মকাণ্ড চলেছে, তার নথিকরণের কাজ করা হয়েছে এই গ্রন্থে); *একশো বছরের নাট্য প্রসঙ্গ*, দেবনারায়ণ গুপ্ত (বাংলা তথা কলকাতা থিয়েটারের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার প্রয়াস লক্ষিত হয় এই গ্রন্থে); *বাবু থিয়েটার*, বিষ্ণু বসু (উনিশ শতকে মূলত কলকাতার বাবুদের উদ্যোগে যে নাট্যধারার প্রচলন হয়েছিল সে বিষয়ে লিখিত গ্রন্থ); প্রভৃতি বাংলা নাট্য ইতিহাসের আকরগ্রন্থগুলোর প্রায় সবকটিতেই বাংলা থিয়েটারের শুরু বলতে ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দকেই গ্রহণ করা হয়েছে। **প্রথাগত ইতিহাসের 'শুরু'র মাপকাঠিটি যেখানে বসানো হয়েছে অর্থাৎ ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দ, সেই সময় থেকে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক নাটকের মঞ্চ-উপস্থাপনার বহুল প্রচলনের মাঝামাঝি সময় এবং মূলত গিরিশচন্দ্র ঘোষের সক্রিয় নাট্যকর্মের সময় অর্থাৎ মোটামুটি ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে আমি গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছি। এই সময়ের ইতিহাসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ পর্বকে নিয়ে আমার অধ্যয়ন।**

এই সময়কাল নিয়ে কাজ শুরু করার মুহূর্তে প্রশ্ন আসে বাংলা থিয়েটাররের 'শুরু' হিসেবে যে মাইলস্টোনটিকে নির্ধারিত করা হয়েছে, তার বৈশিষ্ট্য কী? কী ঘটেছিল ১৭৯৫ সালে? হেরাসিম লেবেদফ নামক জনৈক রাশিয়ান ব্যক্তি বাংলা শেখার অঙ্গ হিসেবে দু'টি নাটক বিদেশি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। অনুবাদের পর তাঁর বাংলা শিক্ষকের প্রেরণায় তার মধ্যে একটি নাটক প্রযোজনা করার প্রয়াস করেন। *কাল্পনিক সংবদল* নামের সেই নাট্য প্রযোজনার কুশীলবরা সকলেই ছিলেন বাঙালি। তাই সেই নাট্য প্রযোজনাটিকে আমরা 'বাংলা থিয়েটারের শুরু' হিসেবে নির্ধারণ করে ফেলি। প্রশ্ন তুলি না, বাংলা থিয়েটারের সংজ্ঞাটি কী? তার গঠনটি কী? কেনই বা লেবেদফের থিয়েটারকে বাংলা থিয়েটারের আখ্যা দেব? কে ঠিক করে দিচ্ছে বাংলা থিয়েটার কাকে বলে?

বাংলা থিয়েটারে প্রতিষ্ঠিত প্রথাগত ইতিহাস জানাচ্ছে—লেবেদফের এই থিয়েটার শুরু হয় ১৭৯৫-তে। তবে থিয়েটারটি বেশিদিন বাঁচল না। ইতিহাস বলছে—মূলত ইংরেজ সক্রিয়তায় বন্ধ হয় থিয়েটার। বিরক্ত হতাশ লেবেদফ কলকাতা ছাড়েন। ততদিনে এদেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভালোভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তৈরি হচ্ছে বাঙালি 'বাবু' শ্রেণি। এই বাবুরা থিয়েটারে উৎসাহ নিয়েছে লেবেদফ ভারত ছাড়ার আরও তিন দশক পরে। ততদিনে ইংরেজি শিক্ষা বেড়েছে, হিন্দু কলেজ খোলা হয়েছে, ছাত্রদের ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে স্কুল কলেজগুলোতে। বাঙালিদের জন্য ইংরেজি ধরনের থিয়েটারের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। অতএব, পাথুরেঘাটার ঠাকুরবাড়ির ছেলে প্রসন্নকুমার ঠাকুর

খুললেন ‘হিন্দু থিয়েটার’। ১৮৩১ সন। প্রসন্নকুমার ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র। প্রচুর সম্পত্তি। সংস্কৃতিবান মানুষ। ত্রিশ বছর বয়সে প্রতিষ্ঠা করলেন ‘হিন্দু থিয়েটার’। বেছে নেওয়া হল, ভবভূতির নাটক ‘উত্তররামচরিত’। যদিও অভিনয় হয়েছিল ইংরেজি ভাষায়।

নবীন শিক্ষার্থীরা শিক্ষার শুরুতেই এই সরলরৈখিক নাট্য ইতিহাসটি মুখস্থ করে ফেলে। অথচ উনিশ শতকের আগে পর্যন্ত বাংলায় অসংখ্য পার্ফর্মেন্সের প্রচলন ছিল। সেগুলো ‘থিয়েটার’ নামক কাঠামোর থেকে বেশ অনেকটাই আলাদা। সৈয়দ জামিল আহমেদ ‘দেশীয়’ শিল্পকলা ও ‘থিয়েটার’- এই দুই ধরনের শিল্পকলার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, “Indigenous’ is that which is ‘born or produced naturally in a land or region”. (*Acinpakhi* 18)। অর্থাৎ পূর্ব-ঔপনিবেশিক সময়ে যে যে শিল্পকলা নিজস্ব দেশের মধ্যে ‘স্বাভাবিক’ রীতিতে ভূমিষ্ঠ হচ্ছে, তাকে তিনি ‘দেশীয়’ সংস্কৃতির আওতায় ফেলছেন। আমার গবেষণা কাজের জন্য মূলত ব্রিটিশ সংস্কৃতির মঞ্চপ্রয়োজনার যে কাঠামোটি কলকাতার বাংলা উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ক্যাটেগরিটিকে আমি ‘থিয়েটার’ হিসেবে গ্রহণ করছি। থিয়েটারের তাত্ত্বিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করে এই সিদ্ধান্ত আমি নিইনি। ‘দেশজ’ ও ‘ঔপনিবেশিক’ দুইটি আলাদা ক্যাটেগরিকে বোঝানোর তাগিদে এই বিশ্লেষণটিকে গ্রহণ করা হয়েছে। যদিও কোন্ শিল্পমাধ্যমটি ‘থিয়েটার’ এবং কোন্‌টি ‘থিয়েটার’ নয়, এই নিয়ে যে তাত্ত্বিক বিতর্ক জ্ঞানজগতে রয়েছে, তা আমার কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। তবুও এই বিভাজন বর্তমান গবেষণার ব্যাখ্যার সুবিধের জন্য গৃহীত হয়েছে।

বাংলার সংস্কৃতি জগতে স্বকীয়তা, জনপ্রিয়তা, নান্দনিকতার নিরিখে এই ‘দেশীয়’ ‘পার্ফর্মেন্স’ ফর্মগুলোর ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ব্রিটিশ প্রভাবে বাংলায় একটি নতুন নির্দিষ্ট ফর্ম এসে হাজির হল। আজ যাকে আমরা সাধারণ ভাবে ‘থিয়েটার’ বলে বুঝি, সেই নির্দিষ্ট ফর্মটি এসে পৌঁছল কলকাতায়। তামাম বাংলার সংস্কৃতিচর্চার ইতিহাসে এই থিয়েটারের সূত্রপাত নেহাতই অল্প দিনের। খুব বেশি হলে ২২৫ বছরের! অথচ, বাংলা সংস্কৃতির ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে আজ প্রসেনিয়াম থিয়েটারের ইতিহাসটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ‘পার্ফর্মেন্স হিস্টরি’ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে। এর পেছনে ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক শক্তিগুলো কী কী? এই সূত্রে ঔপনিবেশিকতার দাক্ষিণ্য ঠিক কতটা? যাকে সাধারণভাবে আজ ‘থিয়েটার’ বলে বুঝি, তার রাজনৈতিক শিকড়টা কী? প্রশ্নটা এই, এখনো অবধি এটাই আমাদের সবচেয়ে প্রচলিত ডমিনেন্ট ইতিহাস কেন? পাশাপাশি, কলকাতাতেই

যে ইংরেজি থিয়েটার প্রচলিত ছিল সেই সময়, তার দিকেও আমরা অবহেলা দেখাই। তার জন্য আলাদা মনোনিবেশ করি না। এমনকি, ১৮৫০-এর পর আর ইংরেজি থিয়েটারের কোনও খোঁজ জানি না। ইংরেজি থিয়েটার তারপর থেকে কি উঠে গেছিল নাকি? সে ইতিহাস খুঁজে পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়ে।

বাংলা নাটকের প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসঃ কলকাতা ও ঢাকা কেন্দ্রিক একটি অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণী

আলোচনার সুবিধের জন্য ঠিক বাংলা নাট্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসের পরিসরটি খানিকটা আলোচনা করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেই প্রয়োজনে বাংলা নাটকে প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসটিকে সূত্রাকারে পরিবেশিত করতে চাইছি। এই ইতিহাস বর্ণনায় সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে বর্ণিত করা হবে এবং সেই বর্ণনায় অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসে ঘটনাটিকে যেভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, সেই বিশ্লেষণটিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।

এই সূত্রে আরও একবার অতি সংক্ষেপে কলকাতা ও পূর্ব বাংলার নাট্য প্রবাহের আলোচনা জরুরী হয়ে ওঠে। নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন বর্তমান এই গবেষক। বাংলা নাট্য আলোচনায় দেশের সীমারেখার বেড়াজাল সরিয়ে ইতিহাস রচনার আকাঙ্ক্ষা তার থাকলেও পরিসর হয়ে ওঠে না। কিন্তু আলোচনা প্রবাহের প্রয়োজনে আরও একবার কলকাতা ও পূর্ববঙ্গে পারস্পরিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসের কিছু পর্যবেক্ষণ তুলে ধরার তাগিদ অনুভব করছি। এই সূত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের পর্যালোচনা করা দরকার।

এশিয়ার নাট্যপ্রবাহ আলোচনায় James R. Brandon-এর The Cambridge Guide to Asian Theatre বইটি এই সূত্রে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলছেন, এশিয়া ও ওশিয়ানিয়ার যেকোনো ধরনের পার্ফর্মেন্স ছিল ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ সম্পর্কীয়। শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, জাপান এবং অবশ্যই ভারতের সমস্ত পার্ফর্মেন্স ইতিহাসে একইরকমের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। পার্ফর্মেন্স ও ধর্মের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করার সূত্রে তিনি বলছেন, ইসলাম ধর্মের প্রভাবে বাংলাদেশের শিল্পকলায় পার্শিয়ান ও আরবীয় গল্পেরও অন্তর্ভুক্তি ঘটতে থেকেছে অনেক ক্ষেত্রে। স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশ তৈরি হয়েছে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে। জনগোষ্ঠী মূলত ইসলাম মতাবলম্বী। তাঁদের ঐতিহ্য ধর্মগত বিশ্লেষণে যদি পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে মনে হয়, তাহলে আবার ভাষাগত বিশ্লেষণে তা হয়ে দাঁড়ায় বাঙালি। আর এভাবেই পূর্ববঙ্গের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য আলোচনায় মিলেমিশে যায় পূর্বভারতের বাঙালি ও পাকিস্তানের মুসলমান সম্প্রদায়। এই ভাষাগত ও ধর্মগত বন্ধনেই বিশিষ্ট হয়ে ওঠে বাংলাদেশের থিয়েটার (Brandon, 12)।

ফলাফলস্বরূপ, বাংলা ভাষার লোকশিল্প যাত্রা দেশের বেড়াজাল কাটিয়ে দুই দেশের জনগোষ্ঠীর কাছে জনপ্রিয় ও আদরণীয় হয়ে ওঠে আজও। যাত্রা তাই এশিয়ার অভিনয়কলাগুলির মধ্যে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ও ব্যতিক্রমী উদাহরণ। এই পার্ফর্মেন্সটি দুই দেশের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে একত্রিতভাবে গ্রহণ করেছ; বহন করছে, দুই দেশেরই রাজনীতি, ধর্ম, সমাজ, জনরুচি, আচার-ব্যবহারের নানান সংযোগজাত বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির আলোচনায় উঠে আসে জারিগান, সারিগান, ভাওয়াইয়া, মুর্শিদি, বাউল, গম্ভীরা, আলকাপে, লেটো, সত্যপীর, গাজিপীর, মানিকপীর, মাদারপীর, বনবিবি, ওলাবিবি এরকম অসংখ্য লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত নাম। এই আলোচনায় পাশাপাশি জরুরি হল, শহরের আলোচনা। পূর্ববঙ্গের শহরের থিয়েটার উনিশ শতকে ঢাকা শহরে শুরু হয়। এই শহুরে নাট্যচর্চায় মূলত শহরের মুষ্টিমেয় কিন্তু ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী বাঙালি মানুষের তৎকালীন চাহিদা, ও চিন্তাভাবনাগুলিকে প্রতিফলিত করেছিল। ব্র্যান্ডনের মতে, 'Until the partition of India and Pakistan in 1947, artists and writers in Dacca and Calcutta shared the ideas and common concerns of Bengali art and culture' (31)। অর্থাৎ দেশভাগের আগে পর্যন্ত সময়ে ঢাকা ও কলকাতা-দুই শহরের বাঙালি শহুরে বুদ্ধিজীবী মহল বাঙালি শিল্প ও সংস্কৃতি নিয়ে প্রায় একইরকম চিন্তন প্রক্রিয়ার মধ্যে বিচরণ করতেন বলে মনে করছেন।

ভারতের নাট্য ইতিহাস আলোচনার শুরুতেই বলতে হয়, সুপ্রাচীন ঐতিহ্যশালী সংস্কৃত নাটকের কথা। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর আগেই থেকেই ভারতে সংস্কৃত নাটকের উপাদানগুলিকে বিভিন্ন উৎসে লক্ষ্য করা যায়। *ভরতের নাট্যশাস্ত্র* ও *ঋকবেদে* গ্রথিত বেশ কিছু উপাদান থেকে ঐতিহাসিকরা এই মতে সিদ্ধান্ত এসেছেন যে, ভারতের সংস্কৃত নাটকের শুরু অতি প্রাচীন কাল থেকেই। শ্রীহর্ষ, অশ্বঘোষ, ভাস, কালিদাস, শূদ্রক, ভবভূতি, বিশাখদত্ত, ভট্টনারায়ণ প্রমুখ নাট্যকারদের নাট্যসৃষ্টি ভারতীয় সংস্কৃত নাট্য ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করে এসেছে। এমনকি বাংলায় নবাবী শাসনকালেও কিছু সংস্কৃত নাটকের অভিনয়ের তথ্য জানা যায়। এর মধ্যে কর্ণপুর বা রায় রামানন্দের নাম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রূপ গোস্বামীর *ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব* প্রভৃতি নাটকও অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। এই সময়েই শ্রীচৈতন্যের *রুক্মিণীহরণ* বা *কৃষ্ণলীলা*-য় অভিনয়ের ধারাটি বাংলার নাট্য ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়।

মধ্যযুগের 'নাটগীতি'র পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত রূপ হিসেবে বাংলা নাট্য অভিনয়ের একটি নতুন ধরন 'যাত্রা'র আগমন। দোল, রাস বা কৃষ্ণযাত্রার কথা এই সূত্রে অবশ্য উল্লেখ্য। পরবর্তীকালে কালীয়দমন যাত্রা, নৌকাবিলাস পালা, রামযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা, ভাসানযাত্রা প্রমুখ অসংখ্য যাত্রা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। উনিশ শতকে

নবজাগরণের প্রভাব পড়েছিল কলকাতার যাত্রা পাড়ায়। পুরনো যাত্রার সংস্কার সাধন করে একের পর এক নতুন যাত্রার প্রচলন করলেন সুবলদাস অধিকারী, পরমানন্দ অধিকারী, গোপাল উড়ে, শ্রীদামদাসেরা। এই সময়ে লিখিত ও মঞ্চস্থ হতে থাকল নলদময়ন্তী যাত্রা, রাজ আবিক্রমাদিত্য যাত্রা, কামরূপযাত্রা, কলিরাজার যাত্রা নন্দবিদায় যাত্রা ইত্যাদি। যাত্রার পাশাপাশি চলতে থাকল পাঁচালি, তর্জা, বুলবুলির লড়াই, হাফ আখড়াই প্রভৃতি লোক পরিবেশনাগুলি।

ইতিমধ্যে ইংরেজরা কলকাতা শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কলকাতায় যে ইংরেজ পরিবারের মানুষেরা বসবাস করা শুরু করেছিল, তাদের মনোরঞ্জনের জন্য ধীরে ধীরে কলকাতা শহরে তৈরী হতে লাগল সেই সময়কার ইংল্যান্ডের নাট্যমঞ্চের আদলে গঠিত অভিনয়ক্ষেত্র। অষ্টাদশ শতকে ইংল্যান্ডে যেমন প্রসেনিয়াম নাট্যগৃহের প্রচলন ছিল, কলকাতাতেও সেই রকমই বানানো হলো থিয়েটার হল। কলকাতা শহরের পশ্চিমী জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে তৈরি হওয়া নাট্যমঞ্চগুলোকে ইতিহাসে কলকাতায় বিদেশী নাট্যের অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই সূত্রে গুরুত্বপূর্ণ নাট্যমঞ্চগুলি হল, কলকাতার ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দের মানচিত্রে উল্লেখিত ‘ওল্ড প্লে হাউস’, ১৭৭৫-এ তৈরি হওয়া ‘নিউ প্লে হাউজ’ বা ‘ক্যালকাটা থিয়েটার’। এছাড়াও নাট্যচর্চা চলেছিল ‘মিসেস ব্রিস্টোর প্রাইভেট থিয়েটার’, ‘হোয়ালার প্লেস থিয়েটার’, ‘চৌরঙ্গী থিয়েটার’, ‘এথেনিয়াম থিয়েটার’, ‘দমদম থিয়েটার’, ‘সাঁ সুচি থিয়েটার’ প্রভৃতি নাট্য মঞ্চে।

এই সময়েই কলকাতা শহরে গেরাসিম লেবেদফ আসেন এবং তিনি নিজের উদ্যোগে বাংলা ভাষা শেখার কাজ শুরু করেন। *দ্য ডিসগাইজ* ও *লাভ ইজ দ্য বেস্ট ডক্টর* নাটক দুটি বাংলায় অনুবাদও করেন তিনি। সেই সময়েই প্রথম নাটকটির বাংলা অনুবাদে দুইটি মঞ্চ প্রযোজনার আয়োজন করেন। তাঁর নাট্যমঞ্চের নাম দেন, ‘বেঙ্গলি থিয়েটার’। নাটকের মঞ্চ সজ্জায় তৎকালীন শহুরে ও ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির অনেক নিদর্শন পাওয়া গেছিল। এমনকি নাটকের অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও ছিল বাঙালি। ইতিহাস জানাচ্ছে, লেবেদফের ‘বেঙ্গলি থিয়েটার’-এর সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে তৎকালীন ইংরেজ নাট্যশালা ‘ক্যালকাটা থিয়েটার’-এর কর্তৃপক্ষ। তাঁদের প্ররোচনায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে জানা যায় লেবেদফের থিয়েটারে। প্রভূত আর্থিক লোকসানের মুখে দাঁড়িয়ে লেবেদফের ‘বেঙ্গলি থিয়েটার’ বন্ধ হয়ে যায়। লেবেদফের থিয়েটারই হল বাংলা ভাষায় বাঙালি অভিনেতৃবর্গের অভিনীত ইউরোপীয় ধরনের প্রথম মঞ্চপ্রযোজনা, এমনটাই জানা যায়।

কলকাতার পাশাপাশি উনিশ শতকের ষাটের দশকের শুরুতে ঢাকাতেও ইংরেজ নৌ-সেনারা দুটি নাটক মঞ্চস্থ করেন (Mamoon, *Bangladesher Theatre* 26); *ক্যাওস ইজ কাম এগেন* এবং *অরিজিনাল*, এছাড়াও

সিলেট, পাবনা, চট্টগ্রামে নৌ-সেনাদের উদ্যোগে নির্মিত হয়েছিল বেশ কিছু নাট্যশালা। তার মধ্যে সিলেটের ‘হার ম্যাজেস্টিস থিয়েটার’ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৫৭-৫৮ সাল নাগাদ কিছু নাট্য মঞ্চায়নের বেশ কিছু নিদর্শন থিয়েটারের ইতিহাসে ছড়িয়ে আছে। ।

বিদেশীদের নাট্য প্রযোজনাগুলি দেখে কলকাতার বাঙালি অভিজাতরাও নিজেদের উদ্যোগে নাটক পরিবেশিত করার উৎসাহ বোধ করেন। উনিশ শতকের প্রথম ভাগ থেকেই মূলত কলকাতায় এই সম্প্রদায়ের মানুষদের নাটক মঞ্চস্থ করার প্রচুর উদাহরণ লক্ষ্য করা যায়। ১৮৩১ সালে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ‘হিন্দু থিয়েটার’, ১৮৩৫ সালে নবীনচন্দ্র বসুর নাট্যশালা, ‘ওরিয়েন্টাল থিয়েটার’, সাতুবাবুর নাট্যশালা, রামজয় বসাকের নাট্যশালা, ‘জোড়াসাঁকো থিয়েটার’, ‘বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ’, ‘মেট্রোপলিটান থিয়েটার’, ‘বেলগাছিয়া নাট্যশালা’, ‘পাথুরিয়াঘাটা নাট্যালয়’, ‘জোড়াসাঁকো নাট্যশালা’ প্রভৃতি অনেক থিয়েটারে নাট্যাভিনয় হতে থাকে।

পাশাপাশি পূর্ববঙ্গের ঢাকা ও তার আশেপাশের অঞ্চলেও ধনী সম্প্রদায়ের মানুষদের উদ্যোগে তৈরি হতে থাকে বেশ কিছু নাট্যশালা। এই সূত্রে উল্লেখ্য, ১৮৬১ সালে ‘নীলদর্পণ’ নাটকটি ঢাকা শহর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল এবং সেই সময়ে ঢাকাতেই এই নাটকের প্রথম মঞ্চায়ন হয় (Mamoon, *Bangladesher Theatre* 27)। ‘পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি’ নামক স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়েই ঢাকার নাট্য ঐতিহ্য বেশ জোরদার হয়ে উঠেছিল। নব্বই দশকে সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হয় ‘ক্রাউন থিয়েটার’। ১৮৬৮ সালে একরামপুরে *পদ্মাবতী* ও *আবু হোসেন,* ১৮৬৯ সালে বরিশালে *স্বর্ণশৃংখল* নামে একটি নাটক অভিনীত হয়েছিল বলে জানা যায়। ১৮৭২ থেকে প্রায় এক দশক ধরে এই ধরনের বহু নাট্যায়নের খবর মেলে ঢাকা, বিক্রমপুর, পাবনা, কুষ্টিয়া প্রভৃতি জায়গায়।

১৮৭২ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ন্যাশনাল থিয়েটার বা সাধারণ রঙ্গালয়। এখানে প্রথম নাটক মঞ্চায়ন হয় দীনবন্দু মিত্রের ‘নীলদর্পণ’। এই নাট্যশালায় অভিনীত হয়েছিল ‘নবীন তপস্বিনী’, ‘লীলাবতী’, ‘বিয়ে পাগলা বুড়ো’, ‘কৃষ্ণকুমারী’, ‘বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ’, ‘যেমন কর্ম তেমনি ফল’ বা ‘জামাইবারিক’-এর মতো বিখ্যাত নাটকগুলি। ১৮৭৩ সালে সাধারণ রঙ্গালয় ভেঙ্গে তৈরি হল ‘হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার’। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ধর্মদাস সুর, মহেন্দ্রলাল বসুরা রইলেন ‘ন্যাশনাল থিয়েটার’-এ। অর্ধেন্দু শেখর মুস্তাফি, অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখরা তৈরী করলেন ‘হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার’। এরপর একে একে ‘বেঙ্গল থিয়েটার’ (মহিলাদের নিয়ে অভিনয় করা হয়েছিল), ‘গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার’, প্রতাপচাঁদ জহুরির ‘ন্যাশনাল থিয়েটার’, ‘স্টার থিয়েটার’, ‘এমারেল্ড থিয়েটার’, ‘বীণা

থিয়েটার’, ‘সিটি থিয়েটার’, ‘মিনার্ভা’, ‘ক্লাসিক’, ‘অরোরা’, ‘কোহিনূর’ ইত্যাদি নানান বিশিষ্ট নাট্যশালার প্রযোজনা চলতে থাকে কলকাতায়। পাশাপাশি ঢাকা ও তৎসংলগ্ন এলাকায় ‘পূর্ববঙ্গরঙ্গভূমি’, ‘প্রাইড অফ বেঙ্গল থিয়েটার’, ‘নবাবপুর অ্যামেটিয়ার থিয়েটার কোম্পানী’, ‘ইলিশিয়াম থিয়েটার’, ‘সনাতন নাট্যসমাজ’, ‘অলিম্পিয়ান থিয়েটার’, ‘ঢাকা থিয়েটার কোম্পানী’, ‘ক্রাউন থিয়েটার’, ‘ডায়মন্ড জুবিলি থিয়েটার’ প্রভৃতি নাট্যমঞ্চের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য (Mamoon, *Bangladesher Theatre* 35)।

World Encyclopedia of Contemporary Theatre গ্রন্থে বাংলাদেশের নাট্যপ্রবাহ বর্ণনা সূত্রে বলা হচ্ছে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারত, বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া এবং আরও নানান দেশে নাট্যসংস্কৃতির মূলধারাটি রামায়ণের গল্পের সঙ্গে আজও সম্পৃক্ত হয়ে আছে। বাংলাই সংস্কৃতির সবচেয়ে পুরোনো, প্রায়, হাজার বছরের পুরোনো ধারা হল কথকতা বা গল্প বলার আসর। তার পাশাপাশি তর্জা, কবির লড়াই, যাত্রা, পালাগান, আলকাপ, গম্ভীরা অত্যন্ত জনপ্রিয় জায়গা করে আছে। ধর্মভাবনার পাশাপাশি সামাজিক নানান সমস্যা, শিক্ষাব্যবস্থার গাফিলতি, নানান সামাজিক অসাম্য ইত্যাদি নিয়েও এই অভিনয়ধারাগুলি বারবার কথা বলে এসেছে। এই লোকধারাগুলির সঙ্গীত ও নৃত্যের প্রভাব এসে পড়েছে বাংলাদেশের থিয়েটার অভিনয়েও। যেমন, জসীমুদ্দিন (১৯০৩-১৯৭৬)-এর নকশিকাঁথার মাঠ বাংলাদেশের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় নৃত্যনাট্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নৃত্যনাট্যের ভূমিকা এই সূত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ‘চিত্রাঙ্গদা’, ‘তাসের দেশ’, ‘শ্যামা’, ‘চণ্ডালিকা’ প্রভৃতি নৃত্যনাট্য পূর্ববঙ্গের নাট্যধারাকে সমৃদ্ধ করেছে। উনিশ শতকে পশ্চিমী ধরনে কলকাতায় যে নাট্যচর্চা শুরু হয়েছিল, বিশ শতকের শুরুতে ঢাকাতে সেই একই উদ্যোগ নেওয়া হতে থাকে। কিন্তু সরকার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোনো সাংগঠনিক সাহায্য ছাড়া এই পশ্চিমী-ধরনের নাট্যপ্রবাহের গতি স্তব্ধ হয়ে পড়ে বলে মতামত রাখছেন লেখক (Rubin 102)।

উপরোক্ত বর্ণনাত্মক ইতিহাসে কলকাতা ও পূর্ববঙ্গের মঞ্চাভিনয়ের ইতিহাসের খানিকটা ধারণা পাওয়া গেল। বর্তমান গবেষণায় এই প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসকে আধার করেই নব্য বিশ্লেষণের কিছু প্রয়াস করা হয়েছে। যদিও আমার গবেষণার কাজে কলকাতা বা পূর্ববঙ্গের ধারাবাহিক নাট্য ইতিহাস রচনা করার কোনো প্রচেষ্টা থাকবে না। বরং প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসের আখ্যানের ইতিহাস ও তার মধ্যেকার ফাঁকগুলিকে লক্ষ্য করার উদ্দেশ্য থাকবে। এই সূত্রে বলে রাখা জরুরি, নাট্য ইতিহাসের (হিস্টরি) বিবরণী নয়, নাট্য ইতিহাস রচনার ইতিহাসের (হিস্টরিওগ্রাফি) রাজনীতির দিকে আমার আগ্রহ থাকবে।

রাজনীতি কাকে বলছিঃ কোনটা রাজনৈতিক, কোনটা নয়?

নাট্য ইতিহাস রচনার ইতিহাসের (হিস্টরিওগ্রাফি) রাজনীতি প্রসঙ্গে অবশ্যই 'রাজনীতি' বলতে কী বুঝছি এই গবেষণার আরম্ভ সংক্ষেপে সেই আলোচনা করা জরুরি। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যায়, 'সার্বভৌমত্ব হল রাষ্ট্রক্ষমতার চিরাচরিত রূপ। অর্থাৎ আইন প্রণন করার ক্ষমতা, দণ্ড দেবার ক্ষমতা, যুদ্ধ ঘোষণার ক্ষমতা... আধুনিক রাষ্ট্রে... একই ভূখণ্ডে কেবল একটি সাংবিধানিক রাষ্ট্রই বৈধভাবে বলপ্রয়োগ করার একচেটিয়া অধিকার লাভ করল। সেই দাবী স্বীকৃত না হলে বা বিপক্ষ কোনো দাবিদার থাকলে আমরা আজকাল বলি যে সেও ভূখণ্ডে সার্বভৌমত্ব 'বিতর্কিত' কিংবা 'বিবাদের বিষয়' যেমন প্যালেস্টাইনে অথবা কাশ্মীরে।' (*Praja O Tantra* ভূমিকা)। রাজনীতিকে একভাবে বলা যেতে পারেঃ ১) ক্ষমতার সঙ্গে ক্ষমতার অধীনস্থ থাকা গোষ্ঠী, কিংবা, ২) ক্ষমতার সঙ্গে ক্ষমতার মধ্যে থাকা উপাদানগুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিসরে 'রাজনীতি' নিয়ে চর্চা অনেকসময়েই এই 'ক্ষমতা'কে প্রশ্ন করে। প্রশ্ন করে, ক্ষমতা কী? কে সেই রাজনীতির ক্ষমতায় থাকবে? আর তার ক্ষমতায় থাকার কী কী শর্ত নির্ধারিত হবে? কে সেই শর্ত নির্দিষ্ট করবে? কে বা কারা সেই শর্ত মেনে চলবে? কার ওপর রাজনীতি ব্যবহৃত হবে? কীভাবে? কখন? 'Popular Politics' প্রসঙ্গে আলোচনায় 'The Nation in Heterogeneous Time' রচনায় পার্থ চট্টোপাধ্যায় ব্যাখ্যা করছেন, 'Governance... is... the body of knowledge and set of techniques used by, or on behalf of, those who govern. Democracy today... should be seen as the politics of the governed' (*The Politics of the Governed* 4)। সংক্ষেপে বলা যায়, এই ভাবনা অনুযায়ী, গভার্নেন্স হল ক্ষমতাবানের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার পদ্ধতি। আর ডেমোক্র্যাসি বা গণতন্ত্র হল ক্ষমতার বাইরে থাকা বা বলা ভালো ক্ষমতার অধীনে থাকা গোষ্ঠীর ক্ষমতা সম্পর্কে মতামত রাখার একটি মাধ্যম।

এই বিষয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের রাজনীতিতে দ্বন্দ্ব বিষয়ক মন্তব্যটি স্মরণীয়। তিনি মনে করছেন, '... a conflict that lies at the heart of modern politics in most of the world. It is the opposition between the universal ideal of civic nationalism, based on individual freedoms and equal rights irrespective of distinctions of religion, race, language, or culture, and the particular demands of cultural identity, which call for the differential treatment of particular groups on grounds of vulnerability or backwardness or historical injustice, or indeed for numerous other

reasons' (*The Politics of the Governed* 4)। এ কথা সম্ভবত নির্দেশ করাই যায় যে, আধুনিক রাজনীতির আলোচনায় বেশিরভাগ দেশের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে দ্বন্দ্ব। জাতীয়তাবাদের আদর্শ ধারণা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, ধর্ম-জাত-ভাষা-সংস্কৃতির নিরিখে সমানাধিকার, বিভিন্ন জনজাতির দাবীদাওয়া, পিছিয়ে থাকা, ঐতিহাসিক অবিচার এবং আরও অসংখ্য বিষয়ের মধ্যেকার পারস্পরিক দ্বন্দ্ব থেকে গড়ে ওঠে আজকের রাজনীতির সংজ্ঞা।

বর্তমান গবেষণার সুবিধার্থে রাজনৈতিক অঙ্গন বা রাজনৈতিক নাটক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্র বা রাজনৈতিক প্রেক্ষিত বা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বা রাজনৈতিক পদক্ষেপ ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গে 'রাজনীতি' শব্দটিকে ব্যবহার করতে হয়েছে (অধ্যায় ২, 'বাংলা নাট্য জগত ও প্রতিবাদী নাটকের ক্ষণস্থায়ী স্ফুলিঙ্গ', উপসংহার অংশ এবং আরও অন্যত্র)। এই সূত্রে এ কথা বলে রাখা প্রাসঙ্গিক হবে যে, বর্তমান গবেষণায় 'রাজনীতি' বলতে এমন এক বিশেষ কাঠামোকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে, যেখানে ক্ষমতা বা পাওয়ারের ক্ষমতায়নের প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করা যায়, প্রশ্ন করা যায় বা নিদেনপক্ষে রাষ্ট্রক্ষমতার বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিশ্লেষণ করা যায়। আবার পাশাপাশি, ক্ষমতার অবনত হয়ে আছে যে বিরাট সমাজ, তাদের দাবীদাওয়া, না-পাওয়া, বঞ্চনা, ক্ষমতাকে প্রশ্ন করা, নিজেরা ক্ষমতায় আসার প্রচেষ্টা করা, ক্ষমতার সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, সক্রিয় অথবা আপাত-নিষ্ক্রিয় নানাবিধ দ্বন্দ্ব, বোঝাপড়া, সংঘর্ষ, লেনদেন ইত্যাদি নানান সম্ভাবনাকে 'রাজনৈতিক আলোচনার পরিসরে' রাখা হয়েছে। এই পরিসর গঠন নির্দিষ্টভাবে গবেষণাকার্যের সুবিধার্থে গৃহীত। কোনোভাবে 'রাজনীতি' শব্দটির স্থায়ী, সংজ্ঞায়িত পরিচয়কে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে এই বিশ্লেষণটিকে গ্রহণ করার অভিপ্রায় আমার নেই।

লেবেদফের বাংলা থিয়েটারঃ কতটা থিয়েটার কতটা বাঙালি?

বাংলা থিয়েটারের গঠনবৈশিষ্ট্যের মধ্যে কতটা লোকনাটকের উপাদান ও কতটা ইউরোপীয় ঘরানার মিশ্রণ— এই নিয়ে বিতর্ক অবধারিতভাবে এসে পড়ার কথা। দর্শন চৌধুরী সেই সময়ের 'নাট্যবোধ' নিয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এক জায়গায় বলছেন, 'হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার (১৮১৭) পর থেকে বাঙালি ছাত্রেরা কলেজে ইংরেজি নাটক পাঠ এবং চৌরঙ্গী থিয়েটারে নাটক দর্শনে তাদের নাট্যবোধ গড়ে তুলেছিল' (*Bangla Theatreer Itihas* 36)। 'নাট্যবোধ' বলতে তিনি বাঁধাধরা ইংরেজি 'নাট্যবোধ'-এর ছককেই বোঝাচ্ছেন, এ কথা মনে করার কারণ আছে বলেই মনে হয়।

বাংলা থিয়েটার আলোচনায় এবং ইতিহাস আলোচনায় বেশিরভাগক্ষেত্রেই প্রথম নাম লেবেদফ। এইটুকু জানার পরেই আমরা লোকগান, পাঁচালি, কথকতা বা যাত্রার সুবিশাল ইতিহাসে আর চোখ রাখি না। বাংলা নাটকের ঐতিহ্যে এই লোক সংস্কৃতির আলোচনার যেন আর কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই! লেবেদফের পরিচালনা করা ঐ দুটি নাটকের মঞ্চায়ন থেকেই যেন হঠাৎ করে 'বাংলা থিয়েটার' নামক ঐতিহ্যটির জন্ম হয়ে গেল। মুছে গেল, আগের সমস্ত সাংস্কৃতিক ইতিহাস। বা তারা রয়ে গেল বাংলা থিয়েটারের অতিসংক্ষিপ্ত ভূমিকা হিসেবেই। নাট্য ইতিহাস রচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাপুষ্ট প্রসেনিয়াম থিয়েটার। এই ইতিহাস আলোচনায় আজ 'নাটক' বা 'থিয়েটার' বলতে মূলতঃ শুধু এই 'প্রসেনিয়াম থিয়েটার'কেই বুঝি। বাংলা নাট্য আলোচনায় যেন আর সেসব লোকজ সংস্কৃতি আলোচনার প্রয়োজন নেই। খেয়াল করি না, লেবেদফের নাটকের অভিনেতারা এসেছিলেন সম্ভবত সেই সময়কার ঝুমুর দল থেকে। দর্শন চৌধুরী বলছেন, '... তখনকার ঝুমুরের দল থেকে অভিনেত্রীদের সংগ্রহ করে থাকতে পারেন' (*Bangla Theatreer Itihas* 63)। লোকজ সংস্কৃতির পেশাদারী শিক্ষা তাঁদের ছিল। ভুলে যাই, তাঁদেরকে বেঁধে-ছেঁদে, 'শিক্ষিত' করে, 'শাসন' করে, উপনিবেশ স্থাপনকারীদের মনের মতো করে তৈরি করেই শুরু হয়েছিল তাঁর নাট্যপ্রয়াস। আর সেই নিম্নবর্গের বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক পুঁজিকে ভিত্তি করেই লেবেদফের বাংলা থিয়েটারের গঠন নির্ধারিত হয়েছিল।

বাংলা সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পরম্পরা দেখে বোঝা যায়, প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশের নাটক ছিল নাচ-গান-বাজনা-অভিনয়-কথকতা-গদ্য ও পদ্য সংলাপ মিশ্রিত একটি পূর্ণ মনোরঞ্জনমূলক অনুষ্ঠান বা টোটাল পার্ফর্মেন্স। ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্যের কথায়, 'নৃত্য-গীত-বাদ্য-অভিনয় প্রভৃতি শিল্প আজ যতখানি পৃথক পৃথক সত্তা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আদিম অবস্থায় এতখানি স্বাতন্ত্র্য তাদের ছিল না। তারা ছিল অবিশ্লিষ্ট। আদিম সাহিত্য-শিল্প বলতে যা পাওয়া যায় তা হচ্ছে নৃত্য-বাদ্যসম্বলিত গান-নৃত্য-বাদ্য-সুর ও কথার এক সমবায় বা অবিশ্লিষ্ট রূপ' (97)। একই কথা শোনা যায় রিচার্ড শেখনারের *Performance Studies* গ্রন্থে। রিচার্ড শেখনার বলছেন, 'In many cultures, theatre, dance, and music are so wholly integrated that it is not possible to place a given event into one or the other category. Kathakali in India, a Makishi performance in Zambia, and the Deer Dance of the Yaquis are but three examples among many that integrate

music, dance, and theatre' (42)। ব্রিটিশদের থিয়েটারে 'অভিনয়'কলার ওপর যে গুরুত্ব দেওয়া হত, সেই রকমভাবে ভারতীয় নাট্যকলা কেবলমাত্র অভিনয়ভিত্তিক নয়। স্বকীয়তায় এই শিল্পধারা অনেকটাই বিশিষ্ট।

লেবেদফ যে সময়ে কলকাতা আসেন, তখন ভারতচন্দ্রের (১৭১২ - ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ) জনপ্রিয়তা ছিল অত্যধিক। লেবেদফও ভারতচন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হন। ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যটির তিনি রুশ ভাষায় অনুবাদও করেছিলেন। তখন অষ্টাদশ শতকের শেষ প্রান্ত। বাঙালির মননে চিন্তায় সংস্কৃতিতে তখন ঐতিহ্যশালী প্রাচীন শৈলীগুলির আধিপত্য। সেই শিল্পধারাগুলি মূলত ছিল দেবদেবী-কেন্দ্রিক। মনসা-শিব-চণ্ডী-দুর্গা-কালী-কমলা-সূর্য এরকম অসংখ্য দেবদেবীদের নানান অলৌকিক কর্মকাণ্ড এবং তাদের মাহাত্ম্যকীর্তনমূলক নানা শিল্পধারা তখন বাংলার শহরে ও গ্রামে প্রবল জনপ্রিয়। অধিকাংশ বাঙালি তখন কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, নারায়ণ দেব, ঘনরাম চক্রবর্তী, বিজয় গুপ্ত, বংশীদাস, দ্বিজরামদাস, জগজ্জীবন প্রমুখ প্রতিভাধর মঙ্গলকাব্যকারের সাহিত্য এবং গান, নাচ, অভিনয়ের নিমগ্ন উপভোক্তা। মঙ্গলকাব্যের পাশাপাশি যাত্রা-পাঁচালী-কীর্তন-কবিগান-কথকতা-ঝুমুর-তর্জার আসরই হল বেশিরভাগ বাঙালির মনোরঞ্জনের প্রধান মাধ্যম।

কিছু কিছু অভিজাত শ্রেণির বাঙালি অবশ্য সেই সময় সবেমাত্র ইংরেজ থিয়েটারের স্বাদ পেয়েছে। কলকাতার ইংরেজরা নিজেদের আনন্দের জন্য ইংরেজি নাটকের অভিনয় করত। দর্শন চৌধুরীর মতে, সেইসব নাটকের রঙ্গমঞ্চ ও তাদের ব্যবস্থাদি, নাটক, নাট্যকার, অভিনেতা, নাট্যাধ্যক্ষ, প্রযোজক সবই ছিল ইংরেজ। এমনকি সেই নাটকের দর্শকও ছিল মূলত বিদেশি। কিছু ইংরেজ ঘনিষ্ঠ বাঙালি ধনী জমিদার ইংরেজদের নাট্যশালায় নাটক দেখার সুযোগ পেত (B. Basu, *Babu theatre* 10)। তবে সেই নাটক দেখে তারা রসলাভ করতে পারত কিনা সে ব্যাপারে সঠিকভাবে কিছু বলা যায় না। তার একটা প্রধান কারণ হয়তো ছিল, রুচি। সাহেবদের নাটক দেখতে গেলে তাঁদের সামাজিক সম্মান বাড়ত বটে, কিন্তু সুপ্রাচীনকালের ঐতিহ্যবাহী বাঙালি সংস্কৃতি তখনও পর্যন্ত তার মূল প্রচলিত রুচি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কৃষ্ণমাহাত্ম্যসূচক যাত্রাপালা অথবা পটে আঁকা ছবির সঙ্গে গাওয়া পটুয়াগীতি কিংবা গীতগোবিন্দমের নাচ-গান-অভিনয় দেখতেই সম্ভবত তার অভ্যস্ত তাগিদ ছিল বেশি।

বাংলা সংস্কৃতির এরকম একটা অবস্থায় লেবেদফ পৌঁছেছিলেন বাংলায়। তাঁর নাটকের হাইব্রিডিটি বা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংকরায়িত রূপটি দেখলে মনে হয়, তাঁর হয়তো ধারণা হয়েছিল যে, শুদ্ধ ইউরোপীয় বা ব্রিটিশদের কায়দায় নাটক করলে তিনি বাঙালি দর্শকের হৃদয় জয় করতে পারবেন না। তাই তিনি বাঙালির দেশজ

শিল্পশৈলীগুলির কিছুটা অনুকরণ করলেন। তাঁর আদ্যোন্ত ‘বিদেশীয়’ নাটকটির মধ্যে তিনি ‘এদেশীয়’ নানা উপকরণ ভরে দিলেন। যেমন- ভারতচন্দ্রের গানের ব্যবহার করলেন, চরিত্রগুলির নামকরণ করলেন বাংলায়, নাটকে অতিরিক্ত নাচ-গান সংযোজন করলেন। মূল নাটকটিতে কোন গান বা গীতিকাব্য নেই। ‘কাল্পনিক সংবদল’ নাটকটি অভিনয়কালে ভারতচন্দ্রের ‘বিদ্যাসুন্দর’ কাব্যের কয়েকটি গান সংযুক্ত করা হয়েছিল বলে মনে করা হয়। মদনমোহন গোস্বামীর অনুমান, নাটকটির প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের শুরুতে এবং দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যের শুরুতে গানগুলি সংযুক্ত হয়েছিল (*Kalpanik Sangbadal* 14)। লেবেদফ নিজে সংগীতজ্ঞ ছিলেন। তাই সম্ভবত নাটকটিকে লোকপ্রিয় করে তুলতে তিনি ভারতচন্দ্রের জনপ্রিয় গানগুলির ব্যবহার করেছিলেন। এমনকি তিনি বিভিন্ন পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্র দিয়ে বাংলার জনপ্রিয় এই গানগুলির সঙ্গে সঙ্গত করেছিলেন বলেও জানা যায়। দর্শন চৌধুরীর অনুমান, গোলোকনাথ দাস হয়তো ঝুমুর দল থেকে অভিনেত্রীদের জোগাড় করেছিলেন (*Bangla Theatreer Itihas* 49)। ফলে লেবেদফের নাটকেও গান-নাচ সমৃদ্ধ ঝুমুর শৈলীর অভিনেত্রীদের নিজস্ব অভিনয় ধারার প্রভাব পড়ে থাকতে পারে। সব মিলিয়ে সম্ভবত তাঁর নাটক হয়ে উঠেছিল, বাঙালি অন্তরাত্মা সম্পন্ন বিদেশি ঘরানায় উদবুদ্ধ একটি সংকরায়িত নাটক।

লেবেদফের নাটককে পুরোপুরিভাবে বিদেশীয় অনুকরণে গড়ে তোলা একটি বাংলা নাটক হিসেবে মেনে নেওয়া হয়তো যাবে না। যদিও অনুমান করা হয়, রঙ্গশালার পরিকল্পনা তিনি বিদেশীয় রীতিতেই করেছিলেন। সেই মতো মঞ্চ ও দর্শকাসনও তৈরি হয়েছিল। (লেবেদফের নাটকের মঞ্চপরিকল্পনা ও প্রেক্ষাগৃহের অলংকরণ নিয়ে চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে)। কিন্তু সেই বিদেশীয় মঞ্চে যে বিদেশীয় নাটকটি বাংলা ভাষায় অভিনীত হয়েছিল, সেটি সম্ভবত ছিল প্রচলিত শহুরে লোকসংস্কৃতির প্রভাবে ভরপুর। সুমন্ত ব্যানার্জী যাকে বলছেন, ‘Urban Folk’। ‘বাঙালির থিয়েটারের উৎপত্তির সময়’ অংশে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। তৎকালীন কলকাতার মানুষের চাহিদা, শিল্পচর্চার ধরন, রুচি ও মনকে অস্বীকার করে বোধহয় তাঁর পক্ষে এক পাও অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিলনা। এই প্রেক্ষিতটি নিয়ে বর্তমান গবেষকের ‘লেবেদফের সময়ে বাঙালি নাট্য সংস্কৃতি’ শীর্ষক প্রবন্ধটিতে বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে (T. Das, *Kathakata-1* 317-325)।

‘বাংলা থিয়েটারের পথিকৃৎ’ লেবেদফের নাট্যানুষ্ঠানেই দেশীয় সংস্কৃতির যে প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তা সত্ত্বেও আজকের থিয়েটারের ইতিহাস রচনায় দেশীয় সংস্কৃতির আলোচনা সম্পূর্ণ অবহেলিত থেকে যায় কেন? কিসের ভিত্তিতে ঠিক করা হচ্ছে কোন্ বিষয়টি বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসের আলোচনায় আসবে, কোন্‌টা নয়? বাংলা ভাষায়

অভিনয় করাটাই কি নাট্য ইতিহাস আলোচনায় বিচার্য? অর্থাৎ লেবেদফ বাংলা ভাষায় থিয়েটার করেছিলেন, তাই তাঁকে বাংলা থিয়েটারের পথিকৃৎ হিসেবে দেখা হয়? তাহলে তো ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের *হিন্দু থিয়েটার* আলোচনায় আসত না। কারণ তিনি বাংলা নাটক করেননি। করেছিলেন ইংরেজি নাটকের অভিনয়। বাংলা নাট্য আলোচনায় তাহলে তাঁর দাবী কিসের জোরে? তিনি 'বাঙালি' বলে? তাহলে বাঙালি দ্বারা থিয়েটার করার প্রয়াস করাটাই বিচার্য? তাহলে তো আবার লেবেদফের কথা আলোচনায় আসত না। কারণ তিনি নিখাদ 'অ-বাঙালি'।

এই সূত্রে দীপেশ চক্রবর্তীর আলোচনাটি উল্লেখ্য। তিনি বলছেন, মানুষকে রাষ্ট্রের সঙ্গে একাত্মবোধ করতে সাহায্য করে ইতিহাস। 'আমি একজন 'ভারতীয়' নাগরিক—এই বোধ তৈরি করতে 'ইতিহাস' অপরিহার্য' (D. Chakraborty, *Monorather Thikana* 174)। এর ফল হয় মারাত্মক। 'ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণির ইতিহাস' লিখতে দেশভাগের আগের লাহোরের শ্রমিককে 'ভারতীয়' হিসেবে মান্যতা দেওয়া হয়। আবার দেশভাগের পরের 'ভারতীয়' ইতিহাস লিখতে গেলে সেই একই শ্রমিক বাদ পড়ে যান 'জাতীয়' ইতিহাসের পাতা থেকে। ঠিক এই ঘটনাটা ঘটেছে কি বাংলার নাট্য ইতিহাসে? বাংলার নাট্য ইতিহাসের আলোচনায় পূর্ববঙ্গের থিয়েটার একেবারেই বাদ পড়েছে বলে মনে হয় না? ঢাকাসহ তামাম পূর্ববঙ্গের বিস্তীর্ণ থিয়েটার ইতিহাসটি কাঁটাতারের এপারের 'ভারতীয়' ইতিহাসে বেশিরভাগ সময় জায়গা পায়নি বলেই মনে হয়। বাংলা ভাষার নিরিখে ইতিহাস রচনা করা হলে বাদ পড়ত না 'পূর্ববঙ্গরঙ্গভূমি' বা 'পূর্ববঙ্গনাট্যসমাজ'-এর সুবিস্তৃত গরিমামণ্ডিত বাংলা নাটকের ইতিহাস। 'ডায়মণ্ড থিয়েটার', 'ক্রাউন থিয়েটার', 'ইলিসিয়াম থিয়েটার', 'নবাবপুর অ্যামেচার থিয়েটার', 'প্রাইড অফ বেঙ্গল থিয়েটার' — উনিশ শতকের এরকম অসংখ্য নাট্যগোষ্ঠীর ইতিহাসকে জানতে আমাদের পূর্ববঙ্গের গবেষক মুনতাসির মামুনের ('উনিশ শতকে বাংলাদেশের থিয়েটার', 'ঢাকার পেশাদারি থিয়েটার', *উনিশ শতকে ঢাকার থিয়েটার, উনিশ শতকে ঢাকার সংবাদ-সাময়িকপত্র* ইত্যাদি*)* গবেষণার দিকে আলাদা করে দৃষ্টি দিতে হয়। 'বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস' নামের বিশেষ ক্যাটেগরিতে নাম মাত্র উল্লেখ পাওয়া যায় এই পূর্ববঙ্গীয় নাট্যসংস্কৃতির সুপ্রতিষ্ঠিত ইতিহাসের। 'বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস'-টি সংকীর্ণ হয়ে আসে 'ভারতীয় বাংলা থিয়েটার'-এর ক্ষুদ্র গণ্ডীতে। 'বাংলা থিয়েটার'-এর অখণ্ড ইতিহাসে যে সমগ্রতার ভাব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হয়, তাতে বাদ পড়ে যায় নানান 'নেশন'-বহির্ভূত বৈশিষ্ট্য। 'জাতীয়তাবাদ'-নির্দিষ্ট কাঠামোর বাইরে থাকা সমস্ত জনজাতিই তাহলে ইতিহাস বহির্ভূত থেকে যাবে? ইতিহাস জটিল হয়ে ওঠে 'ন্যাশনালিজম'-এর নির্ধারিত গণ্ডিকে অনুসরণ করার প্রচেষ্টায়।

মূল অস্তিত্ব বা মৌলিক পরিচয় কাকে বলব?

ঔপনিবেশিক মতাদর্শ অনুযায়ী, ‘বাংলা সংস্কৃতি’ ও ‘বাঙালির আত্মপরিচয়’-এই নিয়ে তাত্ত্বিক অনুসন্ধান করতে থাকলে নিশ্চিতভাবে ইতিহাস রচনার ইতিহাসটি বা হিস্টরিওগ্রাফির ক্ষেত্রটি বেশ জটিল আঙ্গিক হয়ে উঠতে পারে। এই সূত্রে উল্লেখ্য, হোমি ভাবার কাছে, ‘কালচার’ বা ‘সংস্কৃতি’ কোনো স্থায়ী, অপরিবর্তনীয়, নির্দিষ্ট কাঠামো সংহত বিষয় নয়। ভাবার মতে, ‘An important feature of colonial discourse is its dependence on the concept of 'fixity' in the ideological construction of otherness. Fixity... connotes rigidity and an unchanging order as well as disorder, degeneracy and daemonic repetition’ (66)। কোনো সময় বা স্থানিক বৈশিষ্ট্যের বাঁধনে সংস্কৃতিকে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায় না। বরং এই সংস্কৃতির ধারণাটি অনেক শিথিল, সংস্কৃতি সবসময়েই গতিশীল, সদা-পরিবর্তনীয়। সমাজের সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় আলোচনার শুরুতে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের বেশি গভীরে না গিয়ে মোটামুটি এক কথায় সহজভাবে ধরে নিতে পারি, ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কলোনাইজারদের দ্বারা। মেট্রোপলিটান ওয়েস্টের উন্নততর সংস্কৃতি আর ‘কলোনি’র যে ‘নিকৃষ্ট’ বা ‘অবনত’ সংস্কৃতির সংস্পর্শে এলো। এই ‘উন্নত’ ও ‘নিকৃষ্ট এই দুইটি ভাগের মাধ্যমে আসলে দুইটি নির্দিষ্ট বাইনারিকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার চেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পশ্চিমের সংস্কৃতি ও সমাজ যেন পূর্বের সভ্যতার বা অবনত গোষ্ঠীর তুলনায় স্পষ্টভাবে আলাদা ও বিশেষভাবে ‘উন্নত’, এমনটাই মনে করা হচ্ছিল। আর তখনই যেন মনে করা হচ্ছে, এই ‘উন্নত’ সংস্কৃতির প্রভাবে অবনত’ সংস্কৃতির ‘পিওরিটি’ বা ‘পবিত্রতা’ নষ্ট হয়ে একটা কলুষ ছড়িয়ে পড়ছে। এখানেই হোমি ভাবা বলছেন, ‘কালচারাল হাইব্রিডিটি’র কথা। এই কালচারাল হাইব্রিডিটি বিষয়টি একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা দরকার।

ভাবার মতে, অসংখ্য উপকরণ একটি সংস্কৃতির মধ্যে নিয়মিত প্রবেশ করছে এবং প্রতিটি সংস্কৃতিকে প্রতিনিয়ত পাল্টে পাল্টে চলেছে। হোমি কে. ভাবা বলছেন, ‘It is the emergence of the interstices - the overlap and displacement of domains of difference - that the intersubjective and collective experiences of *nationness,* community interest, or cultural value are negotiated’ (2)। তাই ভাবার কাছে, ‘পবিত্র ভারতীয়ত্ব’ বা ‘নিষ্কলুষ ব্রিটিশ’ ধারণাগুলি অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে না। কোনো প্রান্তিক সভ্যতাও কখনো ‘পবিত্র’, ‘নিষ্কলুষিত’, ‘স্থায়ী’, ‘কোনো অন্য সংস্কৃতির প্রভাব বর্জিত’ হতে পারে কিনা, তা নিয়ে ভাবা প্রশ্ন

তোলেন। কারণ সেই প্রান্তিক সভ্যতার হদিশ যখন পাওয়া গেছে, তার কাছে পৌঁছনোর উপায় আছে, সেই সভ্যতার মানুষদের সঙ্গে কোনোভাবে কথোপকথন করা গেছে, তার মানে সেই প্রান্তিক সভ্যতাটিও কোনো না কোনো ভাবে অন্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপকরণকে ইতিমধ্যেই কিছুটা হলেও গ্রহণ করেছে বা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। ভাবার মতে, পশ্চিমের বিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদরা এই পবিত্রতার একটা ধারণা তৈরি করেছিলেন তাদের সভ্যতার তুলনায় সেই নেটিভ বা প্রান্তিক সভ্যতাটি কতটা দূরত্বে দাঁড়িয়ে, সেই ভাবনাটিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। তাহলে সংস্কৃতিকে ব্যাখ্যা করতে হবে কোনো নির্দিষ্ট, স্থায়ী, সীমাভুক্ত গণ্ডি হিসেবে নয়, তাকে বিশ্লেষণ করতে হবে তার গতিশীলতা, শিথিলতা, গ্রহণ করার ক্ষমতা, মিশে যাওয়ার বৈশিষ্ট্যগুলি মারফত। এই মিশে যাওয়াকে ভাবা ডাকতে চেয়েছেন, ‘সংকরায়ন’ বা ‘হাইব্রিডিটি’ নামে।

প্রসঙ্গ সূত্রে এ কথা বলা দরকার, সাদা চামড়ার কলোনাইজারদের এই যে নিজেদের সংস্কৃতিকে ‘উন্নত সংস্কৃতি’ মনে করার প্রচলনটি আরও বেশি করে দানা বেঁধেছিল উনিশ শতক থেকে। আশিস নন্দী রচিত The Intimate Enemy Loss and Recovery of Self under Colonialism গ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নন্দীর মতে, আঠেরো শতক পর্যন্ত ইউরোপীয় কলোনাইজাররা অনেকটাই সাংস্কৃতিকভাবে শিথিল মনোভাব পোষণ করত বলে মনে করা যায়। ভারতীয়দের বিচার করার ক্ষেত্রেও তাদের এই ‘উন্নত’, ‘অবনত’ বাইনারিটি পোক্তভাবে গড়ে ওঠেনি বলেই মনে যেতে পারে। এই ‘স্থায়ী’, ‘উন্নত’ সংস্কৃতির ধারণাটি সম্ভবত গড়ে তোলা হয়েছিল ইংরেজদের মারফত, তাদের ভারতবর্ষে শাসনব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার একটি কৌশল হিসেবে। একই কারণে, একইভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির ‘হীন’ রূপটিও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এই একই সময়ে। পার্থ চট্টোপাধ্যায় বা বেনেডিক্ট অ্যাণ্ডারসনের মতো প্রতিষ্ঠিত চিন্তকদের ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক জাতীয়তাবাদী বিশ্লেষণগুলো নিয়ে ‘মৌলিক নাটক ও গ্রন্থাবলী’ অংশে এবং ‘বাংলা ঐতিহাসিক নাটকে জাতীয়তাবাদ’ অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

এই সূত্রে ভাবা ‘মিমিক্রি’র ধারণাটিকে আলোচনা করছেন। হোমি ভাবার ভাষায়, ‘... colonial mimicry is the desire for a reformed, recognizable Other, as a subject of a difference that is almost the same, but not quite. Which is to say, that the discourse of mimicry is constructed around an ambivalence...’ (86)। ‘উন্নত’ ব্রিটিশ সংস্কৃতি ও ‘নিকৃষ্ট’ ভারতীয় সংস্কৃতি-এই দুই ভাগে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে ভাগ করে দেওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল ঘটেছিল। ব্রিটিশরা তাদের অবনত প্রজাদের নিজেদের সংস্কৃতির যোগ্য

হিসেবে তৈরি করে নিতে চাইল, তাদেরকে নিজেদের 'উন্নত' পর্যায়ে 'তুলে' আনতে চাইল। এভাবেই ইংরেজি শিক্ষা, মূল্যবোধ, রুচি, মতামত, বৌদ্ধিক বিশ্লেষণে ভারতীয়দের 'ব্রিটিশদের মতো' তৈরি করা শুরু হল। কিন্তু কালোনাইজড প্রজারা কলোনাইজার ইংরেজদের মতো পুরোপুরি হয়ে উঠলে তো আর দুই বাইনারির মধ্যেকার কোনো ফারাক থাকবে না! কোনো 'উন্নত' বা 'অবনত' ভেদও থাকবে না। তাই ভাবার মতে, কলোনাইজাররা চেয়েছিল, প্রজারা তাদের মিমিক করুক, নকল করুক। কিন্তু পুরোপুরি ভেদাভেদ মুছে যাক, প্রজারা শাসকের সঙ্গে রুচি, শিল্প, শিক্ষা, বোধ, মতামত ইত্যাদি ক্ষেত্রে একেবারে মিলেমিশে যাক, এটা আশা করেনি। হোমি ভাবা লিখছেন, '... the reforming civilizing mission is threatened by the displacing gaze of its disciplinary double...' (৪6)। তারা হবে 'প্রায় ব্রিটিশের মতো', 'almost the same', কিন্তু 'পুরোপুরি ব্রিটিশ নয়', 'but not quite'। এইভাবেই দুই গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ভেদাভেদ টিঁকে থাকবে।

প্রসঙ্গত আরও একবার উল্লেখ্য, হোমি ভাবার সংস্কৃতি সংকরায়নের আলোচনাটি আনা দরকার ভারতের জাতীয়তাবাদের ধারণাটিকে তুলে ধরতে। আগেই আলোচনা করা হয়েছে, ভাবার মতে, সংস্কৃতি একটি সদা-পরিবর্তনশীল বিষয়। জাতীয়তাবাদী ব্যাখ্যায় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যটি একেবারেই বিপরীত বলে মনে হয়। কারণ 'নেশন'-এর ধারণাটি একটি দেশের মানুষের কাছে প্রাচীনকাল থেকে অপরিবর্তনীয়, স্থায়ী একটি কাঠামো হিসেবেই পরিগণিত হয়, যেটি ভবিষ্যতেও অপরিবর্তনীয় থাকাই সমীচীন বলেই আশা করা হয়। 'এমন একটি 'ভারতীয়ত্ব' যেটি একটি রাজনৈতিক সীমারেখার মধ্যে অবস্থিত প্রতিটি মানুষের সঙ্গে একটি যোগসূত্র স্থাপন করে দিচ্ছে। তাহলে 'নেশন'-এর ধারণায় আবার একটি কঠোর স্থায়ী নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যা চলে আসছে।

কিন্তু একথা মনে রাখা জরুরি, আধুনিক গবেষক ইতিহাস আলোচনায় অতীতের সময়টি থেকে আধুনিক যুগে চলে আসার ফলে যে মূলচ্যুত অবস্থা তৈরি হয়, সেই বিষয়টিকে বোধহয় অস্বীকার করা যাবে না। সংস্কৃতিকে যদি স্থায়ী একটি কাঠামো হিসেবে ধরে নিতে চাই, তাহলে অতীত সময়ের থেকে আধুনিক গবেষকের যে সময়গত ব্যবধান, তাকে কীভাবে অস্বীকার করব? সেখানেই তো সংস্কৃতি হয়ে পড়বে 'পরিবর্তিত', 'অস্থায়ী'। এভাবেই ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ছোটবেলা থেকে শিখে আসা নেশনের ধারণাটি আমাদের কাছে নতুন করে দেখা দেয়। কোন্‌টা 'ভারতীয়', কোন্‌টা 'বাঙালি', কোন্‌টা 'ব্রিটিশ', কোন্‌টা 'মুঘল'—কোন্ সংস্কৃতি আমাদের সংস্কৃতি হিসেবে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করব, সেই প্রশ্ন এসে পড়ে।

বর্তমান গবেষক সমাজ ও সংস্কৃতির আলোচনায় এই ধোঁয়াশা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডীবদ্ধ স্থায়ী সাংস্কৃতিক কাঠামোকে মান্যতা দেওয়ার উদ্দেশ্য তার নেই। তা সত্ত্বেও কিছু ক্ষেত্রে তাকে 'বাঙালি', 'দেশীয়', 'ভারতীয়' সংস্কৃতি এবং উল্টোদিকে 'ব্রিটিশ', বা 'শাসকের' সংস্কৃতি হিসেবে কিছু কিছু বিষয়কে নির্দেশ করতে হয়েছে। এই চিহ্নিতকরণ কোনো বাইনারিকে মান্যতার দেওয়ার উদ্দেশ্যে গৃহীত হয়নি। এই নামগুলিকে নেওয়া হয়েছে গবেষণার কাজের সুবিধের জন্য, একটি স্ট্র্যাটেজি হিসেবে, নিজের বক্তব্য তুলে ধরার একটি পন্থা হিসেবে।

গবেষণা প্রশ্নগুলি

সর্বজ্ঞাত অতি প্রতিষ্ঠিত জনপ্রিয় নাট্য ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করার জন্য এই সন্দর্ভে কোনো ঐতিহাসিক তথ্যের সত্যতা সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন তোলা হয়নি। এই গবেষণা করতে গিয়ে নাট্য প্রযোজনা বিষয়ক কোনো নতুন ঐতিহাসিক হদিশ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বরং, যাকে আমরা সর্বজনস্বীকৃত বাংলা নাট্য ইতিহাস বলে গ্রহণ করে নিয়েছি, তার মধ্যে কী কী ফাঁক দেখা যাচ্ছে বা আর্কাইভ থেকে প্রাপ্ত তথ্য সামগ্রী থেকে কোন কোন বিশ্লেষণ দেখা যাচ্ছে এবং কোন কোন বিষয়ে নাট্য ইতিহাস সতর্ক নিশ্চুপ থেকেছে–এই বিষয়গুলো নিয়েই এই গবেষক নির্দেশ করার চেষ্টা করেছে। এই গবেষণা বাংলা নাটকের জ্ঞানকোষ হয়ে উঠবে না, পাঠ্যপুস্তক নয়, নতুন তথ্যসামগ্রী সম্বলিত আকর গ্রন্থ হতে চাইবে না, কোনো নাট্যব্যক্তির সম্পূর্ণ জীবন বৃত্তান্তও এই গবেষণায় নথিকৃত করা হবে না। বরং বাংলার সুবিশাল নাট্য ইতিহাসের কয়েকটি টুকরো অংশকে বেছে নিয়ে আজকের যুগের লেন্সের সামনে রাখা হবে। সেই লেন্সের মধ্যে দিয়েই এতদিনের পরিচিত ইতিহাসকে আরেকবার দেখে নেওয়া হবে। তার ফলে প্রচলিত ইতিহাসের সঙ্গে নতুন ইতিহাসের কোনো দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য আসছে কিনা সেটাও পর্যবেক্ষণ করা হবে।

শুরুতেই নাট্য ইতিহাস সংক্রান্ত প্রশ্নগুলিকে নির্দিষ্ট কতগুলি বিভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। সেই ভাগগুলির নিরিখেই ধাপে ধাপে গবেষণা প্রশ্নগুলিকে রূপায়িত করা হয়েছে। প্রথম ভাগেই রাখা হয়েছে, সামগ্রিক ইতিহাস রচনার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রশ্নাবলী। অর্থাৎ প্রথাগত থিয়েটারের ইতিহাস বেশ কিছু তথ্যকে একেবারে প্রামাণ্য বা সর্বসম্মতসত্য হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। ইতিহাসরচনার ক্ষেত্রে প্রথাগতভাবে 'সত্য' বা 'প্রামাণ্য' হিসেবে কিছু বিষয়কে ধরে নেওয়া হয়। 'সত্য' বলতে আসলে যেন একটি বিশেষ নির্দিষ্ট ধারণা। 'সত্য'-এর ধারণাটির মধ্যে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণতার ভাব আছে। 'সত্য' মানে যেন কোনো সম্পূর্ণ বিষয়। তার নামটি উচ্চারণ করলেই যেন একটি স্পষ্ট ছবি ফুটে ওঠে। যেমন 'ধনতন্ত্র' নামটি উল্লেখ করলেই যেন ধনতন্ত্রের একটি পরিপূর্ণ রূপ ব্যাখ্যা করা হয়ে গেল,

এরকমটাই মনে করা হয়। মনে করা হয়, নামের মাধ্যমেই বিষয়ের 'সত্য'টি প্রতিষ্ঠিত করা গেল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসে যা 'সত্য' বলে পরিচিত, সেই 'সত্য'-এর স্বয়ংসম্পূর্ণ কাঠামোটিকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন, আলোচনা করা প্রয়োজন। (D. Chakraborty, *Monorather Thikana* 200-206)।

দীপেশ চক্রবর্তীর বিশ্লেষণে বোঝা যাচ্ছে, আধুনিক গবেষকদের অতীত ব্যাখ্যায় কী কী ধরনের সীমাবদ্ধতা বা প্রতিবন্ধকতা এসে দাঁড়ায়। এই বিশ্লেষণ মাথায় রেখে, আমার গবেষণা কর্মে বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসের বেশ কিছু তথ্য ও সত্য সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। যদিও এই অনুসন্ধান কোনোভাবেই সরাসরি কোনো নির্দিষ্ট তাত্ত্বিক গোষ্ঠীর মতাবলম্বী নয়। কোনো নতুন ইতিহাস আখ্যান তৈরি করার চেষ্টা করা হবে না এই গবেষণায়। তাহলে সেই নতুন আখ্যানটিও আরও একটি নতুন খণ্ডিত ও সীমাবদ্ধ ইতিহাস ব্যাখ্যানের বাহক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা বহন করবে। তাই ইতিহাসের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, বৈপরীত্য ও বিভিন্নতাকে খেয়াল করার কাজটুকুই করবে এই গবেষণা। তার বেশি কিছু নয়।

প্রশ্ন ১

এই অধ্যায়ের শুরুতেই লেবেদফের উদ্যোগে শুরু হওয়া বাংলা থিয়েটার নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন করা হল, সেগুলিও এই সামগ্রিক ইতিহাস রচনার আদর্শ সংক্রান্ত বিভাগেরই প্রশ্ন। যেমন লেবেদফের নাটককে প্রথম বাংলা নাটক হিসেবে মনে করার কারণ কী? বা ইতিহাস রচনার প্রথম অধ্যায় লেবেদফ! তার আগের বিশাল ইতিহাস ছোট্ট একটা ভূমিকা মাত্র। এই ইতিহাস লেখার ইতিহাস (Historiography)-র পেছনে কী কী কারণ আছে? বা কোন্ কোন্ মানসিকতা দেখা যাচ্ছে এই ইতিহাস লিখনের পদ্ধতিতে? পাশাপাশি প্রশ্ন আসে, সামগ্রিক ইতিহাস রচনার মধ্যে কতটা ব্রিটিশ মূল্যবোধ বা ইউরোপীয় আচার-আচরণের সমমর্যাদাসম্পন্ন হিসেবে বাংলা থিয়েটার ইতিহাসকে গড়ে তোলার তাগিদ বর্তমান ছিল? অথবা বাংলার প্রসেনিয়াম থিয়েটারের কার্যক্ষেত্রের মধ্যে 'অ-সাধারণ' হয়ে ওঠার উদ্যোগ কতটা ছিল? লোকসংস্কৃতির অবাধ দ্বার থেকে বাংলা থিয়েটারের বিশেষ বদ্ধ দ্বারের ইতিহাসের বিবর্তনে স্থানিক উপকরণগুলি কীভাবে সেই সময়কার সামাজিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিচ্ছায়া হয়ে উঠেছিল, সেই জিজ্ঞাসাও এই গবেষণা প্রশ্ন-বিভাগের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

প্রশ্ন ২

পরবর্তী প্রশ্ন-বিভাগটি হল ইতিহাস রচনা ও তার সঙ্গে লিঙ্গের সম্পর্কের আলোচনা প্রসঙ্গে। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে মেয়েদের থিয়েটারের আসার মুহূর্তটিকে নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা আছে। লিঙ্গ বিষয়ক আলোচনায় বাংলা থিয়েটারের এই অধ্যায়টি নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কিন্তু প্রশ্ন আসে, নারীর বাংলা থিয়েটারে অভিনেত্রী হিসেবে নিয়োগের ক্ষেত্রে এত বাদানুবাদ কেন? কিংবা অন্যভাবে বলতে গেলে, নারীর 'নাট্য-অভিনয়' নামক পেশাকে বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ জুড়ে বাঙালি উচ্চবিত্ত সমাজে যে বিরুদ্ধতা ও পক্ষপাতিত্বের জোয়ার এসেছিল, তার মূল কোথায়? বিশেষত, যেখানে বাংলার লোকসমাজে অভিনেত্রী হিসেবে নারীর যথেষ্ট অংশগ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে নারীচরিত্রে একজন নারীই যে অভিনয় করা উচিৎ এ ব্যাপারে তো তৎকালীন নাট্যকর্মীদের মধ্যে তেমনকোনও দ্বিধার থাকার কথা নয়! এই সূত্রে বিশ্লেষণ করা জরুরী, বাংলা থিয়েটারে অভিনেত্রীদের জাতি-ধর্ম-বর্গ ভেদে অবস্থানটি কীরকম ছিল? উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলার পার্ফর্মেন্স হিস্টরি-তে যেভাবে মেয়েদের বহুল উপস্থিতি দেখা যায়, ক্রমে তা খানিকটা বাধার সম্মুখীন হতে শুরু করল কেন? এই সূত্রে উচ্চবর্গীয় সমাজে 'ভদ্রমহিলা' গড়ে তোলার উদ্যোগটি কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকতে পারে?

পাশাপাশি এই প্রশ্নও আসে যে, বাংলা থিয়েটার যে ব্রিটিশ থিয়েটারকে দেখে প্রভাবিত, সেখানে প্রভূত অভিনেত্রীদের অংশগ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায়। একেবারে গোড়ার দিকে মিসেস হরিটো, মিসেস হিউগেস, মিসেস বেসেট বা এমা র‍্যাংহাম থেকে শুরু করে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত মিসেস ব্যারী, মিসেস ডীকল, মিসেস কাউলি, মিসেস ফ্র্যাঙ্কলিং, মিসেস এণ্ডরসন—এই রকম বহু অভিনেত্রীদের নাম পাওয়া যায়। এমনকি, গিরিশ চন্দ্র ঘোষ নিজেও মিসেস লুইসের থিয়েটারের সংস্পর্শে এসে ইংরেজি থিয়েটার সম্পর্কে উৎসাহিত হয়েছিলেন, প্রশিক্ষিত হয়েছেন। অথচ গিরিশ নিজের থিয়েটার করা কালীন অভিনেত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হচ্ছেন। কেন এমন হল?

আমার পর্যবেক্ষণের লক্ষ্য হল, কী কী কারণে এই নিম্নবর্গের মহিলা সংস্কৃতিকে ভদ্রলোক ইংরেজি শিক্ষিত বাবু সম্প্রদায়ের মানুষেরা উপেক্ষা করলেন বা দূরে সরিয়ে দিতে চাইলেন? ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে কি নিম্নশ্রেণীর মহিলাদের শিল্পচর্চা বাধা পেল? নাকি তাঁরা উচ্চবিত্ত শাসনে 'রুচিশীল' সভ্য হয়ে উঠলেন এবং তাঁদের সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়ে উঠল? তাঁদের জীবনের সহজাত সংস্কৃতি কি ইংরেজি ঔপনিবেশিক 'শ্লীলতা''মূল্যবোধ' ও 'রুচিশীলতা'র মানদণ্ডে

বিনাশপ্রাপ্ত হল? নাকি উচ্চবর্গের সঙ্গে ক্রমাগত সংঘর্ষে আদান-প্রদানে মেলবন্ধনে গড়ে উঠল কলকাতার নতুন নাগরিক লোকসংস্কৃতি? মূলত নাট্যমঞ্চে মেয়েদের অংশগ্রহণের ঘটনাটি নিয়ে নাট্য ইতিহাসে যে প্রতিষ্ঠিত Dominant ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে, সেই আখ্যানের দিকে গভীরতর দৃষ্টিনিক্ষেপ করার উদ্দেশ্যেই এই অধ্যায়ের প্রশ্নগুলি সাজানো হয়েছে।

প্রশ্ন ৩

এর পরের প্রশ্ন-বিভাগটি বাংলা নাটকের ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের ঘটনাটিকে কেন্দ্র করেনির্দেশ করা হয়েছে। রাষ্ট্র ও থিয়েটারের সম্পর্কটির প্রসঙ্গটিকে নির্দেশ করতে এই বিভাগে প্রশ্নগুলিকে পরিকল্পনা করা হয়েছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বাংলা নাট্যমঞ্চে বেশ কিছু সমাজসচেতন প্রতিবাদী নাটকের অভিনয় হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেই নাটকগুলি বেশ স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ ইংরেজবিদ্বেষী বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে। ফলাফলস্বরূপ ইংরেজ সরকার ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে নাট্য অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন লাগু করেন। নাট্য ইতিহাসের এই সময়টি নিয়ে নানান আকরগ্রন্থে একটি নির্দিষ্ট আখ্যান প্রচলিত আছে। নাট্য জগতের অত্যন্ত দেশপ্রেমী নির্ভীক অকুতোভয় ইমেজটিকে গড়ে তুলতে নাট্য ইতিহাসের প্রচলিত আখ্যানটি সদা সচেষ্ট। কিন্তু প্রশ্ন হল, নাট্য ইতিহাসের এই পর্বটিতে মূল নাট্যজগতের কর্মীদের কি আন্তরিক অংশগ্রহণ ছিল? কলকাতার বাংলা থিয়েটারের প্রতিবাদী নাট্যের ঐতিহাসিক প্রবহমানতা ঠিক কেমন ছিল? ব্রিটিশের অনাচারের প্রতিবাদে উনিশ শতকের শেষের দিকে যে যে প্রতিবাদী নাট্যক্রিয়াগুলি ঠিক কীরকম হয়েছিল? এই সময়ের ঘটনাবলী কি একটা ব্যতিক্রমী প্রতিবাদী স্ফুলিঙ্গের মতোই হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোনো ঐতিহাসিক মুহূর্ত? নাকি এই ঘটনার সঙ্গে পরবর্তী সময়ের প্রতিবাদী নাট্যধারার ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে? সময়টিকে নিয়ে প্রচলিত ইতিহাসের রাজনৈতিক আলোচনাও কতটা জোরালোভাবে করা হয়েছে, সেই প্রশ্নটিও জরুরী। এই নির্দিষ্ট ঘটনাটিতে নাট্যজগতের সমসাময়িক বিশাল পরিমণ্ডলটি কীভাবে প্রতিক্রিয়া দিয়েছিল, সেটা বিশ্লেষণ করা জরুরি। নাট্য জগতের এই সাহসী অধ্যায়টি কি সত্যিই ইংরেজ অপশাসনের বিরুদ্ধে নাট্যকর্মীদের সমবেত উদ্যোগ ছিল? নাকি সেখানে অন্যান্য অনেক জটিল অনুপ্রেরণা কাজ করেছিল; বস্তুত এই ঘটনাটিতে কতটা সামগ্রিক নাট্য জগতের প্রতিনিধিত্ব ছিল, সেই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করার জন্য এই বিভাগের প্রশ্নগুলি পরিকল্পিত।

প্রশ্ন ৪

পরবর্তী প্রশ্ন-বিভাগটি ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও নাট্যমঞ্চে তার প্রভাবের কথা বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে তৈরিকরা হয়েছে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সময়ে বাংলা নাট্যমঞ্চ থেকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেওয়া হয়। সেই সংগ্রামী অধ্যায়ে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রের জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল নাট্যমঞ্চ, সে ইতিহাসও ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে যে নতুন ধারার স্বদেশী ঐতিহাসিক নাট্য আন্দোলন শুরু হয়, তার সঙ্গে সেই সময়ের হিন্দু-জাতীয়তাবাদী ভাবনার কতটা সামঞ্জস্য ছিল? স্বদেশী আন্দোলনে জাতীয় বীরের ভাবনা, তৎকালীন মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদীদের সম্পর্ক বা ব্রিটিশ রাজের সঙ্গে ভারতীয়দের যে বিরোধিতা বা বোঝাপড়ার অনুষঙ্গ গড়ে উঠছিল, সেই রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতার বাংলা নাট্য জগতের প্রবণতাগুলি কেমন ছিল? জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক রাজনীতিতে কতটা মিশে ছিল হিন্দু পৌরোহিত্য এবং সমাজের সেই বৈশিষ্ট্যের প্রভাব বাংলা নাট্যরচনায় কেমনভাবে এসেছে বা বাংলা নাটক কীভাবে সুকৌশলে এই হিন্দু জাতীয়তাবোধের সঙ্গে বোঝাপড়া করেছে, সে আলোচনা জরুরি। এই প্রশ্নগুলির নিরিখে উনিশ-বিশ শতকের কলকাতার নাট্য আন্দোলনের গভীরতাকে অনুধাবন করার চেষ্টা করা দরকার। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আগে ও পরে বাংলা নাটকের গতিপ্রকৃতি, দর্শক মনোরঞ্জনের প্রতিক্রিয়া ও প্রযোজনার জন্য বেছে নেওয়া নাটকসমূহের বিশ্লেষণ করে, এই প্রশ্ন বিভাগটি নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৫

সবশেষ প্রশ্ন-বিভাগটি হল, নাট্য ইতিহাসে নাটকের মঞ্চস্থাপত্য ও দৃশ্যসজ্জার ইতিহাস সংক্রান্ত। প্রশ্ন এই, নাটকের ইতিহাসের মূল ধারাবিবরণীতে মঞ্চসজ্জার ইতিহাস স্থান পায় না কেন? শুধুমাত্র তথ্যের অভাবে কি প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস থেকে মুছে গেছিল এই ইতিহাস? নাকি অন্য কোনো জটিল কারণের ফলাফল এটা? অথবা এই বিবরণীতে আসলে নিম্নবর্গের মানুষদের একটা প্রধান ভূমিকা এসে পড়েছিল, আর তাই এই ইতিহাস নিয়ে এত নৈঃশব্দ্য সৃষ্টি? এই প্রশ্ন এসেই যায়। উচ্চবর্গীয় ঐতিহাসিক অ্যাখ্যান থেকে কেন বাদ পড়ে গেল মঞ্চ নাটকের কারিগরি দিকটি?

নাটকের ইতিহাসে শুধুমাত্র টেক্সট-এর আলোচনা থাকে না। কোন তারিখে কোন নাটকে কোন অভিনেতা অভিনয় করেছেন, শুধু সেটা ইতিহাস নয়। নাটকের ইতিহাসে তো নাটকগুলির মঞ্চায়ন পদ্ধতি, নাট্য দৃশ্যের বিবরণ— এগুলোও স্থান পাওয়ার কথা! বিশিষ্ট গবেষক Christopher Pinney ভারতীয় মুদ্রিত অঙ্কনশিল্প ও ভারতের

রাজনৈতিক সংগ্রাম নিয়ে একটি বিকল্প ইতিহাস অনুসন্ধান করেছিলেন।এই গবেষণাটি শুধুমাত্র দৃশ্যশিল্পের ইতিহাস রচনা করার জন্য নয়, মূল প্রচলিত ইতিহাসকে নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে সক্ষম হয়েছিল। ঠিক একইভাবে, উনিশ ও বিশ শতকের নাট্য প্রযোজনাগুলির মঞ্চসজ্জার দৃষ্টি থেকে বাংলা নাট্য ইতিহাস লেখার প্রচেষ্টা করা হল না কেন, সে প্রশ্নটাও জরুরি। আলোচ্য প্রশ্ন বিভাগে সেই অভিমুখেই প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসের দিকে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

বর্তমান গবেষণা কর্মটি নানান বহুমুখী ভিন্নধর্মী পরিসরে বিস্তৃত হয়ে আছে। একমাত্রিক সরলরৈখিক পথে এই গবেষণাটি প্রবাহিত হবে না। এই রকম টুকরো টুকরো ভাবে বিন্যস্ত এবং জটিল আবর্তে প্রবাহিত গবেষণার কাজটিকে একটি সুঠাম রূপ দিতে এই প্রশ্ন-বিভাগগুলির ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে, এই আশা রাখি।

বর্তমান গবেষণার প্রাসঙ্গিকতা

আগেই বলা হয়েছে, বাংলা থিয়েটারের একটি চিরাচরিত ইতিহাস জ্ঞানজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে। নাটক সংক্রান্ত পাঠ্যপুস্তকে, ইতিহাস গ্রন্থে, পত্র-পত্রিকায় সেই ইতিহাস-পরম্পরা বারবার উল্লিখিত হয়ে এসেছে। সময়ক্রম অনুসারে সুগঠিত সেই ইতিহাস বিবরণী নাট্য শিক্ষার্থীমাত্রেই জানেন। সেই প্রচলিত ইতিহাসের তথ্যগত সামগ্রিকতাকে আরওপূর্ণতারদিকেনিয়েযাওয়ার উদ্দেশ্যে এই গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এই গবেষণা বাংলা নাট্য ইতিহাসে কোনো নতুন তথ্যের সংযোজন করতে চাইবে না। বা আর্কাইভে উপস্থিত কোনো তথ্যের সত্যতা সম্পর্কেও বিশেষ মতামত রাখবে না।

আমার গবেষণাটি প্রথাগত সুপ্রতিষ্ঠিত ইতিহাস কাঠামোটিকে কয়েকটি প্রশ্ন করার সুযোগ নেবে। প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস জ্ঞানকে এই গবেষণা কয়েকটি লেন্সের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করবে মাত্র। কিন্তু গবেষণার শেষে যে প্রশ্নগুলো উঠে আসবে, এই গবেষণার শেষে সেই প্রশ্নগুলির সম্ভাব্য উত্তর হিসেবে কোনো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আমি পৌঁছতে চাইবো না বা পৌঁছতে পারবো না। এই গবেষণা কোনো উত্তর খোঁজার কাজ করবে না। বরং এটি প্রশ্ন করার একটি সচেতন পদ্ধতিমাত্র হয়ে ওঠার আশা রাখে। যে পদ্ধতিতে চিরাচরিতকে খুঁটিয়ে দেখার উদ্যোগ নেওয়া হয়; যে পদ্ধতিতে প্রচলিত আচার-আচরণ শুধুমাত্র তথ্য হয়ে থাকে না, বরং কেন তা সমাজে প্রচলিত হয়ে উঠতে পেরেছে, সেই খোঁজে নিয়োজিত থাকে; যে পদ্ধতিতে সমাজে-ইতিহাসে-জীবনে-রাজনীতিতে যা আছে, তা কেন আছে এবং যা

নেই, তা একসময়ে হয়তো ছিল, আজ কেন নেই বা আজ কেন থাকতে পারেনি, সেই অনুসন্ধান করার চেতনা জাগায়।

আদি–মধ্য-অন্ত বিশিষ্ট কোনো ইতিহাস আখ্যান নয়, ইতিহাসকে টুকরো টুকরো ঘটনা হিসেবে বিচার করে মহান আখ্যান বা Grand Narrative-এর মধ্যেকার ফাঁকগুলোকে নির্দেশ করাই আমার উদ্দেশ্য থাকবে। সমগ্র আখ্যানটিকে কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত করার কোনো প্রচলিত বাসনাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করব। যে তথ্য পাওয়া যায়নি, বা ইতিহাসের যে অংশকে অনুধাবন করার সুযোগ থাকবে না, সেই অংশকে 'জানি না' বা 'জানা নেই'—এভাবেই বিশ্লেষণ করার প্রয়াস করব। ঘটনার আগে ও পরের কার্যাবলির সঙ্গে মূল ঘটনাটিকে সূত্রায়িত করার তাগিদে কোনো কল্পনার আশ্রয় নিয়ে মূল ঘটনাটিকে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা থেকে বিরত থাকার প্রচেষ্টা করব। সর্বক্ষেত্রে যে আমি এই নির্মোহ অবস্থান বজায় রাখতে পারব, এমন কথা জোর দিয়ে বলা কঠিন। কিন্তু গবেষকের নৈর্ব্যক্তিক ব্যক্তিত্বের গুরুত্বকে অনুধাবন করতে পারলে গবেষণাকর্মে নিঃসন্দেহে তার একটি জোরালো প্রভাব পড়ে বলে আমার বিশ্বাস। গবেষণাকর্মে ভুল-ত্রুটি, অনৈতিকতা, সমস্যা, বিপদ ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন মস্তিষ্ক নিয়ে চলাই কাঙ্ক্ষিত। যদিও কর্মক্ষেত্রে কোনটা ভুল, কোনটা অনৈতিক—এ ব্যাপারেও খুব নিশ্চিত করে কিছু বলার অধিকার আমার নেই। শুধু গবেষক হিসেবে নিজের সীমাবদ্ধতা ও নিজের সচেতন অবস্থানটিকে অটুট রাখার চেষ্টা আমি করব, এটুকু আশা রাখি। আর এই সীমাবদ্ধতাকে সচেতন গবেষক হিসেবে ব্যবহার করে পুরোনো ইতিহাসকে যাচাই করাটাই আমার কাজের বিশিষ্টতা।

প্রায় দুইশো বছরের বেশি সময় ধরে বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস বহমান। বিশ শতকের গোড়া থেকে বাংলা থিয়েটারের যে ইতিহাস লিপিকরণ হতে থেকেছে, আজ পর্যন্ত তা ক্রমবর্ধমান অবয়ব নিয়ে চলেছে। তৈরি হয়েছে বাংলা থিয়েটারের মহান আখ্যান বা Grand Narrative। নতুন গবেষণা করতে গিয়ে এই মহান আখ্যানকে নিঃসন্দেহ ভিত্তি হিসেবে মনে করে নিতে পারলে কাজ খানিক সহজ হয়। কিন্তু যদি এই আখ্যানকেই কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে বিশ্লিষ্ট করে দেখা হয়, তাহলে সেই ইতিহাসের গোড়াটিই অস্থায়ী হয়ে দাঁড়ায়। তখন তার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা যেকোনো বিশ্লেষণই প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড়ায় কিনা সেই বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা হবে। সমাজের সর্বত্র ক্ষমতার উপস্থিতি আছে। সেই ক্ষমতা কিভাবে নাট্য ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ করছে, কীভাবে নাট্য ইতিহাসের মৌলিক তথ্য ভাণ্ডারকে প্রভাবিত করছে, কিভাবে একটি ঐতিহাসিক ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার নির্দেশ দিচ্ছে সেই ক্ষমতা, এই সমস্ত

প্রশ্নগুলোকে নির্দেশ করা প্রয়োজন। এমনকি, মূল ঐতিহাসিক আখ্যানটি কিভাবে ইতিহাসকারের ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্ব, পছন্দ, কল্পনা ও রুচিবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, সেটিও বিশ্লেষণ করা দরকার। ইতিহাস কি কেবল ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতিবেদন মাত্র? নাকি ঘটনার বিশ্লেষণও ইতিহাসবিদের কাজ? যদি তাই হয়, তাহলে তাঁর বিশ্লেষণের পদ্ধতি নির্ধারণ করছে কে বা কী?

এই গবেষণার কাজে আমার ভূমিকা একজন সচেতন প্রশ্নকর্তা হিসেবে। এটাই আমার কাজের বৈশিষ্ট্য। আমার ভূমিকা থাকবে প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস আখ্যানের এক নিমগ্ন পাঠক হিসেবে। সংগ্রহশালায় প্রাপ্ত প্রামাণ্য তথ্যের ওপর ক্ষমতার প্রভাব সম্পর্কে যথাসম্ভব সচেতন থাকার ভূমিকা আমার থাকবে। নিজের গবেষণার কাজে কোনোভাবে আমার নিজের পক্ষপাতিত্ব সে সম্পর্কে আমার সচেতন ভূমিকা থাকবে। যদিও পুরোপুরি নির্মোহ ভঙ্গিতে প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাসের বিশ্লেষণ করা যে আমার পক্ষেও সবসময় সম্ভব হবে না, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা ও বিশ্লেষণ ভঙ্গি যে আমার চেতনাকেও কিছু ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করতে বাধ্য, সে সত্যও আমার চেতনায় বহমান থাকবে। আরও গভীরে বলতে গেলে বলতে হয়, নির্মোহ ভঙ্গিতে ইতিহাসের বিশ্লেষণ করা আমার উদ্দেশ্যও নয়; আমি এই বিশ্লেষণ করতে চাইছি একটি প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসের রাজনৈতিক সমালোচনা হিসেবে।

গবেষণা বৈশিষ্ট্য, সীমাবদ্ধতা ও পদ্ধতি

ক) গবেষকের অস্তিত্বে সংকরায়নঃ Insider নাকি Outsider

সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যেকোনো সম্প্রদায় বা মানুষের মৌলিক পরিচয় কাকে বলা যাবে, তা নিয়ে বিতর্কের শেষ নেইঃ একটি অস্তিত্বে মিশে আছে নানান প্রজাতি ও ধর্ম। এই প্রেক্ষিত মাথায় রেখে থিয়েটার নিয়ে ইতিহাস চর্চা কি করা হয়? নাকি সে ইতিহাস ভুলে ইংরেজ প্রভাবিত ঔপনিবেশিকতাপুষ্ট কলকাতা নিবাসী হিন্দু উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত বাঙালির ইতিহাস রচনাতেই বেশি মনোযোগী আমরা? একটি সংস্কৃতির নাট্য ইতিহাস রচনা করার কাজে তার অব্যবহিত পূর্বের ইতিহাসকে সম্পূর্ণ ভুলে থেকে নাট্য ইতিহাস লেখা—বড়ই জটিল ও ঝুঁকির কাজ নয় কি? সীমাবদ্ধতা আসতে বাধ্য নয় কি?

এইখানে প্রশ্ন আসে, গবেষকের নির্দিষ্ট গবেষণায় অংশগ্রহণ করার মধ্যে যে জটিলতা বিদ্যমান, সেগুলো সম্পর্কে গবেষক নিজে যথেষ্ট অবগত কিনা। বর্তমান গবেষকের নিজস্ব সমাজকে নিয়েই কাজ। গবেষণার তাত্ত্বিক ভাবনায় গবেষক এখানে Insider। অর্থাৎ অতীত সময়ের যে সমাজকে নিয়ে আমার কাজ, সেই সমাজগোষ্ঠীরই

একজন প্রতিনিধি হয়ে এই গবেষণাকর্মে আমি ব্রতী হয়েছি, এমনটাই সাধারণভাবে মনে করার কথা। সেই শহর, সেই ভাষা, সেই সংস্কৃতির উত্তরসূরী যুগকে আমার নিজের অস্তিত্ব দিয়ে আমি পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পাচ্ছি। সাধারণ ভাবে এমনটাই মনে করা যেতে পারে। কিন্তু একই সমাজের প্রতিনিধি হওয়া সত্ত্বেও ভিন্ন ভিন্ন গবেষকের অবস্থানটি কিন্তু স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। আলাদা আলাদা গবেষকের অস্তিত্ব অনুযায়ী তার শিক্ষা, লিঙ্গ, যৌন পরিচয়, শ্রেণী, জাতি সবকিছুর পার্থক্য হয়ে যেতে পারে। এই ভিন্নতার প্রভাবও পড়ে গবেষণায়। এমনকি গবেষকের পেশাদারি পরিচয়ও এক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি করে। তার ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে কর্মসত্তা দূরে থাকে। বরং দেখা দরকার, গবেষক কি পেশাদারি কাজ হিসেবে গবেষণাটি করছে? নাকি তার মধ্যে থেকে উঠে আসছে তার নিজস্ব স্বর, দৃষ্টিভঙ্গি বা দ্বন্দ্ব। এখানেই power বা শক্তির সঙ্গে গবেষণার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। 'Who can ethically represent whom?'- এটাই আসল প্রশ্ন। গবেষক নিজে গবেষণা-বিষয়ের insider নাকি outsider সে প্রশ্নটি জটিল হয়ে দাঁড়ায়। Insider হিসেবে বিবেচিত কোনো গবেষক, নিজ সম্প্রদায়েরর বাইরে থেকে শিক্ষিত হয়ে এলে সে পুরোনো বা তার নিজের দেশের জগতে Outsider-ও হয়ে পড়তে পারে নিশ্চয়? গবেষকের এই Multiple Subjectivity সম্পর্কে সম্যক অবহিত থাকা দরকার।

সমাজের অসংখ্য বৈচিত্র্য আছে। সে সবকিছু সম্পর্কে জানাটা একজন insider-গবেষকের পক্ষেও সম্ভব নয়। গবেষণার মাধ্যমে নিজের সমাজ সম্পর্কেও সে নানান নতুন দিক জানতে পারে। পূর্ব-অভিজ্ঞতা বা পূর্ব-জ্ঞান পাল্টেও যেতে পারে। মনে রাখা দরকার, একজন গবেষক তার সমাজকে তার নিজস্ব অবস্থান থেকেই শুধু জানেন। গবেষকের নিজস্ব জীবনের অভিজ্ঞতা ও তার পেশাদারি দায়িত্ব-এই দুই অস্তিত্বকে মিলিয়েই তার গবেষণার Hybridity বা সংকরায়নটি উপস্থাপিত হয়। বর্তমান গবেষণাটিতেও সেই সংকরায়ণ পদ্ধতিটি অবশ্যই ঘটেছে, সে কথা মনে রাখা জরুরি।

গবেষক হিসেবে আমার অবস্থানটি এই কারণে জটিল হয়ে পড়েছে। আমি নিজে কলকাতার বাংলা প্রসেনিয়াম নাটকের একজন সর্বক্ষণের কর্মী। নাটকের অভিনয়, পরিচালনা, নেপথ্যের কাজের প্রশিক্ষণ পেয়েছি গত কুড়ি বছর ধরে। নাট্য শিক্ষার গোড়ার দিক থেকেই লেবেদফ, কলকাতার ব্রিটিশ থিয়েটার, শখের থিয়েটার, পেশাদারী থিয়েটার বা গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক আখ্যানগুলি আমার শেখা, শোনা বা মুখস্থ করা। যে সময় থেকে এই ইতিহাসকে শুনেছি, সেই সময়ে আমার আধুনিক গবেষণার কোনো চেতনা তৈরি হয়নি। বারে বারে লিখিত,

শ্রুত, পঠিত বা আলোচিত হয়ে এসেছে যে ইতিহাস, সেই ইতিহাস কাঠামোকেই আমি সমগ্রতার ধারণা নিয়ে নিঃসন্দেহ চিত্তে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই আমার এমন অবস্থা হতেই পারে যে, নাট্য ইতিহাস সংক্রান্ত কিছু কিছু ব্যাখ্যাকে আমি পরিপূর্ণ হিসেবেই সমাদর করে ফেলব। আমার জায়গায় যেকোনো অবাঙালি বা কোনো প্রকৃতই outsider নাট্যকর্মী হয়তো এই নাট্য ইতিহাসের ব্যাখ্যায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের অবতারনা করতে পারবেন। আমি হয়তো সে মুহূর্তগুলোকে নিয়ে প্রশ্ন তোলার চেতনাকে জাগরিত করে রাখতে পারবো না। এইভাবে দেখলে আমার অবস্থানটি একজন গবেষণা ক্ষেত্রের ভিতরের মানুষ হিসেবেই দেখা হতে পারে।

কিন্তু, যে সময়টিকে নিজে আমার কাজ, সেই সময়টিতে কি আমি ভিতরের মানুষ? সেই সময়ের শ্রেণিচেতনা, ধর্মাচার, সামাজিক নিয়মাবলী, আইন, শিক্ষাব্যবস্থা, রাষ্ট্রনীতি, লিঙ্গ রাজনীতির চলন, মানুষের যৌন পরিচয়ের স্বাধীনতা, জাতি বৈশিষ্ট্য—সবটাই আমার পরিচিত পরিধির বাইরের উপকরণ। আমার গবেষণার পরিসর শুরু হচ্ছে মোটামুটি লেবেদফের নাট্যচর্চার সময় (১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দ) থেকে আর শেষ হচ্ছে গিরিশ ঘোষের মৃত্যুকালীন সময়ে (১৯১২ খ্রিস্টাব্দ)। গবেষণার কাজটি মূলত কলকাতা কেন্দ্রিক নাট্যচর্চাকে ঘিরেই। ফলে আপাতভাবে মনে হতেই পারে নিজের শহর, নিজের পেশা ও নিজের ভাষার পরিসরে আমার গবেষণাটি একটি insider-এর নিরীক্ষণ হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু লেবেদফ থেকে গিরিশ ঘোষ—এই দীর্ঘ সময়ের সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতিচর্চা, কোনো কিছুই তো একমাত্রিক থাকেনি। বিশেষ করে লেবেদফ ও তাঁর সমসাময়িক ব্রিটিশ নাট্যচর্চার ইতিহাস যখন আমার আলোচনায় খানিক জায়গা করে নেয়, তখন তো আমি নিজেই আমার শহর বা আমার নাট্য ইতিহাসেরই বাইরে এসে দাঁড়াই। আবার যখন গোলাপসুন্দরী বা বিনোদিনীর অভিনয় জীবনকে নজর করে দেখতে যাই, তখন উনিশ শতকীয় শ্রেণি ও সম্প্রদায়গত চেতনার নিরিখে মহিলা নাট্যকর্মী হিসেবে আমার অবস্থান অনেকটাই outsider হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রনীতি ও নাট্য কর্মের বিরোধের যে মুহূর্তকে আমি পর্যবেক্ষণ করতে চাই, তার সঙ্গে আমার আজকের যুগের বিশ্বায়ন, টেলিভিশন ও প্রিন্ট মিডিয়া, স্যোশ্যাল মিডিয়া ইত্যাদি নানান শক্তির অবয়বের মিল খোঁজা দুষ্কর হয়ে পড়ে। আজ আমার সময়ে ধর্মান্ধতার চেতনাকে যে রূপে দেখি, তার যে রাষ্ট্রীয় প্রতিচ্ছায়া দেখে বিশ্লেষণ করি, তার সঙ্গে উনিশ শতকের নাট্যমঞ্চ এবং হিন্দুত্ববাদী জাতীয় ভাবনার সম্পূর্ণত সাদৃশ্য পাওয়া যায় কি? একইভাবে নাটকের মঞ্চসজ্জার আলোচনায় বাস্তববানুগ আয়োজন ও বিমূর্ততার লেনদেনের বৈশিষ্ট্যকে যখন আমি দেখতে যাই, তখন

আজকের যুগের টেলিভিশন, সিনেমা, ওয়েব সিরিজ-এর মাঝে থিয়েটার কর্মীর অবস্থানটিকে নিঃসন্দেহে আমায় বাইরের মানুষ করে তোলে।

আর এই কারণেই আমি যুক্তিভিত্তিকভাবে বিশ্বাস করে চলি যে, আমার মধ্যে প্রবহমান রয়েছে আজকের যুগের একজন নাট্যকর্মীর প্রচয়, যা আমাকে কলকাতার বাংলা নাট্য ইতিহাসের insider-এর পরিচয় দেয়, আবার একই সঙ্গে আমার গবেষণা পরিসর আমাকে দূরে দাঁড় করিয়ে দেয় আর তখনই আমি সরে গিয়ে দাঁড়াই একজন outsider হিসেবে।

খ) গবেষকের সতর্কতাঃ Archive ও ইতিহাস

পাশাপাশি গবেষণা কর্মের আরও একটি প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হচ্ছে বর্তমান গবেষককে। পুরাতন ইতিহাস নিয়ে গবেষণার একটি অন্যতম শক্তিশালী সহায় হল সংরক্ষণাগার বা archive। সংরক্ষণাগার ও ইতিহাস; সংরক্ষণাগারে ইতিহাস; সংরক্ষণাগারের বাইরে ইতিহাস-এই তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা জরুরি। আর্কাইভ একটি আধুনিক নির্মাণ। আধুনিক রাষ্ট্র আধুনিক অনেক পরিকাঠামোর সঙ্গে সঙ্গে এটিকেও তৈরি করেছে। যেকোনো গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের সত্যতা, যাথার্থ্য যাচাই করা হয় আর্কাইভ-এর মাধ্যমে। অর্থাৎ, আর্কাইভ-এর মধ্যে যে যে তথ্য পাওয়া যায়, তাকেই সত্য হিসেবে বা বিশুদ্ধ তথ্য হিসেবে মনে করা হয়। আর্কাইভ-এর ওপর নজরদারী করে না, এমন কোনো রাজনৈতিক শক্তি হয়তো পাওয়া যাবে না। আর্কাইভ কি তাহলে স্বাধীন দেশের একটি রাজনীতিগত ভাবে পরাধীন স্থান, যেখানে ক্ষমতাই শেষ কথা বলে? তাহলে যে আর্কাইভ-এর ওপর আমাদের সমাজ ও সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা এতটা মুখাপেক্ষী হয়ে আছে, সেই আর্কাইভ-ই কি কোনো ভাবে কোনো রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বে দুষ্ট? তাই যদি হবে, তাহলে সেই আর্কাইভ-কে পড়ার পদ্ধতি কী হওয়া উচিৎ? আর্কাইভ-এর কাগজপত্রে যে নথি পাওয়া যাচ্ছে, তা কি কোনো একক স্বরের প্রতিনিধিত্ব করছে? সত্যের হদিশ খুঁজতে গিয়ে কি আমরা কোনো শক্তিশালী একপেশে স্বরের প্রতিনিধিত্ব করে ফেলছি?

Rebecca Schneider আর্কাইভ নিরীক্ষণ করতে গিয়ে বলছেন, আর্কাইভ কথাটির অর্থ গ্রীক Archon, Head of the State থেকে এসেছে। Archive শব্দের মূল গ্রীক ব্যুৎপত্তিগত অর্থ Archon’s house বা শাসকের বাড়ি। উচ্চবর্গীয় শাসকের (Greek ভাষায় যাদের archon বলে) বাড়িই হল Archon (Schneider 102)। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, আর্কাইভ শব্দটির মধ্যেই কোথাও রাজপক্ষীয় বা শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। যথারীতি

রাজা যে ইতিহাস রচনা করাতেন, তাতে সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের কথা কোথাও উল্লিখিত হত না। অর্থাৎ, প্রাচীন ইতিহাস ছিল রাষ্ট্রশক্তির ইতিহাস, উচ্চশ্রেণীর ইতিহাস। গোটা ইতিহাসচর্চার ধরনটাই ছিল রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। নিম্নবর্গের মানুষের দৃষ্টি থেকে ইতিহাসের কোনো সমান্তরাল পাঠ রচিত হত না।

এই সূত্রে আর্কাইভ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের কথা বলা আবশ্যক। আর্কাইভ-এ কী সংগৃহীত হবে তা নির্ধারণে আর্কাইভ-এর নিজস্ব গঠনটির একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। সেই সংগৃহীত তথ্যই ইতিহাস ও স্মৃতিকে আয়ত্তাধীনে রাখে। আর্কাইভ-এর উপকরণগুলি অতীতের হুবহু নৈর্ব্যক্তিক প্রতিনিধিত্ব করে না। বরং বিভিন্ন কারণে অতীতের কিছু বাছাই করা উপকরণই আর্কাইভ-এ থাকে। যে তথ্য আর্কাইভ-এ নেই, তার হদিশ আর ইতিহাসে মিলবে না। এভাবেই 'ইতিহাস' নামক বিদ্যাশৃংখলাটি (Discipline) গঠিত হয়। 'ইতিহাস' একটি 'গঠিত' (constructed) আখ্যান এবং এই গঠনপ্রক্রিয়ায় তৎকালীন সামাজিক কাঠামোগুলির বৈষম্য প্রতিধ্বনিত হওয়ার সম্ভাবনা বহন করে। তথ্য কী প্রক্রিয়ায় তৈরি করা হচ্ছে, তার ওপরে জ্ঞান (knowledge)-এর কাঠামোটি নির্ধারিত হয়। জাদুঘর, গ্রন্থাগার, মহাফেজখানা, সংগ্রহশালাগুলি ঠিক করে দেয় কী কী সংরক্ষিত হবে। আর সেই সংগৃহীত তথ্য পরোক্ষভাবে নির্ধারণ করে ভবিষ্যতে কী কী চর্চিত হবে। যা আর্কাইভ-এ নেই, তা ভবিষ্যৎ গবেষণায় আর কোনোদিন আলোচনার মধ্যে আসবে না। আর্কাইভ-এর ওপর নির্ভর করার এই এক বড় সমস্যা। বলা যায়, আর্কাইভ-এর ধারণাটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা এটি। এই সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার নানা পদ্ধতি খোঁজার চেষ্টায় ব্যাপৃত আছেন সারা পৃথিবীর নবচেতনা ইতিহাস তাত্ত্বিকরা (Schneider 106)।

এই সমস্যার সমাধান খুঁজতে গিয়ে Patrick Joyce, Thomas Osborne, Antoinette Burton, Sumit Sarkar প্রমুখ চিন্তকরা আর্কাইভ-এর বাইরে নতুন আর্কাইভ-এর প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। অর্থাৎ, যে উপকরণগুলি প্রথাগত আর্কাইভ-এর গণ্ডির মধ্যে পড়ে না বা প্রতিষ্ঠিত আর্কাইভ যে সামাজিক উপাদানগুলিকে মান্যতা দিতে রাজি নয়, সেই উপকরণগুলিতেও ঐতিহাসিক তথ্য ও সত্যকে খুঁজে দেখার কথা বলছেন এঁরা। আর্কাইভ তাঁদের কাছে শুধুমাত্র একটি বস্তুগত স্থান নয়—এটি একটি পদ্ধতি। আর্কাইভ-এর বাস্তবিক গঠনটির মধ্যে নানা পুঁথি, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, ইতিহাসের নানা সামগ্রী থাকে। এ হল বাইরের রূপ।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য Patrick Joyce-এর 'The Politics of the Liberal Archive' প্রবন্ধটি, এই প্রবন্ধে তিনি গ্রন্থাগারের গঠনের অন্তর্নিহিত 'ক্ষমতা'-কে খুঁজতে চেয়েছেন। তিনি আধুনিক আর্কাইভ-কে

জনসাধারণের কাছে খুলে দেওয়ার ঘটনাটিকে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলছেন, স্বাধীন সমাজ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই মুক্ত আর্কাইভ-এর শুরু। গ্রন্থাগার সাধারণের জন্য খুলে দেওয়ার ফলে যে কোনো মানুষ যে কোনো বিষয়ে জ্ঞান লাভের অধিকার অর্জন করল। উদারমনা রাষ্ট্র 'আদর্শ নাগরিক' গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগার খুলে দিল। 'আদর্শ নাগরিক' মানে? যে ধরনের নাগরিক তৈরি হলে সমাজ চালাতে রাষ্ট্রের সুবিধে হয়, সেই নাগরিকই হল রাষ্ট্রের বিচারে 'আদর্শ'। রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আর্কাইভ-এ যে তথ্যাদি থাকে, সেই তথ্যও রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ, রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক তথ্যের সম্ভার 'সুনাগরিক'রা পাবেন না। ফলাফলস্বরূপ, সীমিত তথ্যকে নির্ভর করে ইতিহাস তৈরি হতে থাকল। যথারীতি, আর্কাইভ ইতিহাস তৈরি করতে থাকল। আবার ইতিহাসও আর্কাইভ তৈরি করতে থাকল। Joyce এই সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার জন্য নতুন আর্কাইভ-এর কথা আনছেন।

Pierre Nora-এর Sites of Memory তত্ত্বটি তুলে তিনি এই নতুন আর্কাইভ গড়ার ভাবনা ভাবছেন। বিষয়টা বুঝতে Pierre Nora-র Lieux de Memoire বা Sites of Memory ধারণাটা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে। Nora বলছেন, বর্তমানের অনেক কিছুই ইতিহাসে হারিয়ে যায়, সবকিছুই কোনো না কোনো সময় ইতিহাসে লীন হয়ে যেতে পারে—এই ভাবনা আমাদের মানসিক স্থিতিতে আঘাত হানে। আমাদের স্মৃতির মধ্যে, ঐতিহ্যের মধ্যে, সামাজিক রীতিনীতির মধ্যে, মূল্যবোধের মধ্যে যে ইতিহাস ধরা আছে, তাকে রাষ্ট্রীয় ইতিহাসব্যবস্থা ইতিহাস হিসেবে মান্যতা দিতে চায় না। কিন্তু যা হারিয়ে গেছে বলে মনে হয়, যে যুগটি বা যে ঐতিহাসিক কালটি আর বর্তমানে নেই বা ফিরে আসবে না, সেই যুগটি সম্পর্কে আমাদের উৎসাহ অত্যন্ত বেশি। প্রাচীন রাজারাজড়ার সময়টি আর বর্তমান নেই। কেবল সেই রাজাদের সময়কার কিছু স্থাপত্য, নথিপত্র ছাড়া আমাদের কাছে আর বিশেষ কিছুই অবশেষ নেই। তাই প্রাচীন যুগের সেই বস্তুগত অবশেষটুকুকে আমরা সংগ্রহশালা বা আর্কাইভ-এ ধরে রাখতে চাই। সেই যুগের স্থাপত্য বা শিল্প বা দলিল-দস্তাবেজ বা নথিপত্রগুলিকে পরম সম্মান দিয়ে সংরক্ষণ করতে চাই। এমনকি, বিশেষ বিশেষ কিছু ঐতিহাসিক দিনকে মনে রাখার জন্য আমরা ক্যালেন্ডারে ছুটি ঘোষণাও করে থাকি (যেমন- স্বাধীনতা দিবস, দেশনেতার জন্মদিন, বিজয় দিবস ইত্যাদি)। Nora এই সংরক্ষণের প্রথাটিকেই বলছেন Sites of Memory। অর্থাৎ, Sites of Memory হল এমন কিছু বিষয়ের সংরক্ষণ যা এককালে ছিল, বর্তমানে আর নেই। 'There are lieux de memoire, sites of memory, because there are no longer milieu de memoire, real environments of memory' (Nora 7)।

আবার অন্যভাবে বলা যায়, বর্তমানের যে যে উপকরণ ভবিষ্যতে হারিয়ে যেতে পারে বলে আমাদের আশংকা থাকে, তাকেই আমরা সংরক্ষণ করতে চাই। পূর্বপুরুষের বহু ইতিহাস সংরক্ষণের অভাবে হারিয়ে গেছে। বহু তথ্য ধ্বংস হয়ে গেছে। সে নিয়ে আমরা পরিতাপ করি। বর্তমানকে তাই এই অনিশ্চয়তায় ফেলে রাখতে চাই না। তাকে সংরক্ষিত করে ফেলি। আর যখনই তা ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষিত করে ফেলি, সেটা হয়ে যায়, Sites of Memory। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, ভবিষ্যতকে মনে রাখানোর জন্যই Sites of Memory–র আবির্ভাব। কোনো স্থাপত্যের সংরক্ষণ বা কোনো বিশেষ দিন উদ্‌যাপনের রীতিটি চালু করার আসল উদ্দেশ্যটিই হল ভবিষ্যৎ যেন এই হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসকে মনে করে। এক্ষেত্রে, 'মনে করা' বা 'Remember'-এর বিষয়টি খুব জরুরী একটি বিষয়। সংরক্ষণ বা আর্কাইভ-এর মূল উদ্দেশ্যটাই হল এই 'মনে করা'টা।

Joyce বলছেন, নতুন আর্কাইভ–এর ধারণাটি আর ইতিহাসের সাধারণ উপকরণ হয়ে আটকে থাকবে না। ইতিহাসবিদ্ নিজেই হয়ে উঠবেন আর্কাইভ। তিনিই হবেন 'site of memory', তাঁর বর্তমান অস্তিত্ব দিয়ে তিনি ইতিহাসকে খুঁজবেন। ইতিহাসবদের নিজের স্মৃতিতে অতীত সময়টিকে 'মনে করবেন'। স্মৃতি হল বর্তমানেরই অংশ। তাই আজকের জীবন, বর্তমানের চলা, এখনকার যাপনের মধ্যে অতীতের স্মৃতি বহমান থাকে। সেই স্মৃতিকে ইতিহাসবিদ্ বিচার করবেন, মান্যতা দেবেন—এটাই তাঁর কাছে কাঙ্ক্ষিত।

Thomas Osborne তাঁর 'The Ordinariness of the Archive' প্রবন্ধে আর্কাইভ–এর ব্যাখ্যা করে বলছেন, আর্কাইভ–কে শুধু ইতিহাসবিদ্, গবেষক বা সংগ্রহশালার তত্ত্বাবধায়কের বিচরণ স্থান হিসেবে দেখলে হবে না। তাকে শক্তির অংশ হিসেবে ভাবতে হবে। বিজ্ঞানীদের কাছে পরীক্ষাগারের (Laboratory) যা ভূমিকা, ইতিহাসবিদের কাছে আর্কাইভ–এর প্রায় একই ভূমিকা। এখানে সঞ্চয় (deposition), সংরক্ষণ (preservation)-এর সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের (interpretation) কাজও চলে। 'A centre of interpretation, then; that is what archive is' (Osborne 52). সমাজের সমস্ত উপকরণ নিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ চলে এখানে। অতীত নিয়ে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করা যেতেই পারে। কিন্তু আর্কাইভ–এর তথ্যের মাধ্যমে তার বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা না করতে পারলে তা ইতিহাস নামক বিদ্যাশৃংখলা (Discipline) হিসেবে আমল পায় না—সমাজতাত্ত্বিক ইতিহাস রচনায় আর্কাইভ–এর শক্তি এমনই বেড়ে চলেছে। আবার আধুনিক আর্কাইভ চেতনা থেকে বলা যায়, যদি কোনো

আর্কাইভ কোনো না কোনো গোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত না হয়, কোনো না কোনো স্তরের জনগণ যদি সেই আর্কাইভ-এর উপকরণের হদিশ না পায়—তবে সেটা আর্কাইভই হয়ে উঠবে না।

Osborne আরও বলছেন, অতীতে আর্কাইভ একটি গোপন স্থান ছিল। আধুনিক যুগে তা খুলে দেওয়া হয়েছে সাধারণ মানুষের কাছে। আধুনিক যুগের আর্কাইভ-এ সরাসরি কোনো রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক প্রভাব চোখে পড়ে না। শুধু এটুকু খেয়াল করা যায়, রাষ্ট্র অতি সতর্ক পদ্ধতি অবলম্বন করে আর্কাইভ-এর লুকোনো গোপন তথ্যগুলিকে জনসাধারণে নিয়ে আসছে। ঘটনা বা fact-কে খুলে দেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত গভীরে প্রোথিত রাজনীতিটা অস্বীকার করা যায় না। Osborne-এর মতে, রাষ্ট্র আদপে নতুন প্রক্রিয়ায় জনগণের স্মৃতিকে আদেশ দিচ্ছে। সংরক্ষণের মোড়কে আর্কাইভ-এ কোন্ ঐতিহাসিক তথ্য সাধারণের কাছে খুলে দেওয়া হচ্ছে, কোন্‌টি হচ্ছে না, তা ঠিক করে দিচ্ছে রাষ্ট্র। গ্রন্থাগারিক বা তত্ত্বাবধায়ক আর্কাইভ-এ জমা অসংখ্য তথ্য থেকে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় অংশগুলিকে বেছে নিয়ে জনতার হাতে তুলে দিচ্ছে: 'No doubt there are no details that are necessarily excluded by the archive. There can be archive of just about anything' (Osborne 59)।

Antoinette Burton আবার তাঁর 'Memory Becomes Her' প্রবন্ধে আর্কাইভ-এর বাইরে নতুন এক আর্কাইভ প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গে ঘর বা পরিবারকে আর্কাইভ হিসেবে ব্যাখ্যা করছেন। আর্কাইভ বলতেই রাজনৈতিক ইতিহাস, রাষ্ট্রের মহাফেজখানা, দলিল বা করসমূহের কাগজপত্রের সংরক্ষণশালাকে বোঝানো হয়। Burton আর্কাইভ-এর এই প্রসিদ্ধ ভাবনাটিকে পুরোপুরি পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। গতানুগতিক ইতিহাসের বাইরে 'অপরের ইতিহাস' বা 'history of others' লেখার একটা দিক ঘোষিত হচ্ছে তাঁর প্রবন্ধে। আর্কাইভ-এ রাজনৈতিক ইতিহাস বেশি চর্চিত হয়। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের স্মৃতি বা অভিজ্ঞতাগুলিকে আর্কাইভ ভিত্তিক আলোচনায় আনা হয় না। কিন্তু Burton ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক, ইতিহাস ও স্মৃতি, জাতীয় ও উত্তর-আধুনিক—ইত্যাদি কৃত্রিম ভেদাভেদগুলিকে ভাঙ্গার চেষ্টা করেছেন। প্রচলিত মত অনুসারে, ইতিহাস হল পুরুষতান্ত্রিক ও বৃহৎ বর্ণনার অংশ আর স্মৃতি হল নারীকেন্দ্রিক ও অভ্যাসের দাস—এভাবে বিভাজিত করে সরলীকরণ করতে Burton আগ্রহী নন। 'I want to emphasize, in other words, the importance of home as both a material archive for history and a very real political figure in an extended moment of historical crisis' (Burton

5)। তিনি দেখার চেষ্টা করছেন, ঘরের ভেতরে কোন্ ইতিহাস সৃষ্টি হয়? বাইরের জগতের রাজনৈতিক ইতিহাসের ভিত্তিটি কি ঘরের ভেতরের আর্কাইভ-এ প্রোথিত থাকতে পারে? ঘরের ভেতরের আর্কাইভ-এ মহিলাদের ভূমিকা কী? এই আর্কাইভ-এ কি মহিলারাই শাসকের অবস্থানটি নেন? এই আর্কাইভ-এর মধ্যে লিঙ্গ রাজনীতি বা Gender Politics কীভাবে সংযুক্ত আছে? এ সমস্ত প্রশ্নের আলোচনা প্রসঙ্গে একটি বিকল্প ইতিহাস রচনায় Home as an Archive-এর ভাবনাটির উত্থান করছেন Burton।

সবশেষে বলা যায়, Joyce, Osborne বা Burton কেউই আর্কাইভ-এর বিরোধিতা করতে চাইছেন না। তারা কেউই বলছেন না, সমাজে আর্কাইভ-এর কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। সাবেককালীন আর্কাইভ-কে বিদ্যাচর্চায় অস্বীকার করে কেবলমাত্র 'নতুন আর্কাইভ'-কে (ইতিহাসবিদের নিজের অভিজ্ঞতা, স্মৃতি, শরীর, ঘর ইত্যাদি হল 'নতুন আর্কাইভ') নির্ভর করার সওয়াল কিন্তু তাঁরা করছেন না। তাঁরা শুধুমাত্র কিছু প্রশ্ন তুলতে চাইছেন। আর্কাইভ-এর তথ্যকে যাচাই করে গ্রহণ করতে চাইছেন। আর্কাইভ-এর মধ্যেকার রাজনীতি ও পক্ষপাতের বিষয়ে সচেতন থেকে তাঁরা বিদ্যাচর্চা জারি রাখতে চাইছেন।

আর্কাইভ গড়ে ওঠার পেছনে কোনো না কোনো কারণ থাকে। আর্কাইভ-এর গঠন কাঠামোর মধ্যে কোনো না কোনো কারণ থাকে। আর্কাইভ-এর কর্মপ্রণালীর (Function) মধ্যে কোনো না কোনো কারণ থাকে। এই প্রতিটি কারণকেই তাঁরা খুঁটিয়ে দেখতে চান। আর্কাইভ-কে অস্বীকার করা তো দূরের কথা, তাঁরা বরং আর্কাইভ-কে আরও গভীরভাবে নিরীক্ষণ করে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করতে চান। যেমন Sumit Sarkar তাঁর 'The Kalki-Avatar of Bikrampur: A Village Scandal in Early Tewntieth Century Bengal' প্রবন্ধে ঢাকার বিক্রমপুর জেলার একটি 'অতি সাধারণ' হত্যাকাণ্ডের বিশ্লেষণ করেছেন। ইতিহাসে ঘটনাটির কোনো বিশেষ গুরুত্ব নেই। কারণ আর্কাইভ-এর নথি খুঁজে দেখা যাচ্ছে, বিশেষ কিছু আলোচনা বা তর্ক এ বিষয়ে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই সে সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্যও দুর্লভ। Sarkar তাঁর প্রবন্ধের মাধ্যমে দেখতে চাইছেন, কেন এই ঘটনাটি আধুনিক ইতিহাস চর্চার আলোচনায় কখনোই উল্লিখিত হয় না? বিষয়টিকে একটি ন্যক্করজনক তুচ্ছ ঘটনা বলে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা তৎকালীন নথির মধ্যে দেখা যাচ্ছে কেন? ঘটনাটি হারিয়ে যাওয়ার পেছনের কারণগুলি কী হতে পারে? আসল ঘটনাটি কী ঘটেছিল সে ইতিহাস খুঁজে আনার প্রয়াস তিনি করছেন না। বরং কেন ঘটনাটি ইতিহাসের পাতায় তেমন আলোচিত হল না, তিনি সেটাই ভাবার চেষ্টা করছেন। Sarkar আন্দাজ করার চেষ্টা করছেন কারণগুলি কী কী হতে

পারে। ঘটনায় নারীদের পুরুষ বিরোধী দৃঢ় অবস্থান? নীচ জাতের এক প্রতিনিধির শাসকের অবস্থান পাওয়া? নাকি বিক্রমপুর জেলার তৎকালীন গৌরবান্বিত ইতিহাসে এই ঘটনা কোনো কালো দাগ এনে ফেলতে পারে, এই আশংকায় সমাজের নব্যচেতনার পথিকৃৎরা ঘটনাটির প্রতি বিশেষ উৎসাহ দেখান নি? কী কী কারণ এই ঘটনাটিকে একটি ‘অতি সাধারণ’ পর্যায়ে এনে ফেলল, Sumit Sarkar সেটাই বিশ্লেষণ করেছেন। কী হয়েছিল, তা না খুঁজে, কেন হারিয়ে গেল এই ইতিহাস, সেই সন্ধানটাই করছেন তিনি। এবং এই কাজটি তিনি করছেন, আর্কাইভ-এর নথিকেই আশ্রয় করে। সুতরাং সহজেই বোঝা যাচ্ছে, আর্কাইভ-কে উপেক্ষা করা নয়, সচেতন মস্তিষ্কে আর্কাইভ-কে বিশ্লেষণ করা এবং পুরোনো আর্কাইভ-এর সঙ্গে নতুন আর্কাইভ-এর ভাবনাটির মেলবন্ধন ঘটিয়ে শিক্ষাচর্চা চালিয়ে যাওয়ার অভ্যাসের পক্ষে সওয়াল করছেন এই বিদগ্ধ চিন্তকরা।

গবেষণা করার সময় তাহলে মনে রাখা দরকার, ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোর ওপর সবসময় ঘটনার বাইরের কিছু শক্তির প্রভাব থাকার সম্ভাবনা থাকে। এই শক্তিগুলোর প্রভাবে অন্য ঘটনাগুলোকে সরিয়ে রেখে হয়তো বিশেষ কিছু কিছু ঘটনা ইতিহাসে স্থান পায়; মুছে যায় আর্কাইভে স্থান না-পাওয়া ইতিহাসেরা। প্রথাগত ইতিহাসের আড়ালে এই রকম কত অবদমিত ইতিহাস আছে, সে ব্যাপারে গবেষকের সচেতনতা প্রয়োজন। আর্কাইভ-সর্বস্বতা গবেষককে অনেকাংশেই প্রথার বাইরে ভাবতে বাধা দেয়, ফলে তার গবেষণা হয়ে পড়তে পারে খণ্ডিত, অর্ধ-উচ্চারিত। তাছাড়াও একটি ঘটনা নিয়ে অতীত সমাজে নানান ব্যাখ্যা থাকে। ইতিহাসে লিখিত থাকে খুবই সামান্য অংশ। এই বিষয়ে ওয়াকিবহাল না থাকলে অতীত গবেষকদের মতো আধুনিক গবেষকের কাজও ‘শাসকের স্বর’টি প্রতিফলিত করতে বাধ্য হয়ে পড়তে পারে। কারণ মূলত শাসকের হাতেই থাকে আর্কাইভএর ক্ষমতা। অধিকাংশ সময়েই ঐতিহাসিক তথ্য রক্ষণাবেক্ষণ করে শাসক। ইতিহাসে যা কিছু অবদমিত, তার স্বর অনেকসময়েই শোনা যায় না আর্কাইভের তথ্যভাণ্ডারে। আজকের গবেষক এ কথা খেয়াল না রাখলে ‘বিকল্প ইতিহাস সন্ধান’ হবে কি করে? কি করে স্বর খুঁজে পাবে অতীত সমাজের নিম্নবর্গ বা সাব-অল্টার্ন মানুষেরা?

আরও একটা কথা মনে রাখা দরকার, শুধু আর্কাইভ বা সংগ্রহশালা বা গ্রন্থাগার নয়। ইতিহাসের সূত্র খোঁজা যেতে পারে আজকের মানুষের জীবনচর্চার মধ্যে। আজকের মানুষের জীবনযাত্রার মধ্যে যে embodied history মিশে আছে, তারও পর্যবেক্ষণ দরকার। আজকের নিরীখে অতীতকে ব্যাখ্যা করার কথা বলছি না। আজকের সমাজজীবনের মধ্যে মিশে থাকা ঐতিহ্যের সূত্র ধরে তৎকালীন সমাজকে নিরীক্ষণ করার সম্ভাবনাটিকে বিচারে আনা

দরকার, এটুকুই বলছি। এই সূত্রে Pierre Nora, Peggy Phelan, Diana Taylor বা Rebecca Schneider-এর মতামতগুলোর দিকে চোখ রাখা যেতে পারে। নতুন ইতিহাস রচনার কর্মে আলোকপাত করা হোক প্রথাগত আর্কাইভের বাইরের আর্কাইভ-এ। মনুষ্য স্মৃতি হয়ে উঠুক আর্কাইভ, ঘর আর্কাইভ হয়ে উঠুক, শরীর হয়ে উঠুক আজকের নতুন আর্কাইভ। যুদ্ধক্ষেত্রে কোথায় আর্কাইভ? Embodied History ছাড়া ইতিহাস কোথায়? কাশ্মীরের ইতিহাস কোন্ আর্কাইভে রাখা হচ্ছে কিংবা মণিপুরের ইতিহাস? কোন আর্কাইভ সেখানে ইতিহাসকে ধারণ করে রাখছে? প্রশ্ন থাকুক আধুনিক গবেষকের মনে।

বাংলা নাট্য ইতিহাস রচনার কর্মের ক্ষেত্রেও আর্কাইভ নিয়ে এইরকম অসংখ্য সমস্যা রয়েছে। গবেষক সচেতন মস্তিষ্কে এই সমস্যাগুলোকে মান্যতা দিয়েই গবেষণা কর্মটি এগিয়ে নিয়ে চলে। সুমিত সরকারের প্রবন্ধটি এই রকমই একজন সচেতন গবেষকের উপস্থাপনা। আর্কাইভের তথ্যকে অন্যভাবে দেখার একটি পদ্ধতি। বাংলা নাটকের ইতিহাস নিয়ে কাজ করতে এই নতুন প্রক্রিয়াকে অবলম্বন করতেই হবে। সর্বজ্ঞাত জনপ্রিয় নাট্য ইতিহাসকে আরও একবার বিশ্লেষণ করে দেখার দরকার আছে। বাংলা নাট্য ইতিহাসটি একটি সীমিত শ্রেণীর ও ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর ইতিহাস হিসেবে প্রচারিত হয়ে আছে। সমাজের বাকি সাংস্কৃতিক ইতিহাস সেখানে গৌণ হয়ে রয়ে গেছে। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস নিয়ে এই ধরনের রচনা পদ্ধতি বা historiography নিয়ে কাজ করতে গেলে আর কী কী সমস্যা সম্পর্কে গবেষককে সচেতন হতে হয়, পরবর্তী অংশে সেই অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হবে। যদিও এটা ধরে নেওয়া ভালো, এই বক্তা নিজেও উল্লিখিত সমস্যাগুলো থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। আসলে কোন্ কোন্ সীমাবদ্ধতা আমাদের মগজ-উপলব্ধি-বুদ্ধিকে গ্রাস করে রেখেছে, সেটা অনেক সময় আমরা নিজেরাও জানতে পারি না। সমস্যাগুলো চেনা দরকার, সমাধান না-ও আসতে পারে। কিন্তু তর্ক আসুক, আলোচনা আসুক, প্রথাগত ইতিহাস চেতনাকে নতুন করে ভেঙ্গে চুরে দেখা হোক।

গ) গবেষকের সীমাবদ্ধতাঃ উপস্থাপনার শর্ত, সামাজিক নিয়মাবলী ও নাট্য-ইতিহাস

নাট্য ইতিহাস লিখতে গেলে আমাদের অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে সমসাময়িক নাটকগুলিকে বিচার করা দরকার হয়ে পড়ে। একটি নাটকের টেক্সটকে সমসাময়িক সমাজের দর্পণ হিসেবে বিশ্লেষণ করার দরকার নিশ্চয় আছে। অথবা সেই নাট্য প্রযোজনা সংক্রান্ত যে যে তথ্য ইতিহাসে পাওয়া যায়, গবেষক সেগুলিকে গভীর সম্ভ্রমে গ্রহণ করেন। কারণ, একটি নাট্য প্রযোজনার মধ্যে দিয়ে সেই প্রযোজনার সৃষ্টিকর্তাদের উদ্দেশ্য, প্রবণতা, লক্ষ্যগুলো প্রতিভাত হয়।

সেই সঙ্গে তার প্রযোজনা কৌশল এবং নাটকটির মূল বৈশিষ্ট্যগুলোও প্রকাশিত হয়। নাট্য ইতিহাসের কাজে এই তথ্যগুলো অত্যন্ত জরুরি। ইতিহাস রচনার কাজে অনেক সময়েই মূল তথ্য প্রমাণের সঙ্গে সঙ্গে এই নাটকগুলিতে বর্ণিত ঘটনা প্রবাহকেই ইতিহাসে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়। কিন্তু একটি টেক্সটকে সমগ্র সমাজের হুবহু প্রতিফলন হিসেবে ধরাটা নিঃসন্দেহে খুবই মুশকিল কাজ। কারণ, সমস্যা হল, একটি নির্দিষ্ট ঘটনার ক্ষেত্রে সমাজের একটি অংশে যে বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়েছে, তার একটি প্রতিফলন হয়তো নাটকের টেক্সটিতে দেখা গেল। কিন্তু সেটি যে সমগ্র সমাজের পরিপূর্ণ ছবি, সেটা জোর দিয়ে নিশ্চই বলা যাবে না। নাটকে বর্ণিত ঘটনাপ্রবাহটি যে গোটা সমাজের ক্ষেত্রেও সঠিক, তা তো নাও তো হতে পারে। এই বিষয়টি খেয়াল রাখা দরকার।

একটি নাট্য প্রযোজনা সমসাময়িক সামাজিক মূল্যবোধ, ও নিয়মতন্ত্র অনুযায়ী তৈরি হয়। ইতিহাসবিদের নিজের সময়ের, আদর্শ, ধ্যান-ধারণা, সাংস্কৃতিক প্রচলিত নিয়মকানুন দিয়ে অতীতকে ব্যাখ্যা করার প্রবণতাগুলো কিন্তু ইতিহাস রচনায় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে, এটা খেয়াল রাখা দরকার।

এই সূত্রে Clifford James Geertz-এর আলোচনাটি উত্থাপন করা প্রয়োজন। তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল *Interpretation of Cultures* (1973)। এই গ্রন্থে তিনি প্রচলিত গবেষণা ধারাটি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। চিরাচরিত গবেষণা পদ্ধতিতে কী কী সমস্যা সীমাবদ্ধতা অমানবিকতা র উপাদান আছে, সেই দিকে নজর দিয়েছেন তিনি। এবং প্রতিটি সমস্যা সমাধানের জন্য তিনিগতানুগতিক ব্যাখ্যাগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখতে চেয়েছেন। আমার গবেষণার কাজে সচেতন গবেষণাকর্মীর ভূমিকা পালন করতে এই ব্যাখ্যাগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

তিনি বলছেন, সমাজের গঠন অনুযায়ী নির্ধারিত অর্থের আবর্তে মানুষ বাঁধা পড়ে থাকে। সমাজবদ্ধমানুষ একটি নির্দিষ্ট সমাজেনিজেকে প্রকাশ করার জন্য সেইসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন প্রতীক ও সংকেতের ব্যবহার করে। একজন মানুষের কোনো অভিব্যক্তি বা শব্দোচ্চারণ বা ক্রিয়ার অর্থটি নির্ধারিত হয় সেই মানুষটির পারিপার্শ্বিক সমাজের সেই কাজটির অর্থ কী, তার নিরিখে। এই সূত্রে তিনি ব্রিটিশ দার্শনিক Gilbert Ryle-এর একটি সাধারণ উদাহরণ উল্লেখ করছেন। উদাহরণটি এরকম, দুইটি ছেলে তাদের ডান চোখ পিটপিট করে চলেছে। একজনের চোখের এই ক্রিয়াটি স্বেচ্ছাকৃত নয়। অন্যজন তার বন্ধুকে ইশারায় কিছু বলার জন্য ইচ্ছাকৃত ভাবে চোখ পিটপিট করছে। দুইটি ক্রিয়াই বাইরে থেকে দেখলে এক মনে হয়। বোঝা যায় না, কোনটা ইচ্ছাকৃত, কোনটা নয়। দ্বিতীয়জনের কাজটির একটা সামাজিক সংকেত আছে। এই সামাজিক সংকেতটি বিশ্লেষণ করলে সেই সমাজের

প্রচলিত সংস্কৃতি ও সামাজিক ব্যবহার সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু প্রথমজনের কাজটিতে সেরকম কিছু প্রকাশিত হয় না। সুতরাং বাইরে থেকে বিষয়টিকে দেখে দুইটি ছেলের ক্রিয়াকে এক ব্যাখ্যা করলে এবং দুইজনের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যবহার ও শারীরিক বাধ্যতার বৈশিষ্ট্যকে খেয়াল না করলে, ক্রিয়া দুইটিকে সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ধারণাগুলিকে নানান সংকেতের মাধ্যমে প্রকাশিত করে মানুষ যোগাযোগ স্থাপন করে এবং নিজ জীবন সম্পর্কে একটি বোধ গঠন করে।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে, সংস্কৃতি হল একটি সামাজিক বিষয় বা Public Act। তা একজন মানুষের সমাজ-নিরপেক্ষ অস্তিত্বকে স্বীকার করে না। তাই গবেষক যে সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করছেন, সেই সময়, সেই ইতিহাস, সেই সমাজ ও সেই জনজীবনকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং সেগুলির নিহিতার্থ অনুধাবন করে গবেষণা কাজটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। শুধুমাত্র বাইরে থেকে সংস্কৃতির উপকরণ বা তথ্যগুলোর বর্ণনা নয়, সেই সমাজ সেই সংস্কৃতির সংকেতগুলো-কে গভীর ভাবে চেনা, সেগুলির মর্মার্থকে উপলব্ধি করাটাই গবেষকের কাজ হওয়া দরকার। গবেষকের গবেষণাকর্মের এই জটিল ও গভীর পদ্ধতিকেই গিয়ার্টস নাম দিয়েছেন, 'Thick Description'।

আসলে গিয়ার্টস গবেষণাকর্মের কিছু নৈতিক সমস্যাকে নির্দেশ করার জন্যই এই তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। একটি নির্দিষ্ট সময়ের নির্দিষ্ট সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করতে যদি গবেষক ওপর ওপর কিছু বর্ণনা করেন, সেই সমাজের গভীরতাকেনা জেনে গবেষণার কাজটি করেন, তাহলে তার নিজের জীবন, বোধ, সংস্কৃতি এবং নিজের সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রভাব গবেষণা কর্মটিকে প্রভাবিত করতে বাধ্য। গিয়ার্টস বলছেন, গবেষককে নিজের সাংস্কৃতিক চর্চাকে যথাসম্ভব Unlearn করতে হবে বা ভুলে যেতে হবে। নিজস্ব ভাবধারা বা রাজনৈতিক পরিস্থিতি বা নৈতিকতাকে সেই সংস্কৃতির ওপর চাপিয়ে দেওয়া চলবে না।

এই সূত্রে Thomas Postlewait বলছেন, ইতিহাসবিদ আসলে একজন displaced observer বা 'মূলচ্যুত পর্যবেক্ষক' হিসেবে ঘটনাটিকে প্রত্যক্ষ করছে। 'The event thus occurs at one moment, but the historian, in a different time and place, is a displaced 'observer' (Postlewait 19)। প্রতিটি ঐতিহাসিক ঘটনার শেষে কী ঘটেছিল ইতিহাসবিদ জানেন। ফলে তার মধ্যে ঐতিহাসিক ঘটনাটি নিয়ে একটি কার্যকারণে আবদ্ধ বর্ণনা লেখার প্রবণতা হয়। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সেটাই অত্যন্ত প্রচলিত পন্থা। কিন্তু তার মনে অতীত ঘটনার যে ব্যাখ্যা বা কল্পনা ফুটে ওঠে, ইতিহাসের প্রবাহের আসল প্রগতি হয়ত সেভাবে হয়নি—এই বিষয়ে

ইতিহাসবিদের সচেতন থাকা দরকার। Plotted narrative বা ইতিহাসের কল্পিত আখ্যান লেখার ঝোঁক চলে আসাটা প্রচলিত প্রক্রিয়া। কিন্তু এই ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধান ও নৈর্ব্যক্তিক থাকাটা ইতিহাসবিদের অবশ্য কর্তব্য।

বিশেষ করে নাট্য বিষয়ক সংকেত বা চিহ্নগুলো নিয়ে যখন কাজ করা হয়, তখন বিষয়টি আরও খানিকটা সচেতনতা দাবী করে। কারণ নাট্য প্রযোজনা বা জীবন্ত যেকোনো পার্ফর্মেন্সের মধ্যে দিয়ে চিহ্ন বা প্রতীকী উপস্থাপনার অভিজ্ঞতা, সেই সাংকেতিক অভিযানকে লিখিত বিদ্যামণ্ডলে নিয়ে আসাটা একটা জটিল প্রক্রিয়া হয়ে পড়ে।

ভাষাতাত্ত্বিক জগতকে অতিক্রম করে ইতিহাস, সংস্কৃতি ও শিল্পের অঙ্গনের সামাজিক চিহ্নবিজ্ঞান বা সাংকেতিক ইঙ্গিতগুলোকে ব্যাখ্যা করার জন্য তাত্ত্বিকরা উদ্যোগ নেন দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝের সময় থেকেই। চেকোশ্লোভাকিয়ায়, যাকে আমরা জানি, প্রাগ লিঙ্গুইস্টিক সার্কেল নামে। লোকতাত্ত্বিক Petr Bogatyrev বা আভা-গার্দে নাট্য পরিচালক Jindrich Honzl-এর নাম এই সূত্রে উল্লেখ্য। মঞ্চনাট্যের বিভিন্ন সংকেত, যেমন, দৃশ্যায়নের ক্ষেত্রে পোশাক, মঞ্চসজ্জা, মঞ্চসজ্জার মাধ্যমে প্রেরিত সংকেত; সঙ্গীত ও শব্দ প্রক্ষেপণের মাধ্যমে প্রেরিত যে শ্রবণ সংকেত এবং সবচেয়ে জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ অভিনেতার শরীর ও উপস্থিতির মাধ্যমে অনুভূত নাট্যসংকেতগুলি নিয়ে তাঁরা বিশেষ গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেন। অভিনেতার অস্তিত্ব উপস্থিত ও অনুপস্থিত দুই ধারণাকেই প্রতিফলিত করছে; অভিনেতা নিজে এবং তাঁর অভিনীত চরিত্র-দুইয়েরই সংকেত বহন করছে অভিনেতা একাই (Keir Elam 5)।

অতীতে অভিনীত হয়ে যাওয়া একটি নাট্য প্রযোজনা ও তার টেক্সট নিয়ে আলোচনার জন্য গবেষকরা মূলত প্রযোজনার বিশেষত্ব, তার টেক্সট ও তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ে বিশ্লেষণ করে থাকেন। অতীতকালে প্রযোজিত নাটকের ক্ষেত্রে নাটকটির মঞ্চায়নের বিবিধ পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি এবং অবশ্যই মূলত নাটকটির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আলোচনার পরিসরেই ঐতিহাসিক ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হতে হয়। নাট্য আলোচনার ক্ষেত্রে সমাজের প্রচলিত সংকেত বা সামাজিক নিয়মাবলীর পারস্পরিক আদানপ্রদানের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করার কাজটিকে একটি গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কয়েক দশক আগেই।

এই সূত্রে সম্ভবত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ Patrice Pavis-এর। তাঁর গবেষণায় একটি প্রযোজনাকে বিশ্লেষণ করার জন্য প্রযোজনা সংক্রান্ত সমস্ত ধরনের উপকরণকে ব্যবহার করার প্রয়াস চোখে পড়ে। মঞ্চসজ্জা, অভিনেতা, শব্দাবলী, সমস্ত ধরনের দৃশ্যাবলী, নাটকের গ্রহণযোগ্যতা সবকিছুকে নিয়ে তিনি প্রযোজনা ব্যাখ্যায় উদ্যোগ

নেন। বস্তুত তিনিই হলেন নাট্য মণ্ডলে একেবারে গোড়ার সময়কার সংকেত বা প্রতীকের নিরিখে প্রযোজনা বিশ্লেষণ-পদ্ধতির পথিকৃৎ। যদিও তিনি নিজেই মঞ্চ প্রযোজনার embodiment-এর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেছেন। জীবন্ত প্রযোজনা ঘটার অভিজ্ঞতাকে প্রযোজনা বিশ্লেষণের আলোচনার প্রতিবন্ধকতাটিকে তিনি লক্ষ্য করেছেন (Keir Elam 15)।

আরও বহু নাট্যতাত্ত্বিক এই ধারায় গবেষণা করে গেছেন। তার মধ্যে উপস্থাপনার শর্ত ও নাট্য ইতিহাস বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য মনোযোগ দাবী করে Thomas Postelwait-এর কাজ। তাঁর কথায়, ইতিহাসবিদদের কাজ শুরুই হয় ক্ষতির জগত থেকে। এমন এক ক্ষতি বা এমন এক হারিয়ে যাওয়া, যা আর ফিরবে না কোনোদিন। এই সময়ে দাঁড়িয়ে অতীত ইতিহাসের ছোট ছোট টুকরো এক জায়গায় করেই তাদের কাজ চলতে থাকে। এই না পাওয়া বা হারিয়ে যাওয়ার অনুভূতিটা আরো প্রকট হয়ে ওঠে নাট্য ইতিহাস গবেষকদের ক্ষেত্রে। কারণ যে নাট্য প্রযোজনা নিয়ে তাঁর কাজ, সেটা কোনো ভাবেই কোনো অভিজ্ঞতা হওয়ার তাঁর সুযোগ নেই। অন্য ক্ষেত্রে ইতিহাস গবেষণায় অন্তত কিছু লিখিত বয়ান পাওয়া যায়। পার্ফর্মেন্সের ক্ষেত্রে সেটা একেবারেই ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকে। সবকিছু সম্পর্কে লিখে রাখার যে পাশ্চাত্য রীতি, সেই রীতিও প্রযোজনার ইতিহাস রচনায় থমকে দাঁড়ায়। ফলে ব্যাখ্যা এবং উপস্থাপনার মধ্যেকার স্থানে গবেষক আটকে থাকেন, লড়তে থাকেন (Postlewait 26)।

পার্ফর্মেন্স-এর ইতিহাস নিয়ে এই বিবিধ সমস্যার সমাধানের পথ হিসেবে বাংলা নাটকের নব ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হওয়াই যায়। বাংলা পার্ফর্মেন্সের ইতিহাসের যা কিছু উপকরণ আজও খুঁজে পাওয়া সম্ভব, সেগুলো নতুন উদ্যমে অন্বেষণের প্রচেষ্টা করা যায়। সেলিম আল দীন বা সাইমন জাকারিয়া যেমন বাংলা নাটকের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা ইতিহাস অণ্বেষণে প্রবৃত্ত হয়েছেন। (১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে হাওলাদার প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত সেলিম আল দীনের লেখা 'মধ্যযুগের বাংলা নাট্য' নামের গভীর গবেষণা গ্রন্থটি এই সূত্রে উল্লেখ্য)। নাট্য ইতিহাস নিয়ে গবেষণার আরও একটি পথ হতে পারে, প্রচলিত নাট্যচর্চা ও নাট্য ইতিহাসকে আরও খুঁটিয়ে দেখা, আরও কাছ থেকে দেখা। তার গলদগুলোকে খুঁজে বের করা। আর সেইভাবেই গবেষকের নিজের সমাজ, নিজের সময়, নিজের সংস্কৃতির নিয়মাবলী সম্পর্কে সচেতন থেকে অতীত সময়ের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যায়। সেই প্রচেষ্টার সময় এসেছে। নিজেদের দিকে তাকিয়ে, নিজেদের নাট্য ইতিহাসের দিকে আঙ্গুল তুলে ধরার সময় হয়েছে। অন্য শিল্পমাধ্যমের দিকে উপেক্ষার দৃষ্টি নিক্ষেপ না করে সত্যের

মুখোমুখি দাঁড়াই আমরা। অতীতের প্রবহমান সামাজিক সংকেতগুলোকে খুঁজতে থাকি, যা আজও আমার অস্তিত্বে বহমান; খুঁজতে থাকি আমাদের মধ্যে এত বছর ধরে জমিয়ে রাখা অভিজাতবোধের লক্ষণগুলোকে; আরেকবার বিশ্লেষণ করে দেখি এতদিন ধরে লিখে আসা আমাদের ইতিহাস গ্রন্থগুলিকে; তার মধ্যে যে সত্য ধরা দিচ্ছে, তার চিহ্ন, সংকেত ও প্রতীকগুলোকেও ব্যাখ্যা করে দেখি। বিকল্প ইতিহাস রচনার আগে নিজেদের মধ্যেকার সীমাবদ্ধতাগুলোকে চিনতে শিখি, বুঝতে শিখি নিজেদের আধুনিক ইতিহাস চেতনার ফাঁকগুলোকে। এই দ্বিতীয় পথটিকে গ্রহণ করে বর্তমান গবেষণা কাজটিতে অগ্রসর হওয়া হবে।

অধ্যায় ভাবনা

বর্তমান অধ্যায়ের এই অংশে আমার গবেষণার চারটি অধ্যায়ের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেওয়ার চেষ্টা করব।

প্রথম অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়টিতে মূলত বাংলা থিয়েটারে নারীর অংশগ্রহণ করার ঘটনাটিকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়টির নাম রাখা হয়েছে, ‘অভিনেত্রীর বিশুদ্ধিকরণঃ উনিশ শতকীয় ‘শুদ্ধ’ থিয়েটারে অভিনেত্রীর অনুপ্রবেশ’। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসের এক বিশিষ্ট অধ্যায় হিসেবে দাঁড় করানো হয় মঞ্চে মহিলা-অভিনেত্রীদের অবতরণের ঘটনাটিকে। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে ‘বেঙ্গল থিয়েটারে’ চার অভিনেত্রী প্রথম নাটকে অংশ নেন। এঁরা হলেন, জগত্তারিণী, এলোকেশী, গোলাপসুন্দরী এবং শ্যামাসুন্দরী। আমি এই অধ্যায়ে বাংলা মঞ্চে এই চার মহিলা অভিনেত্রীদের অংশ নেওয়ার ঘটনাটি নিয়ে যা যা মূলধারার ইতিহাস লেখা হয়েছে, সেগুলোকে বিশ্লেষণ করে দেখতে চেয়েছি। মঞ্চে মহিলা আগমন নিয়ে সমাজ স্পষ্ট দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। একদল মানুষ চাইছিলেন নাটকের শিল্পসুষমার স্বার্থে বাস্তবধর্মী বিন্যাসের স্বার্থে মহিলা চরিত্রে একজন মহিলা অভিনয় করাটাই উচিৎ। অন্যদিকে আরেক দল মানুষ নাট্যমঞ্চে মহিলা আগমনে চিরদিনের মতো মঞ্চ সংস্রব ত্যাগ করছেন, এ তথ্যও মেলে। এই দুই পক্ষের মানুষের মধ্যেই কিন্তু অনেকেই ছিলেন, যাঁরা উনিশ শতকীয় সমাজের সংস্কার সাধনের কাজে বিরাট ভূমিকা পালন করেছিলেন। নারীর মঞ্চে আসার পক্ষে বিপক্ষে থাকা বিশিষ্টজনেদের ‘প্রগতিবাদী’ কিংবা ‘রক্ষণশীল’ এরকম কোনো নির্দিষ্ট পরিচয়ে চিহ্নিত করা সম্ভব হবে না। যেমন- মধুসূদন দত্ত জীবনের শেষদিন পর্যন্ত রঙ্গমঞ্চে নারীর অংশগ্রহণের

পক্ষে জোরালো সওয়াল করেছিলেন। আবার তার বিপরীত পক্ষে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ভারতবর্ষের নারীমুক্তি আন্দোলনের সর্ববৃহৎ মহীরুহ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং।

মহিলাদের মঞ্চে আসার ঘটনাটিকে নিয়ে এত বাক্-বিতণ্ডা, বাদানুবাদের মূলগত কারণগুলিকে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যেই এই অধ্যায়টির অবতারণা। এই অধ্যায়ের প্রথমেই আমি দেখাতে চেয়েছি, উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বাংলা তথা কলকাতায় বহু লোক আঙ্গিকের অনুষ্ঠান জনপ্রিয় ছিল। নিম্নবর্গের মানুষদের দ্বারা অভিনীত এই লোকসংস্কৃতিগুলিতে মেয়েদের অংশগ্রহণ করার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে ইতিহাসে। এই অধায়ের মূল অংশে সে উদাহরণগুলি নিয়ে কিছুটা আলোচনাও করা হয়েছে। যদিও এই আলোচনা লোকসংস্কৃতিতে নারীদের অংশগ্রহণ করা নিয়ে সামগ্রিক আলোচনা নয়। লোকতাত্ত্বিক ও লোক-ইতিহাসবিদরা এ বিষয়ে আরও অনেক সমৃদ্ধ তথ্যের বিন্যাস করতে পারবেন। কিন্তু বর্তমান গবেষকের সীমিত পর্যবেক্ষণে এ বিষয়ে যেটুকু বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে, তাতে মনে হয়, লোকসংস্কৃতিতে মেয়েদের অবশ্যই লক্ষ্যণীয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঘরোয়া আচার-অনুষ্ঠানে এবং বেশকিছু ক্ষেত্রে বহির্জগতেও মেয়েদের খানিক প্রতিষ্ঠা ছিল বলে জানা যায়।

এই সূত্রে আরও একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে যখন বাংলা ভাষায় থিয়েটার নামক শিল্পধারাটি তৈরি হতে থাকে, সেখানেও সেই লোকসংস্কৃতির প্রত্যক্ষ প্রভাব বহমান ছিল। নাটক লেখায়, অভিনয় ধারায়, নাটকে বিবেক চরিত্রের সংযোজন—সর্বত্র লোকজ শিল্পধারার প্রেরণা লক্ষ্য করা যায়। যাত্রাপালা বা অন্যান্য লোকসংস্কৃতির নিশ্চিত প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকতে চেয়েছিল গিরিশ-অর্ধেন্দু যুগের নাট্যদর্শক ও কলাকুশলীরা। তাহলে কী কারণে বা কী কী উদ্দেশ্যে লোকসংস্কৃতির এক অন্যতম ভাগীদার সেই মহিলা শিল্পীদের বাংলা নাট্যমঞ্চ থেকে বাদ দেওয়ার প্রস্তাব উঠেছিল? একইভাবে প্রশ্ন আসে, মেয়েদের মঞ্চে আসাকে যাঁরা স্বাগত জানিয়েছিলেন, তাঁরাও তাঁদের লেখায় বা বক্তব্যে সবসময় মহিলা অভিনেত্রীর 'শুচিতা', 'শালীনতা' বা 'সতী' ইমেজটাকে গড়ে তুলতে উদ্গ্রীব হলেন কেন? আর অভিনেত্রীদের 'সভ্য', 'শিক্ষিত', 'ভদ্রমহিলা'র অবয়ব দিতে গিয়ে সেই ইতিহাস লেখকরা কি অভিনেত্রীর জীবনের কোনো কোনো সত্যকে প্রচ্ছন্ন রাখতে চাইলেন? এমনকি নিম্নঘর থেকে আসা অভিনেত্রীর নিজের জবানবন্দীতে কি ধরা পড়ে আরও জটিলতর কোনো সত্য? 'অ-ভদ্র' মেয়ে নাট্যমঞ্চের শুদ্ধিকরণ পদ্ধতিতে যথেষ্ট 'ভদ্র' হয়ে কি উঠতে পারে? নাকি নিম্নঘরের মেয়ের 'অ-ভদ্র' নিম্নবর্গীয় শিকড়টি কলকাতার উচ্চবর্গীয়ের

ভালোবাসার থিয়েটারকে খানিক ‘দূষিত’ করে তোলে? বাংলা নাট্য ইতিহাসে বর্ণিত মহিলা-অভিনেত্রীদের চিরাচরিত অবস্থানটিকে আরও একবার খুঁটিয়ে দেখতে এই অধ্যায়ের ভাবনাটি করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়ের সঙ্গে সময়ক্রম ও কার্যকারণ সম্পর্কের সাযুজ্য রেখে আমি দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয় নির্ধারণ করিনি। বাংলা থিয়েটারের বিরাট নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাসের নানান বিচ্ছিন্ন ঘটনার বা বৈশিষ্ট্যের ওপর আলো ফেলে আমি টুকরো টুকরো ভাবে অধ্যায় বিন্যাস করেছি। তাই একটি অধ্যায় লেখার পর কোনো ধারাবাহিকতা বজায় রাখার কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আমি পরবর্তী অধ্যায়টি রচনা করিনি। এই কারণে দ্বিতীয় অধ্যায়ের জন্য, ইংরেজ সরকার নাট্য অভিনয় নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক যে আইন লাগু করেছিল, সেই সময়ের ঘটনাটিকে আমি বেছে নিয়েছি। এই অধ্যায়ের নাম রেখেছি, ‘নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইনঃ একটি বিকল্প পাঠ’। আমি এই অধ্যায়ে দেখাতে চেয়েছি, বাংলা নাট্য অভিনয়কে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে আইন প্রণয়ন হয়েছিল, সেই ঘটনাটিকে নাট্য ইতিহাস গ্রন্থে যথেষ্ট প্রাধান্য দেওয়া হলেও ঘটনাটির বিকল্প রাজনৈতিক মূল্যায়নের কাজ আজও ইতিহাস জগতে তেমন বিস্তৃতভাবে করা হয়নি। নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন নিয়ে প্রায় সমস্ত লেখাগুলিতেই মূলত উনিশ শতকীয় নাট্যজগতের কর্মী ও কলাকুশলীদের স্বাদেশিক চেতনা, ব্রিটিশ বিরোধী নির্ভীকতা ও অকুতোভয় দেশপ্রেমের ছবিটি তুলে ধরা হয়। বিশ শতকের গোড়াতে যে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন সংঘঠিত হয়েছিল, তারই এক পূর্বদশা হিসেবে নাট্যমঞ্চের এই ইংরেজবিরোধী স্বাদেশিক রূপটিকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। যদিও এই বিষয়ে শিবব্রত চট্টোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত গবেষণা প্রবন্ধটি একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস। তিনি নাট্য ইতিহাসের এই সংগ্রামী অধ্যায়টিকে তাঁর বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে আরও একবার বিচার করে দেখেছেন। আমার বর্তমান অধ্যায়টি তাঁর প্রবন্ধটিকে অনুসরণ করে ঘটনাটির একটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে পারবে বলে আশা রাখি।

কিন্তু প্রথাগত ইতিহাস যাই বলুক না কেন, নাট্য ইতিহাসের এই সময়টিকে আধুনিক নাট্য গবেষকদের আরও গভীরভাবে নিরীক্ষণ করা প্রয়োজন বলে মনে হয়। সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার তিন বছরের মধ্যে এই আইন এনে নাট্যচর্চাকে প্রতিহত করার দরকার হয়ে পড়ল। এই ঘটনার বর্ণনার সময় তৎকালীন সাধারণ মানুষের মনে নাট্যশিল্পের শক্তিশালী প্রভাব ও নাট্য জগতের শিল্পীকর্মীদের দুঃসাহসিক ভাবমূর্তিটিকে প্রতিষ্ঠা করাটা খুব সহজ হয়ে পড়ে। কিন্তু গোটা ঘটনাপ্রবাহটি নিরীক্ষণ করলে প্রশ্ন আসে, গোটা নাট্য সমাজের কত শতাংশ নাট্যকর্মী বা নাট্যমোদী মানুষ এই ঘটনায় ভূমিকা পালন করেছিলেন? বিশেষ করে এই সময়ে নাট্য প্রতিভা গিরিশচন্দ্র ঘোষ বা অর্ধেন্দুশেখর

মুস্তাফির মতো বিশিষ্ট অভিনেতা- নাট্যব্যক্তিত্বরা তাঁদের নাট্যজীবনের মধ্য গগনে পৌঁছে গেছিলেন। জনমানসে তাঁদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তাঁদের নাট্য দল ও নাটকগুলি নাট্য ইতিহাসের একেকটি মাইলস্টোন হিসেবে ততদিনে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছিল। জিজ্ঞাসা আসে, তাঁদের মতো ব্যক্তিত্বরা এই সময়ে কী ভূমিকা নিয়েছিলেন? প্রশ্ন আরও আসে, উপেন্দ্রনাথ দাস ও অমৃতলাল বসুর নেতৃত্বাধীনে যে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক থিয়েটারের জন্ম হল, তার পরবর্তীকালে সেই চর্চাটি কোথায় গিয়ে দাঁড়াল? নাট্য জগতের পুরোধা ব্যক্তিত্বরা কি সেই রাজনৈতিক থিয়েটারের ধারাটির পদানুবর্তী হলেন? নাকি থিয়েটার বেছে নিল কোনো বিকল্প পথ? আমি এই অধ্যায়ে নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রথম সময়ের ঘটনাটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছি। এই ঘটনায় যে যে ব্যক্তিমানুষের নেতৃত্ব ছিল, তাঁদের ব্যক্তি জীবন ও রাজনৈতিক পরিচয়গুলিকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এমনকি, নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন সংক্রান্ত মামলা চলার কারণে সেই নাট্যকর্মীদের ব্যক্তিজীবনে কী কী প্রভাব পড়ল, তাঁদের নাট্যচর্চা এই ঘটনার পর কীভাবে প্রবাহিত হল এবং বাকি সমগ্র নাট্য সমাজ পরবর্তীকালে এই ঘটনাটির ব্যাপারে কী কী প্রতিক্রিয়া জানালো সেই নিরীক্ষণ করতে চেয়েছি। এই পদ্ধতিতেই আমি এই সময়টি সম্পর্কে বাংলা নাট্য ইতিহাসে প্রচলিত মহান আখ্যানটিকে ঈষৎ বিকল্প আদর্শে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস করেছি।

<u>তৃতীয় অধ্যায়</u>

তৃতীয় অধ্যায়টির নাম হল, 'বাংলা ঐতিহাসিক নাটকে জাতীয়তাবাদ'। ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নিরিখে বিশ শতকীয় জনপ্রিয় ঐতিহাসিক নাটকগুলোর অবস্থানকে বিশ্লেষণ করতে আমার এই অধ্যায়ের পরিকল্পনা। ভারতবর্ষে উনিশ ও বিশ শতকীয় সময়ে যে যে জাতীয়তাবাদী চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল, সেই চিহ্নগুলোর উৎস সন্ধান করার একটি প্রচেষ্টা করেছি। পাশাপাশি এই আন্দোলনে উচ্চবর্গীয় হিন্দুভাবধারার প্রাধান্য কতটা ছিল, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেরণায় ভারতবর্ষে 'নতুন হিন্দু' গড়ে তোলার প্রক্রিয়াটি কেমন ছিল এবং সেই হিন্দু-জাতীয়তাবাদের প্রভাবে সমাজের নিম্নবর্গ বা মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষেরা কতটা অন্তর্ভুক্ত হলেন বা হলেন না, সেই ব্যাখ্যাও খানিকটা করার চেষ্টা করেছি। এই সূত্রে গড়ে তোলার উদ্যোগের মধ্যে 'নতুন হিন্দু'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো সেই সময়কার যুগনায়কদের তৎকালীন অবস্থানকেও আমি ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন মনে করেছি। যদিও এই অধ্যায়ের এতটা অংশ পর্যন্ত কোন মৌলিক কথা আমি বলিনি। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশ্লেষণ করে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন নতুন ধারার গবেষণা করেছেন।

আমার এই অধ্যায়ের জন্য সেই ব্যাখ্যা ও আলোচনাগুলিকেই আমি আশ্রয় করেছি। নাট্য ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রবণতাগুলির বৈশিষ্ট্য নিরূপণে আমার তৎকালীন বৃহত্তর সমাজের এই বিশিষ্টতাগুলোকে জানা প্রয়োজন ছিল। পার্থ চট্টোপাধ্যায়, পঙ্কজ রাগ, Jaffrelot, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো প্রাজ্ঞ মানুষের প্রবন্ধাবলী এই বিষয়ে তাত্ত্বিক ধ্যান ধারণা তৈরি করতে আমার গবেষণায় বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পর্বের আলোচনায় মূলত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে এই বিশিষ্ট গবেষকদের মতামতের বিশ্লেষণগুলিই প্রাধান্য পেয়েছে।

এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে আমি এই প্রেক্ষিতে নাট্যজগতের দিকে মনোনিবেশ করেছি। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলা নাট্য প্রযোজকদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ঝোঁকগুলো উঁকি দিচ্ছিল। বিশেষত মধুসূদন দত্তের নাট্য রচনার উদ্যোগ নেওয়ার সময়কার ইতিহাস এই সময়টি নিয়ে আমাদের যথেষ্ট স্পষ্ট ধারণা দেয়। তাই ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে 'ওরিয়েন্টাল থিয়েটার'-এর নাটকের ভাষা নিয়ে বিতর্কটি এবং আর কয়েক বছর পরে মধুসূদন দত্তের *রিজিয়া* নাটকটি নিয়ে যে সমস্যা হয়েছিল, সেই প্রসঙ্গগুলি এই অংশে অনেকটা গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়েছে। এরপরের অংশে এই অধ্যায়ের মূল আলোচনাটি আনা হয়েছে। উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে বিশ শতকের শুরুর সময় পর্যন্ত বাংলা মঞ্চে প্রচুর ঐতিহাসিক নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। এই ঐতিহাসিক নাটকগুলি রচনার প্রেক্ষিত, ঐতিহাসিক নাটকগুলির মঞ্চস্থ হওয়ার কারণ ও রাজনৈতিক প্রয়োজনগুলিকে বোঝার জন্য এই অংশটি লেখা হয়েছে।

১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন লাগু করার পরে পরেই বাংলা নাট্য মঞ্চ রাজনীতির ছোঁয়াচ এড়িয়ে পুরোপুরি নিরূপদ্রব ধর্মীয় আচ্ছাদনের তলায় নিজেকে নিরাপদ মনে করেছে। যদিও প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে সরে থাকতে চাইলেও বাংলা থিয়েটার আসলে এক প্রচ্ছন্ন সাবধানী সুবিধেজনক রাজনীতির চর্চা চালিয়ে গেল। এই রাজনীতিহীনতার রাজনীতির ধারাটিকে পরবর্তীকালে আরও বয়ে নিয়ে চলেছে বাংলা ঐতিহাসিক নাটকগুলি। নাট্যতত্ত্বগ্রন্থগুলি এই সময়কার নাটকগুলিকে 'ঐতিহাসিক নাটক' নাম দিয়ে ইতিহাসে নাটকগুলিকে এক বিশিষ্ট স্থান দিয়েছে। এমনকি নাটকগুলিকে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সংগ্রামী প্রতিবাদী বলিষ্ঠ কিছু নাটক হিসেবেও বর্ণনা করা হয়েছে। এই নাটকগুলি কতটা প্রতিবাদী নাটক, কতটা ব্যবসায়িক স্বার্থে পরিকল্পিত নাটক, কতটা সমসাময়িক রাজনীতি নির্ভর নাটক, কতটা দর্শক মনোরঞ্জনের জন্য প্রযোজিত আর কতটা সামাজিক দায়িত্ব পালনের

নৈতিক তাগিদ থেকে মঞ্চস্থ করা হয়েছিল, সে আলোচনা অত্যন্ত জরুরী। এই সব আলোচনার মাধ্যমে সমসাময়িক জাতীয়তাবাদী রাজনীতির আলোয় উনিশ-বিশ শতকীয় ‘ঐতিহাসিক নাটক’ নামে পরিচিত নাটকগুলিকে বিচার করার প্রয়াস করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম তিনটি অধ্যায়ে যে ফাঁকগুলি নির্দেশ করা হয়েছে, সেগুলির পরিপূরক হিসেবে চতুর্থ অধ্যায়ের সূচনা। অর্থাৎ প্রথম তিনটি অধ্যায়ে বাংলা নাট্য ইতিহাসের এমন তিনটি অংশকে বিচার করা হয়েছে, যা নিয়ে নাট্য সংগ্রহশালা থেকে শুরু করে অসংখ্য পত্র-পত্রিকা, গ্রন্থাদি, বক্তৃতামালা, স্মৃতিকথা বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচীতে পর্যন্ত সমস্ত ক্ষেত্রে অনায়াসে বহু প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায়। তার মানে বোঝা যাচ্ছে, প্রথম তিনটি অধ্যায়ের গবেষণা বিষয়গুলি বাংলা নাট্য ইতিহাসের অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি পর্ব। চতুর্থ অধ্যায়টি নেওয়া হয়েছে নাট্য ইতিহাসের সম্পূর্ণ অন্য একটি অংশ থেকে। এই অধ্যায়ে সরাসরি কোনো ঘটনার শুরু বা শেষ নেই। এই অধ্যায়ে কোনো সাল-সংখ্যা-তারিখের কঠিন নিগড় নেই। বস্তুত এই অধ্যায়ে চর্চিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে মূলধারার ইতিহাস প্রকরণে কোনো মনোযোগই নেই। অথচ থিয়েটার লগ্নের শুরু থেকেই এই বিষয়টি ভীষণভাবে উপস্থিত আছে। নাট্য মঞ্চক্ষেত্রের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বিষয়; কিন্তু নাট্য ইতিহাস ক্ষেত্রে একেবারেই উপেক্ষিত একটি বিষয়। অধ্যায়ের নাম, ‘বাংলা নাটকের মঞ্চসজ্জাঃ বিকল্প ইতিহাস রচনার সম্ভাবনা’। নাটকের মঞ্চসজ্জা বা দৃশ্যসজ্জার বিষয়টি এমনই একটি বিষয়, যা না থাকলে নাট্য ইতিহাসের শুরুই হয় না। নাট্য ইতিহাস লেখা হয়েছে তো নাটকের মঞ্চায়নের সত্যতাটিকে গ্রহণ করে। আমাদের এই নাট্য ইতিহাস তো মূলত মঞ্চ নাটকেরই ইতিহাস। কেবল নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস নয়। অথচ মঞ্চ ক্ষেত্রে এই মঞ্চসজ্জার উপস্থিতি নিয়ে কি অদ্ভুতভাবে লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্য ইতিহাস একেবারে নিশ্চুপ। বলা ভালো এই বিষয়টি নিয়ে কোনো বক্তব্য রাখার প্রয়োজনই মনে করেনি সর্বোচ্চ কর্তৃত্বপূর্ণ বাংলা নাট্য ইতিহাস কড়চা।

এই অধ্যায়ে কলকাতার নাট্যসংস্কৃতির শুরুর দিকের কিছু নাট্য প্রযোজনার মঞ্চপ্রযোজনার মঞ্চসজ্জা নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যেমন কলকাতার অধিবাসী ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের বিনোদনমূলক যে নাট্যানুষ্ঠানের রেওয়াজ ছিল, সেগুলির মঞ্চসজ্জার দিকে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। ব্রিটিশ কর্মচারী ও অঙ্কনশিল্পী উইলিয়াম প্রিন্সেপের নির্দেশিত একটি নাটকের মঞ্চসজ্জার বর্ণনা করা হয়েছে। লেবেদফের ‘বেঙ্গলি থিয়েটার’-এর

মঞ্চসজ্জার পরিকল্পনা নিয়েও বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। এরপর নবীনচন্দ্র বসুর পরিকল্পিত জাঁকজমকপূর্ণ স্পেস-স্পেসিফিক বা স্থান-বিষয়ী নাট্য প্রযোজনাটি সম্পর্কেও বিশেষ আলোকপাত করা হয়েছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অধ্যায়ের এই পর্যায় পর্যন্ত যা যা উল্লিখিত হয়েছে তার জন্য আমায় কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক কাজ করতে হয়নি। সংগ্রহশালায় প্রাপ্ত তথ্যের বিন্যাসেই এই বিশ্লেষণ পদ্ধতি সম্ভব হয়েছে। অথচ এই বিষয়ে বিশেষ গবেষণা করার উদ্যোগ তেমনভাবে নেওয়া হয়নি। কোনো একক ব্যক্তি নিজস্ব উৎসাহে কিছু কাজ হয়তো করছেন, কিন্তু মূল প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাসে সেই গবেষণার কোনো স্থান হয়নি।

কেন? মূল ইতিহাস ধারায় এই মঞ্চসজ্জার ইতিহাসকে অন্তর্ভূক্ত করা হল না কেন, সেই প্রশ্নের উত্তরের তাগিদে অধ্যায়ের পরবর্তী খণ্ডে আমি বাঙলার চিত্রশিল্পের ইতিহাসের দিকে খানিক চোখ রেখেছি। চিত্রশিল্পের ইতিহাসের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে বাংলার নাট্যদৃশ্যকলার ইতিহাসটি নিঃসন্দেহে অনেক সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। চিত্রশিল্পের ইতিহাসে লোকশৈলীর সঙ্গে ইউরোপীয় বাস্তববাদী অঙ্কন শৈলীর যে সংঘাতের বৈশিষ্ট্য উঠে আসে, নাট্য শিল্পে তার কী প্রভাব পড়েছিল, সেই ইতিহাসও আমি পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করেছি। ফলে কেবলমাত্র একান্ত নাট্যশিল্প সম্বন্ধীয় তথ্যের ওপর নির্ভর না করে সংশ্লিষ্ট অন্য ক্ষেত্রের ইতিহাসকে আমি বর্তমান গবেষণার পরিসরের মধ্যে নিয়ে আসতে চেয়েছি। ফলাফলস্বরূপ বাংলা নাটকের মঞ্চ প্রযোজনা নিয়ে যেটুকু তথ্যসামগ্রী পেয়েছি, তার গভীর নিরীক্ষণের সুযোগ পেয়েছি। পাশাপাশি উনিশ বিশ শতকীয় কলকাতা সমাজের রক্ষণশীলতা, শ্রেণীবিভাজন, প্রগতির আকাঙ্ক্ষা, পুরোনো মূল্যবোধের পিছুটান কিংবা নতুনের সঙ্গে সংঘাতে নবতর উত্তরণের এক নতুন দিশা খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছি। এই অধ্যায়টি বাস্তবত কোনো নতুন তথ্য পরিবেশন করার জন্য উত্থাপন করা নয়। বরং পুরোনো হারিয়ে যাওয়া অবহেলিত তথ্য থেকে বিকল্প ইতিহাস রচনার একটি পদ্ধতিকে নির্দেশ করতে চেয়েছে। এই বিকল্প ইতিহাস শুধুমাত্র নাট্য ইতিহাসের গণ্ডীতে থাকার কথা বলে না। তার সঙ্গে সঙ্গে নাটকে মঞ্চসজ্জার ইতিহাস আসলে নিজেই একটি মূলধারার রাজনৈতিক ইতিহাস বিবরণী হয়ে উঠতে পারে। এই ইতিহাস মূল ইতিহাস আখ্যানের পরিপূরকমাত্র নয়; এই ইতিহাস নিজেই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইতিহাস আখ্যান হয়ে ওঠার সম্ভাবনা বহন করে।

সমাজে উপেক্ষিত, অবহেলিত, নজর-না-করা এমন নানান ক্ষেত্র আছে যা আমাদের মূল ধারার ইতিহাসকে নতুন করে চিনতে শেখায়। প্রথাগত ইতিহাসকে অস্বীকার করার কোনো উদ্দেশ্য আমার নেই। আমি শুধু দেখতে চেয়েছি বিজয়ী প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস কেন বিজয়ী হতে পারল। চাপা পড়ে গেল কোন কোন স্বর। অন্ধকারে রয়ে গেল

ইতিহাসের কোন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়। কিংবা ইতিহাস তাকে ব্যাখ্যা করে নিল নিজের সুবিধে মতো। সত্য হয়ে রয়ে গেলো শাসকের সত্যের স্বর। শাসক সত্য বলতে যা বোঝায়, শুধু সেটুকুই স্থান পেল ইতিহাসে। সেই খণ্ডিত প্রতিষ্ঠিত বিজয়ী ইতিহাসকে নতুন ভঙ্গীতে বিচার করতে শেখা, নতুন নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে একই ইতিহাসকে বিশ্লিষ্ট করে চেনা, তার ফাঁকগুলোকে বোঝা, তার শোষণের ধরনটিকে প্রশ্ন করা—এইটুকুই হল নাট্য ইতিহাস গবেষক হিসেবে আমার কাজ।

অধ্যায় ১

অভিনেত্রীর বিশুদ্ধিকরণঃ উনিশ শতকীয় 'সভ্য' থিয়েটারে অভিনেত্রীর অনুপ্রবেশ

> 'But when her work produces an account in which once familiar events no longer make sense, we may judge that something more gravely disruptive of traditional history is taking place' (Jardine 29).

বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস সংক্রান্ত গ্রন্থগুলিতে বাংলা থিয়েটারের শুরুতেই গেরাসিম লেবেদফ-এর নাম উল্লেখ করা হয়। তেমনভাবেই বাংলা রঙ্গমঞ্চের অপর মাইলফলক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয় মেয়েদের রঙ্গমঞ্চ পদার্পণের ঘটনাটিকে। উনিশ শতকীয় বাংলা সমাজ, তার রক্ষণশীলতা, তার প্রগতির আকাঙ্ক্ষা, তার রুচি, চাহিদা, নারীমুক্তির বিতর্ক ইত্যাদি নানান চাপান উতোরের সাক্ষী হিসেবে নারীর নাট্য জগতে আগমন। একদল মানুষের কাছে নারীমুক্তির এক নতুন সোপান হয়ে উঠেছিল এই ঘটনা। আবার অপর এক দল হয়তো এই একই ঘটনায় চির জীবনের মতো নিজেকে রঙ্গমঞ্চ থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। দুই পক্ষের মানুষের মধ্যেই কিন্তু বিদগ্ধতা, সমাজ চেতনা বা মানুষের উন্নতির প্রয়াস কিছু কম ছিল না। যেমন মধুসূদন দত্ত জীবনের শেষদিন পর্যন্ত রঙ্গমঞ্চে নারীর অধিকার প্রদানের বিষয়ে প্রবল উদ্যোগ নিয়েছিলেন। আবার তার বিপরীত পক্ষ অবলম্বনে ব্রতী হয়েছিলেন নারীমুক্তির অপর এক অন্যতম কাণ্ডারি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্বয়ং। তথাপি এই টানাপোড়েন, এই বৌদ্ধিক ও প্রায়োগিক বিতর্ক জয় করে নারী রঙ্গমঞ্চে এসেছে। কলকাতা কেন্দ্রিক নাট্যচর্চাকে সমৃদ্ধ করেছে। লিখিত হয়েছে বাংলা নাটকে নারীকেন্দ্রিক এক বিশিষ্ট অধ্যায়।

কিন্তু প্রশ্ন আসে, নারীর বাংলা থিয়েটারে অভিনেত্রী হিসেবে নিয়োগের ক্ষেত্রে এত বাদানুবাদ কেন? নাট্য গবেষক কিরণ্ময় রাহা লিখছেন, 'It made history of sorts by engaging women to play the female roles. Predictably there was a storm of protest' (25)। মহিলা চরিত্রে একজন নারীকে প্রতিষ্ঠা করতে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল শহরে, এমনটা জানাচ্ছে আমাদের নাটকের ইতিহাস। কিন্তু প্রশ্ন এই, একজন নারী একটি মহিলা চরিত্রে অভিনয় করবে এর মধ্যে সাহসিকতা বা প্রতিবাদের ঝড় আসার কারণ কী? কিংবা অন্যভাবে বলতে

গেলে, নারীর 'নাট্য-অভিনয়' নামক পেশাকে বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ জুড়ে বাঙালি উচ্চবিত্ত সমাজে যে বিরুদ্ধতা ও পক্ষপাতিত্বের জোয়ার এসেছিল, তার মূল কোথায়?

বাংলার লোকসমাজে বিভিন্ন লোককলায় শিল্পী হিসেবে নারীর বহুল অংশগ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। কীর্তন দল, ঝুমুর নাচ, বাউল গান, ভাদু উৎসব, টুসু গান, সূর্য ব্রত, নাচনী নাচ, ভাদুলি ব্রত কথা, খেমটির নাচ, তুঁষতুঁষালি ব্রত, ইতু পুজোর অনুষ্ঠান, মাঘমণ্ডল ব্রত, কথকতা, পাঁচালি গান এরকম আরও বহু লোক অনুষ্ঠানে মেয়েদের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয় ছিল। আশুতোষ ভট্টাচার্যের গবেষণা জানাচ্ছে যে, মেয়েরা ঘরের নানা অনুষ্ঠানে (যেমন বিয়ে, গর্ভাবস্থা, ছেলে ভুলানো) কিংবা নানা কর্মসঙ্গীতে (যেমন—ছাদ পেটানোর গান, ধান ভানার গান ইত্যাদি) প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করত (*Bangla Lokanatya Samiksha*)। লোকশিল্পের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যগুলি নিজেদের দেহে কণ্ঠে ও অস্তিত্ব দিয়ে বহন করত মহিলা শিল্পীরা।

সৈয়দ জামিল আহমেদের গভীর তাত্ত্বিক প্রবন্ধ 'Female Performers in the Indigenous Theatre of Bangladesh' (1994) প্রবন্ধে ঔপনিবেশিক পূর্ব বাংলায় মহিলা উপস্থাপকদের বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা আছে। এই রচনায় পূর্ববঙ্গীয় অভিনয়কলায় মেয়েদের উপস্থিতি সম্বন্ধীয় আলোচনা সূত্রে প্রবন্ধকার জানাচ্ছেন, নিঃসন্দেহে, বাংলা নাটকে মেয়েদের অংশগ্রহণ করার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। যেমন-ঢাপ কীর্তন, রায়ানি গান, খেমটাওয়ালি বা বাঈজি। নৃত্যশিল্পী ও অভিনেত্রী হিসেবে রীতিমতো জনপ্রিয় ছিল মেয়েরা। সৈয়দ জামিল আহমেদের গবেষণা এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছে। সৈয়দ জামিল আহমেদ সরাসরি যে কথাটা জানাচ্ছেন, 'Women have always performed in Bengal, either in the mainstream or in the peripheral theatre performances.... Both male and female performers have portrayed both male and female characters' ('Female Performers' 280)। তাঁর মতে, বাংলার মাটিতে মেয়েরা সবসময় অভিনয় করেছে, মূলধারার বা অন্যান্য শিল্পকলায়। পুরুষ ও নারী অভিনেতারা উভয়েই পুরুষ ও নারী চরিত্রে অংশগ্রহণ করেছে।

জামিলবাবুর মতে, বাংলা সংস্কৃতি বৃহত্তর ভারতীয় সংস্কৃতি থেকেই উদ্ভূত। তাই প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত ও ইতিহাস আলোচনা বাংলা নাটকের আলোচনায় অবশ্যই চলে আসবে। প্রাচীন ভারতের প্রথম শতকে প্রচলিত ও লিখিত *রামায়ণ, মহাভারত, ঐতরীয় ব্রাহ্মণ, কামসূত্রে* নারীচরিত্রে মহিলাদের উপস্থিতির বিস্তারিত বর্ণনা আছে। কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্রে* 'স্ত্রীপেক্ষা' বলে এক ধরনের মেয়েদের অভিনয়কলা প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়। এমনকি

আরও মহেঞ্জোদারো থেকে প্রাপ্ত একটি নবযৌবনা নৃত্যশিল্পীর মূর্তি মেয়েদের পার্ফর্মেন্সে যোগদান করার বিষয়ে আমাদের অনেকটাই নিশ্চিত করে (Iravati 3)। সংস্কৃত নাটকের শুরুতে প্রস্তাবনা অংশের পরেই মঞ্চে ঢুকত নটী। শুরু হত নটী ও সূত্রধারের সংলাপ। অনুমান করা হয়, সূত্রধারের স্ত্রী এই নটী চরিত্রে অভিনয় করত। প্রাচীন ভারতে বহু নারী স্বামীর সঙ্গে এই কর্মসংস্থান খুঁজে নিত বলে মনে করা যেতে পারে। মহাঋষি পতঞ্জলির *মহাভাষ্যে* এই রকম কিছু নারীদের জীবনের বিবরণী পাওয়া যায়। ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-এ একইরকমভাবে মেয়েদের অভিনয় করার বেশ কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-এ নারী চরিত্রে অভিনয়ের পুংখানুপুংখ উল্লেখ পাওয়া যায়। *নাট্যশাস্ত্র*-এ মেয়েদের চরিত্রানুগ সাজগোজ থেকে শুরু করে ভাব-রস সমৃদ্ধ অভিনয়ের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। এমনকি ‘পুষ্পগণ্ডিকা’ নামে যে অভিনয়ের কথা বলা হচ্ছে, সেখানে বলা হয়েছে, মহিলা শিল্পীরাই পুরুষের মতো শরীরী ভঙ্গি, চলা, বসা, আদবকায়দা উপস্থাপন করে নাট্য পরিবেশন করবে (Natyasastra 377)। *থেরগাথা* নামের প্রাচীন বৌদ্ধ পুঁথিতে জানা যায়, তালপুট নামের এক অভিনেতার নাটকের দলে প্রায় পাঁচ শত পেশাদারী অভিনেত্রী বর্তমান ছিল (Varadpande 6)।

এই সূত্রে জামিল আহমেদ বলছেন, অষ্টম শতকে ময়নামতী বুদ্ধ বিহারের দেওয়ালে বহু নৃত্যরত মেয়েদের মূর্তি দেখা যাচ্ছে। ভারতের পূর্ব সীমানার নাট্য ও সংস্কৃতি চর্চায় প্রাচীন কালে থেকেই মেয়েদের উপস্থিতির অনেক প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এমনকি, *চর্যাপদ*-এর মহিলা চরিত্রও এই বিষয়ে আমাদের দিশা দেখায়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রগুলির মধ্যে মেয়েদের চরিত্রগুলি অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত। এই মহিলা অবশ্য উচ্চশ্রেণিভুক্ত পরিবারের সদস্য নন। তাঁরা মূলত সামাজিকভাবে বারবণিতাদের গোষ্ঠীভুক্ত হিসেবেই মনে করা হত। উচ্চশ্রেণির যে মেয়েরা অভিনয়ে অংশ নিতেন, তাঁরা মূলত ঘরোয়া অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন। ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে মুহুম্মদ খানের *সত্যকলি বিবাদ সংবাদ* এই সূত্রে উল্লেখ্য। মাদার হুয়ান-এর গ্রন্থেও এই ধরনের মহিলা অভিনয়ের প্রমাণ লক্ষিত হয় (Ahmed, ‘Female Performers’ 271)।

‘Female Performers in the Indigenous Theatre of Bangladesh’ (1994) প্রবন্ধে সৈয়দ জামিল আহমেদ বলছেন, মধ্যযুগের শুরু দিক থেকেই বাংলায় মেয়েদের প্রকাশ্য অভিনয়ের ক্ষেত্রে বাধা আসা শুরু করে। তাঁর ব্যাখ্যায়, এর মূল কারণ হতে পারে, ১। মুসলমান রাজত্ব, ২। বৈষ্ণব নৃত্য-গীতের প্রচলন। তার সঙ্গে তিনি একথাও বলছেন, মুসলমান রাজত্বকালীন সময়ে নৃত্য একটি অত্যন্ত দরকারি বিনোদন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠলেও

অ-মুসলমান পুরাণ ও সংস্কৃতি রাজ-পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হওয়া শুরু হল। ফলে, রাজপ্রাসাদ বা মন্দিরে মেয়েদের শিল্পকলায় উপস্থিতির যে প্রচলন ছিল, তা ষোড়শ খ্রিস্টাব্দ থেকে মুছে যেতে শুরু করল।

এর রেশ চলল আরও বহু বছর। নীতিগত কারণে ব্রিটিশ ধরনে অভিনীত থিয়েটারেও মেয়েদের পা রাখা বারণ থেকে গেল বহু বছর পর্যন্ত। মেয়েরা হয়ে রইল মঞ্চ থেকে বিতারিত। পশ্চিমী ধরনের অভিনয় কলকাতার পাশাপাশি ঢাকা ও তৎসংলগ্ন কিছু এলাকাতেও প্রচলিত হয়েছিল। কলকাতার মতো ব্রিটিশ জনবসতির কাছাকাছি থিয়েটার হাউজ বানানো হল। বিদেশী নাটকের অভিনয়ও হত সেখানে। অবশেষে কলকাতায় লেবেদফের প্রেরণায় মেয়েরা মঞ্চে নতুন করে উপস্থিত হয়েছিল ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে। এর পরে নবীনচন্দ্র বসুও মেয়েদের মঞ্চে আনার উদ্যোগ নেন।

'Footprints of the 'Outliers': Female Performers in Colonial Eastern Bengal' রচনায় সৈয়দ জামিল আহমেদ জানাচ্ছেন, ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় ব্রিটিশ ধরনের বাংলা থিয়েটারে অত্যন্ত সাহসী পদক্ষেপ নেয় ক্রাউন থিয়েটার। এলাকার মেয়েদের প্রথম মঞ্চে অভিনয়ের সুযোগ করে দেন তাঁরা। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে 'পূর্ণচন্দ্র' নাটকে দুনিয়া নামের একজন অভিনেত্রীকে মঞ্চে আনা হয় (Ahmed, 'Footprints of the' 77)। দুনিয়া ছিলেন বারবণিতা, কারণ সেই সময়ে অভিনয়ের জন্য ভদ্রঘরের মেয়েদের পাওয়া অসম্ভব ছিল। ঢাকা শহরে বারবণিতারা ছিলেন নৃত্য-গীতে পটু। ফলে তাঁরা অভিনয়কলাতেও যথেষ্ট সক্ষম হয়ে উঠেছিলেন। ক্রাউন থিয়েটারের উদ্যোগে কিছু অভিনেত্রী প্রতিষ্ঠিত হতে থাকেন বাংলার রঙ্গমঞ্চে। এই সূত্রে কনক সরোজিনী, সরলা, রানি নামের অভিনেত্রীদের কথা উল্লেখ্য। এমনকি কলকাতা থেকে অভিনেত্রীদের ভাড়া করে নিতে আসত ক্রাউন থিয়েটার এ কথাও আমরা জানতে পারি (Mamoon, *Bangladesher Theatre* 35)।

এই সূত্রে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানাচ্ছেন জামিলবাবু। জামিলবাবুর কথায়, 'It was the *tawai'f*s, who created history in the domain of theatre of eastern Bengal in 1854 by performing Ahmed Hasan Dafar's 'domestic drama' *Bulbul Bimar'* ('Footprints of the' 68)। ঢাকায় তাওয়াইফরা ঘরোয়া আঙ্গিনায় সীমিত দর্শকের সামনে *বুলবুল বিমার* নামক উর্দু নাটকটি প্রদর্শিত করে ইতিহাস সৃষ্টি করে। এর অনেক পরে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় প্রথম নারীদের উদ্যোগে দুইটি পার্শি নাটকের অভিনয় হয়েছিল, যেখানে সকল অভিনয় করা হয়েছিল মহিলাদের দ্বারা। এই নাট্য আয়োজন করা হয়েছিল তিন বোনের প্রচেষ্টায়। *ইন্দ্রসভা* ও

যাদুনগর নাটক দুইটি গুন্নু বাঈ, আন্নু বাঈ, নয়াবন-এই তিন বোনের মিলিত প্রয়াসে নাট্য অভিনয়ের আয়োজন করেন বলে জানা যায় (Mamoon, *Bangladesher Theatre* 33)।

সুবীর রায়চৌধুরীর *বিলাতি যাত্রা থেকে স্বদেশী থিয়েটার* নামক বইটির গোড়াতেই তিনি বাংলা থিয়েটারে 'বিলাতি' ও 'স্বদেশী' প্রভাব নিয়ে আদি বিতর্কের একটি উল্লেখ করেছেন (14)। তিনি দেখিয়েছেন, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের মতে যাত্রা থেকেই থিয়েটারের জন্ম, আবার ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে থিয়েটার ও যাত্রার কোনও নাড়ির টান নেই। অথবা সুশীলকুমার দে বলছেন, যাত্রা ও থিয়েটার উভয়েই উভয়কে প্রভাবিত করে এসেছে। এই বিতর্ক সূত্রেই সুবীর রায়চৌধুরী প্রমাণ করেছেন, যাত্রা প্রভৃতি লোকশিল্পে সেই সময়কার চরিত্র বিন্যাসের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের প্রয়োজন মাফিক নিয়োগের প্রথা চালু ছিল অবশ্যই। প্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় অভিকরণ শিল্পগুলিতে অভিনেত্রী বা শিল্পী হিসেবে মেয়েদের অংশগ্রহণের অসংখ্য উদাহরণ ইতিহাসে ছড়িয়ে আছে। এমনকি উনিশ শতকে মহিলা পরিচালিত দুই যাত্রাদলের নামও পাওয়া যায়—একটি চন্দননগরের 'বৌ-মাস্টারের দল'; প্রখ্যাত যাত্রা অধিকারী মদন মাস্টার মারা গেলে তাঁর স্ত্রী এই দল পরিচালনা করতেন বলে জানা যায়। আরেকটি নবদ্বীপের 'বৌ-কুণ্ডের দল'; নীলমণির কুণ্ড মারা গেলে তাঁর স্ত্রী এই দলের অধিকারী হন (Roychowdhury 14)। এছাড়াও জানা যাচ্ছে, রাজা বৈদ্যনাথের কোনো এক বারবিলাসিনী মহিলা যাত্রাদলের পরিচালনা করেছিলেন (D. Chowdhury 23)। তিনি নিজে *বিদ্যাসুন্দর* গাইতেন বলে জানা যাচ্ছে (G. Bhattacharya 241)।

লোকসংস্কৃতির ইতিহাস ঘাঁটলে মেয়েদের অংশগ্রহণের এইরকম আরও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য লিখছেন, 'বিংশ শতকের প্রথমে ত্রৈলোক্যতারিণী, ভবতারিণী ও কটাগোলাপীর দলে স্ত্রী-ভূমিকায় নারী আসরে অবতীর্ণ হত' (G. Bhattacharya 84)। উনবিংশ শতাব্দী শুরুর দিকে ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে কলিরাজার যাত্রায় নাচগানের জন্য সমকালীন 'এক ভ্রষ্টাকে' দলভুক্ত করা হয়েছিল বলে জানাচ্ছেন গৌরী। তিনি আরও জানাচ্ছেন, ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের 'নন্দবিদায় যাত্রা'য় 'ছিদাম' নামে একটি মেয়েও ছিল। এই সূত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানাচ্ছেন সুমন্ত ব্যানার্জী— '...দাশু রায় (পাঁচালির প্রবক্তা দাশরথি রায়) তাঁর যৌবনের প্রথমে ঘর ছেড়ে গ্রামের স্ত্রী কবিওয়ালী অক্ষয়া পাটনির কবির দলে যোগ দেন। এই মহিলার কাছেই গান-বাজনার তাঁর হাতেখড়ি' (S. Banerjee, *Itar Santan* 79)। 'রাজাহরির দল' নামে আর একটি মেয়েদের যাত্রা দল ছিল। সেই দলে হরিদাসী রাজার ভূমিকায় ভালো অভিনয় করত বলে সেই দলটির নাম হয়েছিল

'রাজাহরির দল'। এই 'রাজাহরির দল'-এ ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে ছয় বছর বয়সে রাজবালা নামে একটি মেয়ে যুক্ত ছিলেন। এই রাজবালা হলেন পরবর্তীকালের বিশিষ্ট গায়িকা ও অভিনেত্রী ইন্দুবালার মা (Sengupta 41)।

অর্থাৎ মেয়েদের নাট্যচর্চায় অংশ নেওয়ার আগে এবং পরে—উভয় ক্ষেত্রেই মেয়েদের লোককলায় অভিনয় করার খবর পাওয়া যাচ্ছে। উনিশ ও বিশ শতকের বাঙলার লোক সংস্কৃতির বিভিন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলিতে মেয়েদের জনপ্রিয়তার বহু প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। যদিও লোকসমাজের সর্বত্র একেবারে অবাধে নারীর অভিনয়ের সুযোগ ছিল, তা নয়। কিন্তু নিঃসন্দেহে লোককলায় মেয়েদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেওয়ার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

অর্থাৎ এ কথা বলা ভুল হবে না যে, উনিশ শতকের বাংলার লোকসংস্কৃতিতে হয়তো মেয়েদের উপস্থিতি ও প্রতিষ্ঠা একেবারে অভূতপূর্ব কোনো ঘটনা ছিল না। এই বিষয়ে পরে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। কিন্তু প্রশ্ন আসে, লোকসমাজে যদি মেয়েরা নাচ, গান, ব্রতকথা, অভিনয়ে যদি সত্যিই অংশ নিতে পারতেন, তাহলে সেই একই সময়ে উচ্চবিত্ত বাঙালির থিয়েটার জগতের আঙিনায় নারীচরিত্রে একজন নারীই যে অভিনয় করা উচিৎ, এ ব্যাপারে তো তৎকালীন নাট্যকর্মীদের মধ্যেও তেমন কোনও দ্বিধার থাকার কথা ছিল না বলেই সাধারণভাবে মনে করা যেতে পারে!

এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে লোকসংস্কৃতিতে মেয়েদের উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও তারা যে একেবারে পিতৃতান্ত্রিকতার উর্ধ্বে উঠে যেতে পেরেছিলেন, তা নয়। লোককলায় মেয়েদের পরিবেশনা সম্পর্কে ও তাঁদের জনপ্রিয়তা নিয়ে এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু সেই আলোচনা থেকে এ কথা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়নি যে, নিম্নবর্গের মেয়েরা একেবারেই পিতৃতান্ত্রিকতার ঘেরাটোপ থেকে মুক্ত ছিল। বরং তারা অনেক ক্ষেত্রেই অবহেলিত হয়েছেন, অসম্মানিত হয়েছেন, সমাজের প্রতিপক্ষ পুরুষশিল্পীর কাছে জনসমক্ষে পর্যুদস্তও হয়েছেন। এমনকি পুরুষ শিল্পীদের পরিবেশনায় একটি অন্যতম হাস্য উপস্থাপনার তির থাকত শিক্ষিত কিংবা স্বাধীন নারীদের উদ্দেশ্যে। কোনো 'পার্ফর্মেন্স'-এ হাসির দৃশ্য বা বর্ণনা হিসেবে অনেক সময়েই শক্তিশালী অবস্থানে নারী এবং অপেক্ষাকৃত অনুগত অবস্থানে পুরুষকে দেখিয়ে বক্রোক্তি করা হত। এই ধরনের বিবিধ উদাহরণ লোকশিল্পের ইতিহাসে অনেক লক্ষ্য করা যায়।

সৈয়দ জামিল আহমেদের ভাষায় বলা যায়, 'Theatre performers... socially... always been outcasts. There is something subversive in their very existence. The female performers are

doubly so in male-dominated society: they pose a potential threat of causing havoc to the very ethos of masculinity' ('Female Performers' 280)। অর্থাৎ মঞ্চ উপস্থাপনাকলায় যুক্ত শিল্পীদের সবসময়েই সমাজ বহির্ভূত হিসেবে চিহ্নিত করা হত। আর মহিলা অভিনেত্রীরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে এক্ষেত্রে দ্বিগুণ অসামাজিকঃ 'পৌরুষের' যে আদর্শ রূপ তাকে প্রশ্ন করার সুযোগ রাখে মেয়েরা, আর তাই তাদের ব্যাপক কোনো ধ্বংসের ক্ষমতা থেকে যায় মেয়েদের উপস্থিতিতে।

মেয়েদের মঞ্চে অভিনয় করার ক্ষেত্রে 'নৈতিকতা'র যে প্রশ্ন বারবার তোলা হয়েছিল, সেই বিষয়ে জামিলবাবুর রচনা থেকে একটি উদাহরণ উল্লেখ্য। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা কলেজে একটি সভা ডাকা হয়। অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে মেয়েদের মঞ্চে উঠে অভিনয় করা নিয়ে এমন সমালোচনাও শোনা যায় যে, নাট্যশালার মধ্যে মেয়েদের জামাকাপড় পাল্টানোর প্রচলনটিও রীতিমতো শালীনতা বর্জিত একটি ঘটনা (Ahmed, 'Footprints of the' 76)। *ঢাকা প্রকাশ* সংবাদপত্রে বেরনো একটি খবরও এই সূত্রে উল্লেখ্য। স্থানীয় পুরুষ স্কুলছাত্ররা দুর্গামনি নামের একজন খেমটাওয়ালিকে শারীরিক নিগ্রহ পর্যন্ত করেছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর অবস্থা এতটাই সংকটজনক হয়ে পড়েছিল যে তাকে হাসপাতালে ভর্তিও করতে হয়েছিল (Ahmed, 'Footprints of the' 70)।

প্রফুল্ল চন্দ্র পালের *প্রাচীন কবিওয়ালার গান* গ্রন্থে যজ্ঞেশ্বরীর প্রতি ভোলা ময়রার তির্যক মন্তব্য সম্পর্কে জানা যায়। 'এই স্ত্রী-কবির সহিত কবি-সংগ্রামে ভোলা ময়রা যে শ্লীলতাবর্জিত খেউর আমদানী করিয়াছিলেন তাহা বিশেষ চমকপ্রদ হইলেও কবিগানের কলঙ্কস্বরূপ' (Pal 82)। বাংলার গ্রাম ও গ্রাম থেকে আসা শহরের নিম্নবর্গের মনুষ্যগোষ্ঠীর মধ্যেও নারীদের অসাম্য ও অবহেলার বিরুদ্ধে অমানবিক লড়াই করতে হত বলে অনুমান করা যায়। এই সূত্রে একটি কবির লড়াইয়ের আসরের বর্ণনা জরুরী। যজ্ঞেশ্বরীর ছিলেন ভোলা ময়রার সমসাময়িক এক প্রখ্যাত মহিলা-কবি। ভোলা ময়রা একটি কবির লড়াইয়ের আসরে যজ্ঞেশ্বরীকে বলেন যে, তিনি একজন মহিলা হয়ে কোন সাহসে পুরুষের সঙ্গে কবির লড়াই করতে এলেন? মেয়েরা রান্না ছাড়া আর কিছুই ভালো করার যোগ্যতা রাখেন না (Pal 82)।

তবু সুমন্ত ব্যানার্জীর পথ ধরে এ কথা বলা যায়, কবির গান বা খেউর এই ধরনের প্রকাশ্য অভিনয়গুলি অথবা ঘরোয়া মেয়েলি অনুষ্ঠানের গান বা আচারগুলো অনেক সময়েই নিম্নবর্গের মেয়েদের নিজ জীবনের অনাচার ও

অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ বা প্রতিবাদ গ্রহণের একটা সুযোগ করে দিয়েছে। উচ্চবর্গের মেয়েদের তুলনায় এই সুযোগ অবশ্যই অনেক বেশি পেয়েছে নিম্নবর্গের অপেক্ষাকৃত স্বাধীন মহিলারা। তাঁদের গান-নাচ-ব্রতকথা-কবির লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে তাঁরা কখনো ঘরের আঙ্গিনায়, কখনো প্রকাশ্য সমাবেশে সরাসরি পুরুষের অবমাননার সমালোচনা করার সুযোগ অন্তত পেয়েছে (S. Banerjee 'Marginalisation of Women's' 167)।

অতএব এ কথা বলা যায় যে, মেয়েদের লোকশিল্পে জড়িয়ে থাকার অনেকগুলি নিদর্শন এখানে পাওয়া যাচ্ছে। উপরিউক্ত বর্ণনায় লোকসমাজে নারীর সমস্ত ধরনের অংশগ্রহণের সম্পূর্ণ, সামগ্রিক কোনো বিবরণী তুলে ধরা হল না। ইতিহাস থেকে মাত্র কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উল্লেখটুকু করা হল। লোকনাট্য ও অভিনয়কলার গবেষকেরা এ বিষয়ে আরও অনেক বিস্তারিত তথ্যের হদিশ দিতে পারবেন। কিন্তু এই আলোচনায় যেটুকু তথ্য উল্লেখ করা হল, তা থেকে লোকসমাজে মেয়েরা অনেক সময়েই বিভিন্ন অভিনয়ে বা নৃত্য-গীতে যে অংশ নিতেন, এ সম্বন্ধে জানা গেল। তা সত্ত্বেও থিয়েটারের ক্ষেত্রে মহিলা নিয়োগের আলোচনায় এত জল্পনা আসার কারণ কী?

শুধু লোকশিল্পও নয়; মঞ্চে অভিনেত্রী আগমনের ঐতিহ্য এই ভারতবর্ষে আঠেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই দেখা যাচ্ছে। ব্রিটিশ, আমেরিকান, আর্মেনিয়ান, অস্ট্রেলিয়ান মহিলারা ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের পর থেকেই প্রসেনিয়াম মঞ্চে অংশ নিচ্ছেন (R. Bhattacharya, *Public Women* 3)। কলকাতার জনজাতির বিস্তার কত বৃহৎ ছিল সেই বর্ণনায় রিমলি ভট্টাচার্য জানাচ্ছেন, পার্সি, ইহুদী, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, বাঈজি, তাওয়াইফ, জুটমিল শ্রমিক, অন্যান্য ক্ষেত্রের শ্রমজীবী মানুষ ইত্যাদি নানান জাতি-পেশা ও সামাজিক স্তরভিত্তিতে বিন্যস্ত অসংখ্য বৈচিত্র্যময় মানুষ এই কলকাতার বাসিন্দা ছিলেন। রিমলি ভট্টাচার্যের কথায়, 'Histories of Bengali theatre, past and present, rarely allude to the multilingual and heterogenous indigenous traditions flourishing in the city' (*Public Women* 291)। অর্থাৎ তাঁর মতে, নতুন বা পুরনো সবরকমের ইতিহাস রচনার ঐতিহ্যেই আঠেরো-উনিশ শতকীয় কলকাতার বিভিন্নতা বিশিষ্ট নানা ভাষাভাষীর বৈচিত্র্যসম্পন্ন একেবারে অনন্য দেশীয় সংস্কৃতির ইতিহাসকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। সেই সময়ের কলকাতার ইউরোপীয় বা অবাঙালি আবাসিকদের সংস্কৃতি ও জীবনচর্চার কথা প্রায় উল্লেখই করা হয়নিই মূলধারার ইতিহাস রচনার উদ্যোগে।

উল্টোদিক থেকে ভাবতে গেলে, যে মানুষেরা থিয়েটারে নারী চরিত্র নারীকে দিয়ে করানোরই পক্ষপাতী ছিলেন, তারাও নারীর থিয়েটারে আসার পক্ষে যুক্তি সাজাতে গিয়ে নারী-অভিনেতাদের সতীত্ব, শুচিতা ও উচ্চ

ন্যায়ভাবের ওপর এতটা গুরুত্ব আরোপ করে জোর পেতে চাইলেন কেন? অনায়াসে এ কথা বলতে পারলেন না কেন, নারী চরিত্র নারী অভিনেতা দ্বারা অভিনয় করাটাই তো বহু বছরের প্রচলিত, যেমনটা হয়ে এসেছে অসংখ্য লোকজাত সংস্কৃতিতে! নিজেদের পক্ষের জোরদার যুক্তি প্রদানের সময় তারা মূলত প্রাধান্য দিলেন নারী-অভিনেতাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, শালীনতাবোধ, নিয়মানুবর্তিতা ও পবিত্র রুচিবোধের ওপর! এর কারণ কী?

সমস্যাটির অনুসন্ধানে কলকাতার অষ্টাদশ শতকের প্রচলিত সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করা প্রয়োজন। অষ্টাদশ শতাব্দী ও উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্তও বাঙালি উচ্চবিত্ত ও নিম্নবর্গ উভয় শ্রেণির মানুষেরা লোকসংস্কৃতিতে বিভোর হয়ে থেকেছে। এমনকি, তারও অনেক পরে গিরিশ-অর্ধেন্দুদের সময়েও বাংলা থিয়েটার সে প্রভাব ছাড়াতে চায়নি। এই বিষয়ে প্রথম অধ্যায়ে ‘প্রকৃত সমস্যার সন্ধানে’ অংশে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। তাই বিশ শতকের শুরুতেও গিরিশের হাত ধরে যে থিয়েটারের রমরমা চলেছে সেখানেও মূল জনপ্রিয়তা পেয়েছে যাত্রা তথা লোকসংস্কৃতির প্রভাবসঞ্জাত পৌরাণিক থিয়েটারের ধারা। গিরিশের নাট্য কর্মের শুরুর দিকে যদিও শেক্সপীয়ারের মতো বেশ কিছু ক্ল্যাসিকাল নাটকের প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছিল। কিন্তু তার খানিক পরেই গিরিশ বাঙলার নাট্য দর্শকের রুচি ও চাহিদাকে মান্যতা দিয়ে পৌরাণিক নাটকেই মনোনিবেশ করেছিলেন। ইউরোপীয় ঘরানাকে অনুসরণ করে যাত্রা শুরু করে থাকলেও বাংলা থিয়েটার তো কখনোই তেমন ‘বিলাতি’ হয়ে উঠতে চায়নি বলেই মনে হয়। সংস্কৃত ও লোকসাহিত্যের ভাব ও রসে নিয়োজিত থেকেছে বরাবর। তাহলে যে লোকসমাজে নারীর বেশ কিছু উপস্থিতি ছিল, সেই সমাজের মনোজ্ঞ দর্শকেরা পরবর্তীকালে যখন থিয়েটার করতে শুরু করছে, সেখানে নারীকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যাটা ঠিক কোথায়? বিষয়টায় একটা দ্বিমুখী টানাপোড়েন দেখা যায় না কি? সহজ সরল প্রথাগত নাট্য ইতিহাসে এ প্রশ্নের জবাব মিলবে না। উত্তর খুঁজতে হবে tangentially। একটু বঙ্কিম পথের ভাবনা ধারায় ভাবা প্রয়োজন।

আবার একই ভাবে প্রশ্ন জাগে, নারীর অভিনেত্রী হিসেবে থিয়েটারে আসার প্রসঙ্গে তৎকালীন পুরুষ কর্মকর্তা বা দর্শক বা অভিনেতা বা সহকারী নাট্যকর্মীদের বয়ানে কিংবা স্বয়ং অভিনেত্রীদের নিজস্ব স্মৃতিকথায় তাঁদের প্রতি সমাজের নিপীড়ন বা ভালোবাসা বা জনপ্রিয়তা বা করুণার বর্ণনাগুলি নাট্য ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে কোনও বাধা হয়ে দাঁড়ায় কি? ইতিহাস রচনার গুরুদায়িত্ব সম্পন্ন করতে গিয়ে অভিনেত্রীদের প্রতি কি খানিকটা মহিমা-অর্পণের প্রয়াস চোখে পড়ে না কি? যেমন গিরিশ ঘোষের রচনায় বারাঙ্গনা পরিবার থেকে আসা অভিনেত্রী বিনোদিনীর সম্বন্ধে

উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লক্ষ্যণীয়ঃ ‘নিম্ন শ্রেণীর অভিনেত্রী হইতে কেমন করিয়া সে অতি উচ্চস্তরে উঠিয়াছিল, কিরূপ সাধনা, কিরূপ প্রাণপণ অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়া সে সমগ্র বঙ্গবাসীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহা জানিবার বিষয় হইতে পারে’ (Dasi 117)। এই রচনায় তিনি লিখেছেন বিনোদিনী ‘সমগ্র বঙ্গবাসীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ’ করতে পেরেছিলেন। অথচ সেই সময়ে থিয়েটার প্রচলিত ছিল মূলত কলকাতা শহরে এবং কিছু ক্ষেত্রে ঢাকায়। ‘সমগ্র বঙ্গবাসী’র কাছে বিনোদিনী আদরণীয় হয়ে ওঠার সুযোগই পাননি বলে মনে হয়। গিরিশের এই রচনায় নিঃসন্দেহে নিজ ছাত্রীর প্রতি এক প্রগাঢ় ভালোবাসা ও স্নেহ প্রতিফলিত। নয়তো থিয়েটার জগতের বিখ্যাত অভিনেত্রী বিনোদিনীর প্রশংসায় ‘সমগ্র বঙ্গবাসীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা’র পাত্রী হওয়ার কথা বলতেন। অভিনেত্রী প্রসঙ্গে তৎকালীন অনেক লেখায় এই ধরনের অনুরক্তিমূলক রচনার বেশ কিছু নিদর্শন আছে।

প্রশ্ন এই, নারীদের পক্ষ অবলম্বন করে রচনা করতে গিয়ে এত প্রশস্তি করতে হত কেন? এই প্রশ্নের উত্তর হিসেবে মনে হয়, তৎকালীন যুগের তপ্ত যুদ্ধক্ষেত্রে হয়তো সে ‘পক্ষপাতিত্বের’ প্রয়োজন ছিল সমসাময়িক রচনাকারদের। সমাজ যখন অবহেলিতকে আক্রমণে উদ্যত, রক্ষাকর্তা তখন যুগোপযোগী মূল্যবোধ ও মহিমা আরোপ করে আক্রান্তকে রক্ষা করতেই চাইবে, এটাই দস্তুর। নারীদের মঞ্চে আসাটা উনিশ শতকীয় বাংলা সমাজে নারী স্বাধীনতার একটি অঙ্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন বাংলা থিয়েটার মহলের দরদী মানুষেরা। সম্ভবত, নারী স্বাধীনতা, বিশেষত হতদরিদ্র নিম্নজাতের নারীদের, ‘উদ্ধারকর্তা’র ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হল বাংলা নাট্যকর্মীরা। বেশ্যাদের মঞ্চে গ্রহণ করে তারা আসলে সমাজেরই শুদ্ধিকরণের কাজে অংশগ্রহণ করছে, এমনটাই প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন কিছু নাট্যব্যক্তিরা। তাই তাঁদের রচনাতেও খানিক মহিমা-অর্পনের দোষ থাকাটা অসম্ভব ছিল না। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তা নৈতিকতার প্রশ্নে কিছুটা ভ্রান্তিময় হলেও যুগের অত্যুষ্ণ আবহাওয়ায় এই ধরনের রচনা একেবারে নীতিবোধশূন্য হয়তো ছিল না।

কিন্তু পরবর্তী নাট্য ইতিহাস রচনাকারদের ভূমিকা দেখে খানিক অনুসন্ধিৎসা জাগে। বাংলা থিয়েটারের পুরনো যুগ নিয়ে ইতিহাস লেখার কাজে আধুনিক ইতিহাসকাররা কেন সেই সাবেক যুগের ধারাতেই অভিনেত্রীদের জীবনের বিশ্লেষণে প্রবৃত রইলেন, সেটাই আশ্চর্য। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *The Story of the Calcutta Theatres* গ্রন্থে সুশীল কুমার মুখার্জী মেয়েদের থিয়েটারে আসার মুহূর্তটিকে ব্যাখ্যা করছেন এইভাবে:

> It was a very bold step in an essentially conservative society. The initial reaction was anything but favourable. Iswar Chandra Vidyasagar who had so long been quite enthusiastic about the theatre and was also a great friend of Michael, ceased to take any further interest in it... Undaunted, Bengal Theatre continued with actresses and soon this became the practice. (72)

সুশীলের ব্যাখ্যায় থিয়েটারের আঙ্গিনায় মেয়েদের আসাটা কলকাতার রক্ষণশীল সমাজের পক্ষে অত্যন্ত সাহসী একটি পদক্ষেপ। শুরুর প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত প্রতিকূল ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা তুলে সুশীল বলতে চাইলেন, বিদ্যাসাগরের মতো থিয়েটার উৎসাহী মানুষও মেয়েদের থিয়েটারে আসাটাকে ভালো ভাবে নিতে না পেরে নিজেই থিয়েটারের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করেন। কিন্তু শত বিরূপ প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও *বেঙ্গল থিয়েটার* নির্ভীকভাবে মেয়েদের নিয়ে থিয়েটার করতে থাকে এবং সেটাকেই প্রচলিত করে ফেলতে সক্ষম হয়। তাঁর ব্যাখ্যায় মেয়েদের থিয়েটারে আসার প্রতিকূলতার কারণ হিসেবে মূলত রক্ষণশীল সমাজকেই উল্লেখ করা হয়েছে। সমাজের কর্তাব্যক্তিরা রক্ষণশীল বলেই মেয়েদের থিয়েটারে আসাটা অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ, এমনটাই মনে করেছেন সুশীল।

সুশীলের এই ব্যাখ্যা থেকে ভাবনাসূত্র খানিক বিশৃংখল হয়ে পড়ে। মেয়েদের নাট্য শিল্পে অংশগ্রহণ করা নিয়ে এত মহিমা অর্পণের কারণটি ঠিক ধরা যাচ্ছে না। মেয়েরা মঞ্চে উঠবে, অভিনয় করবে, সেই কাজকে 'সাহসিকতা' হিসেবে মনে করার কী কারণ থাকতে পারে, সে বিষয় নিয়ে ধন্দ লেগে যায়। বিশেষত যেখানে লোকশিল্পে মেয়েরা অভিনয় করতো, অনেকসময়েই লোককলায় অংশ নিত মেয়েরা, তখনকার উচ্চবর্গীয়সমাজে তা নিয়েতেমন বিরূপতার কথা জানা যায় না। তাহলে সুশীল মেয়েদের নাটকে অভিনয় করাকে 'সাহসী' আখ্যা দিচ্ছেন কেন? মেয়েদেরকে মঞ্চে আনার ঘটনাকে 'ঐতিহাসিক' ঘটনা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করানোর মূল সূত্রগুলো কী?

আসলে, সুশীলের মতো আধুনিক ইতিহাস লেখকরাও নাট্য ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে এই ধরনের কিছু ধন্দের অবকাশ রেখে গেছেন বলে মনে হয়। এমনকি যে মহিলারা প্রথম মঞ্চে আসছেন, অধিকাংশ রচনায় তাঁদের শুধু 'অভিনেত্রী' হিসেবেই পরিচয় দেওয়া হয়েছে। সুশীল মুখার্জীর গ্রন্থ শেষে অভিনেত্রীদের পরিচয় পর্বেও তাঁদের বারাঙ্গনা জীবনের সমস্ত তথ্য সম্পর্কে নীরব থেকেছেন। তাহলে কি তাঁদের বেশ্যা জীবনের কোনো কথার উল্লেখ করতে চাননি গবেষক? এই সূত্রে উল্লেখ্য অনেক পুরুষ অভিনেতাদেরও হয়তো ব্যক্তিগত পরিচয় গ্রন্থে জানানো

হয়নি। কেবল থিয়েটারের সঙ্গে তিনি কিভাবে যুক্ত ছিলেন সংক্ষেপে সে কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু বিনোদিনী বা গোলাপসুন্দরীর ব্যক্তিগত জীবনের পরিচয়টি উল্লেখ করা যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল, সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই। তৎকালীন পুরুষ নাট্যকর্মী অথবা পরবর্তীকালের মহিলা নাট্যশিল্পীদের মতো করে সমান মানদণ্ডে যদি এই শ্রেণি ও সম্প্রদায়েরর মেয়েদের নাট্যকর্মগুলিকে বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে অনেক স্বর চাপা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

আধুনিক লেখকদের তো পুরনোদিনের অভিনেত্রীদের সামাজিক আক্রমণ থেকে রক্ষা করার কোনো দায় না থাকারই কথা। কলকাতা বা ঢাকার শহরকেন্দ্রিক বাংলা থিয়েটারে নারীরা এখন অনেকটাই সুপ্রতিষ্ঠিত বলা যায়। এমনকি, আধুনিক বাংলা থিয়েটারে মফস্বল বা শহরের নাট্যদলগুলিতে অসংখ্য নারী অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত। নাট্যদল ও নাট্য প্রযোজনার সংখ্যার নিরিখে যদিও আজও বাংলা থিয়েটারে নারী অপ্রতুল। কিন্তু নিঃসন্দেহে নারীর আজকের যুগের সংখ্যা বা সংগ্রামটা আগের যুগের তুলনায় অনেকটাই আশাজনকভাবে পরিবর্তিত। এই সময়ে দাঁড়িয়ে যখন অতীত ইতিহাসের কথা লিখতে হয়, তখন অতীতকালের অভিনেত্রীদের জীবন বর্ণনায় ইতিহাসবিদ্‌রা সাবধানী দয়াশীল কৃপাভরা অবস্থান নেন কেন? অভিনেত্রীদের সম্পর্কে পাঠকমনে করুণার সঞ্চার করতে চান কেন? নির্মোহ দৃষ্টিতে ইতিহাসের ব্যাখ্যা করে নারীকে 'করুণা'র মায়াজাল থেকে মুক্ত করার দায় কেন নিলেন না, সে ধন্দ থেকেই যায়।

বর্তমান অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করে দেখা হবে, অভিনেত্রী সম্বন্ধীয় যে ইতিহাস রচনার ধরনটি প্রচলিত রয়ে গেছে, তার মধ্যে কতটা প্রচলিত ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। নারীর রঙ্গমঞ্চে আসার পক্ষে ও বিপক্ষে যে ইতিহাস আজকের যুগে প্রধান হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, তার মধ্যে কী কী ফাঁক থাকার পরিসর রয়ে গেছে।

বাঙালির থিয়েটারের উৎপত্তির সময়

সমস্যাগুলোর উত্তর খুঁজতে বাংলা প্রসেনিয়াম থিয়েটারের উৎপত্তির দিকে খানিক নজর করা দরকার বলে মনে হয়। কী কারণে হঠাৎ 'থিয়েটার' করার বাসনা জাগল উচ্চবিত্ত বাঙালি মনে? কেন তাঁরা সাবেককালের লোক ঐতিহ্যের চর্চা ভুলে নতুন এক কৃষ্টির আকর্ষণে ছুটে যেতে চাইলেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তখনকার সময়ের

কলকাতা শহরের প্রচলিত সংস্কৃতির দিকে চোখ রাখা দরকার। এই সূত্রে সুমন্ত ব্যানার্জীর একটি ব্যাখ্যা উল্লেখ্যঃ সুমন্ত ব্যানার্জী বলছেন,

> With the decline of the village economy and the beginnings of industry in nineteenth century Bengal, there was a regular exodus of poorer men and women from the countryside to Calcutta.... These Bengali villagers brought with them into Calcutta the songs they inherited from rural folk culture with their own poetic rules, their own musical scales and rhythms. ('Marginalisation of Women's' 130)

অর্থাৎ উনিশ শতকের গ্রামীণ অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে যাওয়ায় এবং বাংলায় শিল্পের সূত্রপাত হওয়ায় গ্রামীণ নারী-পুরুষেরা প্রায়শই কলকাতায় চলে আসতে শুরু করে। এই গ্রামীণ মানুষের গোষ্ঠী নিজেদের গ্রামীণ সংস্কৃতি, গান, কাব্যধারা, সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য ও ছন্দ ইত্যাদিকে বহন করতে আনতে শুরু করে কলকাতার বুকে। তাঁর মতে, উনিশ শতকের কলকাতার সংস্কৃতি ও অর্থনীতি আলোচনায় গবেষক সুমন্ত ব্যানার্জী কলকাতার জনগোষ্ঠীর দুইটি স্পষ্ট বিভাগ দেখানোর চেষ্টা করছেন। বাঙালি উচ্চবিত্ত, মূলত ইংরেজদের শাসনব্যবস্থার সহায়ক গোষ্ঠী (বেনিয়া, দেওয়ান ইত্যাদি)। উচ্চবর্গের এই গোষ্ঠীর ইংরেজ সংসর্গের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে তোলার চেষ্টা করছিল নিজেদের সাহিত্য, সঙ্গীত, দৃশ্যকাব্য ইত্যাদি। এর পাশাপাশি সুমন্ত ব্যানার্জীর পর্যবেক্ষণটি অনুসরণ করে বলা যায়, কলকাতায় আরেকটি গোষ্ঠী উপস্থিত ছিল, সেটি হল, বাঙালি নিম্নবর্গের মানুষেরা। এই গোষ্ঠীর অগণিত মানুষ পেটের তাগিদে শহর কলকাতা চলে আসতে থাকেন। সঙ্গে বাহিত করে নিয়ে আসেন তাঁদের গ্রামের নানান লোকসংস্কৃতি। গান, পাঁচালি, কথকতা, যাত্রা, কীর্তন।

উচ্চবিত্ত বাঙালিও ব্রিটিশ আগমনের পূর্বে নিম্নবর্গের মানুষের দ্বারা অভিনীত যাত্রা, কথকতা, কবির লড়াই, কৃষ্ণমাহাত্ম্যসূচক পালাতেই মেতে ছিলেন দীর্ঘকাল। কলকাতা ও তার আশেপাশের ধনী বাঙালির বাড়িতে নিয়মিত যাত্রানুষ্ঠানের হদিশও পাওয়া যায়। শ্যামসুন্দর সরকারের বাড়িতে ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে *কামরূপ যাত্রা*, ভূকৈলাসের মুখুজ্জে বাড়িতে ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে *রাজাবিক্রমাদিত্য যাত্রা*, শ্রীকৃষ্ণ সিংহের তত্ত্বাবধানে ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে *নন্দবিদায় যাত্রা* অভিনয় হওয়ার খবর পাওয়া যায় (D. Chowdhury, *Bangla Theatreer Itihas 26*)।

সর্বত্রই মহিলা শিল্পীদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই লোকশিল্পগুলির মধ্যে বিশেষভাবে মেয়েদের জন্য নির্ধারিত বেশ কিছু শিল্প ছিল। ব্রতকথা, ধাঁধা-ছড়া, ধর্মীয় নানান আচার, সাংস্কৃতিক বহু গ্রামীণ অনুষ্ঠানের ধারা বা প্রবাদ-প্রবচন—এগুলিতে মূলত মহিলা শিল্পীদেরই আধিপত্য ছিল। যেমন উনিশ শতকের ঢপ-কীর্তনে মেয়েদের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। খেউড়েও নারীপুরুষের ছড়া কাটাকাটির বেশ জনপ্রিয়তা ছিল। বিশেষ করে, নেড়ি কবির দল বা বৈষ্ণবীর দলের এতই চাহিদা ছিল যে অনেক সময় কলকাতা থেকে এই নেড়ি কবিদের আমন্ত্রিত মঞ্চ উপস্থাপনা করতে যেতে হত গ্রামের দর্শকের কাছে। এই বিষয়ে *সমাচার দর্পণ*-এ ১১ই মার্চ ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে একটি সংবাদে লেখা হয়েছে— ‘কলকাতা থেকে গোলকমণি, দয়ামণি ও রত্নমণি এই তিন দল নেড়ি কবি কৈকালা গ্রাম নিবাসী কৃষ্ণকান্ত দত্তের বাড়ি কবি গান করতে আমন্ত্রিত’। এই ‘নিম্নবর্ণ’ ও ‘নিম্নশ্রেণী’র মহিলা ও পুরুষ শিল্পীরা শহরে এসে উপস্থিত হওয়ায় তাঁদের সংস্কৃতি ও শিল্প ধারাগুলিতে শহরের নানা উপকরণ মিশে গেল। গ্রামীণ সংস্কৃতির সঙ্গে মিলে মিশে গেল শহরের আমেজ, শহুরে ঘটনাবলীও।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গ্রামের সংস্কৃতিতে সাধারণত শিল্পের লেখকের বা সৃষ্টিকর্তার নাম উল্লেখ থাকত না। উনিশ শতকীয় নাগরিক সমাজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উদ্ভবের ফলে এই সমস্ত শিল্পকর্মে শিল্পী নিজের নাম জুড়ে দিতে থাকল। নাগরিক লোকসংস্কৃতির মহিলা শিল্পীরাও তাঁদের গান কথকতা বা রচনায় নিজেদের নাম জুড়ে দিয়ে সৃষ্ট শিল্পকর্মে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অংশ নিল। লোকসংস্কৃতির ইতিহাসে পুরুষের পাশাপাশি বহু মহিলা শিল্পীর নাম পাওয়া যাচ্ছে। ভোলা ময়রা বা নীলু ঠাকুরের সমসাময়িক স্ত্রী-কবিয়াল হিসেবে যজ্ঞেশ্বরীর যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ছিল। ঢপ-কীর্তনে বিখ্যাত ছিলেন সহচরী, জগন্মোহিনী, বামা, শ্যামা, রমা, গুরুদাসী, ঠাকুরদাসী এরকম আরও কত শিল্পী। নিম্নবর্গের এই মহিলা শিল্পীরা সম্ভ্রান্ত বংশীয় মহিলাদের তুলনায় অনেক স্বাধীন ছিলেন। তাঁরা প্রকাশ্যে বেরোতে পারতেন। ফলে উচ্চবর্গীয় মেয়েদের তুলনায় তাঁরা সমাজের নানা ঘটনা সম্পর্কে অনেক বেশি ওয়াকিবহাল ছিলেন। সহজ সরল সকলের বোধগম্য কথ্য ভাষায় সোজা সাপ্টা বাংলায় অভিনয় করে তাঁরা বাইরের সমাজের নানা ঘটনা ও সংস্কৃতিকে পৌঁছে দিতেন সম্ভ্রান্ত অন্দরমহলে। এমনকি সম্ভ্রান্ত মেয়েদের শিক্ষাদান করে জীবিকা অর্জন করার কথাও অনেক স্থানে জানা যায়। দ্বারকানাথের পিতার সময় থেকেই মেয়েদের শিক্ষাদান করতে আসতেন বৈষ্ণবীরা। নিয়ম করে পরিবারের সব মেয়েকে এই বৈষ্ণবীদের কাছে পড়তে বসতে হত। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের আমলেও ঠাকুরবাড়িতে নিয়মিত একজন বৈষ্ণব ঠাকুরানি আসতেন। তাঁর ব্যাপারে ‘প্রদীপ’ মাসিক পত্রিকা, ভাদ্র ১৩০৬ সংখ্যায় স্বর্ণকুমারী

দেবী রচিত 'আমাদের গৃহে অন্তঃপুরশিক্ষা ও তাহার সংস্কার' প্রবন্ধে পাওয়া যাচ্ছে, '...স্নানবিশুদ্ধা, শুভ্রবসনা, গৌরী বৈষ্ণবী ঠাকুরাণী বিদ্যালোক বিতরণার্থে অন্তঃপুরে আবির্ভূতা হইতেন । ইনি নিতান্ত সামান্য বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্না ছিলেন না। সংস্কৃত বিদ্যায় ইঁহার যথেষ্ট বুৎপত্তি ছিল, অতএব বাঙ্গালা ভাল জানিতেন ইহা বলা বাহুল্য। উপরন্তু ইঁহার চমৎকার বর্ণনা শক্তি ছিল, কথকতা ক্ষমতায় ইনি সকলকে মোহিত করতেন। যাঁহাদের বিদ্যালাভের ইচ্ছা নাও বা থাকিত, তাঁহারাও বৈষ্ণবী ঠাকুরাণীর দেব দেবী বর্ণনা, প্রভাত বর্ণনা শুনিতে কুতূহলী হইয়া পাঠগৃহে সমাগত হইতেন'। লেখাপড়ার উৎসাহ না থাকলেও এই গল্পের লোভে মেয়েরা পড়ার ঘরে জমায়েত করত।

এ কথা আগেই বলা হয়েছে, নিম্নবর্গের স্বনির্ভর মেয়েরা উচ্চবর্গীয় ভদ্রমহিলাদের তুলনায় অনেক বেশি স্বাধীনতা উপভোগ করতেন বলে অনুমান করা হয়। বাইরে জগতের কাজের বাজারে ছেলেদের সঙ্গে মেয়েরাও অসংখ্য পেশাতে নিজেদের যুক্ত রাখার সুযোগ করতে পারত। উনিশ শতকের ভিক্টোরিয়ান নৈতিকতার চাপ পড়তে শুরু করছিল ইংল্যাণ্ডে। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় সেই চাপেরই প্রভাব এসে পড়ছিল তার ঔপনিবেশিক শহরগুলোতে। এই বিষয়ে এই অধ্যায়ের পরবর্তী স্থানে 'নিম্নবর্গের বিরুদ্ধে দ্বৈত নিধান' অংশে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। আর তারই প্রভাবে ঐতিহ্যগত ভাবে যাদের সাধারণ নিম্নবিত্ত নারী বলে মনে করা হত, তারা সকলেই একটিইমাত্র নির্দিষ্ট ক্যাটেগরিতে চিহ্নিত হতে লাগল। অতএব আধুনিক শাসনচিন্তার একটা রূপ এই উনিশ শতক থেকেই প্রথম দেখা যেতে শুরু করেছে। আর এই ভিক্টোরিয়ান নৈতিক অবস্থানের প্রভাবেই 'পরিবার' ধারণার বাইরে যে মহিলারা সমাজে বিচরণ করছিলেন, তাঁদের সবাইকেই একটি একমাত্রিক ক্যাটেগরিতে ফেলে দেওয়া হল। এই ক্যাটেগরির মেয়েরা অনেক সময়েই 'পরিবার'-এর শাসনতন্ত্রে বন্দী নন, আর তাই তাঁরা 'পরিবার' ধারণাটার বিরুদ্ধে একটা চরম প্রতিবাদ হয়ে ওঠার ক্ষমতা রাখেন, আর তাই তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, সম্ভবত এমনটাই মনে করা শুরু হয়েছিল এই নারীগোষ্ঠী সম্পর্কে। 'পরিবার'-এর এই শাসনতন্ত্র সম্পর্কে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের একটি গুরুত্বপূর্ণ দুশ্চিন্তার কথা জানাচ্ছেন শমিতা সেন তাঁর *Women and Labour in Late Colonial India* গ্রন্থে। তাঁর ভাষায়,

> There was a growing concern with the fate of the working-class 'family'. A proliferating public discourse focused on disease, crime and prostitution in working-class. In official and Bengali middle-class literature, the poor came to be characterized

> as sexually promiscuous. Such characterisations drew on the contrast between the brahminical (sic.) norm of sacramental marriage and openly prevalent low-caste practices of divorce, second or temporary marriages and widow remarriages. (Samita Sen 19)

'নিম্ন' বর্গের মহিলাদের এই 'স্বাধীন' চলাফেরা কোথাও যেন একটি ভয়ংকর অপরাধচক্রের মুখোমুখি এনে দাঁড় করায় উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পুরুষকে। শমিতা সেন বলছেন, 'Any public activity—public performance, freedom of movement and participation in labour outside the home—pushed women from their accepted role of mother, daughter, sister and wife to that of the prostitute who was an outcaste. The space outside the home was the space of the beshya' (qtd. in T. Banerjee, *Performing Silence* 166)। ঘরের বাইরের যে কোনো রকমের স্থান মেয়েদের জন্য হয়ে উঠলো 'নিম্নশ্রেণি'র বেশ্যার স্থান।

এই সূত্রে উল্লেখ্য, 'Marginal Women: Independent Earners in Colonial East Bengal'. প্রবন্ধটিতে ফইরুজ জাহান উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গের মহিলাদের 'জীবিকা' ও 'স্বাধীনতা' নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর বিশ্লেষণ, উনিশ শতক থেকে নারী স্বাধীনতার কথায় নারীদের আর্থ-সামাজিক ভূমিকা পালন করার বিষয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এই আলোচনাতে সব শ্রেণী ও গোষ্ঠীর মেয়েদের কথা মনে রাখা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন। উনিশ শতকের 'নিম্নশ্রেণি' ও 'নিম্নজাতি'র মহিলাদের জীবিকার বিস্তারিত খতিয়ান তুলে ধরছেন তিনি। পাশাপাশি তিনি সুমন্ত ব্যানার্জির পথ ধরে এ কথাও বলেন যে, নানা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় রীতিনীতির বৈশিষ্ট্যের কারণে 'উচ্চ' সমাজের মহিলাদের তুলনায় 'নিম্ন' সমাজের মহিলারা খানিকটা হলেও বেশি 'স্বাধীনতা' উপভোগ করতে পারতেন বলে মনে হয়। তাঁর পর্যবেক্ষণে, '... a very crucial difference between the two classes of women was the level of male domination. Among the elite class the so-called social reforms were also enforced by the men on the women and the men used to decide the degree of reforms for their women. But the marginal working women were mostly the ones who were no longer associated to their husbands ...' (Jahan 162)। যদিও এ

কথা উল্লেখ্য, পরিবারতন্ত্রের বাইরে অবস্থান করা নারীদের সম্পর্কে এই ধরনের ধারণাগুলো ব্রিটিশ-পূর্ববর্তী যুগ থেকেই সমাজে অবশ্যই বর্তমান ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনকালে এই ধারণাগুলি একটি রাষ্ট্রীয় আকার ধারণ করল; বিশেষত আইন ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ক্ষেত্রে। ফলে উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক সরকারের একটা অন্যতম কাজ হয়ে দাঁড়ালো এই জনগোষ্ঠীর মেয়েদের সমাজ বহির্ভূত করা, তাঁদের ঘৃণ্য হিসেবে প্রান্তিক করে তোলা।

উনিশ শতকীয় সমাজে এই নিম্নবর্গীয় নারীগোষ্ঠীর থেকে দূরে দাঁড়িয়ে উচ্চবিত্ত ভদ্রলোকের যোগ্য সহধর্মিনী গড়ে তোলারও প্রয়োজন হয়ে পড়ল। এই নব্য 'ভদ্রমহিলা' পশ্চিমী নারী নন, হিন্দু ঘরের এই মেয়েরা সংসার-ধর্ম-দায়িত্বগুলো পালন করেন। আবার, এই মেয়েরা নিচুজাতের মেয়েদের মতো ঘরের বাইরে কোনো স্বনির্ভর রোজগেরে পেশাতেও যুক্ত হন না। কোনো কলকারখানায় শ্রমিক হিসেবে বা গয়না তৈরির কাজে বা দৈনিক মজুর হিসেবে বা ধাইয়ের কাজে বা কোনো লোকশিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁরা ঘাম ঝরান না। কারণ বাইরের জগতে কাজে বেরোনো মানেই বহির্জগতের পুরুষের সামনে উন্মুক্ত হওয়া। আর তার মানেই তাঁরা সংসারের পবিত্রতা রক্ষা করতে অপারগ হয়ে পড়বেন। এই সূত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে করাচ্ছেন শমিতা সেন। তাঁর কথায়, '... women's chastity and sexual purity had become an obsessional preoccupation with the middle classes. From this ideological vantage, working-class men and women's readiness to dispense openly with cherished ideals as sacramental marriage and monoandry apeeared shocking...' (qtd. in T. Banerjee, *Performing Silence* 165) মহিলাদের সতীত্ব ও পবিত্রতা মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙালিদের কাছে এক আবশ্যিক শর্ত হয়ে দাঁড়ালো। ফলে 'নিম্নবর্গীয়' মহিলাদের বিপরীতে দাঁড়িয়ে 'ভদ্রমহিলা' হলেন আলোকপ্রাপ্ত, এনলাইটেন্ড কিন্তু আবশ্যিকভাবে 'পবিত্র' ও 'সতী'। কিন্তু তিনি শুধুমাত্র নিজের স্বামীর সঙ্গেই সাহিত্য-রাজনীতি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতে পারেন এবং স্বামীর 'যোগ্য' সহকারী হয়ে উঠতে চান। 'বাহির'-কে দেখেন স্বামীর চোখ দিয়ে, 'স্বাধীনতা'র আস্বাদ নেন স্বামীর তৈরি করে দেওয়া গণ্ডীর মধ্যেই বিচরণ করে। এই বিষয়ে 'নিজ গৃহের নারী নয়' অংশে কৃষ্ণভামিনী দাসের রচনা বিশ্লেষণ করে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

মধ্যবিত্ত পুরুষের কাজের জগতে যে সমস্যা আসছে বা ইউরোপীয় ধরনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য যে তাকে অনবরত টানাপোড়েনের মুখোমুখি হতে হচ্ছে, তার বিরুদ্ধ একটা নিজস্ব সাবেকি রক্ষণশীলতাকে গড়ে তোলার স্থান হয়ে দাঁড়াচ্ছে তাঁর 'ঘর'। এই সূত্রে পার্থ চট্টোপাধ্যায় লিখছেন, 'Adjustments would have to be

made in the external world of material activity, and men would bear the brunt of this task ... the organization and ways of life at home ... was to retain the inner spirituality of indigenous social life. The home was the principal site for expressing the spiritual quality of the national culture, and women must take the main responsibility for protecting and nurturing this quality' (P. Chatterjee *Nation and its Fragments* 126)। ঘরের মেয়েদেরকে সে 'উন্নত' করতে চায়, কিন্তু ইউরোপীয় শর্তে নয়, দেশীয় সাবেকি শর্তে। হিন্দু বিবাহের ধারণাটাকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করে যে সংঘর্ষ হচ্ছে, তারই ফলাফল হিসেবে গড়ে উঠছে, ভদ্রমহিলা।

এই পথ ধরেই বাঙালি শহুরে মধ্যবিত্তদের মধ্যে মেয়েদের স্বাধীনতার প্রশ্নে প্রচণ্ড বিতর্ক শুরু হয়েছিল। কতটা পর্যন্ত স্বাধীনতা নারীকে দেওয়া যায় বা কতটা পর্যন্ত শিক্ষা দিলে নারীদের অবস্থান একটি সমাজ গঠনে সাহায্যও করে, আবার রক্ষণশীল সমাজের পরিবার কাঠামোকেও অটুট রাখতে পারে, সেই নিয়ে প্রভূত কথোপকথন শুরু হয় এই সময়ে। যদিও এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে বিভিন্ন মতামতের মধ্যে একটা বিষয়ে তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই এক মত হয়েছিলেন। নারীর পড়াশোনা, সাজগোজ, ঘরের কাজের দায়িত্ব, সাহিত্যপাঠ, চারুকলার প্রশিক্ষণ ইত্যাদির আলোচনার মাঝে একটা ব্যাপারে তাঁরা সকলেই একমত হয়েছিলেন যে, কোনোভাবেই চিরাচরিত লোকসাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনগুলিতে থেকে উচ্চবিত্ত ও উচ্চবর্ণের মেয়েরা যেভাবে সামাজিক বা সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ পেত, সেগুলোকে চলতে দেওয়া যাবে না। শিক্ষাগ্রহণের সেই পদ্ধতিটিকে একেবারে নির্মূল করে ফেলতে হবে। সুমন্ত ব্যানার্জীর ভাষায়, '...they all agreed on the need to eradicate what they were trained to believe was the pernicious influence of certain prevailing literary and cultural forms on Bengali women, particularly on the women belonging to their own homes'. ('Marginalisation of Women's' 128)। বিশেষ করে যে সাংস্কৃতিক পরিবেশনাগুলি উচ্চবিত্তের অন্দরমহলের ভেতরে ঢুকে পরতে পারত, সেগুলি বিশেষ করে শহুরে ইংরেজি শিক্ষিত পুরুষ সমাজের কাছে তীব্র আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ালো। এই পরিবেশনাগুলো অনেকগুলিই ছিল একেবারে গ্রামীণ সংস্কৃতিজাত, আবার কিছু কিছু ফর্ম ছিল নব্য শহুরে কলকাতার ঔপনিবেশিক ফসল। এই ফর্মগুলির মধ্যে ছিল ছড়া, গান এবং নাট্য পরিবেশনা। ইংরেজ মিশনারি এবং পণ্ডিতদের দ্বারা প্রবর্তিত শিক্ষা-কাঠামোর বাইরে অবস্থান করা নিম্নবর্গের মহিলারাই মূলত এই শিল্পকর্মগুলির সঙ্গে যুক্ত

থাকতেন। উনবিংশ শতকের বাংলায় এবং বিশেষ করে কলকাতায়, এইসব জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক পরিবেশনাগুলির দর্শক ছিল উল্লেখযোগ্যভাবে বিভিন্ন স্তরের মহিলারা। নিম্নবর্ণের এবং নিম্ন শ্রেণীর স্বনির্ভর মহিলাদের থেকে শুরু করে ভদ্রলোকের অন্দরমহলের স্ত্রী এবং কন্যারাও এই ফর্মগুলির উপভোক্তা ছিলেন।

এই সূত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন মূলত কোন কোন লোকশিল্পে নিম্নবর্গীয় পেশাদারি মেয়েদের কতটা অংশগ্রহণ ছিল। মহিলাদের দ্বারা পরিবেশিত লোককলাগুলির মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল- ছড়াগান, কবিতা, প্রবাদ, গান, নাটকীয় রচনা - এবং তাঁদের বিভিন্ন উপধারা বা কীর্তন, পাঁচালী, কবি গান, তরজ, ঝুমুর গান, বিভিন্ন নৃত্য, যাত্রা অনুষ্ঠান, কথকতা, আবৃত্তি, বিয়েতে বাসর গান এবং কিছু মহিলাদের আচার -অনুষ্ঠানের গান ইত্যাদি। যদিও এই ধরনের রচনার বেশিভাগেরই লেখকের নাম জানা যায় না, মৌখিক ঐতিহ্য বা ওরাল ট্রাডিশনের মধ্যে দিয়ে এগুলো বাহিত হয়ে এসেছে। তা সত্ত্বেও কিছু কিছু টেক্সট থেকে কয়েকজন নারী সুরকারের জীবন কাহিনী এবং তাঁদের নামগুলি সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এমনকি পুরুষ লোকশিল্পী ও রচনাকারদের লেখা থেকেও তাঁদের মহিলা সহকর্মীদের সম্পর্কে আন্দাজ করা সম্ভব হয়েছে। এর থেকেই ধরা যায়, রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমের গানগুলিতে বিশেষ করে নারী গায়করা অত্যন্ত সংযুক্ত ছিলেন। এই মেয়েরা উনিশ শতকের বাংলার গ্রাম এবং কলকাতার বাজার এবং রাস্তায় ভিড় করে গান-নাচ-অভিনয় করতেন। এই মহিলা গায়কেরা ছিলেন বৈষ্ণব, এঁরা বোষ্টমী বা নেড়ি নামে পরিচিত ছিলেন।

সমাচার দর্পণ-এ ১১ই মার্চ ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দের সংবাদ থেকে জানা যায় যে, বাংলার কৈকাল গ্রামে, সরস্বতী পূজা উপলক্ষে কলকাতা থেকে একজন কৃষ্ণকান্ত দত্তের বাড়িতে তিনজন নেড়িকবিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এই নেড়িকবিরা তাঁদের নিজস্ব গানের দল নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন এবং রাধা এবং কৃষ্ণ, শিব ও পার্বতী এবং কালীর উপর গান গাইতেন। এই নেড়িকবিরা বাংলার সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হয়ে উঠেছিল। দুই বছর পরে *সমাচার দর্পন*-এ পুরুষ কবিয়ালদের লেখা একটি চিঠি থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়। তারা সেই চিঠিতে অভিযোগ করেছিল যে কীভাবে কিছু বছর আগে 'নেড়ি বৈষ্ণবীরা' তাঁদের প্রায় সব উৎসবের সময় গান এবং নাচের মাধ্যমে তাঁদের পেশা থেকে বিতাড়িত করে ফেলেছিল। কিন্তু রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপে তারা আবার নেড়িদের উৎখাত করে নিজেদের কবিয়ালের পেশাটিকে বাঁচিয়ে তুলতে পেরেছে। সুমন্ত ব্যানার্জীর বর্ণনায়, 'they complained how some years ago 'Neri [lit. shaven-headed] Vaishnavees' had ousted them from their occupations by singing and dancing during almost every festival at the houses of the rich. 'But by devising

some means with the help of the Sudder [which could either mean the district administrative head-quarters, or the outer apartment of the male head of a Bengali house-hold], we have succeeded in getting rid of the Neries' ('Marginalisation of Women's' 135)।

আরও একটি উদাহরণ এই সূত্রে উল্লেখ্য। উনিশ শতকের শুরুর দিকে কলকাতায় ভোলা ময়রা, নীলু ঠাকুর এবং অন্যান্য বিখ্যাত পুরুষ কবিদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন যজ্ঞেশ্বরী নামে পরিচিত একজন মহিলা কবি। এই নারী কবি অনেক সময়েই তাঁর পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীদের কবিগানের প্রতিযোগিতায় হারিয়ে ছিলেন। অথচ এই যজ্ঞেশ্বরীও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষ কবিদের কাছ থেকে অপমান এড়াতে পারেননি। যজ্ঞেশ্বরীর গানের উত্তরের বিখ্যাত ভোলা ময়রা; বাবুদের উপস্থিতিতে তাঁকে অসম্মানিত করার জন্য তাকে 'নির্লজ্জ' মহিলা হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন।

এ কথাও জানা যায় যে, মহিলা গায়কেরা তা%দের নিজস্ব গানের দল তৈরি করেছিলেন তরজা এবং ঝুমুর গান করার জন্য, সেই দল নিয়ে তারা দেশ ভ্রমণ করতেন। আমরা ভবানী (ভবরানী নামেও পরিচিত) নামটি জানতে পারি, যিনি ১৮৫০-এর দশকের শেষের দিকে এমন একটি দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন (S. Banerjee *Itar Santan* 137)।

বৈষ্ণব ঠাকুরাণিরা আগে উচ্চবিত্ত মহলের মেয়েদের গৃহশিক্ষিকার কাজ করতেন। ভদ্রমহিলা গড়ে তোলার উদ্যোগ থেকে এই বৈষ্ণবীরা একে একে কাজ হারাতে লাগলেন। অন্দরমহল থেকে বিতাড়িত হয়ে, বৈষ্ণব গায়িকারা কলকাতার রাস্তায়, এবং মাঝে মাঝে কিছু ধনী বাঙালি বাড়ির আঙ্গিনায় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য আমন্ত্রিত হতেন প্রায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত। তাঁরা ঢাপ নামের একটি বিশেষ ধরনের লঘু ছন্দের কীর্তনে পারদর্শী ছিলেন। সহচরী নামের এক মহিলা ঢাপশিল্পীর নাম পাওয়া যায়, যিনি ১৮৪০-এর দশকে একজন জনপ্রিয় কীর্তন গায়িকা ছিলেন। সহচরীর পরের এক বিখ্যাত ঢাপশিল্পী ছিলেন জগন্মোহিনী। এই জগন্মোহিনী লোকশিল্পের জগতে এক স্বতন্ত্র স্বাক্ষর রাখতে পেরেছিলেন বলে জানা যায়।

লোককলায় বা ঘরের বাইরের যেকোনো কাজে নিম্নবর্গের মেয়েদের অংশগ্রহণ করাকে মধ্যবিত্ত পুরুষ সমাজ সন্দেহের চোখে দেখার ফলে চাপ এসে পড়ে যাত্রাশিল্পের নারী অভিনেত্রীদের ওপরেও। প্রায় পুরো উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে বিশেষভাবে আক্রমণ সংগঠিত করে যাত্রা থেকেও নারীদের বাদ দেওয়া শুরু হয়েছিল। মহেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের ভাই) ১৮৭৩-৭৪ সালে কলকাতায় তাঁর শৈশব সম্পর্কে স্মৃতিচারণে মহিলা যাত্রা গোষ্ঠীর বর্ণনা

দিয়েছেন: 'তখনকার দিনে মেয়েদের কার্য উপলক্ষ্যে মেয়ে-পাঁচালীর প্রথা ছিল অর্থাৎ মেয়ে-যাত্রার দল। তাঁরা নিজেরাই সাজিত আর ভাঁড়ের পালা করিত... কিন্তু মেয়ে-পাঁচালী বেশিদিন চলিল না। শিক্ষিত লোকেরা নিন্দা করিতে লাগিল ও উঠিয়া গেল' (M. Dutta 33)।

এই জনপ্রিয় 'অনুষ্ঠানগুলি' অনেকসময়েই প্রকাশ্যে অভিনীত হত; রাস্তায়, বাজারে, মেলায় এবং ধর্মীয় উৎসবগুলিতে। ভদ্রলোক সম্প্রদায় এই প্রকাশ্য প্রদর্শনের বিরুদ্ধে তাদের জোরদার প্রচার শুরু করেছিল। এই অভিযানের অন্যতম শিকার হয়েছিল ঝুমুরওয়ালিরা। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে ভবানীর ঝুমুর দল নানা জায়গায় ভ্রমণ করে তাঁদের পরিবেশনা করতেন, এ কথা আগে বলা হয়েছে। মহেন্দ্রনাথ দত্তও ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ সময় সম্পর্কে লিখছেন, '...কলিকাতায় তখনকার দিনে ঝুমুরওয়ালী ছিল। তাহারা ছোটলোক, কেলে কেলে মাগী, কাছ দিয়ে চলে গেলে একটা দুর্গন্ধ ছাড়িত, তাহারা পায়ে ঝুমুর দিয়া গাহিত' (M. Dutta 33)। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ঝুমুর দলগুলি কার্যত অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা শহরে সব মিলিয়ে ২০টাও তর্জা ও ঝুমুর দল টিঁকে থাকতে পেরেছিল কিনা সন্দেহ (S. Banerjee *Itar Santan* 139)।

এইভাবেই উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের মাধ্যমে কলকাতায় এক নব্য নাগরিক সংস্কৃতি তৈরি হয়ে উঠছিল। এই নাগরিক সংস্কৃতি গ্রামীণ সংস্কৃতির থেকে আলাদা বা শহুরে উচ্চবিত্ত ধ্রুপদী শিল্প ঐতিহ্যের থেকেও তা ছিল স্বতন্ত্র। কিন্তু প্রশ্ন এই, কী কারণে উচ্চবিত্ত বাঙালি ইংরেজি ধারার থিয়েটারে আগ্রহী হয়ে উঠল? কোন্ প্রেরণা থেকে তারা উৎসগতভাবে বিদেশীয় একটি সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরতে চাইল? প্রসেনিয়াম থিয়েটারের একেবারে গোড়ার দিকে প্রসন্ন ঠাকুরের থিয়েটার বা নবীন বসুর নাট্যশালার নাটক যে সাধারণ মানুষের চাহিদার সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছিল বা চেয়েছিল, এমন কোনও উদাহরণ তো পাওয়া যায় না। তাই বলে এই প্রয়াসের গুরুত্ব কিছু কমে না ঠিকই; কিন্তু সেই যুগে কেন তারা বিদেশি ঘরানার থিয়েটার করতে চাইলেন, তাদের এই প্রয়াসের পেছনে কোন্ সমসাময়িকতার ঝোঁক ছিল, সেটা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। কারণ তার সূত্র ধরেই নারীর থিয়েটারে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লড়াইয়ের যোগ পাওয়া যেতে পারে বলে মনে হয়।

'অ-সাধারণ' উচ্চবিত্ত

উনিশ শতকের কলকাতার উচ্চবিত্ত হিন্দু ইংরেজি শিক্ষিত ইউরোপীয় ভাবধারায় পুষ্ট বাঙালি সম্প্রদায়ের মানুষেরা ইংরেজি রসবোধ ও রুচিশীলতার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তৎকাল পর্যন্ত প্রচলিত সমস্ত

লোকসংস্কৃতিকে ‘মন্দ’, ‘নিম্নরুচি’ ও ‘অশ্লীল’ হিসেবে চিহ্নিত করা শুরু করল। উচ্চবিত্ত হিন্দু বাঙালি সমাজ তাদের ইংরেজ প্রভুদের প্রতি আকর্ষণ বশে ইংরেজদের ঠাঁটবাঁট আয়ত্ত করার পন্থা হিসেবে বেছে নিয়েছিল নাট্যচর্চাকে। শাসকের ভাষা, সংস্কৃতি, আদবকায়দা রপ্ত করার উদ্দেশ্যেই তাদের এই উৎসাহ। দর্শন চৌধুরী বলছেন, ‘ইংরেজি নাটক পড়ে, থিয়েটারে অভিনয় দেখে বাঙালিরা যেমন নতুন থিয়েটারের প্রতি উৎসাহ বোধ করল। তেমনি তৎকাল প্রচলিত যাত্রার বিকৃতরূপ দেখে বিরক্তবোধও করেছিল’ (D. Chowdhury *Bangla Theatreer Itihas* 53)। এইখানেই সম্ভবত লুকিয়ে আছে বর্তমান প্রশ্নের উত্তর। ‘যাত্রার বিকৃত রূপ’ সম্পর্কে সহসা ‘সচেতন’ হয়ে উঠল উচ্চবিত্ত সমাজ। সাধারণ জনজাতি যখন সেই *পাঁচালি, গান, কথকতা বা কলিরাজার যাত্রা, নলদময়ন্তী, কামরূপযাত্রা, নন্দবিদায় যাত্রা*-র নিমগ্ন দর্শক, সেই সময়ে হিন্দু বাঙালি উচ্চবিত্ত নিজেদের ‘বিশেষ’ প্রমাণ করার তাগিদে ধীরে ধীরে ‘যাত্রার বিকৃতরূপ’ দেখে ‘বিরক্ত’ হয়ে উঠতে চাইল। তারা সেই স্থানে গ্রহণ করে নিতে চেষ্টা করল শাসক শ্রেণির ‘রুচিশীল থিয়েটার’-কে। ‘চৌরঙ্গী থিয়েটার’, ‘সাঁ সুসি থিয়েটার’-এর ঢঙ্গে তারা নিজেদের গৃহের আঙ্গিনায় গড়ে তুলতে লাগল নাট্য মঞ্চ। সেট সেটিং-এর প্রয়োগ করে, মঞ্চ বেঁধে, দৃশ্যপট, উইং, কার্টেন-এর ব্যবহার করে ইংরেজি ধারার নাট্যশালা বানানো শুরু হল। যাত্রার মতো মুক্ত মঞ্চের প্রতি তাদের আর টান রইল না। উচ্চবিত্ত বাঙালি নাট্যমোদীরা দর্শক ও অভিনেতার একই সমতলে অবস্থান করতে চাইল না। ইংরেজি থিয়েটারের আদলে তৈরি করল উঁচু নাট্যমঞ্চ। সাহেবদের কায়দায় দর্শকের থেকে দূরত্ব তৈরি করে নাট্য অভিনয়কে একটি বিশিষ্ট রূপ দেওয়ার প্রচলন শুরু হল। সাধারণ মানুষের ছোঁয়াচ এড়িয়ে, শুধুমাত্র নিজ গোষ্ঠীর মানুষদের মনোরঞ্জনের জন্য ও শাসক ইংরেজদের কাছে খানিক ‘রুচিশীলতা’ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই সম্ভবত তাদের এই সাংস্কৃতিক উদ্যোগ।

যে কোনও উপায়েই হোক, ‘সাধারণ’ থেকে ‘অসাধারণ’ হয়ে ওঠার এই আন্তরিক তাগিদ থেকেই উচ্চবিত্তের নাট্যপ্রীতি। এই প্রবণতা কিন্তু সেই যুগে সর্বত্রই হিন্দু বাঙালি উচ্চবিত্তের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। কি শিক্ষা ক্ষেত্রে, কি জীবিকা ক্ষেত্রে, কি মূল্যবোধের চর্চায়, কি সংস্কৃতি চর্চায় সর্বত্রই ইংরেজ জাতির সমগোত্রীয় হয়ে ওঠার তাগিদ থেকেই তাদের জীবন ধারা নির্ধারিত হত। তবু এ কথা সত্য যে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই যে তারা সম্পূর্ণত ‘Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect’ (Macaulay 12) হয়ে উঠতে পেরেছিলেন, তা নয়। গিরিশ ঘোষের স্মৃতিচারণাটি এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য। বড়লোক হিন্দু বাঙালির হঠাৎ থিয়েটারের নেশা নিয়ে গিরিশ লিখছেন, ‘অতি উচ্চশ্রেণীর নাটক না হইলেও অধিকাংশ দর্শক তাহার রসাস্বাদন

না করিতে পারলেও কৃতবিদ্য ব্যক্তির প্রশংসার অনুকরণ করিয়া সকলেই প্রশংসা করিতেন... যাঁহারা রসাস্বাদন করিতে পারিতেন না, তাঁহারাও লোকে পাছে বেসমজদার বলে, এই ভয়ে প্রশংসা করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের যাত্রা বা কবির রুচির পরিবর্ত্তন হয় নাই। রং-তামাশা নীচ অঙ্গের আমোদ পূর্ব্ববৎ রহিল' (*Girish Rachanabali* 1: 743)।

অর্থাৎ ইংরেজ নাট্য রুচির সঙ্গে সঙ্গত দিতে উচ্চবিত্ত হিন্দু বাঙালি প্রবল সংগ্রাম করতে থাকল। বাইরের মণ্ডলে উচ্চবিত্ত হিন্দু বাঙালি 'আধুনিক' ব্রিটিশ সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার উদ্যোগ চালালো। কিন্তু ভেতরে বহমান সংস্কৃতি ও রুচির পরিবর্তনে তাঁরা তেমন প্রস্তুত হয়ে উঠতে পারল না। কর্মক্ষেত্রে যা-ই হোক, গৃহের অভ্যন্তরে, বিশেষত নারীর সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে, তারা অবশ্যই চিরাচরিত রক্ষণশীলতার বেড়াজালে আবদ্ধ থাকতে চেয়েছেন। পার্থ চ্যাটার্জি তাঁর *Nation and its Fragments* গ্রন্থে যেমন সেই সময়ের বাঙালির 'ঘর' ও 'বাহির'-এর ক্ষেত্র বিভাজন প্রসঙ্গে বলছেন, বাহিরে বাস্তব জগৎ। মূলত পাশ্চাত্য বাস্তবিকতা —যেমন বিজ্ঞান বা যুক্তি চর্চা। তা পুরুষের। ঘরে আসল আধ্যাত্মিক ভারতীয় চর্চা। যা নারীর। বাহিরে পাশ্চাত্যের সঙ্গে সমঝোতা করে নিতে হয়। হৃদয়ে বা আধ্যাত্মিকতায় যে সনাতন ভারতীয়তা, তার প্রকাশ ঘটার সুযোগ হয় না। কখনো বা সংঘর্ষ লাগে। কিন্তু ঘরে পাশ্চাত্যের প্রতাপ ঢোকে না। সেখানে 'আধ্যাত্মিক দেশের' স্থান নিরাপদ (P. Chatterjee *Nation and its Fragments* 120)।

নাট্য জগতে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার বিতর্কে হিন্দু বাঙালির মননে এই দুই ধারার টানাপোড়েন এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। 'ঘর' ও 'বাহির'-এর সহাবস্থান উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু বাঙালিকে নিজ মূল্যবোধ সম্পর্কে একেবারে এক সংশয়াপন্ন অবস্থায় নিক্ষেপ করেছিল। 'ঘর'-এর হিন্দু রক্ষণশীলতার প্রতি আনুগত্য, আবার 'বাহির'-এর পাশ্চাত্যের অভিনবত্বের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণের মাঝখানে এসে পরেছিল নারীর রঙ্গমঞ্চে প্রতিস্থাপনের প্রশ্নটিও।

দূরত্ব বাড়ানোর নানা হাতিয়ার

সাধারণের থেকে আলাদা হওয়ার উদ্দেশ্যে নাট্যশালাকে পথ ঘাট মাঠ ময়দান ও সাধারণ মানুষের আঙ্গিনা থেকে সরিয়ে এনে একেবারে বড়লোকের ঘরের ভেতর নিয়ে আসা হল। এখানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। যদিও এর আগে যাত্রা প্রভৃতি লোকনাটকও বড়লোকের বাড়িতে হওয়ার নমুনা আছে। কিন্তু থিয়েটারের ক্ষেত্রে বিষয়টি বেশ রাজনৈতিকভাবে জটিল। কপিলা বাৎস্যায়নের যাত্রা সম্পর্কিত ঐতিহাসিক বিশ্লেষণটি লক্ষ্য করার মতো। কপিলা বাৎস্যায়নের কথায় বলা যায়, 'Yatra... had the potential of establishing communication with high

and the low, the literate and the illiterate, the religious congregration and the popular masses alike... The actors of the Yatras came from all sections of society: Brahmins, Kshatriyas, Vaisyays. They can be farmers, peddlers, zamindars and clerks' (139)। বাৎস্যায়নের ব্যাখ্যা হল, যাত্রা তথা অন্যান্য দেশজ শিল্পমাধ্যমগুলোতে সব শ্রেণি, সব বর্গের (সম্ভবত মূলত হিন্দু) মানুষের মধ্যেকার যোগাযোগের একটা সম্ভাবনার দিক খোলা ছিল। ধনী-গরীব নির্বিশেষে লোকসংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারত। অনেক সময়েই হয়তো তাদের চর্চার ক্ষেত্রটা আলাদা ছিল। কিন্তু সংস্কৃতি চর্চার আধিপত্যের বিচারে ধনী-গরীবের বিশেষ প্রভেদ ছিল না। সকলেই যাত্রা দেখতে পারতেন, সামর্থ্য মতো যাত্রানুষ্ঠানের উদ্যোগ নিতে পারতেন, অভিনয় করতে পারতেন বা অন্যভাবে অংশগ্রহণ করতে পারতেন।

কিন্তু এবার থিয়েটারের বিষয়টা একটু অন্যরকম হয়ে গেল। বাংলা থিয়েটারকে গড়েই তোলা হল স্বতন্ত্রভাবে উচ্চবিত্তেরই জন্য। থিয়েটার দর্শন ও চর্চার একচেটিয়া অধিকার ন্যস্ত থাকল বড়লোকের হাতে। থিয়েটার নিয়ে মেতে উঠল শুধুমাত্র কলকাতাবাসী 'বাবু'-রা। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের *হিন্দু থিয়েটার* প্রবর্তনায় শুরু হল কলকাতার বাবুদের বাড়িতে থিয়েটার তথা 'বাবু থিয়েটার' (B. Benerjee, *Bengali Stage: 1795-1873*)। উনিশ শতকের শেষের দিকে অত্যন্ত কম কিছু বুদ্ধিজীবী ও উচ্চবিত্ত মানুষই আছেন যারা থিয়েটারে সংযুক্ত হননি। দ্বারকানাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মধুসূদন দত্ত, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, নবগোপাল মিত্র, প্রিয়নাথ দত্ত, কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়— প্রত্যেকেই কোনও না কোনও সময়ে থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন বা থিয়েটারের প্রভাব তাঁদের কর্মজীবনকে প্রভাবিত করেছে।

আরও একটি প্রবণতা এই সূত্রে লক্ষণীয়। সাধারণের থেকে নিজেদের আলাদা করে তোলার প্রক্রিয়ার একটি অংশ হয়ে উঠল ধ্রুপদী নাটকের অভিনয়। লোকনাটকের বিষয়গুলি সরিয়ে রেখে নাট্য মঞ্চে প্রধানত জায়গা পেতে থাকল ইংরেজ শেক্সপীয়ার বা ভারতীয় সংস্কৃত নাট্যকারেরা। এই সূত্রে বিষ্ণু বসুর পর্যবেক্ষণটি গুরুত্বপূর্ণ। '১৮৩১ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রায় তেতাল্লিশ বছরের মধ্যে বাবুদের বাড়ির গুরুত্বপূর্ণ থিয়েটারের সংখ্যা বারো।...এই বারোটি মঞ্চে বিভিন্ন সময়ে মঞ্চস্থ হয়েছে একত্রিশটি নাটক ও প্রহসন। এদের মধ্যে যেমন ছিল ইংরাজী নাটক ও প্রহসন, তেমনি ছিল সংস্কৃত থেকে অনুদিত ও মৌলিক বাংলা নাটক' (B. Basu, 'Bangla Proscenium Theatre' 12)।

অর্থাৎ নিজেদের নাট্যচর্চাকে অত্যন্ত ‘উচ্চমানতাসম্পন্ন’ ও ‘রুচিশীল’ প্রমাণের তাগিদ ছিল বাঙালি ধনীপাড়ার নাট্যকর্তাদের। তাই তারা সমকালের সাহেবপাড়ার নাটকগুলিকে আশ্রয় করে নেন অথবা ফিরে তাকাতে চান সংস্কৃত নাট্যকারদের দিকে। এমনকি এই সময়ে মৌলিক নাটক (যেমন-*কুলীনকুলসর্বস্ব, শর্মিষ্ঠা, কৃষ্ণকুমারী*)-গুলিও সংস্কৃত নাটকগুলিকে অনুসরণ করেই লেখা হয়েছিল। প্রাচীন সংস্কৃত নাটকগুলিকে ভিত্তি করে, তার ছাঁচটিকে মোটামুটি অপরিবর্তিত রেখে রচিত হয়েছিল তৎকালীন মৌলিক নাটকগুলি।

সাধারণের থেকে নিজেদের আলাদা করে তোলার এই প্রক্রিয়ারই এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল, মেয়েদের মঞ্চে আসার বিষয়টি। মনে করা যেতে পারে, লোকসমাজ থেকে গৃহের চৌহদ্দিতে নিয়ে এসে ধনীরা যেমন ভাবে থিয়েটারকে একটি ‘বিশিষ্ট’ রূপ দিতে চাইল, ধ্রুপদী নাটকের অভিনয় করে যেমন থিয়েটারকে অত্যন্ত রুচিশীল প্রমাণ করার চেষ্টা করা হল, একই সমতল থেকে দর্শক ও অভিনেতাকে বিচ্ছিন্ন করে উঁচু মঞ্চ বানিয়ে অভিনয় শিল্পকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা হল, সম্ভবত ঠিক একই উদ্দেশ্যে লোকসমাজ থেকে স্বতন্ত্র করে তোলার উদ্দেশ্যেই থিয়েটার থেকে বাদ পড়ল মেয়েরা। যদিও একটি কথা উল্লেখ্য যে, উঁচু মঞ্চ বানানোর তাগিদ ছিল পেছনের বা দূরে বসা দর্শকদের অভিনয় দেখানোরও জন্য; কিন্তু এ কথাও বোধহয় অস্বীকার করা যায় না যে, সেই সময়কার বেশিরভাগ লোক-আঙ্গিকের পরিবেশনাগুলোতে (হাফ-আখড়াই, খেউড়, ঝুমুর, কথকতা বা কীর্তনের আসর) দর্শক ও অভিনেতাদের মধ্যেকার দূরত্ব ও তলের পার্থক্য প্রায় থাকত না; ইংরেজ প্রভাবিত বাংলা থিয়েটারে উঁচু মঞ্চ ও দর্শকের থেকে অভিনেতাদের দূরত্ব তৈরি করার প্রয়াসটি এই কারণে লক্ষ্যণীয়। ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাওয়া উচ্চবিত্ত বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষদের কোনোভাবে হয়তো মনে হয়েছিল, ‘থিয়েটার’ আর যাই হোক ‘লোকশিল্প’ নয়। এ এক ‘বিশেষ’ শিল্পমাধ্যম। আর ‘থিয়েটারের’ বিষয় চয়ন, নাট্য আঙ্গিক, মঞ্চ নির্মাণ-সবদিক থেকে হয়তো থিয়েটারের সঙ্গে সাধারণ মানুষদের সম্পর্কটিকে ‘বিশেষ’ করে তোলা হল। তাদের উদ্যোগে ‘নিচুতলা’র মেয়েরা লোককলার মতো ‘নিচুকাজে’ অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতেও পারে; ‘বিশেষ’ মানুষের বাড়ির মেয়েরা পড়াশোনা শেখে, দেশীয় রাজনীতির কাজে পুরুষের আদর্শ সহযোগী হয়ে ওঠার যোগ্যতা তৈরি করে, নতুন সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করে, নতুন ধরনের সাজগোজ করে। কিন্তু সাধারণ জনগণের সামনে উন্মুক্ত হয়ে কখনোই অভিনয়ের মতো ‘নিচুকাজ’ করে না। লোকসমাজে মেয়েরা অনেক সময়েই মঞ্চে বিচরণ করতে পারে, তাই ‘অ-সাধারণ’ সমাজে তারা গৃহীত হয় না। এই সূত্রে রিমলি ভট্টাচার্যের ব্যাখ্যা, ‘...education would actually make a better wife,

better mother and better nationalist subject. The actress did not fit into any of these categories, nor was she an accepted member of an older recognised community with access to and legitimate pride in erudition and cultivation of the the arts' (*Public Women* 62)। নতুন শিক্ষায় শিক্ষিত নারী ভালো স্ত্রী, ভালো মা ও ভালো জাতীয়তাবাদী বিষয় হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু অভিনেত্রীরা এই ক্যাটেগরিতে ঠিক মানানসই হতে পারল না। আবার পূর্ববর্তী যুগের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি ধারার প্রবাহের সঙ্গে এই অভিনেত্রীরা অবিচ্ছিন্নভাবে সম্পর্কযুক্তও ছিল না।

অতএব সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই হয়তো শুরু হল রঙ্গমঞ্চ থেকে মহিলা বিতাড়ন। আরও নিখুঁতভাবে বলতে গেলে, নাট্যকলাকে একান্তভাবেই উচ্চশ্রেণীর শিল্পমাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ চলতে থাকল। কোনোভাবেই যেন এই শিল্পের মধ্যে নিম্নবর্গের থাবা না বসতে পারে। নাট্যচর্চা একটি 'বিশেষ', 'পবিত্র'কর্ম এবং নাট্যালয় হল 'শুদ্ধ তীর্থক্ষেত্র' বা 'মন্দির'-এর মতো একটি 'পুণ্য স্থান'—এভাবেই নাট্যশালাকে সংজ্ঞায়িত করার প্রচেষ্টা ছিল উচ্চবিত্তের। এমনকি পরবর্তীকালে বিশ শতকের গোড়ার দিকে নাট্যপত্রিকাগুলি প্রকাশিত হওয়ার সময়েও নাট্যসংক্রান্ত কর্মসূচীকে পবিত্র ধর্মীয় কাজের সঙ্গে তুলনীয় করার প্রয়াস দেখা যাচ্ছে। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও অমরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রকাশিত নাট্য ম্যাগাজিনটির নাম রাখা হয় *নাট্য-মন্দির*। সভ্য জাতি তৈরি করার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে এই নাট্য জগতকে 'পবিত্র মন্দির' হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগটি লক্ষ্যণীয়। এই পত্রিকার ভূমিকায় গিরিশ লিখছেন, 'মানবের প্রধান পরীক্ষা—তাহার রুচি। সে রুচির পরিচয়—*নাট্য-মন্দিরে* সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হন' (*Girish Rachanabali* 1: 745)। একটি সভ্য জাতির সমস্ত স্তরের মানুষের কাছে এই *নাট্য-মন্দির*-এর যে কত প্রয়োজন, সে ব্যাপারেও গিরিশ বিস্তৃত ও গভীর বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হন।

যদিও উল্লেখ্য, বাঙালি উচ্চবিত্ত 'বাবু' সম্প্রদায়ের ভদ্রলোক নিজের বাড়িতে নৃত্যগীত পারদর্শী বাঈজির গান শুনতে অভ্যস্ত। ২১শে অগ্রহায়ণ ১২৮১ সালের *সাধারণী* পত্রিকা লিখছে, 'বঙ্গভাষায় নাটক অভিনয়ের আর যে কোন উদ্দেশ্য থাকুক নীচ ভাবোদ্দীপক জঘন্য খ্যামটা নাচ সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করা একটা প্রধান লক্ষ লওয়া উচিত। বাঈনাচ থাকিলে ক্ষতি নাই'। আসলে বাঈনাচ ছিল মুঘল আমলের রাজদরবারের গীত নৃত্য অনুষ্ঠান। মুঘলের পতনের পর এই বাঈজি সম্প্রদায় লক্ষ্ণৌ ও দিল্লী দরবার থেকে সরে এসে কলকাতা ও আশেপাশের এলাকায় স্থান নিয়ে নেয়। উচ্চবিত্ত ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালিদের ঘরে ঘরে তাদের আদর বেড়ে ওঠে। সুমন্ত ব্যানার্জীর মতে, '... ইংরেজি

শিক্ষিত বাঙালির অধিকাংশের কাছেই বাঈনাচ তার বনেদি, রাজদরবার সম্পর্কিত উৎসের জন্য পার পেয়ে গিয়েছিল' (*Itar Santan* 69)। কিন্তু পার পেল না নিম্নশ্রেণির মহিলা শিল্পীগোষ্ঠী। নাট্য আঙ্গিনার শুচিতার মধ্যে বারবণিতার অনুপ্রবেশ সম্ভ্রান্ত বংশীয় বাবুরা মেনে নিতে পারলো না। বিতর্ক উঠল প্রবল। এই সূত্রে গিরিশ ঘোষের আরেকটি আক্ষেপ লক্ষ্যণীয়। 'কীর্ত্তনী ও নর্ত্তকীর প্রতি তাঁহাদের তাদৃশ বিদ্বেষ নাই। কীর্ত্তনী গাহিতেছে, সে সভায় সকলেই বসেন। নাচের নিমন্ত্রণে উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ যাওয়ায় কোন সম্প্রাদায়ের ধর্ম্মযাজক আপত্তি করেন না। কিন্তু রঙ্গালয়ের প্রতি—তাঁহাদের সে উদারতা প্রকাশ নাই। কীর্ত্তনে নর্ত্তনে গুণ দেখেন—বেশ্যা দেখেন না। কিন্তু সমস্ত রঙ্গালয় বেশ্যার ঘ্রাণে পরিপূর্ণ। এরূপ বিদ্বেষের কারণ বোঝা ভার' (*Girish Rachanabali* 1: 736)। একই রকম ভাবে ঢাকার *ক্রাউন থিয়েটার* মেয়েদের অভিনয়ে আনেন। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে গিরিশ ঘোষের *পূর্ণচন্দ্র* নাটকে দুনিয়া নামের এক অভিনেত্রীকে আনা হয়। এই সূত্রে *ঢাকা প্রকাশ* লিখছে, 'মনোহরিণী বারবনিতাগণ অভিনয় করে বলিয়া যাহারা আপত্তি করেন তাহারা এই নাট্যভিনয়ের সুখ সৌন্দর্য্যে বঞ্চিত হতে পারেন। কিন্তু সর্বসাধারণ যখন তাঁহাদের ভদ্রমহিলাগণের নৃত্যগীতাদি দর্শন শ্রবণে সমর্থ নহে; ... অপিচ এই অভাব বশতঃ লোককে যখন বাই খেমটাওয়ালার নৃত্য গীত যোগ দিতেই হয় তখন তাহা অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ এই নাটক অভিনয় দর্শন আমরা কাহারও পক্ষে অন্যায় মনে করি না' (qtd. in Mamoon, *Bangladesher Theatre* 35)। অর্থাৎ, বাঈ খেমটার আসরে বা কীর্তনীর নাচের অনুষ্ঠানে যে শিল্পী গোষ্ঠীকে অনায়াসে গ্রহণ করা যাচ্ছে, সেই জন গোষ্ঠীর মানুষদের নাট্য শিল্পের সম্ভ্রান্ত পরিমণ্ডলে মেনে নেওয়া অত্যন্ত কঠিন ছিল উচ্চবর্গের বাবুদের পক্ষে।

যদিও নাট্য জগতের প্রথম যুগের মেয়েরা সকলেই বারবণিতা গোষ্ঠী থেকে আসা কিনা, সে ব্যাপারে যথেষ্ট জোর দিয়ে কিছু বলা যায় না। রিমলি ভট্টাচার্যের মত, নাটকে আসা মেয়েরা সকলেই অবিবাহিত ছিল এবং তাঁদের বাড়ির এলাকাগুলো বিচার করে ধরেই নেওয়া হয় তারা বারবণিতা শ্রেণিরই মেয়ে ছিল। '...residential locality and single status were reason enough for the woman concerned to be identified as a prostitute. Even those who were not directly recruited from prostitute quarters were regarded as public women because they consented to appear and perform in public' (R. Bhattacharya, *My Story and My life* 12). আবার এই মেয়েরা সকলেই হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত কিনা সেটাও স্পষ্ট করে বলা যায় না। তবে ধরে নেওয়া হয় সকলেই নিচুজাতের হিন্দু। কিন্তু কেউ কেউ নাম পাল্টে নিজেদের

ধর্মীয় পরিচয় হয়তো গোপন করেছিলেন, এমন সম্ভাবনার কথাও বলছেন রিমলি ভট্টাচার্য— '... the actresses were almost invariably Bengali and Hindus, although some may have changed their names and kept their religious identity a secret for professional convenience' (R. Bhattacharya, *My Story and My life* 14)। এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ স্বরে সুমন্ত ব্যানার্জীও বলছেন, অনেক মুসলিম দেহপসারিনীদের নিজেদের আদি ধর্মীয় পরিচয় গোপন করার প্রবণতা থাকত— 'Among the Muslim prostitutes there seemed to be a tendency to hide their religious identity' (S. Banerjee, '*The 'Beshya' and the 'Babu''* 2465)। এরই সঙ্গে উল্লেখ্য ২৮ শে নভেম্বর ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের *ঢাকা প্রকাশ* নামের একটি সংবাদপত্রে *পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি* নামের প্রেক্ষাগৃহে কিছু মুসলিম বারবণিতার অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায় (S. Banerjee, '*The 'Beshya' and the 'Babu''* 2470)।

বাংলা থিয়েটারের একেবারে গোড়ার দিকে এই কূলজাতের ঠিকঠিকানাহীন নারীদেরই নাট্যমঞ্চ থেকে সরিয়ে ফেলার কর্মোদ্যোগ নেওয়া হল। লোকসমাজে নারী শিল্পজগতের এক অন্যতম দাবীদার ছিল। কিন্তু বাংলা থিয়েটার মঞ্চে তাকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হল। নিম্নশ্রেণির এই নারী রঙ্গমঞ্চের অধিকার থেকে উৎপাটিত হল। তার বেশ খানিকটা পরে যুগের গতিময়তায় প্রবাহে, মধ্যবিত্ত নাট্যপ্রেমিক যুবকদের আন্তরিক আহ্বানে এবং কিছুটা ব্যবসায়িক প্রয়োজনে নারী আবার ফিরে পেয়েছিল মঞ্চের অধিকার। অনেক প্রতিরোধ এসেছিল। তা সত্ত্বেও মেয়েরা মঞ্চে প্রত্যাবর্তন করেছিলো। মেয়েরা মঞ্চে ফিরে আসাতে বাংলা থিয়েটারের মোড় ঘুরে গেছিল; পরিকাঠামোগত ও নান্দনিক অনেকটাই পরিবর্তন এসেছিলো নাট্য সমাজে। উচ্চবিত্ত বাবু থিয়েটারে মাঝেসাঝে ডাক পেলেও মেয়েরা পাকাপাকি জায়গা করতে পারেনি। বঙ্গরঙ্গমঞ্চে মেয়েদের তথা নিচু জাতের মেয়েদের দীর্ঘস্থায়ী প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল সাধারণ মানুষের জন্য খোলা রঙ্গালয়—অর্থাৎ সাধারণ রঙ্গালয়। থিয়েটারকে ন্যায়নীতির মানদণ্ড হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যটিকে সরিয়ে রেখে মূলত বাস্তবের মতো থিয়েটার বা ইল্যুশনিস্ট থিয়েটার বানানোর তাগিদে ও রঙ্গমঞ্চের ব্যবসায়িক স্বাচ্ছন্দ্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে সাধারণ রঙ্গালয়ের নাট্যগোষ্ঠীগুলি মেয়েদের জন্য বাংলা নাট্যমঞ্চের দরজা খুলে দিতে বাধ্য হয়েছিল।

নিজ গৃহের নারী নয়

কিন্তু প্রশ্ন এই, কেন নিজ গৃহের নারীকে মঞ্চে ওঠার অনুমতি দিল না বাংলার উচ্চবিত্ত নাট্যমোদীরা? নিচ জাতের নারীকে না হয় গৃহের লাগোয়া ঘরে অভিনেত্রী হিসেবে নিয়োগ করার অনেক সমস্যা আছে, সেটা বোঝা গেল। কিন্তু নিজ গৃহের নারীকে কেন তাহলে এই কর্মে উৎসাহিত করা হল না? তাহলে তো নিচ শ্রেণির দূষিত উপস্থিতির ভয়ও দূর হয়, আবার নাট্য চরিত্রের যথাযথ চরিত্রায়নের সুবিধেও অটুট থাকে। এই সূত্রে, তৎকালীন উচ্চবিত্ত বাঙালি ঘরের 'নতুন নারী' তথা 'ভদ্রমহিলা' তৈরি করার বিষয়টি উল্লেখ করা দরকার।

অধ্যাপক পার্থ চ্যাটার্জি এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন *Nation and its Fragments* গ্রন্থের 'Women and the Nation' অধ্যায়ে (135)। তিনি বলছেন, এই সময়ে নতুন মেয়েদের অবস্থা নিয়ে তর্ক চলতে থাকে। তার জামাকাপড়, আদবকায়দার ধরন, শিক্ষা নিয়ে বাদপ্রতিবাদ শুরু হয়। বাড়ির ভেতরে ও বাইরে তার কী ভূমিকা হওয়া উচিৎ তাই নিয়ে প্রবল আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হয় বুদ্ধিজীবী মহলে। নতুন মধ্যবিত্ত পরিবার গড়ে উঠছে, সময় দ্রুত বদলাচ্ছে। মানুষের মধ্যে সমানাধিকারের ভাবনা আসছে। ফলে 'নতুন নারী'-র ধারনাও প্রবল হচ্ছে। 'ভদ্রমহিলা' গড়ে তোলা দরকার হয়ে পড়েছে। 'ভদ্রলোক'-এর যোগ্য সহকারী হিসেবে 'ভদ্রমহিলা'-র প্রয়োজন। এই 'ভদ্রমহিলা' বা 'নতুন নারী' পাশ্চাত্যের নকল। কিন্তু আপাদমস্তক মেমসাহেব নয়। সে নব্য শিক্ষা পাবে, কিন্তু ঘরকে বিপন্ন করবে না। সাংস্কৃতিক উন্নতি হবে তাঁর। 'নতুন নারী' পাশ্চাত্য নারীর থেকে আলাদা, কারণ সে বাইরের জগতে বেরিয়ে ছেলেদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে না। ঘরের শান্তি বজায় রাখতে জানে। আধ্যাত্মিকতা বজায় রাখতে শেখে। বাইরের জগতে ছেলেদের অনেক কিছু মেনে নিতে হয়। সাজগোজ, খাওয়া, ধর্মীয় আচার, সামাজিক আচরণ। এই মেনে নেওয়াগুলো পুষিয়ে দেয় আদর্শ মেয়েরা। তারা নেশা করে না, ধর্ম মানে, পরিবার ও আত্মীয়দের সময় দেয়।

এই 'নতুন নারী' হল আদর্শ আধুনিক ভারতীয় ইমেজের রক্ষাকারী। অবশ্য বাইরের জগৎ যে একেবারে রুদ্ধ, তা নয়। সে বাইরের জগতেও যেতে পারে। কিন্তু নারীসুলভ আচার-ব্যবহারকে বজায় রেখে। নিজের পরিবারের আগের প্রজন্মের মেয়েদের থেকে সে অবশ্য অনেক এগিয়ে। কারণ সে 'স্বাধীন'। কৃষ্ণভামিনী দাস স্বামী দেবেন্দ্রনাথ দাসের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে গেছিলেন দীর্ঘ আট বছরের জন্য। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে তিনি দেশে ফেরেন। তিনি ছিলেন প্রথম বঙ্গমহিলা যিনি তাঁর ভ্রমণকাহিনির মাধ্যমে বিলেতের গল্প দেশের লোকেদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাঁর রচনায়

উনিশ শতকের ‘নতুন নারী’র ধারণাটির সমস্ত উপকরণ পাওয়া যায়। কৃষ্ণভামিনী নিজের স্বাধীনতা বিষয়ে লিখছেন, ‘মনে বড় আহ্লাদ হইল, আবার দুঃখও হইল, আহ্লাদ-আমি স্বাধীন, দুঃখ -ভারতমহিলারা এ স্বাধীনতাসুখ জানেন না’ (K. Das 6)। কৃষ্ণভামিনীর এই ভ্রমণকথা আরও একটি কারণে উল্লেখযোগ্য। সেই সময়ে তাঁর স্বামী দেবেন্দ্রনাথের পক্ষেই দেশ ছেড়ে বিলেতে যাওয়া ছিল এক ব্যক্তিগত জীবনের বিপ্লবের মতো (K. Das ভূমিকা pp. বারো)। পিতা শ্রীনাথ দাসের (নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ দাসের পিতাও তিনি) সংস্কারাচ্ছন্ন মন দেবেন্দ্রনাথকে প্রথমবার বিলেত থেকে ফেরার পর গৃহচ্যুত করেছিল। কৃষ্ণভামিনী স্বামীর সঙ্গ নিলেন। কিন্তু পাঁচ বছরের মেয়ে তিলোত্তমাকে সঙ্গে পেলেন না। ঠাকুরদাদা শ্রীনাথের কাছেই রয়ে গেল ছোট মেয়েটি। কৃষ্ণভামিনী পার করলেন ‘ঘর’ এবং দেশের মধ্যেকার ‘বাহির’-কে পার করে চললেন বিলেত। তিনি লিখছেন, ‘২৬শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার রাত্রি সাড়ে আট্টার সময় বোম্বাই হইয়া ইংলণ্ডে যাইবার জন্য আমার স্বামীর সহিত হাবড়া ষ্টেশনে আসিয়া কলিকাতা হইতে রওনা হইলাম। আজ আমি মুখ খুলিয়া কলের গাড়ীতে উঠিলাম’ (K. Das 4)। তিনি বেরোলেন; ‘ঘর’ ছেড়ে, মেয়ে ছেড়ে, ঘোমটা খুলে। এই ঘোমটা খোলার বিষয়টি তাঁর রচনায় অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল বলে মনে হয়। তিনি লিখছেন,

> দেখিতে দেখিতে হুগলী, ও বর্দ্ধমান ইত্যাদি ষ্টেশনে আসিতে লাগিলাম; ইহারা আমার পূর্ব পরিচিত, আগে পিত্রালয়ে যাইবার সময় মুখ ঢাকিয়া এই ষ্টেশণ (sic.) দিয়া যাইতাম, কই আজ আমার সে ঘোমটা কোথায়? ঘোমটা টানিতে গিয়া মাথায় টুপিতে হাত ঠেকাতে নিজের ভিন্ন পোষাক দেখিয়া মনে মনে একটু লজ্জা হইল। আজ আমাকে কোন পরিচিত লোক দেখিলে চিনিতে পারিবে না, হয়ত “মেম সাহেব বলিয়া সেলাম করিবে অথবা ভয়ে সরিয়া যাইবে। কি আশ্চর্য্য! পোষাকে এত প্রভেদ। (K. Das 5)

ঘোমটা ছেড়ে টুপি পরাতে তাঁর যেন একটা ক্ষমতায়নের আস্বাদ নেওয়ার সুযোগও খুলে গেল। নারী হিসেবে শুধু নয়, ইংরেজি আদবকায়দা শিক্ষিত নারী হিসেবে তাঁর পরিচয় যেন এক অনন্য প্রতিষ্ঠা পেতে লাগল। তিনি লিখলেন, ‘আজ যদি আমি ঘোমটা দিয়া এই ষ্টেশনে দাঁড়াইতাম তাহা হইলে কত লোক চাহিয়া দেখিত, কিন্তু আমাদের দেশে ইংরেজী পোষাকের কি মাহাত্ম্য! কেহ তাকাইতেও সাহস করে না, সকলেই ভয় পায়’ (K. Das 13)। তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতির বিচারে বোঝা যাচ্ছে, শুধুমাত্র ঘোমটা খোলার বিপ্লবেই কৃষ্ণভামিনীর সামাজিক অবস্থান নিয়ে এই স্বাতন্ত্র্যবোধ আসছে।

কৃষ্ণভামিনীর রচনাকে যদি হিন্দু উচ্চবিত্ত সমাজের 'নতুন নারী'র আলোকে ব্যাখ্যা করা যায়, তাহলে তার নিরিখে 'নিচু' শ্রেণীর মানুষের থেকে সে কতটা 'উঁচু'তে অবস্থিত এমন ধারণাটি সম্পর্কে খানিক ওয়াকিবহাল হওয়া যায়। কারণ কৃষ্ণভামিনীর মতোই উনিশ শতকীয় হিন্দু উচ্চবিত্ত ইংরেজি পরিভাষায়, নিচুতলার মেয়েরা তো 'স্বাধীনতার মানেই বোঝে না', 'স্বাধীন' হওয়ার কোনও সাংস্কৃতিক শিক্ষাই পায়নি তারা। অথচ যতদূর জানা যায়, নিচু তলার মহিলারা হয়তো উচ্চবিত্ত মহিলাদের তুলনায় স্বাধীন বেশি ছিল। কিন্তু উনিশ শতকীয় সমাজের কাছে এই 'সহজ লভ্যতা'ই হয়ে উঠেছিল 'নিচু জাতের' একটি অব্যর্থ তকমা। রিমলি ভট্টাচার্য লিখছেন, 'Paradoxically, their greatest strengths—an unconventional family structure, the ability to defy authority if necessary, uninhibited access to male compny, the capacity for working late nights and keeping irregular hours, touring the provincesanddistat cities, usually umchamperoned—only served to reinforce the sterotype of 'low class' women with no morals' ('Early Actresses' 155)। উঁচু ঘরের নতুন নারীর সংজ্ঞা নির্ধারণ করে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* লিখছে, 'নব্য সম্প্রদায় চায় যে স্ত্রীটি বাঙ্গালা বেশ জানে, ইংরেজিতে কথাবার্তা কহিতে পারে, সেলি-বায়রন পড়িতে পারিলে তো সোনায় সোহাগা। পিয়ানো বাজাইতে জানে, চিত্রবিদ্যায় নিপুণতা থাকে এবং বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে শাস্ত্রীয় আলাপ করিতে পারে। স্ত্রীতে এইসব গুণ থাকিলে তবে তাহাদের মন উঠে এবং হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয়' (*Tattwabodhini Patrika* 30)।

আবার অন্যদিকে আরও একটি বিশেষ আলোচনা এই সূত্রে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। সেটি হল মহিলাদের লিখিত বয়ানের 'সংশোধনা' প্রসঙ্গে। বারাঙ্গনা-অভিনেত্রীরা নিজেদের অভিনেত্রী জীবনের যাবতীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য অবলম্বন করে থেকেছিলেন মূলত তাঁর সমসাময়িক পুরুষ নাট্যকর্মীদের দিকে, এমনটা মনে করা যেতে পারে। এমনকি কোনোকিছু লিখে প্রকাশ্যে ছাপানোর ক্ষেত্রেও একবার অন্তত নাট্যশিক্ষাগুরুর কাছে লেখাটা দেখিয়ে নেওয়ার প্রয়াস দেখা যায় বিনোদিনীর ক্ষেত্রে। *আমার কথা ও অন্যান্য রচনা* গ্রন্থের শুরুতেই বিনোদিনীর 'নিবেদন',

> আমার শিক্ষাগুরু ঁগিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের অনুবোধে এই আত্মকাহিনী লিখিয়া যখন তাঁহাকে দেখিতে দিই, তিনি দেখিয়া শুনিয়া যেখানে যেরূপ ভাবভঙ্গীতে গড়িতে হইবে উপদেশ দিয়া বলেন যে, "তোমার সরলভাবে লিখিত সাদা ভাষায় যে সৌন্দর্য্য আছে, কাটাকুটি করিয়া পরিবর্ত্তন করিলে তাহা নষ্ট হইবে। ... আমি তোমার পুস্তকের একটি ভূমিকা লিখিয়া দিব"। একটি ভূমিকা লিখিয়াও দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা আমার

> মনের মতন হয় নাই। লেখা অবশ্য খুব ভালই হইয়াছিল, আমার মনের মতন না হইবার কারণ, তাহাতে অনেক সত্য ঘটনার উল্লেখ ছিল না। আমি সেকথা বলাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, "সত্য যদি অপ্রিয় ও কটু হয়, তাহা সকল সময়ে প্রকাশ করা উচিত নয়। (Dasi pp. ছ)।

নিজের 'মনের মতন' হয়নি বলে বিনোদিনী এই রচনার প্রথম সংস্করণে (১৯১১) গিরিশচন্দ্রের লেখা ভূমিকাটিকে স্থান দেননি। অবশ্য পরের বছর গিরিশের মৃত্যুর পরে বিনোদিনী গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণে সেই 'মনের মতন' না হওয়া ভূমিকাটি যুক্ত করে শিক্ষাগুরুকে প্রণাম জানান। 'মনের মতন' না হওয়ায় নিজের গ্রন্থে শিক্ষাগুরুর ভূমিকাটি সংযুক্ত না করার যে 'স্বাধীনতা' নিয়েছিলেন বিনোদিনী, সে রকমটা আবার বোধহয় দেখা যাচ্ছে না উচ্চবিত্ত হিন্দু সম্ভ্রান্ত রমণী কৃষ্ণভামিনীর রচনায়। কৃষ্ণভামিনী লিখছেন,

> শিক্ষা রাজনীতি ইত্যাদি কয়েকটা বিষয়ে আমার স্বামী যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন; তিনি এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অনেক স্থল সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, এবং তাঁহার পরামর্শে স্থানে স্থানে অনেক নূতন বিষয় সন্নিবেশ করিয়াছি। তাঁহার যত্ন ও পরিশ্রম বিনা আমি কখনই এই পুস্তক বর্তমান আকারে বাহিরে আনিতে পারিতাম না (K. Das 3-4)

কৃষ্ণভামিনী নিজের লেখার 'অনেক স্থল সংশোধন ও পরিবর্ত্তন' অধিকারও হয়তো দিয়ে রাখেন স্বামীকে। গিরিশ ঘোষ কিন্তু 'পরিবারের শাসনতন্ত্রে'র বাইরে থাকা বিনোদিনীর রচনায় সংশোধন করার কথা ভাবেন না। 'সরলভাবে লিখিত সাদা ভাষায় যে সৌন্দর্য্য আছে, কাটাকুটি করিয়া পরিবর্ত্তন করিলে তাহা নষ্ট হইবে' বলে তিনি মনে করেন। যদিও, প্রথম সংস্করণে অপ্রকাশিত গিরিশ-লিখিত ভূমিকার শেষাংশে গিরিশ মতামত দেন, 'নিজ জীবনীতে উক্তরূপ কঠোর লেখনীচালনা না হইলেই ভাল ছিল' (Dasi 149)। হয়তো গিরিশের 'মনের মতন' 'কঠোর লেখনীচালনা' না করার পরামর্শটিকে, গ্রহণ না করার 'স্বাধীনতা' বিনোদিনীর ছিল। আর তাই জন্যই হয়তো গিরিশ কোনো রকম 'কাটাকুটি করিয়া পরিবর্ত্তন' করার কথা ভাবেননি। যাই হোক, এই দুই নারীর লিখিত রচনা ছাপানোর ক্ষেত্রে যে 'স্বাধীনতা'র এই দুই ছবি উঠে আসে, তা আমাদের উনিশ শতকীয় নারী-স্বাধীনতার দুইটি বিপরীত দিক দর্শন করায় বলে মনে করা যায়।

কৃষ্ণভামিনীর ছকেই অনেকটা 'শিক্ষিত' হয়ে ওঠে 'উঁচু' শ্রেণির 'নতুন নারী'। সে এখন পিতৃতন্ত্রের একটি নতুন বিষয়। হয়তো বলা যায়, নবপর্যায়ের পিতৃতন্ত্র। সাবেকি পিতৃতন্ত্রের থেকে আলাদা। এ এক নতুন পিতৃতন্ত্র।

এই নবাবিষ্কৃত পিতৃতন্ত্রের প্রভাবে 'নতুন নারী'র মধ্যে একটা সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের ভাব এলো। কিন্তু তা এলো সম্পূর্ণত পুরুষের ছত্রছায়ায়, পুরুষের অধীনে থেকে, পুরুষের উন্নততর সহায়করূপে। এই নারী লেখাপড়া শিখছে, গান শিখছে, নতুন কায়দার সাজগোজ শিখছে। কিন্তু নিচুজাতের মেয়েদের মতো সাধারণত অভিনয় করতে স্টেজে উঠে পড়ছে না। সে স্বামীর সহযোগী, স্বামীর সহায়ক, নতুন হিন্দু নারী। এ নারী আপাদমস্তক পশ্চিমী নারী নয়, আবার পুরোনো রক্ষণশীল হিন্দুও নারীও নয়। কৃষ্ণভামিনীর ভাষায়,

> যদিও আমি সেই ঘোমটা দিয়া বৌ হইয়া নাই বটে, আমার খাওয়া দাওয়া পোষাক ইত্যাদি সব ইংরাজী ধরণে হইতেছে, কেহ দেখিলে "হিন্দুর মেয়ে" বলিয়া জানিতে পারেন না; তবুও আমার মা, বাপ, ভাই, বোন আত্মীয় পরিজন সকলের প্রতি সেইরূপ ভালবাসা আছে, এখনও তাঁহাদের দেখিতে পাইলে দৌড়িয়া গিয়া গলা ধরিয়া কথা কহি। এখনও আমার ভারতবর্ষের জন্য সেই প্রকার কষ্ট হইতেছে, তবে আমাদের দেশীয় লোকেরা যে জাহাজে উঠিলে মন বদলাইয়া যায় বলেন তাহা একেবারে ভুল বলিয়া মনে হইতেছে; তাঁহারা বোধ হয় আলাদা পোষাক দেখিয়াই, আলাদা মন হইয়া যায় বিশ্বাস করেন। (K. Das 30)

যদিও এই সূত্রে উল্লেখ্য, পরবর্তীকালে কোনো সম্ভ্রান্ত বাড়ির মেয়েরা মঞ্চে উঠছে, তারাও কিন্তু দর্শক হিসেবে পাচ্ছে পরিবারের সদস্যদের বা পরিবার ঘনিষ্ঠ মহলেই তাঁদের অভিনয় চর্চার সুযোগ ঘটছে। যেমন দ্বিতীয় দফার জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা বরাবরই গৃহের নাট্যানুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এসেছে। ঠাকুরবাড়ির বেশির ভাগ বিয়েতেই একটা করে থিয়েটার হত (Deb 68)। আশ্চর্যের বিষয় হল, এই ঘটনায় তেমন বিরুদ্ধতার আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা পরিবারের আত্মীয় বন্ধুদের সামনে অভিনয় করায় সম্ভবত তেমন কোনো বিরুদ্ধতা তো আসেইনি, বরং বেশ কিছু পরিবারের বাইরের লোকের সামনেও তাঁরা অভিনয় করেছেন। সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা এতে প্রশংসাই করেছে। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে *বাল্মিকী প্রতিভা*-য় প্রতিভাদেবী সরস্বতী চরিত্রের অভিনয় করেন। এই নিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে চিত্রা দেব লিখছেন, 'তাঁর কাকিমা, পিসিমারা অভিনয় করেছিলেন ঘরোয়া আসরে। দর্শক হিসেবে যাঁরা ছিলেন তাঁরা সবাই আপনজন, চেনাশোনা মানুষ; সুতরাং লজ্জা ছিল না, সমালোচনার আশঙ্কাও না। সাধারণ মানুষ, যাদের আমরা বলি পাবলিক, সর্বপ্রথম তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন প্রতিভা ... 'বিদ্বজ্জন-সমাগমে'র সভায় মেয়েরা অভিনয় করতেও এগিয়ে এলেন। সবার আগে প্রতিভা, 'বাল্মিকী প্রতিভা'র সরস্বতী হয়ে'' (Deb 67)। প্রশংসা দেখা যায় *আর্যদর্শন* কাগজেও। *আর্যদর্শন*-এ বৈশাখ ১২৮৮ এপ্রিল ১৮৮১ (৭ম

ভাগ ১ম সংখ্যা) -তে লেখা হয়, 'শ্রীযুক্ত বাবু হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিভা নাম্নী কন্যা প্রথমে বালিকা পরে সরস্বতী মূর্তিতে অপূর্ব অভিনয় করিয়াছিলেন'। *সাধারণী* পত্রিকাতেও বিস্তৃত প্রশংসা ছাপা হয়। *সাধারণী* পত্রিকায় ১৭ই ফাল্গুন ১২৮৭ (২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৮১) তারিখে লেখা হয় — 'বঙ্গকুল-কুমারী কর্তৃক রঙ্গবেদী এই প্রথম উজ্জ্বলীকৃত হইল। বঙ্গ রঙ্গ-ভূমির নবকলেবরের এই অভিষেক ক্রিয়ার প্রতিভা উপযুক্ত অধিষ্ঠাত্রী দেবী বটেন ... তাঁহার গীতাভিনয়ে দর্শকবৃন্দের অনেকে বিস্মিত এবং প্রীত হইয়াছিলেন'।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, জ্ঞানদানন্দিনীদেবী ও রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা অভিনেত্রী ব্রিগেডকে তেমন কোনও কঠোর প্রতিবন্ধকতা বা কুৎসা বা সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে বলে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। কিছু ক্ষেত্রে যদিও খানিক বক্রোক্তি এসেছিল সমাজে। কিন্তু সে বক্রোক্তির প্রকটতা রঙ্গমঞ্চে বারাঙ্গনা-অভিনেত্রীদের আনার ঘটনায় যে সমালোচনা হয়েছিল, তার তুলনায় অনেক স্তিমিত ছিল বলেই মনে করা যায়। যেমন, স্বামী-স্ত্রী ভূমিকায় ভাসুর-ভাদ্রবৌ বা নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় দেবর-বৌদির অভিনয় করা নিয়ে কিছু ব্যঙ্গাত্মক আলোচনা হয়েছিল। 'অভিনয়ের মধ্যে যে পারিবারিক সম্পর্কের কিরূপ বিপর্যয় ঘটেছিল তা দেখিয়ে বঙ্গবাসী কাগজ লিখেছিল 'ঠাকুরবাড়ির নতুন ঠাট'' (A. K. Ghosh, *Thakurbarir Abhinoy* 24)। এই সমালোচনা ছিল বা ব্যঙ্গোক্তি ছিল অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের পরিবর্তনের প্রসঙ্গে। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের নিজের স্ত্রী মৃণালিনীদেবী অভিনয় করেছিলেন ভাশুর সত্যেন্দ্রনাথের নায়িকা চরিত্রে, আবার সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বিপরীতে। এই দেবর-বৌদি ভাশুর-ভ্রাতৃ জায়া সম্পর্ক নিয়ে বঙ্গবাসী বিদ্রূপাত্মক প্রবন্ধটি লেখে। কিন্তু বাড়ির মেয়েদের অভিনয় করা নিয়ে তেমন কোনো বক্রোক্তি ছিল না। ভদ্র সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের অভিনয় করা নিয়ে কারোর কোনো বিরূপতা ছিল বলে জানা যায়নি। নতুন সমাজের নতুন নারী স্বাধীনতার পথিকৃৎরাও কিন্তু এ বিষয়ে খুব বিরূপতা প্রকাশ করেছেন বলে জানা যায় না। এমনকি, নাট্য ইতিহাস গ্রন্থগুলোতেও নারীর রঙ্গমঞ্চে পদার্পণ করা নিয়ে যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, সেখানেও জোড়াসাঁকোর মেয়েদের অভিনয় করার মতো বিশেষ ঘটনাকে খুব অনায়াস বাস্তবতা হিসেবেই বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে কেন নারী-অভিনেতার কোনও সমস্যার মুখোমুখি হতে হল না, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়নি। যদিও রবীন্দ্রনাথের নিজের রচনাতেই খানিক বিরুদ্ধতার আভাস পাওয়া যায়। 'বাগানকে যে অবিকল বাগান আঁকিয়াই খাড়া করিতে হইবে ও স্ত্রী-চরিত্র অকৃত্রিম স্ত্রীলোককে দিয়াই অভিনয় করাইতে হইবে এরূপ স্থূল বিলাতি বর্বরতা পরিহার করিবার সময় আসিয়াছে' (R. Tagore, *Bichitra*

Prabandha 78)। যদিও পরবর্তী অনেক নাটকেই রবীন্দ্রনাথ সেই ‘স্থূল বিলাতি বর্বরতা’কে অনুসরণ করে মেয়েদের নিয়েই অভিনয় করেছিলেন।

নিম্নবর্গের বিরুদ্ধে দ্বৈত নিধান

উঁচুঘরের মেয়েদের এইভাবে ‘শিক্ষিত’ করে তোলার পাশাপাশি বাঙালি উচ্চশ্রেণির ভদ্রলোকেরা নিম্নশ্রেণির মেয়েদের নিজ ঘরের আঙ্গিনা থেকে উচ্ছেদ করল। সম্ভ্রান্ত ঘরের দরজা নিম্নবর্গের মানুষদের জন্য অবরুদ্ধ হল। ফলে কাজ হারাতে শুরু করল নাগরিক লোকসংস্কৃতির মহিলা শিল্পী সহ গোটা শিল্পী দল। বৈষ্ণবীরা আর বাড়ির মেয়েদের পড়ানোর জন্য ডাক পেল না। চিত্রা দেব ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের পড়াশোনার আলোচনায় লিখছেন, ‘...বৈষ্ণবীর স্থান গ্রহণ করেন ইংরেজ গৃহশিক্ষিকারা। ... ঠাকুরবাড়িতেও বিদেশিনী শিক্ষয়িত্রী মিস গোমিস এসেছিলেন...’ (12)। সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের শুদ্ধিকরণের চাপে নিম্নবর্গের সংস্কৃতি আর বড়লোকের ঘরের ভিতরে স্থান পেল না। এত বছর ধরে নিম্নশ্রেণির মানুষেরা উচ্চশ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁদের সংস্কৃতি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারছিল। ঠিক সেইখানেই থাবা বসালো ইংরেজিয়ানার নব্য মূল্যবোধ। গৌতম ভদ্র লিখছেন, ‘কথকতার প্রধান শ্রোতা মেয়েরা, কিন্তু তাদের রুচিতে বদল হয়েছে; তাঁরা নিজেরা পড়তে সক্ষম হয়েছেন ও বাদ-বিচার করছেন, রসবোধ অন্যদিকে মোড় নিয়েছে, সাহিত্য বদলে গেছে, উপন্যাস পাঠ জনপ্রিয় হচ্ছে। পৃষ্ঠপোষকতার পরিবর্তনের পেছনে সামাজিক গোষ্ঠীর ওঠা নামার চাইতে অনেক বেশি সক্রিয় রসের আস্বাদের রূপান্তর, উপন্যাস নামে নতুন শিল্পের প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহ’ (‘Kathakatar Nana Katha’ 207)।

এই সূত্রে আরও একটি প্রতাপশালী শক্তি ভারতের নিম্নবর্গের শিল্পীদের জীবন প্রবাহকে ত্বরান্বিত করেছিল। ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু উচ্চবর্গের এই সমাজসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের পিতৃতান্ত্রিক অশ্লীলতা দমনকারী নীতি নিম্নবর্গের শিল্পীদের রুজি রোজগারের পথে একেবারে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। ভারতবর্ষের নীতিগত রূপটি বা নৈতিক নীতিগুলো স্থির করে দিতে থাকল ইংরেজ সরকার। কোনটা শ্লীল, কোনটা অশ্লীল, কোনটা শোভন, কোনটা অশোভন, কোনটা ন্যায়, কোনটা অন্যায় সেটা নির্ধারণ করতে শুরু করল সরকার। একের পর এক অশ্লীলতা বিরোধী আইন লাগু হতে থাকল। ব্রিটিশের অশ্লীলতাবিরোধী অভিযানে সহযোগিতা শুরু করে দিল উচ্চবিত্ত ভদ্রলোক সম্প্রদায়। ঐশিকা চক্রবর্তী বলছেন, ‘সার্বভৌম শ্বেত শাসকের নীতিবোধ ও যৌন উৎকণ্ঠাকে একাত্ম করে নেয় বাঙালি ভদ্রলোকও। নিজের ঘরের সাংস্কৃতিক মঞ্চে তারাও আজ ক্ষমতাসীন শাসকের ভূমিকা অবতীর্ণ। নিজের

সমাজেরই একাংশকে তাই কিছুটা জেনেবুঝেই নির্বাসিত ও নিশ্চিহ্ন করে তারা শিল্পকলার জগৎ থেকে, বঙ্গ সংস্কৃতির মানচিত্র থেকে, ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয় নিম্নবর্গের নাচ-গানের স্বতঃস্ফূর্ত ধারাটি কলকাতার ভদ্রলোকের শিল্পকলার জগৎ থেকে' (35)। এই অশ্লীলতা বিরোধী উচ্ছেদ অভিযানের মূল লক্ষ্য হয়ে উঠল মহিলা লোকশিল্পী ও বারবণিতারা। স্কুলের পাশে বারাঙ্গনাপল্লী থাকলে তাতে ছাত্রদের চরিত্রহানির ভয় থাকে, এমন মন্তব্য করা হচ্ছে *স্টেটসম্যান* পত্রিকায়। বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে কালীপ্রসন্ন সিংহ কলকাতার নির্দিষ্ট অঞ্চলে বারাঙ্গনাদের বসতি সীমাবদ্ধ করার জন্য আন্দোলন করেন। মিশনারি প্রতিষ্ঠানগুলিও চাইছে এই বারাঙ্গনা পল্লীগুলি শহর থেকে সরিয়ে নেওয়া হোক।

এই সময়ে কলকাতার সাংস্কৃতিক মহলের যথেষ্ট উন্নতির কারণে বারাঙ্গনারাও নিজেদের দুঃখ যন্ত্রণা প্রতিবাদ জানিয়ে ছাপাখানার সাহায্য পেল। সেই সময়ে বেশ অনেক পত্র পত্রিকায় অভিনেত্রী ও দেহপসারিনীদের নানা লেখা কাগজে ছাপা হতে শুরু করে। বারাঙ্গনাদের উচ্ছেদের ঘটনায় তাঁদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ করে একটি চিঠি লেখা হয়। চিঠিটি এইরকম:

> এতন্নগরীয়া কতিপয় বারাঙ্গনাগণের নিবেদনমিদং
>
> সম্পাদক মহাশয়, ...অবলারা অবলাদোষেই বাসভ্রষ্ট ও নানা কষ্ট পাইতেছে। সে সুবিবেচক সম্পাদক মহাশয় একবার অভাগিনীগণ পক্ষে কৃপাকটাক্ষে স্বল্পক্ষণ ঈক্ষণ করিলে বিলক্ষণরূপে অলক্ষণ দূর হয়। কোন পত্রপ্রেরক মহাশয় পাঠশালা সন্নিকটে হীনজাতি বেশ্যাবর্গের বাস থাকায় বালকবৃন্দের বিদ্যাবিষয়ক ত্রুটিকর বিবেচনায় তদবসবাস পরিবর্তনার্থ ইত্যাদি বিবরণ প্রভাকর ও ইংলিশম্যান পত্রে প্রকটিতকরণে স্কুলাধ্যক্ষগণ তৎপাঠে যথার্থ হানিজনক বিবেচনায় কতিপয় সহায়-সম্পত্তি বিহীনা বারাঙ্গনাকে ইংরেজী স্কুলের নিকট হইতে উঠাইয়া দিয়াছেন।......কতকগুলি অনাথিনী বাররমনীগণ স্থানভ্রষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ চিরদুঃখিনীর ন্যায় কেহ বা পর্ণকুটিরে, কেহ বা হট্টমন্দিরে, কেহ বা তরুতলে বৃক্ষচ্ছায়াতে যূথভ্রষ্ট হরিণীর ন্যায় হা হুতাশ করতঃ দিনযাপন করিতেছে। (qtd. in Maitra 13)

এই চিঠি যিনি লিখেছিলেন তাঁর নিশ্চয় প্রথাগত বাংলা ভাষার শিক্ষা ছিল। চিঠিটির ভাষার বাঁধুনী দেখে নিঃসন্দেহে এ কথা বলা যায়। নিম্নবর্গের মানুষদের লেখা এই ধরনেরই দুটি চিঠি নিয়ে সুমন্ত ব্যানার্জীর বিশ্লেষণ, 'Unlike the oral expressions-in songs and sayings, quoted earlier, where the language was

the patois current in the red-light areas-these letters were composed in the chaste Bengali language of the bhadralok society. The letters indicate that the writers either had past training in the reading and writing or were assisted by some outsiders' (*'Beshya' and the 'Babu'* 2469)। অর্থাৎ নিষিদ্ধ পল্লীর মেয়েদের রোজকার জীবনের ভাষা বা তাঁদের গান বা শিল্পের ভাষার থেকে এই চিঠির ভাষা আলাদা। এই চিঠি লেখা হয়েছে ভদ্রলোক বাবু সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত পরিশীলিত বাংলা ভাষায়। এই চিঠির লেখক বা লেখিকা হয়তো আগে পড়াশোনা ও লেখার সুযোগ পেয়েছিলেন কিংবা কোনো বাইরের সম্প্রদায়ের মানুষ হয়তো এই চিঠি লিখতে তাঁদের সাহায্য করেছিল।

এই প্রসঙ্গে মুঘল শাসনতন্ত্র ও দেশীয় 'নীতিগত' অবস্থানের প্রশ্নটিকে সুমন্ত ব্যানার্জীর বিশ্লেষণটি অবশ্য স্মর্তব্য। সুমন্ত ব্যানার্জী বলছেন, 'In the pre-colonial era, the Moghul emperors based in Delhi, or their locally appointed administrators operating from provincial capitals (like Dhaka, and later Murshidabad in Bengal) rarely interfered with the value systems and social practices that were prevalent in rural society—as long as their dem ands for revenue and levies were met'. ('Marginalisation of Women's' 143)) অর্থাৎ, এমনটা বললে বোধহয় ভুল হবে না, প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে, দিল্লি ভিত্তিক মোগল সম্রাটরা, খুব কমই গ্রামীণ সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধ এবং সামাজিক ভাবে প্রচলিত ধ্যান-ধারণাগুলোর ওপর হস্তক্ষেপ করতেন। তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল রাজস্ব এবং শুল্ক আদায়। কিন্তু ঔপনিবেশিক প্রশাসকদের কাছে বেশ কিছু দেশীয় মূল্যবোধ ও সামাজিক প্রচলনগুলি রীতিমতো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ালো এবং প্রায়শই এগুলিকে অপরাধ হিসেবে দেখা হত। ব্রিটিশদের 'কর্তৃত্ব'-এর ধারণাটি, মোগল প্রশাসনকে প্রতিস্থাপিত করে অধিকার কায়েম করেছিল এবং তাদের শাসনের ধরনটি ছিল অনেক বেশি সেন্ট্রালাইজড বা কেন্দ্র-নিয়ন্ত্রিত। ব্রিটিশ প্রশাসনের এক অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের নৈতিক ভাবে সভ্য করে তোলা এবং তাদের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধগুলির শুদ্ধিকরণ করা। প্রসঙ্গত বলা দরকার, ঔপনিবেশিক আলোচনায় একটা বিষয় বারবার বলা হতে থাকে যে, একটি সভ্যতা গড়ে ওঠার একটা অন্যতম মাপকাঠিটি তৈরি করা হয়, একটা দেশ, একটা সংস্কৃতি, তার মহিলাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করে, তার নিরিখে। সুতরাং বারবার ভারতীয় নারীদের সঙ্গে ভারতের সংস্কৃতির যে

ব্যবহার, তা থেকে এই আলোচনা উঠতে থাকে যে, ভারত স্বায়ত্তশাসনের জন্য তখনও মোটেই যোগ্যই হয়ে ওঠেনি। এই সমালোচনার সব থেকে বড় নিদর্শন হচ্ছে, ১৯২৭-এ ক্যাথারিন মেয়োর লেখা *মাদার ইণ্ডিয়া*।

ব্রিটিশ কর্তৃত্ব ও দেশীয় মূল্যবোধের মধ্যেকার এই ক্রমাগত সংঘর্ষের সময় একদিকে ছিল প্রাক-ঔপনিবেশিক মূল্যবোধ ও সামাজিক প্রচলনগুলি, এবং অন্যদিকে ছিল ব্রিটিশ প্রশাসনের কর্তৃত্বের ধারণাটির প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া চালু করার উদ্যোগ, আর সঙ্গে চলছিল, সমসাময়িক ব্রিটিশ নৈতিক ধারণাগুলোর অনুকরণে ভারতীয়দের সামাজিক অভ্যাসগুলির সংস্কারের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা। এই তিন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় টানাপোড়েনের মাঝে বাংলায় পতিতাবৃত্তি প্রথার সংজ্ঞাটি একটি পুনর্গঠন ঘটলো। এর আগে পতিতাবৃত্তিকে মনে করা হত ‘পাপ’, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসন এই বৃত্তিকে চিহ্নিত করলো ‘অপরাধ’ হিসেবে।

এই সামাজিকভাবে ধর্মীয়ভাবে নির্ধারিত গ্রামীণ কাঠামোর মধ্যে, বারবণিতাকে ‘পাপী’ হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও, তাকে ‘অপরাধী’ হিসেবে ধরা হত না, এবং তাঁর পেশাটাকে বহাল রাখার এক রকমের অনুমোদন সমাজে প্রচলিত ছিল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে, পতিতাবৃত্তি ক্রমশ একটি ‘অপরাধ’ হয়ে ওঠে। উনিশ শতকের কলকাতা এবং তার শহরতলিতে যেভাবে পেশা সম্পর্কে ঔপনিবেশিক ধ্যানধারণাগুলো প্রবিষ্ট হচ্ছিল, সেই পথ অনুসরণ করেই এই পেশাটিকে এভাবে ‘অপরাধ’ হিসেবে চিহ্নিত করাটা শুরু হয়। অর্থাৎ ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত সভ্য সমাজে কোন পেশাকে অনুমোদন দেওয়া যাবে এবং কোন পেশাকে নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন সে ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া শুরু হল। একইভাবে, ‘পাপ’-এর সম্বন্ধে দেশীয় যে ধারণাগুলি প্রচারিত ছিল তার সঙ্গে ঔপনিবেশিক ধারণাগুলোর সংঘর্ষ বাঁধতে থাকল।

ঔপনিবেশিক সরকারের চোখে বেশ্যালয়গুলি আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলার পক্ষে একপ্রকার যেন প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়। উনিশ শতকের কলকাতার বেশ্যাপল্লিগুলির সঙ্গে রাষ্ট্র অপরাধ জগতের গভীর সংযোগ লক্ষ্য করতে শুরু করে। গ্রাম ও শহরতলীর বিরাট জনগোষ্ঠী কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে এই বেশ্যাপল্লি এলাকাগুলোতে জড়ো হতে শুরু করে। এই নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠীর মানুষদের যে পেশাগুলো উদ্ভূত হতে শুরু করে, সেগুলোকেই ব্রিটিশ সরকার ‘অপরাধ’ হিসেবে চিহ্নিত করতে থাকে। গোটা উনিশ শতকের বিভিন্ন সময় জুড়ে এই ‘অপরাধ’-এর সংজ্ঞা নির্ধারিত হতে শুরু করে ও তার নিরিখে একে একে আইন প্রবর্তিত হতে থাকে। আর ব্রিটিশ নৈতিকতা বোধের প্রেক্ষিতে এই সময়েই ‘অশ্লীল অভিনয়’ ও ‘শ্লীলতাহীন গান’ একে একে সংজ্ঞায়িত হতে থাকে।

আর এই সময় থেকেই ক্যান্টনমেন্ট আইন বলবৎ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। আপাতভাবে দেখলে মনে হয়, বারবণিতারা এই আইন অনুসরণ করে নিয়মিত শরীর পরীক্ষা করতে রাজি না হওয়ার পেছনে অন্যতম কারণ ছিল, তাদের চিকিৎসা সম্বন্ধীয় বিভিন্ন ভীতি বা সচেতনতার অভাব। কিন্তু এর বাইরেও একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। তাঁদের শরীর পরীক্ষার পরে যদি দেখা যেত সেই মহিলার শরীরে অসুখের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, তাহলে তাঁদেরকে দীর্ঘদিন হাসপাতালে বন্দী করে চিকিৎসা করা হত। আর সেই দীর্ঘদিন তাঁদের কোনো কাজ করার উপায় থাকত না, অর্থাৎ রোজগার বন্ধ হয়ে যেত, আর সংসারে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জোগানও বাড়ন্ত হয়ে পড়ত।

এই সূত্রে সুমন্ত ব্যানার্জী এক বারবণিতার কথা জানাচ্ছেন, যিনি বলছে, 'Arrest me, I shall only get a month in prison; but if I register I may have six months in hospital' (qtd. in S. Banerjee *Under the Raj* 153)। মানে, আমাকে গ্রেফতার করুন, তাতে আমার এক মাস মাত্র জেল হবে, কিন্তু শরীর পরীক্ষা করার আইন মেনে নিজের নাম রেজিস্টার করালে আমার হয়তো ছয় মাস হাসপাতালে থাকতে হবে। অনেক বারবণিতারাই এই হয়রানি মেনে নেয়নি, অনেকেই প্রতিবাদ করেছে। সুখিমনি রাউরের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। সুখিমনি ক্যান্টনমেন্ট আইন অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন, তাঁর রেজিস্ট্রেশনের জন্য যে মেডিক্যাল পরীক্ষা ছিল, সেখানে তিনি উপস্থিত হননি। এই অপরাধে ১৮৬৯ সালের ২২ সেপ্টেম্বর কলকাতা হাইকোর্টে তাঁকে হাজির করা হলে, তিনি কখনোই নিজের নাম এইভাবে নিবন্ধিত করবেন না, কারণ তিনি নিজেকে আর পাঁচটা 'সাধারণ বারবণিতা' বলে মনে করেন না। তিনি একটি নির্দিষ্ট ফ্যাক্টরীতে এক নির্দিষ্ট পুরুষের আশ্রয়প্রাপ্ত নারী। তাই তিনি 'সাধারণ বারবণিতা' নন, এমনটাই তিনি মনে করেছিলেন (S. Banerjee *Under the Raj* 154)।

ফলে বোঝা যাচ্ছে, এই সময়ে ভারতীয়দের অতি পরিচিত সামাজিক অভ্যাস, পেশা, দৃষ্টিভঙ্গি ও বৃত্তি নিয়ে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে খুবই সংঘর্ষ লাগতে থাকে। এক তরফা ভাবে আইন চাপিয়ে দিয়েই যে ব্রিটিশরা ভারতীয়দের খুব একটা করায়ত্ত করে উঠতে পেরেছিল, তা নয়। আইনের প্রয়োগ ও আইনের ফাঁকফোকরকে কাজে লাগিয়ে এবং কখনো কখনো বা সরাসরি প্রতিবাদী স্বকীয়তায় রাষ্ট্রের মুখোমুখি নিয়ত সংঘাতে প্রবৃত হয়েছে কলকাতার নিম্নবর্গীয় বারবণিতা গোষ্ঠীর মেয়েরা।

বারবণিতাদের আদি পেশা ও বাসস্থান থেকে মূলোচ্ছেদ করানোর উদ্যোগের ফলে অসহায় হয়ে পড়ছে তারা। পূর্বোক্ত চিঠিতে ছাপাখানার এই পরিশীলিত বাংলা ভাষার মাধ্যমে তাঁদের অসহায়তার যে বয়ান পাওয়া যাচ্ছে,

তা হয়তো তাঁদের নিজস্ব বাচন ভঙ্গিতে বিবৃত হয়নি। খবরের কাগজের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত পাঠকের উপযোগী ভাষায় এই বিবরণী লিখিত হয়েছে। কিন্তু তাঁদের নিজস্ব লোক শিল্পের ভাষায় যে স্বর উঠে আসছে, তার বক্তব্যও ওই চিঠির থেকে আলাদা কিছু নয় বলে মনে হয়। এই সূত্রে বেশ্যাদের আদি পেশা থেকে উচ্ছেদ করার উদ্যোগের বিরুদ্ধে লোকশিল্পী ভবানীর একটি তর্জা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা পালন করে। সুমন্ত ব্যানার্জীর গ্রন্থে এই তর্জাটির উল্লেখ করা হয়েছে। এই তর্জার মাধ্যমে লোক শিল্পের সোজাসাপ্টা বাংলা ভাষায় স্পষ্টভাবে বারঙ্গনাদের পক্ষ নিয়ে ভদ্রলোক সম্প্রদায়ও সরকারের বাহাদুরের বিপক্ষে ভবানী তাঁর ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন:

ভালো আইন কল্লো এবার কোম্পানী রাজায়
বেশ্যারা সব শশব্যস্ত পালিয়ে যাবে কে কোথায়
কেহ বা ত্যজে সোনার ঘর
পারে গিয়ে পালিয়ে গেছে হয়ে আতান্তর
কেউ বা দেখে শুনে বেচে কিনে শ্রীবৃন্দাবনে যেতে চায়

....

বলে লাজে মরি, কি ঝকমারি
মৃত্যু হ'লে প্রাণ জুড়ায়। (qtd. in S. Banerjee, *Itar Santan* 137)

বারবণিতা ও মহিলা লোকশিল্পীদের এই ভাবে আদি অবস্থান থেকে উচ্ছেদ করায় তাঁদের পেশার মূলটি নড়েচড়ে যাচ্ছে। তাঁদের শিল্পের মুন্‌শীয়ানা আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে। শুধু বেশ্যারাই নাচগান করত বা যারা যারা নাচগানের সঙ্গে যুক্ত ছিল তারা সকলেই যে বেশ্যা ছিল এমন নয়। কিন্তু নিজেদের আদি স্থান থেকে মূলোচ্ছেদ করায় ও নিজেদের আদি পেশাটিকে ঘৃণ্য হিসেবে সূচীত করায় বেশির ভাগ মহিলা লোকশিল্পীরাই বাধ্য হল বেশ্যাবৃত্তিকেই জীবন ধারণের একমাত্রপথ হিসেবে বেছে নিতে। সুমন্ত ব্যানার্জী ঔপনবেশিকতার এই ভয়ংকর পরিণতির দিকে নজর রেখে বলছেন, 'Like other wage workers in a system that thrives on intensification of division of labour and specialisation of skills, the prostitute also is pushed into a strictly defined narrow space. She is condemned to the exclusive role of a specialist in sexual entertainment' (*'Beshya' and the 'Babu'* 2461)। অর্থাৎ অন্যান্য বেতনভুক কর্মীদের মতো বারাঙ্গনারাও

একটি কাজের জন্য নির্দিষ্টভাবে নিযুক্ত হতে বাধ্য হল। ফলে যৌন আনন্দদায়িনী হিসেবেই তাঁর মূল্য রইল। যৌনতা বাদ দিয়ে সেই মেয়েদের অন্য কোনো শিল্পচর্চার উপায় বা প্রয়োজন রইল না।

ব্রিটিশ সরকারি রিপোর্টে লোকশিল্পী ও বেশ্যাদের একই গোত্রে ফেলে দেওয়া হল। লক্ষ্ণৌয়ের উনিশ শতকের বারবণিতাদের নিয়ে আলোচনায় ভীণা ওল্ডেনবার্গ লিখছেন, "Singing and dancing girls' was the classification invented to describe them in the civic tax ledgers...' (260)। পাশাপাশি তিনি এটাও দেখাচ্ছেন, কীভাবে লক্ষ্ণৌয়ের ইংরেজ সেনাদের শরীর স্বাস্থ্য অটুট রাখতে যৌন সঙ্গী হিসেবে বেছে নেওয়া হচ্ছে লক্ষ্ণৌয়ের কোনো রোগহীন বারবণিতাদের। এমনকি ইংরেজ সৈন্যদের সুস্বাস্থ্যের সুরক্ষায় আইন করে নিয়মিত মেডিক্যাল চেক আপ করতে বাধ্য করা হচ্ছে দেহপসারিনীদের। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে ক্যান্টনমেণ্ট আইন বলবৎ হয়। যার ফলস্বরূপ সারা ভারতবর্ষে ক্যান্টনমেন্ট এলাকাগুলিতে মাত্র কয়েক জন বারবণিতা নির্বাচিত করা হয়েছিল সৈন্যদের যৌন চাহিদা পূরণ করার জন্য। এবং তাঁরা কোনো রকম যৌন রোগের বাহন কিনা সেটা যাচাই করতে সরকারের তরফ থেকে তাঁদের নিয়মিতভাবে শারীরিক পরীক্ষা করা হত। সুমন্ত ব্যানার্জীর গবেষণা থেকে জানা যাচ্ছে, ভারতীয় ও ব্রিটিশ সৈন্যদের জন্য আলাদা আলাদা বেশ্যা নির্দিষ্ট করা ছিল। এমনকি ভারতীয় সৈনিকরা গোরাদের জন্য নির্দিষ্ট করা বেশ্যাপল্লীতে ঢুকতে গেলে তাদের মেরে বের করে দেওয়ার নজিরও পাওয়া যায় (*'Beshya' and the 'Babu'* 2463)। কোনোভাবেই ব্রিটিশ শরীর ও ভারতীয় শরীরে মিশ্রণ না ঘটে সে ব্যাপারে সদা জাগ্রত হয়ে উঠেছিল ব্রিটিশ সরকার।

এর পাশাপাশি দীপেশ চক্রবর্তীর ঔপনিবেশিক ভারতে চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্যের আলোচনাটিও প্রাসঙ্গিক। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্যবিষয়ক যেকোনো ভাবনাচিন্তার মূলে ছিল কোম্পানির সেনাবাহিনীর শরীর ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত। দীপেশ লিখছেন, 'কোম্পানির সৈন্যদের যুদ্ধপ্রস্তুতি ও ক্ষমতার একটি প্রধান অন্তরায় ছিল সংক্রামক ব্যাধি বা মহামারি' ('Shorir, Samaj O Rastra' 163)। ভারতের নানা স্থানে যে সেনাবাহিনীকে ঘুরে বেড়াতে হত, তাদের এই অসুস্থতা ইংরেজ সরকারের পক্ষে খুবই চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছিল। '১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে বুন্দেলখণ্ডে ... সৈন্যরা অনেকেই কলেরার কবলে পতিত হন। এক সপ্তাহে ৭৬৪ জন সৈন্যের পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে' (D. Chakraborty 'Shorir, Samaj O Rastra' 163)। সরকারের মূল উদ্দেশ্যই ছিল এই সৈন্যবাহিনীর স্বাস্থ্য

নিরাপত্তা। খোলামেলা আলোবাতাস ভরা এলাকা স্থির করা হল ইংরেজ সৈন্যদের জন্য। ‘সাম্রাজ্যবাদী জনস্বাস্থ্যের মূল কথাই ছিল জাতিবৈষম্যকে বাঁচিয়ে রাখা’ (D. Chakraborty ‘Shorir, Samaj O Rastra’ 165)।

ইংরেজ সৈন্যদের বাইরে বাকি আপামর জনজাতির স্বাস্থ্যরক্ষার কোনো তাগিদ বা প্রয়োজন ইংরেজ সরকারের ছিল না। ‘... ভারতীয় শরীরগুলো দুর্বল হোক, অল্পায়ু হোক, তাতে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বা পুঁজির কিছু এসে যেত না তেমন’ (D. Chakraborty ‘Shorir, Samaj O Rastra’ 165)। ভারতীয় শরীরের সংস্পর্শে যতটা সম্ভব না আসা—এটাই ইংরেজদের ‘নীরোগ’ থাকার দাওয়াই ছিল। বরং জাতীয়তাবাদী মধ্য ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির মানুষদেরই ‘আধুনিক’ স্বাস্থ্যবিধির প্রতি উৎসাহ ছিল বেশি। তাঁরাই চেয়েছিলেন, সমাজের নিম্নবর্গের ‘কুসংস্কারাচ্ছন্ন’, ‘অবৈজ্ঞানিক’, ‘ঘৃণ্য’ স্বাস্থ্যচর্চা থেকে বেরিয়ে আসতে। যদিও নিম্নবর্গের স্বাস্থ্যচেতনার এই চর্চা থেকে উন্নত হয়ে উঠতে তাঁরা পুরোপুরি ইউরোপীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান বা শুদ্ধিনীতি নিতে চাননি। তাঁরা চেয়েছিলেন, ইউরোপ ও ভারত—এই দুইয়ের মেলবন্ধনে গড়ে ওঠা এক নবতর শরীর-স্বাস্থ্য চেতনা। কিন্তু উচ্চবর্গের এই ভারতীয়ত্ব কখনোই নিচুজাতির মানুষের স্বাস্থ্য বিষয়ক টোটকা বা নিম্নবর্গীয় শরীরবোধকে ভিত্তি করে নয়। ভারতীয় শরীরচেতনাকে গড়ে তোলা হচ্ছিল ‘আদর্শ ভারতীয়’ পদ্ধতিতে। ফলে বালগঙ্গাধর তিলকের ‘হিন্দু জাতীয়তাবাদী’ স্বাস্থ্যচেতনা তাঁকে আয়ুর্বেদের পুনরুজ্জীবনের দিকে ধাবিত করেছিল।

ব্রিটিশ সরকারের এইধরনের শ্লীলতা, অশ্লীলতা, শরীর, স্বাস্থ্য নিয়ে কঠোর শুদ্ধিকরণ নীতি ও নিচুজাতের মানুষের স্বাস্থ্যচেতনা বা সংস্কৃতিচেতনার প্রতি হিন্দু উচ্চবর্গের প্রবল ছুঁতমার্গ—এই বিবিধ দমননীতির ফলায় কলকাতার নাগরিক লোকশিল্পীদের পসার উঠে যেতে থাকল। উচ্চবর্গের থেকে আরও আলাদা হতে থাকল নিম্নবর্গ। হেরে যেতে থাকল কলকাতা শহরের নাগরিক লোকশিল্প। এই সূত্রে আগেই বলা হয়েছে, সুমন্ত ব্যানার্জীর অভিমত, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা শহরে সব মিলিয়ে ২০টাও তর্জা ও ঝুমুর দল টিঁকে থাকতে পেরেছিল কিনা সন্দেহ (*Itar Santan* 139)।

‘প্রকৃত’ সমস্যার সন্ধানে

তাহলে সমস্যার উৎসটা ঠিক কী? বড়লোক বাড়ির শুদ্ধতা রক্ষার্থে মঞ্চনাটকে নারীর প্রবেশ নিষেধ। অথচ উচ্চবিত্ত গৃহকর্তার নিজ গৃহের নারী যদি পরিবারের কর্তাব্যক্তিদের কর্তৃক বাছাই করা দর্শকের সামনে অভিনয় করে, তাতে সম্ভবত বিশেষ সমস্যা থাকে না। পরিবারের চেনাজানা দর্শকদের সামনে কিংবা নিমন্ত্রিত অতিথিদের

উপস্থিতিতে বাড়ির মেয়েরা বাড়ির পুরুষদের সঙ্গে অভিনয় করলে তেমন কোনও বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে না। তাহলে সমস্যা ঠিক কোথায়? শুধুমাত্র নারীর অভিনয় করাতে নয় নিশ্চয়। নিচুজাতের নারীর গৃহের পুরুষের সঙ্গে অভিনয় করাটাই তাহলে মূল সমস্যা হয়ে ওঠে? সেক্ষেত্রে ভাবতে গেলে, উচ্চবিত্ত বাঙালির বাঈজিগান শোনা বা রক্ষিতা রাখার অভ্যাস তো যথেষ্ট প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়। তারাও তো সমাজের ‘নিচু তলা’র মানুষ। তাহলে তো ভয়টা শুধুমাত্র নিম্নবর্গের মানুষের গৃহের আঙ্গিনায় ঢুকে পরার ভয় নয়। কারণ বাঈজি সংস্কৃতি অনেক আগেই সে বেষ্টনী ছিন্ন করে ফেলেছে। আরও গভীর কোনও ভয়ের সূত্র আছে কি?

শর্বাণী গুপ্ত বলছেন, বেশ্যাবৃত্তিকে কখনো সামাজিক আতঙ্ক হিসেবে মনেই করা হয়নি। যুগ যুগ ধরে এই প্রথা চলেছে। কিন্তু থিয়েটারে আসাতে সেটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল (2)। এমনকি, বারবণিতাদের শিল্প সংস্কৃতির ধারক হিসেবেও মনে করা হত। অন্দরমহলের পবিত্রতা রক্ষার ক্ষেত্রে কখনো এই জীবিকা ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি। উনিশ শতক থেকে এটা সামাজিক ভয়ের কারণ হিসেবে দেখা হল। সাধন গুহর একটি পর্যবেক্ষণও এই সূত্রে অবশ্য স্মর্তব্য (R. Bhattacharya, *My Story and My life* 12)। তিনি বলছেন, লেবেদফের নাটকেও মেয়েরা অভিনয় করেছিল। সেই মেয়েরা সকলেই নিচুজাতের মেয়ে। সাধন গুহের মতে তারা বারবণিতা শ্রেণি থেকে এসেছিল। কিন্তু সেই সময় বাংলা সংস্কৃতি সমাজে বিশেষ হইচই হয়নি। কারণ হিসেবে গুহ বলেন, লেবেদফের সময় পর্যন্ত বাঙালিদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা ও ইংরেজি রুচিবোধ বা মূল্যবোধের চর্চা শুরু হয়নি। ফলে লেবেদফের সময়ে মেয়েদের অভিনয় করাটা অতি সহজ প্রথা ছিল।

কিন্তু উনিশ শতকের প্রেক্ষিতে সেই অনায়াস চর্চাটিই সবচেয়ে বেশি সমালোচনার মুখে পড়ল। থিয়েটার করতে গিয়ে ছেলেরা প্রকাশ্যভাবে এই বেশ্যাদের সঙ্গে অভিনয়কালীন ঘনিষ্ঠতায় জড়িয়ে পড়ছে। এটাই হয়তো সবচেয়ে ভয়ের কথা। ‘অভদ্র’ বারবণিতাদের ‘ভদ্রলোক’ অভিনেতাদের সঙ্গে একত্র শিল্পযাপন সমাজের পক্ষে বড় ভয়ংকর প্রভাব ফেলল। ন্যায়, নীতি, মূল্যবোধ, সভ্যতা, ভদ্রতা, নিয়ম নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার প্রতীক হিসেবে থিয়েটারকে গড়ে তোলার উদ্যোগে যেন বাধা হিসেবে দাঁড়ালো রঙ্গমঞ্চে বেশ্যা-অভিনেত্রীদের আগমন। মঞ্চের অভিনেত্রী মঞ্চে দাঁড়ালে অসংখ্য সমস্যাকে যেন সাক্ষাৎ মূর্ত করে তোলে। সে আধুনিকতাকে মঞ্চের ওপর ঘটতে দেখায়, আবার একই সঙ্গে সেই আধুনিকতার মধ্যে বিরাজ করা অগণিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-টীকা-মন্তব্যকে দৃষ্টির সামনে এনে দাঁড় করায়। রিমলি ভট্টাচার্য এই সূত্রে বলছেন, ‘... she lived out everyday, in her roles and in her life, the

contradictions between the idealisation of 'traditional Hindu' womanly virtues, the impulse to modernity and, not the least, a critique of that modernity. Woman as spectacle thus became a component of disparate cultural agendas' (*Public Women* 4)।

বড়লোকের ঘরের ভেতর বেশ্যা-অভিনেত্রীদের নাট্যচর্চায় অংশ নেওয়া বড়লোকের শুচিতা রক্ষার পরিপন্থী হয়ে গেল। কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য গঠিত যে থিয়েটার, অর্থাৎ সাধারণ রঙ্গালয়ের যুগে আবার 'নিচু' জাত ও শ্রেণির মেয়েদের কাছে—মূলত বারাঙ্গনা শ্রেণির মেয়েদের কাছে নাট্যমঞ্চের দরজা খুলে গেল। ফলে আদর্শ 'পরিচ্ছন্নতার প্রতীক' হিসেবে নাট্য জগতকে প্রতিষ্ঠা করার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, তা আঘাত পেল। আসলে সাধারণ রঙ্গালয়ে নিচুজাতের মেয়েরা আসায় 'ভদ্র' ও 'অভদ্র'-এর মধ্যেকার সীমাটি মুছে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল। রিমলি ভট্টাচার্যের একটি ব্যাখ্যা এখানে অবশ্য উল্লেখ করা দরকার— 'Other forms of rural-based or populr entertainment had traditionally encouraged the free mixing of sexes ... With the tightening grip of Western education and the transmission of Victorian values, traditional or popular entertainment was kept strictly out of respectable homes' ('Early Actresses' 146)। নাট্যমঞ্চকে উনিশ শতকীয় শিক্ষা ও মূল্যবোধের নিরিখে তৈরি হওয়া রুচিশীলতার পীঠস্থান হিসেবে গড়ে তোলার কাজে নিঃসন্দেহে আঘাত এনেছিল রঙ্গমঞ্চে নিম্নবর্গের নারীর অনুপ্রবেশ। যাত্রা, নাচ, ঝুমুরের মতো রুচিহীন লোককলার সঙ্গে নাটককে আলাদা করতে না পেরে হতাশ হল বুদ্ধিজীবী সমাজ। নাট্যমঞ্চের আঙ্গিনায় নারীর পুণঃপ্রতিষ্ঠা হল।

বাস্তবের মতো বা ইল্যুশনিস্ট থিয়েটার বানানোর নান্দনিক প্রয়োজনটি মান্যতা দিতে মেয়েদের প্রয়োজন ছিল। নারীর মঞ্চে আগমন অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। মঞ্চের গঠন, মঞ্চসজ্জা, পোশাক, নাট্য বিষয় সর্বত্র ইউরোপীয় বাস্তবকে দেখার ধরনের বিতর্কটির প্রভাব লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠেছিল। এই সূত্রে নাট্য মঞ্চসজ্জারক্ষেত্রেও এই বিবর্তনটিকে নিয়ে চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি পেশাদারি নাট্য গোষ্ঠীর ব্যবসায়িক লাভের দিকটিকে গ্রাহ্যতা দিতেও মঞ্চে মেয়েদের আনতেই হত। নাট্য কর্মীদের নাট্য পেশাটিকে বাঁচিয়ে রাখতে নাটকে মেয়েদের না এনে উপায়ও ছিল না। এবং বারবণিতা গোষ্ঠীর মেয়েরা ছাড়া আর কোনো মেয়ে নাটকে অভিনয়ের জন্য পাওয়াও যেত না। ফলে বেশ্যা-অভিনেত্রীদেরকেই মঞ্চে আনতে হয়েছিল। এই নিচুতলার মেয়েদের

ভদ্রসমাজের সংস্কৃতি জগতে ঢুকতে দেওয়ায় সম্ভ্রান্ত বাঙালির নৈতিকতা প্রবলভাবে আঘাত পেল। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২২শে আগষ্ট তারিখের *ভারত-সংস্কারক* সাপ্তাহিক পত্রে লেখা হচ্ছে: 'এপর্য্যন্ত আমরা যাত্রা, নাচ, কীর্তন, ঝুমুরেই কেবল বেশ্যাদিগকে দেখিতে পাইতাম, কিন্তু বিশিষ্ট বংশীয় ভদ্রলোকদিগের সহিত প্রকাশ্যভাবে বেশ্যাদিগের অভিনয় এই প্রথম দেখিলাম। ভদ্রসন্তানেরা আপনাদিগের মর্য্যাদা আপনারা রক্ষা করেন ইহাই বাঞ্ছনীয়'।

বাংলা থিয়েটারে নারীর এই পুণঃপ্রতিষ্ঠা ঘটালেন কোন্ শ্রেণীর মানুষেরা? রিমলি ভট্টাচার্যের পর্যবেক্ষণে এর স্পষ্ট নির্দেশ আছে (*My Story My Life* 10)। তিনি বলছেন, সাধারণ রঙ্গালয়ের উদ্যোগী যুবাদের কয়েকজন সঙ্গীতশিক্ষায় তালিমপ্রাপ্ত মানুষ ছিলেন। প্রাক-ব্রিটিশ যুগের রাজসভার সঙ্গীতজ্ঞদের উত্তরসূরীরা এই সংস্কৃতি জগতের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে থাকলেন। আবার একদল মানুষ ছিলেন, সম্পন্ন পরিবারের সদস্য। এঁরা উচ্চবিত্ত বুদ্ধিজীবী নন, কিন্তু কোনো না কোনো ভাবে উচ্চবিত্ত পরিবারের সঙ্গে যুক্ত। উচ্চবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা সাহিত্য, ধর্ম, সভা-সমিতি, প্রকাশনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। সাধারণ রঙ্গালয়ের যুবকরা তাঁদের মতো কার্যকলাপে উৎসাহী ছিল না। আবার সাধারণ চাকুরীজীবীদের মতো 'white collar job' পাওয়ার মতো পড়াশোনাও করেননি। অনেকেই স্কুল ছেড়ে দিয়েছেন বা স্কুল থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। তাঁদের বেশিরভাগই প্রথাগত অফিস চাকরি করতে চাননি। অন্য কোনো ধরনের গতানুগতিক পেশা তাঁরা নিতে চাননি বা নিতে পারেননি। '...they were willing to endure physical hardship for their beloved theatre' (R. Bhattacharya, *My Story and My life* 10). এই শ্রেণীর নাট্যযুবারাই মেয়েদের জন্য আরও একবার থিয়েটার জগতের দরজা খুলে দিলেন। উচ্চবর্ণ হিন্দু ভদ্রসন্তানরাই সাধারণ মানুষের রুচিকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থিয়েটারকে শুচিতার উচ্চ আসন থেকে সরিয়ে নিয়ে সাধারণের আঙ্গিনায় নিয়ে এল। সমাজের ধর্মনীতিঘাতক এই যুবকদের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল পত্রিকাগুলো। *অমৃতবাজার পত্রিকা* ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী এই বিতর্কে খানিকটা মধ্য পন্থা অবলম্বন করে লিখছে, 'রঙ্গভূমিতে স্ত্রীলোকের অংশ স্ত্রীলোকের দ্বারা অভিনীত হইলে অভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর হয়। কিন্তু এই স্ত্রীলোকের অংশ সকল সমাজপরিত্যক্ত ধর্ম-ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা অভিনীত হইলে জনসমাজে পাপ ও অমঙ্গল বৃদ্ধি হয় কিনা, তাহা পরীক্ষাসাপেক্ষ। ...... নাটকাভিনয়ের উন্নতি করিতে গিয়া যদি সমাজের একজন লোককেও আমাদের পরিহার করিতে হয়, তাহা হইলে সে ক্ষতির আর পুড়ন করা হইবে না'। *মধ্যস্থ* পত্রিকার সম্পাদক মনমোহন বসু সে যুগে যাত্রা, আফ-আখড়াই, থিয়েটার, পাঁচালীতে পারদর্শী ছিলেন। তিনিও এই বিষয়ে কোনো দ্বিধা না রেখে তীব্র মন্তব্য করে লিখলেন:

> সত্যকার রমণীকে রমণী সাজাইলে দেখিতে শুনিতে সর্বপ্রকারেই ভাল হয়। এ দেশে কুলজা কামিনীকে অভিনেত্রীরূপে প্রাপ্ত হওয়া এক কালেই অসম্ভব, স্ত্রী অভিনেত্রী সংগ্রহ করিতে গেলে কুলটা বেশ্যাপল্লী হইতেই আনিতে হইবে। ভদ্র যুবকগণ আপনাদের মধ্যে বেশ্যাকে লইয়া আমোদ করিবে, বেশ্যার সঙ্গে একত্র সাজিয়া রঙ্গভূমিতে রঙ্গ করিবেন, বেশ্যার সঙ্গে নৃত্য করিবেন, ইহাও কি কর্ণে শুনা যায়? ইহাও কি সহ্য হয়? ... চিরকাল স্বভাবের বিরোধী যাত্রাওয়ালারা জঘন্য অভিনয় প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত থাকে, সেও ভাল, তবুও যেন এমন দুষ্প্রবৃত্তিসাধক ধর্মনীতিঘাতক ঘোর লজ্জাজনক প্রথাকে আমাদিগের এই জাতীয় নাট্যসমাজ অথবা অন্যান্য অভিনেতৃসমাজ অবলম্বন না করেন। (qtd. in Maitra 9)

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মঞ্চে মহিলা আসাটা হয়তো ততটা সমস্যার নয়। 'সত্যকার রমণীকে রমণী সাজাইলে দেখিতে শুনিতে সর্বপ্রকারেই ভাল হয়'। কিন্তু গৃহের আঙ্গিনার মধ্যে একজন নিচু তলার মানুষের শিল্পী হিসেবে 'প্রকাশ্যভাবে' নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে তোলাটাই হয়তো মূল সমস্যা। বিশেষত বারবণিতাদের জীবনে একটি 'বিকল্প পেশা' হিসেবে এই থিয়েটার শিল্পকে প্রতিষ্ঠিত করাটাই প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ১৮৭৩ ১৮ই অগাস্ট 'বেঙ্গল থিয়েটার'-এ মেয়েদের অংশগ্রহণ করা নিয়ে *হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকা* লিখল: 'It is true that professional women join the jattras and natches, but we had hoped that the managers of the Bengali theatres would not bring themselves down to the level of the Jattrawallas' (B. Banerjee, *Bangiya Natyshalar Itihas* 157)।

স্পষ্টত প্রতিভাত, থিয়েটারে মেয়েদের অভিনয় করা নিয়ে প্রতিবেদক ক্ষুব্ধতা প্রকাশ করছেন না। তাঁর মূল আপত্তি সম্ভবত 'professional women' বা 'পেশাদার মহিলা'দের নিয়ে। পেশাদার মহিলা বলতে তিনি বারবণিতাদেরই নির্দেশ করছেন, এ কথা অনায়াসে বোঝাই যাচ্ছে। নাট্য গবেষক কিরণ্ময় রাহা এই সূত্রে লিখছেন, 'Considering the climate of social opinion of the times, it was courageous on the part of Bengal Theatre to have engaged... 'professional women' (25)। যদিও এত অবহেলা ঘৃণা সত্ত্বেও বাঙালি সমাজের একটি অংশের সাহচর্য ও উৎসাহে নিম্নবর্গের কিছু মানুষ শিক্ষিত সমাজে জনপ্রিয়তা পান। অভিনেত্রীদের অথবা লোক গায়িকাদের একটি ক্ষুদ্র অংশের প্রতিনিধিরা বাংলা নব্য চর্চিত নাট্য সমাজে আদরণীয় হয়ে ওঠে।

জমিদারের বাড়ির ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে নাটক যখন সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে চলে এল তার কিছুকাল পর থেকেই শত প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও নিম্নবর্গের মহিলা শিল্পীদেরই আপন করে নিল কলকাতার নাট্য দর্শক। সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছে গেলেন বিনোদিনী দাসী, সুকুমারী দত্ত বা কুসুমকুমারীর মতো বারাঙ্গনা-অভিনেত্রীরা। তাঁদের মূল পেশার পাশাপাশি তাঁদের নাট্য চর্চা জনমানসে এক গভীর শ্রদ্ধার স্থান পেয়েছিল, এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই। যদিও তাঁরা তাঁদের বারবণিতা অস্তিত্বকে ঘৃণা করে, সেই জীবনকে অস্বীকার করে নাট্য অভিনেত্রী জীবনকে মহিমান্বিত করে দেখতে পেরেছিলেন বলেই ভদ্র সমাজে তাঁদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে পেরেছিল। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত নাট্য উদ্যোগী যুবকরা তাঁদের আধুনিক ভারতীয় নারীদের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে থাকেন। নিজেদের অপর পেশাটিকে ঘৃণা করতে শেখান। এই সূত্রে সুমন্ত ব্যানার্জী লিখছেন, 'কিন্তু মনে রাখতে হবে, এঁরা সকলেই এই সম্মানীয় অবস্থায় পৌঁছতে পেরেছিলেন নিজেদের অতীত সাংস্কৃতিক সত্তাকে খর্ব করে। খোল-নোলচে পালটিয়ে, ঘষে-মেজে নতুন মানুষে তৈরি হতে বাধ্য হয়েছিলেন, তদানীন্তন শিক্ষিত বাঙালি সমাজের গৃহীত 'সভ্য' 'পরিমার্জিত' আদর্শের চাহিদা অনুযায়ী... এইভাবেই এঁরা শিক্ষিত বাঙালির নতুন সংস্কৃতির পরিমণ্ডল—থিয়েটারে—প্রবেশলাভ ও স্থান করে নেবার অধিকার পেয়েছিলেন। এটাই ছিল তাঁদের বাঁচার উপায়' (*Itar Santan* 141)।

যে নিম্নবর্গের মানুষেরা, বিশেষত যে মহিলা শিল্পীরা এই গতে স্থান করে নিতে পারেননি, যাঁরা মধ্যবিত্ত নাট্য প্রেমী যুবাদের সান্নিধ্যে আসতে পারেননি, তাঁরা সরে গেছেন নিজেদের আদি পেশা থেকে। হারিয়ে গেছেন কলকাতার নাগরিক সংস্কৃতির ইতিহাস থেকে। যদিও তাঁদের চর্চিত সংস্কৃতিগুলি বহন করতে থাকল বাংলা থিয়েটার। বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের নাটকগুলি, বিশেষ করে গিরিশ ঘোষের পৌরাণিক নাটকগুলিতে লোকশিল্পীদের অভিনয়ের ধরন ও বৈশিষ্ট্য অনুসৃত হয়েছে আরও বহু বছর। যাত্রা বা কথকতার ধরনটিকে অনুসরণ করেই বাঙালির থিয়েটারের পরিবেশনা চলতে থেকেছে আরও বেশ কিছু কাল। থিয়েটার শিল্পের বাকি উপাদানগুলির সাথে সাথে মঞ্চসজ্জার ক্ষেত্রে যে লোকশিল্প, লোকশিল্পী ও লোকসংস্কৃতির প্রভাব থেকে গেছিল, সেই বিষয় নিয়ে চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত হিন্দু ইংরেজি শিক্ষিত থিয়েটার অনুরাগী মানুষেরা কলকাতা শহরে যেভাবে নিজেদের থিয়েটার গড়ে তুলেছিলেন, তার মঞ্চসজ্জার ক্ষেত্রে কিভাবে লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলি অনেকাংশে প্রভাব বিস্তার করেছিল, সেই বিষয় নিয়ে লিখিত বর্তমান গবেষণার চতুর্থ অধ্যায়টি লক্ষ্যণীয়। সেই সূত্রে বোঝা যাবে, লোকনাটকের পরিবেশনার যে আঙ্গিক ও বিশিষ্টতা ছিল, বাংলা থিয়েটারে সেসব বৈশিষ্ট্যগুলি মিলে মিশে রয়ে গেল;

সংস্কৃতি বাদ পড়ল না, মিশে রইল থিয়েটার চর্চায়। শুধু বাদ পড়ল মানুষগুলো, বাদ পড়ল সেই লোকসংস্কৃতির লোকশিল্পীদল।

ইংরেজি 'থিয়েটার'-প্রভাবিত বাংলা 'থিয়েটার'-এ লোকসংস্কৃতির প্রভাব কীভাবে 'থিয়েটার'-কে প্রভাবিত করেছে সেই আলোচনায় অবশ্যই চোখ রাখতে হয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাট্যকর্মের দিকে। গিরিশচন্দ্রের অভিনয়জীবনের শিক্ষাকালীন সময়টিকে বর্ণনা করতে গিয়ে জীবনীকার অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখছেন, 'সেই সময় কলিকাতায় যেমন স্থানে স্থানে থিয়েটার হইতেছিল, সেইরূপ আবার স্থানে স্থানে সখের যাত্রাও হইতেছিল। থিয়েটার অপেক্ষা যাত্রার খরচ অনেক কম পড়িত। গিরিশবাবু, নগেন্দ্রবাবু, ধর্ম্মদাস সুর, রাধামাধব কর প্রভৃতি বন্ধুগণ মিলিত হইয়া ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বাগবাজারে একটি সখের যাত্রা সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন' (*Girishchandra* 58)। অর্থাৎ সেই সময়ের 'থিয়েটার' উৎসাহী হয়ে ওঠা নব্য মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষেরা অভিনয়ের জন্য প্রথম সমবেত ভাবে প্রচেষ্টা করেন আধুনিক যাত্রাপালা আয়োজনের মাধ্যমে। সেই সময়ে সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়নি। যদিও ইতিমধ্যেই জমিদারের আঙ্গিনার নাটকে 'থিয়েটার' দর্শনের সুযোগ করে নিয়েছে এই বাঙালি যুবারা। নিজেদের প্রচেষ্টায় 'থিয়েটার' উদ্যোগের শুরুতেই তারা অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করছে যাত্রাপালার আঙ্গিককেই। নাটক হিসেবে বেছে নেওয়া হচ্ছে, মধুসূদনের *শর্মিষ্ঠা* নাটক। উৎপল দত্তের ব্যাখ্যায়, 'This at once marks off Girish from the usual practitioners of Yatra of his time' (*Girish Chandra Ghosh* 11)। দত্তর বর্ণনা থেকে জানা যায়, গিরিশ ছিলেন মনোমোহন বসুর শিষ্য, যিনি প্রথম উনিশ শকের বাংলা যাত্রা ও থিয়েটারের একটি সংশ্লেষ ঘটানোর প্রচেষ্টা করেছিলেন। ফলে গিরিশের নাট্যক্রিয়ায় মনোমোহন বসুর যাত্রার আঙ্গিক ও নতুন 'থিয়েটারের' মিশেল থাকার সম্ভাবনা হয়তো ছিল। আর তারই ফলাফলস্বরূপ তিনি যাত্রার আঙ্গিকে অভিনয় করার চেষ্টা করলেন মধুসূদন দত্ত রচিত *শর্মিষ্ঠা* নাটকটি। এই *শর্মিষ্ঠা* নাটকটি বাংলা ভাষায় রামনারায়ণ তর্করত্নের প্রথাগত সংস্কৃত নাটকের ধরন থেকে সরে এসে নতুন থিয়েটার রচনশৈলির একটি প্রথম ব্যতিক্রমী প্রয়াস। তেমন *বিদ্যাসুন্দর*-এর প্রেম বা কৃষ্ণের লীলা বিষয়ক যাত্রা কর্ম থেকে সরে এলেন গিরিশ অন্তত বিষয়গত ভাবে। কিন্তু যাত্রার ধরনটিকে রক্ষা করলেন *শর্মিষ্ঠা* নাটকে কিছু গান সংযোজনের মধ্যে দিয়ে। পরবর্তীকালে গিরিশের *মণি-হরণ* নাটকে আঠাশটি গান সংযোজন করা বা *উষাহরণ*-এ ছাব্বিশটি গান বেঁধে দেওয়ার চর্চাটি কোথাও যেন তাঁর যুবকজীবনে কথকতা, রামায়ণগান শোনা বা কবিয়ালদলে ও যাত্রাদলের প্রশিক্ষণ নেওয়ার কথাই মনে করায়; হাফ-আখড়াইয়ের কবি

ঈশ্বরগুপ্তের প্রতি গিরিশের আকর্ষণ কিংবা তাঁর নাটকের গানের ব্যবহার আধিক্য তাঁর নাট্যচর্চায় লোকসংস্কৃতির প্রভাবকে বোধহয় উপেক্ষা করতে পারে না। এই সূত্রে দর্শন চৌধুরীর এই পর্যবেক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ। দর্শন চৌধুরী বলছেন, 'ইংরেজি নাটক থেকে সৃষ্ট বাংলা নাটক ইংরেজিয়ানার দিকে মোড় ফিরেছিল। আবার জনরুচিতে ছিল তৎকালীন গীতাভিনয় যাত্রার আকর্ষণ। গিরিশ ইংরেজি নাটক এবং যাত্রার টানাপোড়েনে পথ হারাননি' (*Bangla Threatreer Itihas* 280)। পাশাপাশি উল্লেখ্য, যে বারবণিতা শ্রেণির মহিলাদের বাংলা থিয়েটার স্থান করে দেওয়া হয়েছিল, সেই মহিলারাও অনেকেই প্রথাগতভাবে লোকসংস্কৃতির সঙ্গীত প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন বলেই জানা যায়। সুকুমারী দত্ত নিয়েছিলেন কীর্তনগানের প্রশিক্ষণ, আবার বিনোদিনী পেয়েছিলেন গঙ্গাবাঈজির কাছে সঙ্গীত শিক্ষা। ফলে একথা মনে করার কারণ আছে যে, লোকশিল্পীদের থেকে নিজেদের সরিয়ে নিতে পারলেও তাঁদের চর্চিত সংস্কৃতিগুলি আরও বেশ কিছু বছর সরাসরি বহন করতে থেকেছিল বাংলা থিয়েটার।

উনিশ শতকের নাট্যকর্মীদের বারবণিতা গোষ্ঠীর সঙ্গে সংস্পর্শ ও তাঁদের বাহিত সংস্কৃতি নিয়ে যে সামাজিক অস্বস্তি, সেই সূত্রে সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায় আরও একটি সামাজিক আতংকের কথা নির্দেশ করছেন (Sudipto Chatterjee 197-198)। দর্শন চৌধুরীর একটি মন্তব্যকে বিশ্লেষণ করার সূত্রে তাঁর মত, বাংলা নাটকের নারীদের তেমন কঠিন বা জটিল চরিত্র দেওয়া হত না। নাটকের নারী চরিত্রগুলি বিশেষ নাটকীয় বৈশিষ্ট্যময় ছিল। সাদা সরল একরৈখিক চরিত্রেই নারীকে অভিনয় করতে দেওয়া হত। নাট্যকারেরা নাটক লেখার সময়ে নারী চরিত্রের মধ্যেকার নানা টানাপোড়েন বা আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের চিহ্ন পর্যন্ত রাখতেন না। নারী চরিত্র হত হয় কোনো 'দেবী', নয় এক 'পাগলিনী'। এমনকি, গিরিশ ঘোষের সামাজিক নাটকগুলিতেও মেয়েদের চরিত্রগুলি অত্যন্ত আড়ম্বরহীন। দর্শনের মতে, এই ধরনের সরলরৈখিক চরিত্র করতে অশিক্ষিত নিম্নমেধার অভিনেত্রীদের সুবিধে হত। নাট্য অভিনয়ের বিশেষ জ্ঞান না থাকায় নারীদের দিয়ে নাট্যকার কোনো কঠিন চরিত্র করানোর ঝুঁকি নিতেন না।

এই সূত্রে সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, নারীদের প্রতিভা বা জ্ঞানের অভাব নয়, একটি গভীর সামাজিক আতঙ্কের কথা ভেবেই নাট্যকারেরা নারীদের জন্য সহজ চরিত্র রাখতেন। তাঁর মতে, পৌরাণিক নাটকের দেবীরূপে বা পাগলিনীবেশে বেশ্যা-অভিনেত্রীদের উচ্চবিত্ত বাঙালী বাবু দর্শক মেনে নিতে পারে। কিন্তু সামাজিক নাটকের সাধারণ পরিবারের গৃহবধুর চরিত্রে একটি বারবণিতাকে মেনে নেওয়া হয়তো তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে নাটকের নারী চরিত্রগুলি হয় 'অত্যন্ত ভালো' বা 'ভালো নয়'—এই দুটি ভাগেই সীমাবদ্ধ ছিল। চরিত্রগুলি নিতান্তই

সাদামাটা ও ফাঁপা। যে চরিত্র 'বাবু'দের ঘরের আঙ্গিনার বাইরে সেই চরিত্রে সমাজ-বহির্ভূত নারী ভালোই অভিনয় করতে পারে। কিন্তু গৃহের মধ্যেকার যে নারীকে 'বাবু'রা সবসময় দেখে থাকেন—যেমন বাবুদের মা, বোন বা স্ত্রী—সেই চরিত্রে একজন বেশ্যা-অভিনেত্রীকে বাবু সম্প্রদায় কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। ফলে উনিশ শতকের সামাজিক নাটকের নারী চরিত্রগুলিও যেন পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাটকের নারী চরিত্রদের মতোই জটিলতাহীন, বৈচিত্র্যহীন একপেশে।

যদিও এই সূত্রে, গিরিশ ঘোষের লেখা বেশ কিছু নাটকে মহিলা চরিত্রগুলিকে ঠিক সরলরৈখিক সহজ স্তরবিন্যাসহীন চরিত্র বলে এক কথায় মেনে নেওয়া যায় কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ আসে। বিশেষ করে, *জনা* নাটকটিতে জনা চরিত্রের দৃপ্ত সংলাপ ও সমগ্র নাটকে সেই চরিত্রের যে আবেগ ও কঠোর আচরণের মিশেল, তা হয়তো অত্যন্ত সহজ আঙ্গিকে অভিনয় করাও সম্ভব বলে মনে হয় না। একই কথা হয়তো বলা যেতে পারে গিরিশের *প্রফুল্ল* বা *বলিদান*-এর নারী চরিত্রের ক্ষেত্রেও। কিংবা গিরিশের নাট্যরূপে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *মৃণালিনী* বা *বিষবৃক্ষ*-এর নারী চরিত্র অথবা উপেন্দ্রনাথ দাসের *শরৎ-সরোজিনী*-র ক্ষেত্রেও হয়তো নারী চরিত্রগুলির যে নিজস্ব স্বর ও সক্রিয়তা দেখা যায়, তা নিঃসন্দেহে 'দেবী' বা 'পাগলিনী'র তুলনায় অনেক বেশি জটিল, কঠিন ও নানা স্তরসমন্বিত বলেই মনে হয়।

তার মানে দেখা যাচ্ছে, বেশ্যা-অভিনেত্রীরা বাবু ভদ্রলোকেদের সঙ্গে 'প্রকাশ্য' ভাবে অভিনয় করলে এক মহা সমস্যা ছিলই। তার ওপর সেই অভিনেত্রী যদি বাবুর ঘরের পবিত্র মহিলার চরিত্রেও অভিনয় করে তাহলে বাবুদের সমস্যা আরও দ্বিগুণ হয়। মঞ্চের নারী চরিত্রটিকে একজন বেশ্যা অভিনয় করে দেখাচ্ছে, এই ভাবনাটিই বাবুদের পক্ষে যথেষ্ট অস্বস্তির। উচ্চবিত্ত নব্য বাঙালি গৃহের অভ্যন্তরে যে নারীকে নিয়ে সংসার গড়ে তুলেছে, হুবহু সেই রকম আদব-কায়দা, পোশাক-পরিচ্ছদ, কথা বলার ধরন অনুকরণ করে দেখাচ্ছে একজন নিকৃষ্ট শ্রেণীর বেশ্যা—এই ধারণাটিই উনিশ শতকীয় বাঙালি সমাজের আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ালো।

যদিও নাটকে গড়ে তোলা এই নারী চরিত্রগুলি অভিনয় করতে বারাঙ্গনা-অভিনেত্রীদের এক বিশেষ ধরনের প্রাপ্তি ঘটত বলে অনুমান করা যেতে পারে। এই বিশেষ প্রাপ্তির প্রসঙ্গে পরবর্তী অংশে বিনোদিনীর রচনাংশটি উল্লেখ্য। ব্যক্তিগত জীবনের দুর্বিপাকে জর্জরিত অভিনেত্রীরা নাট্যশিল্পের মধ্যে দিয়েই হয়তো নিজেদের জীবনের এক পূর্ণতা পাওয়ার খোঁজ করতেন। স্বামী ও সংসারের যে পরিমণ্ডল উচ্চবিত্ত হিন্দু বাড়ির মেয়েদের অনবরত মেনে চলতে হত,

সেই সংসার না পাওয়ার যন্ত্রণা ভুলিয়ে দিতে বা বলা ভালো সেই যন্ত্রণায় খানিক প্রলেপ লাগাতে থিয়েটার হয়তো খানিকটা সাহায্য করত। উচ্চ ও মধ্যবিত্ত ঘরের নারীর যে 'তৈরি করা রূপ' উনিশ শতকীয় সমাজে প্রবল প্রচলিত হয়ে উঠেছিল, সেই ধাঁচের চরিত্রে অভিনয় করার সুবাদে অভিনেত্রীরা সেই চরিত্রগুলির মনন মানসিকতা ও বৌদ্ধিক চর্চায় অবগাহন করার সুযোগ পেতেন। যে সংসার জীবন তারা বাস্তব জীবনে পেলেন না, সেই সংসার জীবনের রূপ রস রোমাঞ্চ যেন তাঁরা নাট্য বাস্তবতায় ছুঁয়ে দেখতে চাইতেন। এতে তাঁদের জীবনে একধরনের শান্তি হয়তো আসত, এক ধরনের সাফল্য সূচীত হত, এক ধরনের অর্জনের গরিমায় গৌরবান্বিত হওয়ার সুযোগ হয়তো হত।

'নিষ্কলুষ' ইতিহাস রচনা

সুতরাং থিয়েটারে মেয়েদের আসা নিয়ে এই বিশ্লেষণগুলো থেকে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, লড়াইটা সমগ্র মহিলা সম্প্রদায়ের নয়। সূক্ষ্ম বিচারে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, লড়াইটা আসলে 'বারবণিতা' গোষ্ঠীর। সমাজে 'বিকল্প পেশা' হিসেবে বাবুদের থিয়েটার পাড়ায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার লড়াই। আজও এই লড়াই বিদ্যমান। সমাজে আজও বেশ্যাদের সম্মানজনক প্রতিষ্ঠার লড়াই নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। কিন্তু সমস্যা হল, 'বাংলা থিয়েটারে বেশ্যাদের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লড়াই'টাকে 'বাংলা থিয়েটারে সমস্ত মেয়েদের প্রতিষ্ঠার লড়াই' হিসেবে সমবিচারে ফেলা হল কেন? একটি 'বেশ্যার লড়াই' আর 'সামগ্রিক নারীগোষ্ঠীর লড়াই'কে এক মাপকাঠিতে ফেলে দিয়ে আসলে কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা চলল? ঐতিহাসিক তথ্য ও নিদর্শনগুলো আপাদমস্তক নিচুতলার মানুষের সংগ্রামের ঘটনাকে সূচীত করছে বলে মনে হচ্ছে। অথচ সেই তথ্যগুলোকে ভিত্তি করেই যখন ইতিহাস রচনা করা হচ্ছে, তখন মূল সত্য থেকে সন্তর্পণে সরে আসার প্রয়াস চোখে পড়ছে না কি?

'অভিনেত্রী', 'নারী' ও 'বেশ্যা' এই তিনটি সামাজিক বিভাগকে এক গোত্রে ফেলে দিলে কি সত্যের অপলাপের সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে না? একজন উচ্চবর্গের উচ্চবিত্ত পরিবারের নারীর অভিনেত্রী হয়ে ওঠার প্রতিকূলতা ও একজন নিম্নবর্গের বেশ্যার অভিনেত্রী হয়ে ওঠার প্রতিবন্ধকতাকে কি সত্যি একই নিক্তিতে মাপা যায়? অথচ বাংলার অভিনেত্রীদের নিয়ে বেশিরভাগ ঐতিহাসিক বর্ণনাতেই দেখা যায় এই অমনোযোগ। কিংবা গভীর কোনও উদ্দেশ্যেই 'বেশ্যার লড়াই' ও 'অভিনেত্রীর লড়াই'-কে এক করে দেখার এই প্রচেষ্টা। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের অনেক জায়গাতেই খুব আলগাভাবে 'বেশ্যা'র স্থানে 'নারী' শব্দটি বা 'মেয়ে' শব্দটি বা 'অভিনেত্রী' শব্দটি বা এই শব্দগুলোর সমমর্যাদার

শব্দ ব্যবহার করে বেশ্যার সংগ্রামকে সমগ্র নারী সমাজের সংগ্রামের সঙ্গে এক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা হয়েছে বলে মনে হয়।

যেমন অমিত মৈত্রের বর্ণনায়, ‘***অভিনেত্রীদের*** মঞ্চাবতরণ কটু-কাটব্যের পরিবেশ সৃষ্টি করল’ (Maitra 7)। অন্য এক জায়গায় অমিত মৈত্রের বিবরণীতে, ‘এত সমালোচনা, এত কটুকাটব্যের ঝড়, নিন্দাসর্পের দংশন—সব-কিছু উপেক্ষা করেই বঙ্গরঙ্গমঞ্চে ***রঙ্গনায়িকারা*** অধিকার আদায় করে নিলেন’ (Maitra 9)। দর্শন চৌধুরী এই সূত্রে লিখছেন, ‘মঞ্চে ***অভিনেত্রী*** গৃহীত হলে সমাজে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হয়। নাট্যাভিনয়ের প্রয়োজনে নারীচরিত্রে মেয়েদের অবশ্য প্রয়োজন। ... কিন্তু সে যুগে ভদ্র গৃহস্থ ঘরের মেয়েদের অভিনয়ের ক্ষেত্রে পাওয়া সম্ভব না হওয়াতে বেঙ্গল থিয়েটার বারাঙ্গনা পল্লী থেকে এই অভিনেত্রীদের যোগাড় করে। তাতেই সমাজপতিদের দুশ্চিন্তার মাত্রা বেড়ে যায়; ... কিন্তু ***অভিনেত্রীদের*** মঞ্চ থেকে বিদায় করা যায় নি। বরং বাংলা মঞ্চে ***অভিনেত্রী*** পাকাপাকিভাবে নিজের জায়গা পাকা করে নিয়েছিল’ ((D. Chowdhury, *Bangla Theatreer Itihas* 108)। অমিত মৈত্র আরেক স্থানে বলছেন, ‘ফলে ***নারীর*** কাছ থেকে মঞ্চের অধিকার কেড়ে নেওয়া হল’ (Maitra 5)। *বেঙ্গল থিয়েটার* নারীদের অভিনেত্রী হিসেবে গ্রহণ করার ঘটনাকে বর্ণনা করতে গিয়ে দর্শন চৌধুরী লিখছেন, ‘সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রথম ***অভিনেত্রী*** গ্রহণ করে বেঙ্গল থিয়েটার অভিনব ও দুঃসাহসিক কাজ করেছিল। ... পরবর্তী বাংলা থিয়েটারে অভিনেত্রী দিয়ে অভিনয় সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল’ (*Bangla Theatreer Itihas* 113)।

উদাহরণগুলো থেকে বোঝা যাচ্ছে, যে নারী গোষ্ঠীর লড়াই নিয়ে বাংলা থিয়েটারে প্রবল বিতর্ক তৈরি হয়েছিল, সেই নারী গোষ্ঠীর শ্রেণিগত অবস্থানকে কার্যত ভুলে যাওয়ার একটি প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য এই ইতিহাস রচনাকারদের রচনায় প্রতিভাত হচ্ছে। বারবণিতা পরিবারের মেয়েটির সঙ্গে আপামর অভিনেত্রী সমাজের অস্তিত্বকে গুলিয়ে দেওয়ার একটি অতি সূক্ষ্ম প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এটা কেন হল? সম্ভবত নাট্য ইতিহাসকার ও তৎকালীন নাট্য কর্মীরা বারবণিতাদের খানিকটা উচ্চ ভাবধারায় প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করছিল। থিয়েটারকে উচ্চধারার শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য নিয়ে তার থেকে সমস্ত কলুষ মুছে ফেলতে চেয়েছিল তৎকালীন নাট্যকর্মীরা। যাত্রাওয়ালাদের থেকে আলাদা এবং অত্যন্ত উন্নতমানের শিল্প জগতের অধিকারী হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল তারা। আর তাই অভিনেত্রীদের ‘বেশ্যাবৃত্তি’র পেশাটিকে খানিকটা প্রছন্ন করে রাখার দায় তাদের থাকতেই হত। অভিনেত্রীদের বারবণিতার জীবনের ইতিহাসকে খানিক গুরুত্বহীন করে রেখে তাঁদের চারিত্রিক উচ্চভাব প্রচার করার দায় হয়তো

তাদের ছিল। তাই অভিনেত্রীদের বারাঙ্গনা জীবনকে 'অভিশপ্ত' আখ্যা দিয়ে নবজীবনদানের সামাজিক ভূমিকা পালনের মহৎ উদ্দেশ্যে তারা অভিনেত্রীদের চরিত্র ও রুচিশীলতাকে 'ভদ্রমহিলা'দের মানদণ্ডে বসানোর চেষ্টা করে গেছিল। নট-নাট্যকার অমৃতলাল বসুর স্মৃতিকথা থেকে একটি বর্ণনা এইরকম:

> আমার নিজের একটা ভয়ানক ভুল ধারণা ছিল যে, যে-শ্রেণীর নারীর মধ্য হইতে অভিনেত্রী নির্বাচন করা হবে, তারা নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল ...... কিন্তু অভিনেত্রীরা রিহার্সাল আরম্ভ করার দু' সপ্তাহের মধ্যেই আমার সে সব ভ্রম দূর হয়ে গিছল। ... তাদের সকল বিষয়ে নিয়মানুবর্তিতা, শিক্ষালাভের পিপাসা ও যত্ন এবং কর্মস্থলে শ্লীলতারক্ষা, সহজভাব দেখে আমাদের মধ্যে অনেক পুরুষকেও নিজ নিজ চরিত্র সম্বন্ধে সাবধান হতে হয়েছে। (*Smriti O Atmasmriti* 198)

অর্থাৎ হীনজন্মা বারবণিতারা দরিদ্র হতে পারে, উৎপীড়িত হতে পারে, কিন্তু তাঁদের নিয়মানুবর্তিতা, শিক্ষালাভের পিপাসা, শ্লীলতারক্ষার ভাবটি কোনও উচ্চশ্রেণীর ভদ্রমহিলার থেকে কম কিছু নয়। তাঁদের শুচিতা, সতীত্ব ও রুচিবোধ প্রচার করে সেই সময়ে অভিনেত্রীদের পুরুষ সহকর্মীরা আসলে এই মেয়েদের মধ্যেকার উনিশ শতকীয় 'ভদ্রমহিলা' ইমেজটিকে বের করে আনতে চাইল। তাঁদের প্রতি অমৃতলালের সহমর্মিতা আছে, শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু তার থেকে বেশি যা আছে, তা হল, নিজেকে এবং নিজের শিল্পমাধ্যমে সংযুক্ত সহকর্মিনীকে সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার দায়। সমাজের বুকে নিষ্কলুষ শিল্পমাধ্যম হিসেবে থিয়েটারকে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে, যাত্রাওয়ালাদের তুলনায় নিজেদেরকে উচ্চস্থানে স্থাপন করতে গেলে, থিয়েটারের সমস্ত বিভাগকে পরিশীলিত, পরিচ্ছন্ন ও অকলঙ্কিত করে তুলতেই হবে। নাটকের পাণ্ডুলিপি নির্বাচন করা থেকে অভিনেত্রী নির্বাচন করা পর্যন্ত সর্বত্রই তাদের এই প্রয়াস লক্ষিত হয়।

শুধু এই অভিনেত্রীদের সম্পর্কে লেখালেখিতেই সীমাবদ্ধ থাকেননি এই নাট্যকর্মীরা। বেশ্যাবৃত্তি থেকে আসা মেয়েদের মধ্যে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শিক্ষা রুচি মূল্যবোধের প্রশিক্ষণও দিতে শুরু করে তারা। নাটকে ভদ্রলোকের ঘরের মেয়ে বা গৃহিণী চরিত্রে অভিনয় করার জন্য তাঁরা ভদ্রবাড়ির মেয়েদের মতো আচার আচরণ, মানসিকতা ও বাংলা ভাষা বলা আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন। উচ্চবিত্ত বাড়ির মেয়েদের জন্য যে 'পবিত্রতা' ও 'শুদ্ধতা'র মানদণ্ড তৈরি করা হয়েছিল সেই সময়ের সমাজে, সে আদর্শগুলিকে ভীষণ রকম আত্মস্থ করার চেষ্টা করেছিলেন অভিনেত্রীরাও। কেউ কেউ তাঁদের নাট্য জগতের অভিনয় শিক্ষকের কাছে এই তালিম পেতেন। এভাবে অভিনেত্রীরা এটি বিশিষ্ট

নতুন ‘নিম্নজাতিগোষ্ঠী’র জন্ম দিল। রিমলি ভট্টাচার্যের লেখনীতে, ‘...the actress represented a new underclass: she was almost exclusively trained by Bengali males and her art and livelihood lay in the display of her body, her self’ (*Public Women* 303)। কেউ কেউ তাঁর রক্ষক ‘বাবু’-টির কাছে থাকতে থাকতে নিজেকে উঁচুবাড়ির মেয়েদের মানসিকতা, চেতনা ও ভাবধারায় উন্নীত করে ফেলতেন। আদি জীবনের ক্ষুদ্র দিনযাপন থেকে সরে এসে তাঁরা উচ্চবিত্তের মননশীলতায় সজ্জিত হয়ে উঠতেন। বিনোদিনীর নিজ জীবন বর্ণনায় এই বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়:

> আমার অন্য কথা বা অন্য গল্প ভাল লাগিত না। গিরিশবাবু মহাশয় যে সকল বিলাতের বড় বড় অভিনেতা বা অভিনেত্রীদের গল্প করিতেন, যে সকল বই পড়িয়া শুনাইতেন, আমার তাহাই ভাল লাগিত। ...... এলেন্টারি কিরূপ সাজ-সজ্জা করিত, ব্যাণ্ডম্যান কেমন হ্যামলেট সাজিত, ওফেলিয়া কেমন ফুলের পোষাক পরিত, বঙ্কিমবাবুর ‘দুর্গেশনন্দিনী’ কোন পুস্তকের ছায়াবলম্বনে লিখিত, ‘রজনী’ কোন ইংরাজী পুস্তকের ভাব সংগ্রহে রচিত, এই রকম কত বলিব গিরিশবাবু মহাশয়ের ও অন্যান্য স্নেহশীল বন্ধুগণের যত্নে ইংরাজী, গ্রীক, ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মানি প্রভৃতি বড় বড় অথরের কত গল্প যে আমি শুনিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। (Dasi 31)

অবশ্য অভিনেত্রীরা নিজেরাও তাঁদের বেশ্যা জীবনের কুৎসিত পরিমণ্ডল থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ খুঁজতেন। নিজেদের আত্মজীবনী রচনাতেও তাঁদের এই আকাঙ্ক্ষার কথাটি যথেষ্ট প্রতিফলিত হয়। সমাজের অবহেলিত অবাঞ্ছিত গোষ্ঠীর বেড়াজাল থেকে পালিয়ে তাঁরা উন্নততর সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন। তাঁদের নিজেদের লেখাতেও এই ধরনের বহু বয়ান খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। বিনোদিনীর মতো আরও অন্যান্য অভিনেত্রীদের রচনার প্রতি পদে তাঁদের পতিতা জীবনের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও বিরূপতা লক্ষ্য করা যায়। যদিও এই সূত্রে বিচার্য, অভিনেত্রীদের নিজেদের জীবন সম্পর্কে প্রায় সমস্ত লেখাই তাঁদের ‘পরিবর্তিত জীবন’-এ উপস্থিত হওয়ার পরের লেখা। নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নাট্য প্রেমিক যুবকদের সান্নিধ্যে থিয়েটার পরিমণ্ডলে দীর্ঘ সময় কাটানোর পরে অভিনেত্রীরা কলম ধরেছেন। তাই তাঁদের রচনাতে যে বক্তব্য উঠে আসে, তা কতটা তাঁর নিজের স্বর, কতটা তাঁর সম্প্রদায়ের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছে, আর কতটা তাঁর সহকর্মী মধ্যবিত্ত সহ-অভিনেতার স্বরকে প্রতিফলিত করছে, সে ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল।

তবে এ কথা সম্ভবত অনস্বীকার্য যে, নিচুজাতের মানুষ উঁচুজাতের মানুষদের সমাজে প্রবেশ করার বিন্দুমাত্র সুযোগ পেলে তার সদ্‌ব্যবহার করতে চাইতে পারে। সমাজের জাতি-ধর্ম ব্যবস্থায় নিচুগোষ্ঠী সুবিধেভোগী শ্রেণির কাছাকাছি আসতে চাওয়ার ঐতিহাসিক প্রবণতাটি রয়ে যায় বলেই মনে হয়। বেশ্যা-অভিনেত্রীদের ক্ষেত্রেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়ার কোনও কারণ ছিল না, এ কথা অনুমান করা যেতে পারে। আগের অংশে উল্লিখিত বিনোদিনীর রচনায় এমনই এক 'উন্নীত' হওয়ার বাসনাময় উদাহরণের ছাপ পাওয়া যায়। এমনকি, এই গোষ্ঠীর মানুষেরা অভিনয় জগতে মোটামুটি খ্যাতি পেলেই কিংবা কোনো উচ্চবিত্ত 'বাবু'-র আশ্রয় পেয়ে গেলেই তাঁরা তাঁদের আদি বাড়িটি ত্যাগ করে অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হতে চাইতেন বলেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জানা যায়। এই সূত্রে ইন্দুবালা নিঃসন্দেহে একটি ব্যতিক্রমী নাম। বিশ শতকে খ্যাতনামা গায়িকা ও অভিনেত্রী ইন্দুবালা প্রবল জনপ্রিয়তা ও অর্থলাভের পরেও তাঁর রামবাগানের নিষিদ্ধপল্লীর আদি বাড়িটি ছেড়ে যাননি। তিনি লিখছেন,

> দুনিয়া সুদ্ধ সকলে বলে যে আপনি ভদ্রপল্লীতে যান, স্কুল করুন, আপনার জিনিস সব দান করুন, শেখান, ইত্যাদি, ইত্যাদি। তা কি হয় নাকি? দিদিমা বনবিষ্ণুপুর হতে এসেছিলেন, চাটুজ্জেদের বাড়ির মেয়ে ও মুখুজ্জেদের বাড়ির বৌ হয়ে। পরে বিধবা হয়ে এই পাড়ায়, তিন পুরুষের বাস কি ভাঙতে পারি!... মানা অর্থাৎ প্রণব সেও জানে যে তার জীবনে সে যখন অভিজাত পাড়ায় বাড়ি করবে তখন তার এই মা কোনদিন যাবে না। শেষ জীবনে কোথায় মরব জানি না, তবু এই পাড়ায় মরবার আশা রাখি (Sengupta 219)।

এক দিকে খ্যাতি অন্য দিকে নিষিদ্ধপল্লির ক্লেদ—এই দুইয়ের সহাবস্থানেই ছিল ইন্দুবালার জীবন। কিন্তু ইন্দুবালা ছাড়া আর সমস্ত অভিনেত্রীই নিজেদের বেশ্যা জীবনকে ঘৃণা করতে চেয়েছেন। নিজে ও নিজের সন্তানকে অনেকেই বেশ্যা জীবনের ঘৃণ্য পরিবেশ থেকে মুক্ত করার প্রাণপণ চেষ্টা করে গেছেন। থিয়েটার তাঁদের কাছে সেই 'মুক্ত' জীবনের হদিশ হয়ে দেখা দিয়েছে।

এই সূত্রে আরও একটি উদাহরণ অবশ্য উল্লেখ্য। *গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে* উপেন্দ্রনাথ দাসের *শরৎ-সরোজিনী* নাটকের এক অন্যতম অভিনেতা গোষ্ঠবিহারী দত্তের সঙ্গে তৎকালীন জনপ্রিয় নায়িকা গোলাপসুন্দরীর ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে আইনানুসারে বিয়ে হয় (S. Dutta 11)। *শরৎ-সরোজিনী* নাটকের সুকুমারী চরিত্রে অভিনয় করে গোলাপসুন্দরী সবার কাছে 'সুকুমারী' নামে বিখ্যাত হয়ে যান। তারপর গোষ্ঠবিহারী দত্তের সঙ্গে বিয়ে হওয়ায় তাঁর পুরো নাম হয়ে দাঁড়ায় 'সুকুমারী দত্ত'। মঞ্চের কল্পিত অস্তিত্বকে অভিনেত্রীর নিজের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার

এই ঘটনাটিকে নিয়ে রিমলি ভট্টাচার্যের বিশ্লেষণ, 'The connections between fictive, imagined and projected identities are fused in the actress being given as token of public adulation...' (*Public Women* 86)। দর্শকের কাছে অভিনীত চরিত্রের জনপ্রিয়তার বিনিময়ে দর্শকের ভালোবাসা প্রদানের এক মাধ্যম ছিল এই গোলাপসুন্দরীর এই নামবদল। এমনকি সুকুমারী একমাত্র অভিনেত্রী ছিলেন যাঁর বিয়ের পর 'মিসেস সুকুমারী দত্ত' নামে বিজ্ঞাপনও প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। সেই সময়ের নিরিখে দাঁড়িয়ে এই পদক্ষেপটি নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ লাগে। ব্রাহ্মণকন্যা হলে নামের পরে 'দেবী' এবং শূদ্রকন্যার নামের পরে 'দাসী' ব্যবহার করার রীতিটি সেই সময়ে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। রিমলি ভট্টাচার্যের বিশ্লেষণ নাট্যজগতেও এই 'দাসী' শব্দের ব্যবহার শুধুমাত্র সেই মহিলার জাতগত পরিচয়কে বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হত না। বরং সেই মহিলার শ্রেণিগত অবস্থানকে নির্দেশ করতেই এই 'দাসী' শব্দটি নামের শেষে ব্যবহার করার রীতি ছিল বলে রিমলি ভট্টাচার্য মনে করেছেন (*Public Women* 88)।

উপেন্দ্রনাথ দাসের উদ্যোগে এই বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়। বাংলা থিয়েটারে ইনিই প্রথম মহিলা অভিনেত্রী যাঁর 'ভদ্রবাড়ির' পদবী পাওয়ার অধিকার হয়। গোলাপসুন্দরী থেকে সুকুমারী দত্ত হওয়ার মধ্যে 'উচ্চবিত্ত' বাঙালি 'নতুন নারী' হয়ে ওঠার একটি প্রচেষ্টা লক্ষ্যণীয়। 'ভদ্রমহিলা'র সংজ্ঞার মধ্যে একটি অভদ্র মেয়েকে ঢুকিয়ে দিয়ে উপেন একটা সামাজিক প্রগতিশীল পদক্ষেপ নিতে চেয়েছিলেন। যদিও এই বিবাহ সুখের হয়নি। গোষ্ঠবিহারীর ভদ্র সমাজ তাকে সমাজচ্যুত করে। বিবাহ ভেঙ্গে যায়। কিন্তু উপেন্দ্রনাথের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে একজন বেশ্যাপল্লী থেকে আসা অভিনেত্রীকে 'সংসারী' করার প্রচেষ্টা।

গোলাপসুন্দরীকে 'ভদ্র' বাঙালি মেয়েদের মতো 'দত্ত' পদবীর আচ্ছাদনে ঢুকিয়ে কোথাও যেন তার পূর্ববর্তী জীবনের সংগ্রামকে খানিক আড়াল করে নতুন 'ভদ্র' জীবন দেওয়ার চেষ্টা; 'অভদ্র' গোলাপকে ধরে পিটিয়ে সুকুমারী দত্ত নামের 'নতুন নারী' হিসেবে বানিয়ে তোলা; হিন্দু উচ্চবিত্ত সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষদের মতামতকে উপেক্ষা করে গোলাপসুন্দরীর জীবনে স্বামী ও পদবী যুক্ত করে যেন 'ভদ্রমহিলা' স্তরে উন্নীত করার মধ্যে উপেনের ঐকান্তিক প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। নারীমুক্তি আন্দোলনের এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে এই বিবাহের ঘটনাটি বহুদিন যাবৎ আলোচিত ও সমালোচিত হয়ে এসেছে।

'গোলাপসুন্দরী' নামটি যে ইতিহাস বহন করে, যে সভ্যতা বা 'অ-সভ্যতা' ধারণ করে, যে সংস্কৃতিকে প্রতিবিম্বিত করে—সবটা সজোরে মুছে দিয়ে 'সুকুমারী দত্ত' নামক এক 'নতুন' ইতিহাসকে তাঁর ওপর চাপিয়ে দেওয়া

হয়। কোনো রকম সামাজিক ও মানসিক প্রস্তুতি ছাড়াই গোলাপসুন্দরীকে একজন ‘ভদ্র’ ঘরের যুবকের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়। গোলাপসুন্দরীর আদি পেশাটির প্রতি অপরিসীম ঘৃণা ও ‘নতুন নারী’র ধারণাটির প্রতি নির্দ্বিধ আস্থা উপেনকে দিয়ে এই কাজ করায়। তাঁর হয়তো মনে হয়েছিল, নিচুজাতের অবলা মেয়েটিকে উঁচুজাতের ভদ্র পরিবারে জোর করে ঠেলে ঢুকিয়ে দিতে পারলেই তাঁর সমস্ত দুঃখের অবসান হবে। নিম্নবর্গের মেয়েটি বুঝি ‘ভদ্র’ পরিবারের তক্‌মাটুকু পেলেই সমাজে তাঁর পবিত্র সতী রূপটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।

পরবর্তী ঘটনাবলী জানাচ্ছে যে উপেনের এই ধারণা হয়তো আপাদমস্তক ভুল। কিন্তু তাঁর এই প্রয়াস থেকে অভিনেত্রীদের কলঙ্ক মোচনের জন্য একটি নিবিড় প্রচেষ্টাকে অস্বীকার করা বোধহয় যায় না। বেশ্যা-অভিনেত্রী ‘কপালের লিখনে’ বেশ্যাবৃত্তি করতে বাধ্য হয়েছে; কিন্তু তাকে সুযোগ দিলে সে-ও ভদ্রমহিলাদের মতো সৎচরিত্র, সতীত্বপূর্ণ, বিশুদ্ধ ‘সংসারী’ নারী হয়ে উঠতে পারে, এমনটাই হয়তো প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন উপেন।

সমাজের কাছে নাট্য অভিনেত্রীদের পবিত্র সতী ও উচ্চ ভাবধারার প্রতিমাস্বরূপ গড়ে তোলার আরও একটি পন্থা অনুসৃত হয়েছিল। বারবণিতাদের দেহ ব্যবসার পাশাপাশি থিয়েটার যে একটি বাড়তি রোজগারের পথবিশেষ, সেই সত্যটি বিভিন্ন লেখায় সন্তর্পণে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। সেই সময়কার ও পরবর্তী যুগের সমস্ত রচনাতেই যেন অভিনেত্রীদের নিয়মানুবর্তিতা, কাজের প্রতি মনোযোগ, শেখার ইচ্ছে ও শৈল্পিক প্রতিভার দিকে নজর ঘুরিয়ে দেওয়ার একটি উদ্যোগ দেখা যায়। শ্রমকে প্রাক-পুঁজিবাদী সময়ের আবেগের বন্ধনে, গুরুশিষ্য পরম্পরার বনিয়াদের ওপর দাঁড় করানোর চেষ্টা হল। শ্রম ও তার উৎপাদনের সম্পর্কের ভিত্তিতে অভিনেত্রীদের শিল্প-অঙ্গনে পদার্পণ করার বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়ার একটা প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। রিমলি ভট্টাচার্যের একটি ব্যাখ্যা এই সূত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলছেন, অভিনেত্রীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিটিকে সেই সময়কার অন্যান্য শ্রমজীবী মহিলাদের প্রেক্ষিতে দেখাটা বিশেষ জরুরী। ‘This socio-economic profile would obviously be contexualised within that of other working women, such as industrial workers and women in domestic sectors’ (R. Bhattacharya *Public Women* 303).

অর্থনৈতিক বনিয়াদটি জোরদার করার উদ্দেশ্যে অভিনেত্রীদের মঞ্চে আগমন হয়েছিল, এমনটা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। দেহব্যবসার সঙ্গে চলা একটি অন্যতম উপার্জনের সহায় হিসেবে সাধারণত থিয়েটার অভিনেত্রীদের জীবনে স্থান করে নিয়েছিল। থিয়েটার ছিল তাঁদের একটি ‘Alternative Profession’, ‘বিকল্প

পেশা’ বা আরও নিখুঁত করে বলতে গেলে থিয়েটার ছিল এই মেয়েদের কাছে একটি ‘Additional Profession’বা ‘উপরি রোজগারের পথ’। এই profession-কে passion হিসেবে জোর করে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল বলে মনে হয়। রিমলি ভট্টাচার্য এই সূত্রে লিখছেন, ‘For little girls, ‘acting’ was primarily a means of extra income, somewhat in the manner in which little boys today are ‘given’ to a petrol pump or garage to learn the trade while they take on the role of a dogsbody’ (*My Story and My life* 11)।

এ কথা ঠিক যে, নাট্যশিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অনেক অভিনেত্রীরই মানসিক ও বৌদ্ধিক অনেক পরিবর্তন হয়েছে। জীবন, সমাজ, নারীর অধিকার সম্পর্কে নিঃসন্দেহে তাঁদের অনেক পূর্ব ধারণার পরিবর্তন এনে দিয়েছিল থিয়েটারের পরিমণ্ডল। জনপ্রিয় ও সফল অভিনেত্রীদের জীবনের আত্মবিশ্বাসের মাত্রাটাই পালটে দিতে ভূমিকা রেখেছিল থিয়েটার। কিন্তু তাঁদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার বিকল্প পন্থা হিসেবে থিয়েটারের ভূমিকাটাকেও অস্বীকার করা যায় না। বরং বলা চলে সেটিই হয়তো ছিল তাঁদের জীবনে থিয়েটারের মূল উপযোগিতা। নাট্যকর্মী হিসেবে তাঁরা যেটুকু রোজগার করতেন তাতে তাঁদের জীবন চলা হয়তো কঠিন ছিল। রিমলি ভট্টাচার্যের মতামত, ‘Even Their status as wage earners through theatre work (monthly salaries and later, bonuses) was never considered sufficient to assure their economic independence’ (‘Early Actresses’ 146)। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আনার মতো মাইনে থিয়েটার তাঁদের দিত না। তবু খানিকটা অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য পেতেই হয়তো তাঁদের থিয়েটারের গণ্ডিতে আনাগোনা, আধুনিক ইতিহাসকারদের এই ঘটনাটি গোপন করার তো কোনও কারণ নেই।

পরিবারের মধ্যে থেকেই অভিনেত্রীদের কোনো এক উচ্চবিত্ত বাবুর আশ্রয়ে রক্ষিতা হিসেবে থাকার চাপ দেওয়া হত সবসময়। নাট্য অভিনেত্রী হিসেবে সে বা তাঁর পরিবার পূর্ণ সুরক্ষা পেত না। বরং উচ্চবিত্ত বাবুর আশ্রিতা হিসেবে সে অনেক ‘নিরাপদ’ মনে করত তাঁর পরিবার। নাট্যজগত ছিল তাঁদের কাছে একটি প্ল্যাটফর্ম, ‘... an alternative livelihood, a platform for captivating the heterogenous and anonymous audiences in the city...’ (*Public Women* 302)।

কিন্তু নাট্য ইতিহাস তাঁদের জীবনের এই বাস্তব দিকটিকে যথাসম্ভব আড়াল করে দিতে চাইল। পেটের তাগিদে নয়, যেন মহত্তর শৈল্পিক উদ্দেশ্যেই বেশ্যাদের থিয়েটারে বিচরণ—এমনটাই প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলেন কেন ইতিহাসকাররা? বেশ্যা-অভিনেত্রীদের শ্রমকে উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত না করে, তাঁদের শ্রমকে অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে আলোচনা না করে,প্রাক-পুঁজিবাদী সমাজের মতো আবেগের বন্ধনময় মহত্ত্বে উন্নীত করার চেষ্টা করলেন কেন আধুনিক ইতিহাসবিদ্‌রা?

সত্যি কথা বলতে কি, থিয়েটার থেকে অভিনেত্রীদের রোজগারের নিশ্চিত সুব্যবস্থা তখনও তৈরি হয়নি বলেই মনে হয়। মাঝে মাঝেই থিয়েটার উঠে যেত। অভিনেত্রীরা কর্মহীন হয়ে পড়তেন। সেই সময় তাঁদের পারিবারিক পেশাকে বেছে নেওয়া ছাড়া তাঁদের আর কিছু করারও ছিল না। এতে তো কোনও গ্লানি থাকার কথা নয়। বিনোদিনীর বিবরণী থেকে কোনও গ্লানির চিহ্নমাত্রা পাওয়া যায় না। বিনোদিনী লিখছেন,'... আমাদের অবস্থা গতিকে আমাকে একটি সম্ভ্রান্ত যুবকের আশ্রয়ে থাকিতে হইত। তিনি অতিশয় সজ্জন ছিলেন; ... তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহগুণে আমায় তাহার কতক অধীন হইতে হইয়াছিল' (Dasi 32)। এটা তাঁদের কাছে ছিল বাস্তব পরিস্থিতি, 'matter of fact'। বিনোদিনীর রচনায় এই বিষয়টি লুকোনোর মত কোনও প্রয়াস চোখে পড়েও না। অভিনেত্রীরা নিজেদের জীবন বিষয়ে রচনা করতে গিয়ে যেটুকু আড়াল বা নৈঃশব্দ্য সৃষ্টি করেছেন, তা কখনো 'ভদ্র' ঘরের নিরূপদ্রব শান্তি ও সম্মান বজায় রাখার জন্য, আবার কখনো নিজেদেরই নিরাপত্তার কথা ভেবে।

যেমন বিনোদিনী জীবনের তিরিশটি বছর যে মানুষের সাঙ্গে অতিবাহিত করেন, তাঁর নাম পর্যন্ত তিনি কোথাও উল্লেখ করেন না। অপরিসীম শ্রদ্ধা-কৃতজ্ঞতা-ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও নিজের রচনায় সেই মানুষটির নামোচ্চারণ করে তাঁর সামাজিক অবস্থানটিকে বিব্রত করে তুলতে চাননা। রিমলি ভট্টাচার্যের কলমে, 'Binodini follows this practice in not naming Saratchandra Sinha—the upper-class patron whose co-wife she had become and with whom she spent almost 30 years of her life' (*Public Women* 49)। এই সূত্রে আরও একটি উদাহরণ উল্লেখ্য। এই উদাহরণটি অভিনেত্রী নিজের নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করতে একটা আড়াল তৈরি করেছেন তাঁর লেখার মধ্যে। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে *রূপ ও রঙ্গ* পত্রিকায় 'সৌদামিনী (অভিনেত্রীর আত্মকাহিনী)' রচনার শুরুটি এইরকম, 'I have deliberately kept secret the name by which I am

known on the stage. Because, while no one will stand to gain by knowing the name, there is certainty of some harm befalling me if they do' (*Public Women* 328)।

বেশ্যা-অভিনেত্রীদের রচনায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে নৈঃশব্দ্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তার কারণগুলি অনুধাবনযোগ্য। কিন্তু সেই অভিনেত্রীদের নিয়ে অন্য ইতিহাসবিদ্‌দের রচনাগুলি খানিক সমস্যা সৃষ্টি করে। অভিনেত্রীদের পেশাগত দিকটিকে খানিকটা উহ্য রেখে বা নামমাত্র উল্লেখ করেই তাঁদের শৈল্পিক প্রতিভার বর্ণনা করাটাই যেন উদ্দেশ্য হয়ে পড়ে। ফলে ইতিহাস খণ্ডিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। আবার অভিনেত্রী তারাসুন্দরী 'কোনও বিলাসী ধনপতির দুর্দম প্রলোভনে' বেশ কয়েক বছরের জন্য থিয়েটার ছেড়ে দিয়েছিলেন (Vidyabhushan 76)। *চন্দ্রশেখর* নাটকের শৈবলিনী চরিত্রটি অভিনয় করে তিনি প্রবল খ্যাতি পান। কিন্তু মাত্র তিন রাত্রি অভিনয় করেই হঠাৎ তিনি থিয়েটার ছেড়ে ধনপতি অমরেন্দ্রনাথ দত্তের বাগানবাড়িতে স্থিত হন। এই উদাহরণ থেকে কি সত্যিই থিয়েটারের প্রতি তারাসুন্দরীর প্রবল passion বা অসীম দায়িত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায়? ইতিহাসে এই ঘটনাগুলির নামমাত্র উল্লেখ করলে অভিনেত্রীদের জীবন ধারণের অন্যান্য পন্থাগুলিকে কোনও স্বীকৃতি না জানানোর চেষ্টাটি প্রকাশ হয়ে পড়ে।

'Theatre as an alternative profession' হিসেবে প্রতিষ্ঠা না করে অভিনেত্রীদের কার্যকলাপের ওপর মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ আরোপ করে 'theatre as a passion' হিসেবে উত্তীর্ণ করার প্রয়াস ছিল ইতিহাস রচনাকারদের। তা না হলে, থিয়েটারকে 'উচ্চ', 'পবিত্র', 'নিষ্কলুষ' শিল্পমাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা সত্যিই কষ্টকর হয়ে পড়ত। রিমলি ভট্টাচার্যের একটি উক্তি এই সূত্রে উল্লেখ্য— 'Binodini Dasi and the other girls or women who were brought into the theatre halls were employed for their labour. And, thereby, they were inserted almost overnight into a cultural enterprise in whose 'projection' they had never had a part—although as actresses, they were to be instrumental in making theatre possible' (*My Story and My life* 5)। শ্রমের বিনিময়ে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের খোঁজে বিনোদিনী বা সুকুমারীদের থিয়েটারে আসা। তারা থিয়েটারে আসায় যা ঘটছে তাতে তারা মোটেই অংশ হয়ে উঠতে পারছে না; তারা কেবলমাত্র থিয়েটারের একটি সহায়ক যন্ত্রের মতো কাজ করছে এবং বিনিময়ে অর্থলাভ করছে।

উনিশ শতক ও বিশ শতকের শুরুর দিকে নাট্য ইতিহাস রচনাকারদের রচনায় বা নাট্যমোদী দর্শকের লেখায় বা নাট্যবিশারদ কোনও শিল্পীর স্মৃতিচারণায় এই পক্ষপাতিত্বপূর্ণ প্রবণতার যথেষ্ট যৌক্তিকতা আছে, এ ব্যাপারে

কোনও সন্দেহ নেই। সমাজ যখন বেশ্যাপল্লী থেকে আসা মেয়েদের আক্রমণে উদ্যত, তখন তাঁদের সহ-নাট্যকর্মীরা নিজেদের স্বার্থেই তাদের সমকালীন নানান প্রচলিত মূল্যবোধের ধারণাগুলোকে আরোপ করে সহ-অভিনেত্রীদের রক্ষা করতে চেষ্টা করবেই। তাতে খানিক অতিকথনের ভ্রম আসতে পারে, পক্ষপাতিত্ব দোষ থাকতে পারে, ইতিহাস বিকৃতির সম্ভাবনাও প্রবল হয়ে ওঠে। কিন্তু যুগের তীব্র আবহাওয়ায় এই পথ না নিয়ে তাদের হয়তো উপায়ও থাকে না।

কিন্তু আশ্চর্যের জায়গা হল, তার পরবর্তী নাট্য ইতিহাসকাররাও কেন এই একই পথের পথিক হলেন। পুরনো নথি পত্র থেকে পাওয়া তথ্যগুলোকে পাশাপাশি রেখে অভিনেত্রীদের প্রতি কোনও পক্ষপাতিত্ব বা করুণার ধারা বর্ষণ না করে সম-আলোচনার পথটি একেবারেই গ্রাহ্য করলেন না কেন? অভিনেত্রীদের 'আদি নিবাস'-এর আলোচনা করতে গিয়ে অধিকাংশ আত্মজীবনীকার ও নাট্য ইতিহাসকাররা 'অজ্ঞাত' পরিচয়টি নির্দেশ করতে উদ্যোগ নিয়েছেন। তাঁরা অভিনেত্রীদের জন্ম সম্পর্কে শুধু 'অজানা স্থান' হিসেবেই বর্ণনা করছে না, বরং তার সঙ্গে নিষিদ্ধপল্লী, অখ্যাতপল্লী, কুখ্যাতগলি, অজ্ঞাতপল্লী, পতিতাপল্লী ইত্যাদি নানান শব্দের প্রয়োগ করে অভিনেত্রীদের জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে এক বিশেষ ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করছেন। সরাসরি নাম করা যায় না এমনসব জায়গার নাম না-উল্লেখ করার মতো করে উল্লেখ করে, এই ইতিহাসকাররা সম্ভবত অভিনেত্রীদের মঞ্চের বাইরের জীবনের সত্যিকারের পরিস্থিতির ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকতেই চেয়েছেন। অনুমান করা যায়, এইসব শব্দচয়নের মাধ্যমে সেইসব অখ্যাত-কুখ্যাত গলি সম্পর্কে নৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্ত রকম 'কদর্যতা'-কে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন সেইসব ঐতিহাসিকরা। এই ধরনের বর্ণনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রিমলি ভট্টাচার্যের বক্তব্য, 'These euphemisms for places that must not be named reflect the erasure of the material conditions of life outside the stage. They hint darkly as the worst possible combination—of poverty with moral depravity' (*Public Women* 89)।

এই সূত্রে আরও একটি বিপজ্জনক ঘটনার কথা খেয়াল রাখা দরকার। গণনাট্য সংঘের নাট্য আন্দোলন বা নবনাট্য আন্দোলন বা গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের যুগ পেরিয়ে আজ এক নতুন যুগে আমাদের নাট্য সমাজ এসে পৌঁছেছে। এই নতুন নাট্য জগতের অভিনেত্রীরা ইতিহাসের পাঠ নিতে গিয়ে নিজেদের অভিনেত্রী হিসেবে নিজের সংগ্রামের পূর্বসূত্র হিসেবে বিনোদিনীর জীবনকথা বা তিনকড়ি দাসী বা কুসুমকুমারীর জীবনের উদাহরণ পেয়ে আপ্লুত

হয়ে পড়ে। নিজেদেরকে এই সমস্ত বারবণিতা-অভিনেত্রীর উত্তরসূরি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে অত্যন্ত নিপীড়িত মনে করে। গত শতকে বিনোদিনীর সঙ্গে যে ঐতিহাসিক অপরাধ ঘটেছে, তার সঙ্গে নিজেদের অভিনেত্রী জীবনের বিন্দুমাত্র সামঞ্জস্য খুঁজে পেলেই তাকে ঐতিহাসিক সূত্রে সূত্রায়িত করে ফেলে।

শুধু অভিনেত্রীদের কথা বলছি না। এ যুগের যেকোনো ইতিহাসচর্চাকারী বস্তুতঃ আজকের যুগের অভিনেত্রীদের বিনোদিনী বা সুকুমারীর সম্প্রদায়ের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে ফেলতে চায়। কিন্তু বাস্তবতা থেকে জিজ্ঞাসা এই, আজকের যুগে যে অভিনেত্রীরা বাংলা রঙ্গমঞ্চে মর্যাদার সঙ্গে অভিনয় করছে, তাদের সঙ্গে তৎকালীন বারবণিতাদের জীবনপ্রবাহের কোনও যোগসূত্র আছে কি? আজকের যুগের অভিনেত্রীদের সংগ্রাম ও সেই যুগের ‘পেশাদার মহিলা’দের লড়াইকে কি সত্যিই একই প্রবহমানতায় আদৌ সূত্রায়িত করা যায়? বরং এই যুগের উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে আসা অভিনেত্রীদের পূর্বসূরি হিসেবে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার খানিকটা মিল পাওয়া গেলেও যেতে পারে। কিন্তু কোনোভাবেই বাংলার শখের নাট্যশালা বা পরবর্তীকালের সাধারণ রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীদের জীবনপ্রবাহের সঙ্গে আজকের নাট্য জগতের অভিনেত্রীদের জীবনধারাকে এক সূত্রে গ্রথিত করে ফেললে আবার একটি ঐতিহাসিক কদর্যতার সাক্ষী থেকে যাবে না কি আজকের নাট্য ইতিহাস রচনা বা today’s theatre historiography?

অধ্যায় ২

নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইনঃ একটি বিকল্প পাঠ

> 'দেশের নাট্যকারগণের বুকের মধ্য হইতে যদি কখন সত্য ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, আইনের নামে, শৃংখলার নামে রাজসরকারে তাহা বাজেয়াপ্ত হইয়া গেছে; তাই সত্যবঞ্চিত নাট্যশালা আজ দেশের কাছে এমনই লজ্জিত, ব্যর্থ ও অর্থহীন' । (S. C. Chattopadhyay 2098)

বাংলা নাট্য ইতিহাস রচনায় যে প্রধান ঘটনাগুলোকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, তার মধ্যে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাঁক হল, সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা। জমিদার শ্রেণীর শখের নাট্যশালার ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে এসে জনগণের আয়ত্তের মধ্যে চলে এলো নাট্যাভিনয়। সাধারণ জনগণ জমিদারের রাজবাড়িতে প্রবেশাধিকার পেত না। তাই নাটক তাদের কাছে থেকে গেছিল অধরা। সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেই নাটক জনগণের কাছে সহজলভ্য হয়ে উঠল। শুধু বিশিষ্ট ধনীগোষ্ঠীর শখের শিল্পচর্চার উপকরণ হিসেবে বাঁধা পড়ে থাকলো না।

১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঠাকুর নামে কলকাতার এক বিত্তশালী ব্যক্তি প্রথম বাঙালি মালিকানায় নাট্যচর্চা শুরু করেন। ক্রমে আরও অনেক বাবু সম্প্রদায়ের বাঙালি সেই প্রবাহে নাম লেখান। প্রচুর অর্থ ব্যয় করে উচ্চবিত্ত বাঙালির শখের থিয়েটারগোষ্ঠীগুলোর নাটক করার উদ্যম চলতে থাকে। কিন্তু এইসবশখের রঙ্গালয়ের আয়ু ছিল মালিকের ইচ্ছে নির্ভর। যে সব মালিক খুবই নাট্যমোদী ছিলেন, তারা অনেক ব্যয়ভার বহন করে, ধৈর্য্য রেখে নাট্যচর্চা চালাতেন কিছুকাল। আবার অনেক নাট্যগোষ্ঠীর মালিক নেহাত খেয়ালের বশে মাত্র কয়েকদিন যাবৎ নাটক চালাতেন, তারপর নাট্যশালা বন্ধ করে দিতেন। যত পেশাদারি মনোভাব থাকুক না কেন, শেষ পর্যন্ত নাটকের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে দিতেন জমিদার মালিকই। কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম। একদিকে বহু অর্থ ব্যয় করে যেমন নবীন বসু নাট্যাভিনয় করেছিলেন। অন্যদিকে আবার শোভাবাজার রাজবাড়ির রাজাদের অনাগ্রহে এক রাত নাট্যাভিনয় হয়, তারপরে তাঁদের নাট্যালয়টি উঠে যায় (B. Basu 32)। জমিদার চাইলে নাটক হবে, না চাইলে নাটক রচিত হয়ে পড়ে থাকবে নাট্যকারের খাতায়। মধুসূদনের মতো নাট্যকারও তাঁর অমর সৃষ্টিগুলির মঞ্চায়নের অপেক্ষায় থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। *কৃষ্ণকুমারী* নাটকটি মঞ্চায়ন করার আশা নিয়ে ঘনিষ্ঠদের লেখা চিঠিগুলিই এর প্রমাণ।

নাট্যবন্ধু বাবু কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলিকে লেখা চিঠিতে অভিমানী মধুসূদন লিখছেন, ‘Mind you, you all broke my wings once about the farces; if you play a similar trick this time, I shall forswear Bengali and write books in Hebrew and Chinese!’ (Shome 370)। অন্য একটি চিঠিতে অত্যন্ত ব্যথিত আহত আশাহত মধুসূদন লিখছেন, ‘And now old boy, what about Kissen Kumari?... I am afraid, brother Keshub, we are all losing that fine enthusiasm we once had in matters dramatic!’ (Shome 371)। একটি নতুন নাটক লিখে উদ্যমী ও আশাবাদী নাট্যকার মধুসূদন ধীরে ধীরে অভিমানী, ও আরো পরে রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন। ক্ষোভ তাঁর এতই ছিল যে, *কৃষ্ণকুমারী* নিয়ে ঘটা বিশৃংখলার পর তিনি অবশিষ্ট জীবনে বাংলা রঙ্গালয়ের জন্য বহু বছর পর্যন্ত আর কোনও দিন কোনো নাটক লিখলেন না। *কৃষ্ণকুমারী* রচনার এক যুগ পরে তিনি সর্বব্যাপী হতাশার মধ্যে কিছু টাকা পাওয়ার আশায় ভঙ্গ শরীরে *বেঙ্গল থিয়েটারের* জন্য *মায়াকানন* নাটকটি লেখেন। কিন্তু সেই নাটকে তাঁর প্রতিভার অগ্রগতি তেমন লক্ষ্য করা যায় না বলে মনে করছেন মধুসূদনের জীবনীকার গোলাম মুর্শিদ। এ রচনা তিনি নিতান্তই বেঁচে থাকার তাগিদ থেকে করতে বাধ্য হয়েছিলেন (Murshid, *Ashar Chhalane Bhuli* 343)।

জমিদারের খেয়ালখুশি বশে নাটক করার এই রীতিকে চ্যালেঞ্জ জানালো নব্যযুগের কিছু মধ্যবিত্ত যুবক। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী, ধর্মদাস সুর, অমৃতলাল বসু, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশ ঘোষের মতো তরুণ প্রতিভারা নিজেদের প্রচেষ্টায় খুলে ফেললেন *ন্যাশনাল থিয়েটার* ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে (B. Mukhopadhyay 575)। টিকিট বিক্রি করে নাট্য প্রদর্শন করা শুরু করলেন তারা। ফলে কারোর নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে থাকতে হল না তাদের। বাংলা থিয়েটার স্বাধীন হল। শিল্পীদের ওপরে কলকাঠি নাড়ানোর কেউ রইল না। স্বাধীনতার স্বাদ আস্বাদিত হল নাট্য অঙ্গনে।

কিন্তু সত্যিই কি তাই হল? রইল না কি কোনো শর্ত? দেশ স্বাধীন হওয়ার আগেই স্বাধীনতা উপভোগ করতে শুরু করল নাট্যসমাজ? পরবর্তী নাট্য ইতিহাস অবশ্য আমাদের তেমন খবর দিচ্ছে না। বরং উল্টোটাই ঘটছে জানতে পারছি। নাটক আরও নিষেধাজ্ঞায় পড়ছে। আরও শর্তাধীন হয়ে পড়ছে নাটক। এবারের শর্ত আর মালিক বা জমিদার আরোপ করছে না। এই নতুন নিষেধের ঘেরাটোপ তৈরি করছে স্বয়ং সরকার বাহাদুর। রাষ্ট্রের কুনজরে পড়ে নাট্যজগতের গতি খানিক শ্লথ হয়ে পড়ছে। জনগণের ওপর নাটকের অপরিসীম প্রভাব পড়তে পারে, ক্ষেপে উঠতে পারে জনগণ—এমন ভাবনায় জেরবার হয়ে পড়ে ব্রিটিশ শাসকরা। নাট্য জগতের বিপ্লবী কর্মশক্তিকে রীতিমত ভয়

পেতে শুরু করে ইংরেজ সরকার। নাট্যজগতের নির্ভীক সৈনিকদের কণ্ঠরোধ করতে ব্রিটিশরাজ উঠে-পড়ে লাগে। অন্তত তেমনটাই জানাচ্ছে, আমাদের প্রথাগত নাট্য ইতিহাস।

নাট্য জগতের বিদ্রোহী মূর্তি

টিনের তলোয়ার নাটকের ভূমিকায় উৎপল দত্ত লিখছেন, 'বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবার্ষিকীতে প্রণাম করি সেই আশ্চর্য মানুষগুলিকে—যাঁহারা কুষ্ঠগ্রস্থ সমাজের কোনো নিয়ম মানেন নাই... যাঁহারা পশুশক্তির ব্যদিত মুখগহ্বরের সম্মখে টিনের তলোয়ার নাড়িয়ে পরাধীন জাতির হৃদয়-বেদনাকে দিয়াছিলেন বিদ্রোহ মূর্তি...যাঁহাদের উল্লসিত প্রতিভায় সৃষ্টি হইল বাঙালির নাট্যশালা, জাতির দর্পণ, বিদ্রোহের মুখপাত্র' (73)। ইতিহাস নির্ভর কোনো বর্ণনাত্মক লেখা লিখতে গিয়ে উৎপল এই কথাগুলি লেখেননি। বাঙালির নাট্যশালাকে বিদ্রোহের মুখপাত্র হিসেবে দেখতে চাওয়ার আন্তরিক অভিলাষ থেকে তাঁর এই বিশ্লেষণ। উৎপলের এ রচনা ইতিহাস অনুসারী নয়। কিন্তু দায়িত্বপূর্ণ ইতিহাসবিদ্‌রাও কি বাঙালির নাট্যশালাকে সংগ্রামী চেতনার রঙে রাঙাতে একই রকম কিছু শব্দ চয়ন করে ফেলেননি? ইতিহাস রচনার গুরুদায়িত্ব নিয়ে রচয়িতার নিজস্ব আকাঙ্ক্ষার কথা তো স্থান পাওয়ার কথা নয়! তাহলে গোটা বাংলা থিয়েটারের বিপ্লবী চরিত্র প্রতিষ্ঠায় এই ধরনের অতিশয়োক্তি বা অতিরঞ্জকতার যুক্তি কী?

প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য *বাংলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব* গ্রন্থে লিখছেন, 'নাট্যকারদের নাটক রচনার উদ্দেশ্য ছিল দেশসেবা। তাই তাঁদের কবিকল্পনা জগৎ ও জীবনকে অস্বীকার করে সাহিত্যের রসতীর্থে নির্বিকল্প স্বপ্নপ্রয়াণ করেনি। দেশ যেখানে পরাধীন, দেশবাসী সেখানে মুমূর্ষু, সেখানে কোনো খেয়ালী কল্পনা গ্রহণ করা নাট্যকারদের পক্ষে সম্ভব ছিল না' (328)। অর্থাৎ পরাধীন দেশের মুমূর্ষু দেশবাসীর পাশে দাঁড়িয়ে নাট্যকর্মীরা নিজেরা দেশীয় কর্তব্যপালনে ব্রতী থেকেছেন, এমনটাই মনে করছেন প্রভাত। একইরকম ভাবে দর্শন চৌধুরী লিখছেন, 'নীলদর্পণের অভিনয় থেকেই ব্রিটিশ সরকার ভীত হচ্ছিল। রঙ্গমঞ্চের মাধ্যমে জাতীয় চেতনা অনেক বেশি কার্যকর হতে পারে এবং আপামর জনগণের চিত্তবিক্ষোভ রঙ্গমঞ্চ ঘটিয়ে তুলতে পারে—এই আশঙ্কা রঙ্গমঞ্চপ্রিয় ইংরেজ জাতি সহজেই বুঝে নিয়েছিল' (125)। আরও এক জায়গায় তিনি লিখছেন, 'বাংলা মঞ্চে এই সময়ের অভিনয়ের মধ্যে ইংরেজ বিদ্বেষ, পরাধীনতার বেদনা, ইংরেজে অত্যাচার, সর্বোপরি দেশ স্বাধীন করার বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা মূর্ত হয়ে উঠেছে। *নীলদর্পণ* থেকে শুরু করে *সুরেন্দ্র-বিনোদিনী* পর্যন্ত অধিকাংশ নাটকেই ইংরেজ রাজপুরুষদের নানা ধরনের অত্যাচার বিশেষ করে তাদের লাম্পট্যের দৃশ্য দেখানো হয়েছে, এর ফলে জনমত উত্তেজিত হওয়া স্বাভাবিক। বৃটিশ বিরোধী

মনোভাব গড়ে ওঠা স্বাভাবিক' (128)। স্পষ্টতই বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস নিয়ে আলোচনায় মানুষদের বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসেবে লিখিত হয়েছে এই বর্ণনা। শিশির কর ব্রিটিশ শাসনে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই প্রসঙ্গে লিখছেন, '১৮৭২ সালে কলকাতায় জাতীয় রঙ্গমঞ্চ (*ন্যাশনাল থিয়েটার*) স্থাপিত হবার পর দেশপ্রেম ও স্বাধিকার যে ঝড় তুলেছিল নাটক ও নাট্যশালাগুলি, তাতে ইংরেজ সরকার প্রমাদ গুনেছিলেন। বিভিন্ন দেশাত্মবোধক নাটকের ক্রমাগত অভিনয় সাফল্যে শাসকগোষ্ঠী শঙ্কিত হয়। নাটকের মাধ্যমে দেশে যে জাগরণ ও বিদেশী শাসন থেকে মুক্তির বাসনা জেগে ওঠে, তা স্তব্ধ করে দেবার জন্যই সরকার তৎপরতার সঙ্গে নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন বিধিবদ্ধ করেন' (34)।

পাশাপাশি আরও এক নাট্য ইতিহাসবিদ পুলিন দাস এই সময়টিকে ব্যাখ্যা করছেন এভাবে, 'ইংরেজ শাসনের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা এবং সেইসব নাটকের বিপুল জনপ্রয়তা ইংরেজ শাসককুলকেও স্বভাবতঃই শঙ্কিত করে তোলে। আইনের সহায়তায় নাটক ও মঞ্চের কণ্ঠরোধের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন শাসকসম্প্রদায়'(*Banga Rangamancha O Bangla Natak* 145)। বাংলা থিয়েটারের বিপ্লবী মুর্তি দেখে নাট্যকর্মীদের সংঘবদ্ধ ঐক্যবদ্ধতা ও একের পর এক দেশাত্মবোধক নাটকের জয়যাত্রায় দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ব্রিটিশ আশংকিত হয়ে পড়েছিল, এমনটাই প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস চোখে পড়ছে নাট্য ইতিহাস সংক্রান্ত প্রচলিত রচনাগুলিতে।

নাট্যজগতের কর্মীদের এইভাবে দেশপ্রেমিক চেতনায় জাগরিত হয়ে ওঠার ইতিহাসকে প্রামাণ্য ধরে নিয়েই আমরা প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসের নানান চর্চা চালাতে থাকি। কিন্তু প্রচলিত ইতিহাস যাই হোক না কেন, নাট্যকর্মীদের রাজনৈতিক চেতনা দেশপ্রেম ইংরেজবিরোধিতা স্বাদেশিক ভাবনা বা বিপ্লবী ইমেজটির বিশ্লেষণ করতে আজকের নাট্য ইতিহাসের শিক্ষার্থীদের অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনকালীন ঘটনাটি গভীরভাবে নিরীক্ষণ করা প্রয়োজন।

বিদ্রোহী বাংলা নাটকের শুরুঃ একটি পর্যবেক্ষণ

১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এর পথ চলা শুরু হচ্ছে। জমিদারের বাড়ির আঙ্গিনা থেকে বেরিয়ে সাধারণ মানুষের জন্য খুলে যাচ্ছে থিয়েটারের দরজা। থিয়েটারের দর্শকের গণ্ডী প্রসারিত হচ্ছে। ক্ষুদ্র পারিবারিক গণ্ডীর বাইরে এক বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি হচ্ছে থিয়েটারের মানুষদের। কলকাতার নাগরিক সমাজের এক বিরাট অংশের কাছে নাট্যকর্মীদের যুগোপযোগী মতপ্রকাশের পরিসর খুলে যাচ্ছে। নাট্য জগতের বিপ্লবী চেহারাটিকে প্রতিষ্ঠা করার প্রভূত সুযোগ এসে পড়ছে নাট্যকর্মীদের হাতে। আর তার ঠিক তিন বছরের মাথায়

ব্রিটিশরাজ নাট্য অভিনয় নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি নতুন বিল নিয়ে আসছে। প্রতিহত করা হচ্ছে নাটকের বিপ্লবের বীজটিকে। সাধারণ রঙ্গালয় বা সাধারণ মানুষের জন্য গিরিশ-অর্ধেন্দুরা যখন রঙ্গালয়টি চালু করলেন, তখন কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিল না। গোড়াতে জনসাধারণের নাট্যশালায় কোনো আঘাত পড়েনি। মঞ্চস্থ হয়েছিল দেশপ্রেমিক নাটক *নীলদর্পণ*। তবু বাধা দেয়নি সরকার। খুব সাধারণভাবে একটি নতুন উদ্যোগে কোনও বাধা থাকে না। সেই সময় সাধারণ রঙ্গালয়ের শক্তি বা জনপ্রিয়তা বা ক্ষমতা নিয়ে ইংরেজদের কোনো মনোযোগও ছিল না।

সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রথম নাটকটি মঞ্চস্থ হল *নীলদর্পণ*। ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল এই নাটকটি। নাটকটির ইংরেজি অনুবাদের জন্য মামলা হয়েছিল। এবং *নীলদর্পণ*-এর বেশ কিছু অংশ মানহানিকর সাব্যস্তও হয়। নাটকটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করার 'অপরাধে' জেল ও জরিমানা হয়েছিল জেমস লঙ সাহেবের। প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল কলকাতার উচ্চবিত্ত সমাজ। প্রতিবাদ উঠেছিল বিভিন্ন মহলে। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখছেন, 'কোন গ্রন্থবিশেষে যে সমাজকে এতদূর কম্পিত করিতে পারে তাহা অগ্রে আমরা জানিতাম না' (*Ramtanu Lahiri* 219)।

যদিও সমাজের সম্ভ্রান্ত গোষ্ঠী নিজেরা সত্যিকার বিপদে সামিল হল না। রণজিৎ গুহের বিশ্লেষণ, 'He is ready to connive at the ryot arming himself against the planter. But he would not take up arms' (4)। নীলচাষীদের প্রচ্ছন্নভাবে মদত দিতে প্রস্তুত কলকাতার সম্ভ্রান্তরা। কিন্তু তাঁরা নিজেরা হাতে অস্ত্র তুলে নেবেন না। বরং তাঁরা আবেদন করতে চান আইনের কাছে। তাঁদের মতামত এমন— এদেশের সরকার দেশের স্বার্থে আদর্শ আইন রচনা করেছেন। সেই আইনের অপব্যবহারে তাঁরা ক্ষুব্ধ। তাঁরা চান, নীলচাষীদের আন্দোলনকে গুরুত্ব দিয়ে ইংরেজ সরকার এই ক্ষমতার অপব্যবহারকারী নীলকর সাহেবদের সায়েস্তা করুক। আরও একটি আশ্চর্যের বিষয়, মূল বাংলা নাটকটির বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি (Kar 261)। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে এই নাটকটি মঞ্চায়ন করার সময়ও কোনো বাধা সৃষ্টি হয়নি। ২১শে ডিসেম্বর ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে নাটকটির দ্বিতীয় অভিনয়ের আগে *ন্যাশনাল থিয়েটার* মানহানিকর হিসেবে বিবেচিত অংশগুলো বাদ দিয়েই অভিনয় করেছিল (Goswami 108)। সম্ভবত সেই কারণেই সাধারণ থিয়েটারে নাটকটির অভিনয়ে বাধা দেয়নি ইংরেজ সরকার (Shibabrata Chatterjee 13)। এমনকি, জেমস লঙের বিরুদ্ধে মামলা চলার সমসাময়িককালে বোম্বাইতে সম্ভবত মঞ্চস্থও হয় নাটকটি। তখনও বাধা দেয়নি সরকার। কলকাতার সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হওয়ার আগেই নাটকটি প্রকাশিত হওয়ার পরেই ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার *পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি*-তেও অভিনীত হয় নাটকটি (Dasgupta 90)। *হরকরা পত্রিকা*

লিখছে, 'Our native friends entertain themselves with occasional theatrical performances and 'Nil Darpan' was acted on one of these occations' (qtd. in Mamoon, *Natyachinta* 15)। সেই সময়েও কোনও প্রতিবন্ধকতার কথা জানা যায় না। লেখক দীনবন্ধু মিত্রের মৃত্যুরও অনেক পরে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে নাটকটির অভিনয় নিষিদ্ধ করেছিল ইংরেজ সরকার। তবে *নীলদর্পণ* নাটকের বাংলা বইটি কখনো নিষিদ্ধ বা বাজেয়াপ্ত হয়নি (Kar 261)।

সাধারণ রঙ্গালয়ে *ন্যাশনাল থিয়েটারে* ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে *নীলদর্পণ* নাটকটি মঞ্চায়নের সময় ব্রিটিশ সরকার তেমন কিছু ভাবিত হয়নি বলেই মনে হয়। কারণ যখন এই নাটকটি লিখিত হয়, অর্থাৎ ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে, সেই সময় নীলচাষ ও নীলচাষীদের অত্যাচারিত হওয়ার ঘটনাটি অত্যন্ত আলোচিত এবং বিতর্কিত একটি বিষয় ছিল। কিন্তু লিখিত হওয়ার ১২ বছর পরে যখন নাটকটি আবার মঞ্চস্থ হয়েছিল, তখন নীলচাষের এই বিষয়টির সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। নাট্যবিদ পুলিন দাসের ধারণায়, 'The Government did not feel very much concern about the stage performance of 'Nildarpan' as indigo plantation and its allied problems were almost a dead issue by that time. ... In case 'ChaKar-Darpan' was staged... and the barbarous activities of the tea planters were revealed through it, there was a possibility of a greater calamity' (P. Das, *Perscecution of Drama and Stage* 6)। ইতিমধ্যেই সিন্থেটিক নীল আবিষ্কার হয়ে গেছে, নীলচাষের ব্যবহার এবং সেই সময়ে ফলন অনেক কমে এসেছে বলে মনে করা হয়। ফলে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার নিয়ে রচিত নাটকের বাস্তব প্রত্যক্ষ উদাহরণ সমাজে তখন আর তেমন বহুল প্রচলিতভাবে উপস্থিত নেই বলে জানা যায়। পুলিন দাসের মতে, বরং আসামের চা চাষীদের দুর্দশা নিয়ে দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা *চা-কর দর্পণ* নাটকটি সেই সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক ছিল বলে মনে হয়। সেই নাটকটি মঞ্চস্থ হলে সমাজে বড়সড় সমস্যা হতে পারতো বলে মনে হয়। কিন্তু তাই বলে একথা বলা হচ্ছে না যে, নীলচাষ ও সেই সংক্রান্ত ব্রিটিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের *ন্যাশনাল থিয়েটার* প্রযোজিত *নীলদর্পণ* নাটকটির তেমন কোনো প্রতিবাদী ভূমিকাই নেই। শুধু এ কথা বলার চেষ্টা করা হচ্ছে যে হয়তো সেই সময়ে *নীলদর্পণ* নাটকের মঞ্চায়নে বারো বছর আগের সেই তীক্ষ্নতা ছিল না বা ব্রিটিশদের শাস্তির মুখে পরার

মতো চিন্তার কারণ হয়ে ওঠার তেমন ক্ষমতা রাখত না, তাই *ন্যাশনাল থিয়েটার* নাটকটির মানহানিকর হিসেবে বিবেচিত অংশগুলো বাদ দিয়েই অভিনয় চালিয়ে যেতে পেরেছিল।

উপেন্দ্রনাথ দাস ও বিদ্রোহী বাংলা নাটক

ব্রিটিশ সরকার বাংলা নাটকের ওপর আঘাত করলো সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা হওয়ার আরও তিন বছর পর। ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে। এই ঘটনার প্রধান কাণ্ডারী হলেন, উপেন্দ্রনাথ দাস নামক এক উদ্যমী যুবা (S. Mitra 171)। বর্তমান অধ্যায়ের গুরুত্ব বিচারে এই ব্যক্তিটির যথাসম্ভব বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

উনিশ শতকের বাংলা নাট্যমঞ্চে স্বদেশচেতনা, সমাজসংস্কার, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, ব্রিটিশ বিরোধী কর্মকাণ্ডের অন্যতম পুরোধা ছিলেন উপেন্দ্রনাথ দাস। তাঁর জীবনের গতিপ্রকৃতি ও নাট্যপ্রয়াসগুলি নিঃসন্দেহে বাংলা নাট্য ইতিহাসে কৌতূহলোদ্দীপক ও রোমাঞ্চকর অধ্যায় বিন্যাস করেছিল। উপেন দাসের বাবা শ্রীনাথ দাস ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অঙ্কের মাস্টারমশাই। পরে আইন নিয়ে পড়াশোনা করে হাইকোর্টে ব্যবসা শুরু করে ভালো সম্পদশালী হয়ে ওঠেন। বনেদী কলকাতার এক অন্যতম পরিবার হয়ে ওঠে শ্রীনাথের পরিবার। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বেশ ঘনিষ্ঠ ছিলেন তিনি। শ্রীনাথের কাছে অবসরে বিদ্যাসাগর শেক্সপীয়ার পড়তেন বলে জানা যায়। আবার শ্রীনাথও নাকি বিদ্যাসাগরের কাছে শিখতেন বাংলা। আজও চাঁদনি চকে তাঁর বাড়ির সামনের রাস্তাটির নাম তাঁরই নামে, শ্রীনাথ দাস লেন।

শ্রীনাথের মেজ ছেলে (মতান্তরে পঞ্চম ছেলে) উপেন্দ্রনাথ সংস্কৃত কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করার পর ব্যারিস্টারী পড়তে লণ্ডন যেতে চান। কিন্তু রক্ষণশীল শ্রীনাথ তাতে বাধা দেন। এর মধ্যে উপেনের স্ত্রী মনোমোহিনী কলেরা আক্রান্ত হন। উপেন স্ত্রীকে মেডিকেল কলেজে ভর্তি করতে চান। রক্ষণশীল শ্রীনাথ গৃহচিকিৎসক দিয়ে পুত্র বধুর চিকিৎসা করাতে থাকেন। অচিরেই মনোমোহিনী মারা যায়। উপেন ক্ষোভে গৃহত্যাগ করেন। পরে বিদ্যাসাগরের অনুসারী হয়ে তিনি এক অন্য 'নিম্নজাতীয়া' বিধবাকে বিয়ে করেন (Shastri, *Atmacharit* 113)।

তিনি মনে করতেন বিধবা বিবাহ করাটাও সমাজ আন্দোলনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তাই তাঁর ক্লাসমেট যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন বিধবাকে বিবাহ করলে উপেন সেই দম্পতিকে ও তাঁর প্রিয়বন্ধু তৎকালীন ব্রাহ্ম সমাজের পথিকৃৎ শিবনাথ শাস্ত্রীকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন (Shastri, *Atmacharit* 110)। গৃহত্যাগের পরে কিছু দিন তিনি মাদ্রাজ বসবাস করেন। কলকাতা ফিরে সেই শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গেই গড়ে তোলেন

Indian Radical League। সমাজের যুবা সম্প্রদায়কে সমাজকল্যাণমূলক কাজে ব্রতী করার উদ্দেশ্যে উপেন ও শিবনাথ নানা জায়গায় সমাজ সংস্কারক নানা বক্তৃতা দিতেন। শ্রোতা সমাগম বিশেষ না হওয়ায় অন্য পথ নেওয়ার কথা ভাবতে হয়। *অমৃতবাজার পত্রিকা*-র সমাজদরদী দেশসেবায় নিয়োজিত প্রাণ সাংবাদিক ও *ন্যাশনাল থিয়েটারের* আদি ডিরেক্টরদের একজন শিশিরকুমার ঘোষ তাঁর বন্ধু ছিলেন। তাঁর সূত্রেই Indian Radical League-এর বক্তব্য প্রচার করতেই তিনি *গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে* আসেন (Maitra 32)।

১৮৭৫-এ উপেন *গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে* ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত হন। ম্যানেজার হলেন রসরাজ অমৃতলাল বসু। মঞ্চস্থ হল *শরৎ-সরোজিনী* নাটক (Shankar Bhattacharya, *Bangla Rangalayer Itihaser Upadan* 121)। অত্যন্ত জনপ্রিয় হয় এই নাটক। ‘প্রাচীন বা মধ্যযুগের ইতিহাস কিংবা ব্যক্তিক বা সামাজিক বিচ্যুতিজনিত ঘটনার পরিবর্তে উপেন্দ্রনাথের নাটকের আশ্রয় তাঁর সমসাময়িক কলকাতা ও তাঁর সমমনোভাবাপন্ন মানুষ’ (P. Das, *Banga Rangamancha O Bangla Natak* 153)। এই নাটকে সুকুমারী চরিত্রে অভিনয় করে গোলাপসুন্দরীর আদি নাম মুছে গিয়ে পাকাপাকি ভাবে ‘সুকুমারী’ নামটিই বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল। এই নাটকটি সম্পর্কে ১৪ই জানুয়ারী ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে *অমৃতবাজার পত্রিকা* লিখছে, নাটকটি নাকি এতই জনপ্রিয় হয়েছিল যে দ্বিতীয় শো-য়ের পর প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০ মানুষ টিকিট না পেয়ে ফেরৎ গিয়েছিল (D. Chowdhury, *Bangla Theatreer Itihas* 118)। অমৃতবাজারের সাংবাদিক ছিলেন উপেনের বন্ধু শিশির ঘোষ, যিনি সমাজসেবার কাজে সাহায্য করতে উপেনকে নাট্যশালায় আনেন। ফলে অমৃতবাজারের এই তথ্যতে খানিক অতিরঞ্জন দোষ থাকতেও পারে। কিন্তু নাটকটি যে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিশেষত সুকুমারীর নাম পাকাপাকি পালটে যাওয়ার ঘটনাটি নাটকটির সাফল্যকে সূচিত করে।

এই নাটক সম্পর্কে সুকুমার সেনের একটি মন্তব্যও বেশ জরুরী। তাঁর কথায়- ‘উপেন্দ্রনাথ বাংলা নাট্য রচনায় বিপ্লব ঘটাইলেন দেশোদ্ধারের প্রচেষ্টায় খুন-জখম লাঠালাঠি ও ইংরেজ বিদ্বেষের মশলা যোগাইয়া’ (Sukumar Sen 329)। স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ উপেনের প্রচেষ্টাকে ‘মশলা’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন সুকুমার সেন। পুলিন দাসের ব্যাখ্যায় অবশ্য অন্য রকম বিশ্লেষণ পাওয়া যায়- ‘তিনি দেশপ্রেমকে ইতিহাসের প্রাসাদচূড়া থেকে নামিয়ে এনে আশ্রিত করেছিলেন সমসময়ের বাস্তব ঘটনাবলীর উপরে। রূপকের আড়াল ত্যাগ করে ইংরেজ রাজশক্তি ও স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর সংঘর্ষকে নাটকের কেন্দ্রগত বিষয় করে তুলে পিস্তল বোমা বারুদ প্রভৃতির প্রয়োগে সন্ত্রাসবাদী

রাজনীতির সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন' (*Banga Rangamancha O Bangla Natak* 153)। উপেনের এই নাটক ও পরবর্তী জীবনের প্রবাহে উপেনের জীবনে বিপুল সংশয় ঘনিয়ে আসে। অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে সেই আলোচনা করা হয়েছে। প্রশ্ন আসে, উপেনের জীবন আলোচনার নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণ করলে নাটকে ইংরেজ বিরোধিতার মতো বিপজ্জনক এবং প্রয়োজনীয় কাজকে 'মশলা' হিসেবে বিধৃত করা যায় কিনা। এ কথা বলে রাখা ভালো, যুগের চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিয়ে জনগণের মনের খোরাক জোগাতে উপেন সম্ভবত নাটক লেখেননি। তাঁর সংক্ষিপ্ত অথচ দুঃসাহসিক জীবন তাঁর সমাজসংস্কারক প্রবণতার কথাই বারবার মনে পরায়। জীবনের এত গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি নেওয়া উপেনের কার্যকলাপ দেখে আদৌ মনে হয় না যে, তিনি কোনো 'চটক' বা 'মশলা'র জোগান দিতে নাটকে ইংরেজ বিরোধিতার 'তাস' খেলে দেখেছেন। এ তাঁর ঐকান্তিক প্রয়াস। তাঁর জীবনের গতিপ্রবাহ দেখে মনে হয়, সমসাময়িক প্রতিষ্ঠিত নাট্যব্যক্তিদের তুলনায় অনেক বেশি প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক, সমাজদরদী, নিঃস্বার্থ ছিল তাঁর এই উদ্যোগ।

শরৎ-সরোজিনী জনপ্রিয় হওয়ার পর উপেন চলে গেলেন *বেঙ্গল থিয়েটারে*। সেখানে মঞ্চস্থ করলেন *সুরেন্দ্র-বিনোদিনী* নাটক (Shankar Bhattacharya, *Bangla Rangalayer Itihaser Upadan* 35)।পুনরায় জনপ্রিয় হল উপেনের নাটক। এই নাটকের প্রকাশিত পাণ্ডুলিপির 'বিজ্ঞাপন'-এ অর্থাৎ ভূমিকায় উপেন নিজের নাম গোপন করেন। ভূমিকাটি এই রকম:

> একদিন সন্ধ্যার সময়, সালিকাগ্রাম হইতে কলিকাতায় আগমনকালে, এক বটবৃক্ষমূলে এই পুস্তকখানি প্রাপ্ত হইয়াছি। পুস্তকাধিকারী কে, তাহা অদ্যাপি নিরূপণ করিতে সমর্থ হই নাই। ইহার এক প্রান্তে, হস্তাক্ষরে এই কয়েকটি মাত্র কথা লিখিত ছিলঃ—'নবগোপাল মিত্র এক প্রকাণ্ড জানোয়ার্—বৎসর বৎসর হিন্দুমেলা করিয়া কি হইতেছে? মৃতব্যক্তিকে কে পুনর্জীবিত করিতে পারে? আবার শুনিতেছি না কি 'কলিকাতা অ্যাসোসিয়েসন্' নামে একটি সভাস্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে। শিশিরকুমার ঘোষের শ্রাদ্ধ হইতেছে! –এদিকে অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' করিতেছেন। আমার পিণ্ড চট্কাইতেছেন। কে পড়ে?' ...ইহার অর্থ কি! যাহা হউক পুস্তকস্বামীমহাশয় অনুগ্রহপুরঃসর আর্যদর্শন কার্যালয়ে পত্র লিখিবেন। পত্রপ্রাপ্তিমাত্র তাঁহার পুস্তক তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করা যাইবে। (U. Das *Surendra-Binodini*)

উপেনের সমগ্র জীবনের অধিকাংশ কার্যকলাপেই এই রকম গোপনীয়তার সন্ধান পাওয়া যায়। নাট্য রচয়িতা হিসেবে নাম গোপন করা বা প্রযোজনার শেষে উপেনের দেওয়া বক্তৃতার বিষয় গোপন করা—সবক্ষেত্রেই উপেনের

এই গোপনীয়তার ভঙ্গিটি লক্ষ্যণীয়। মূল নাট্য প্রযোজনায় যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামী মানুষটির রাজনৈতিক ভাবনার একটি স্পষ্ট চিত্র দেখা যায়, প্রযোজনার বাইরে কিন্তু তাঁর অবস্থান ও কার্যকলাপগুলিকে তিনি অত্যন্ত রহস্যে মুড়ে রেখেছিলেন। অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে সেই বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

এই *সুরেন্দ্র-বিনোদিনী* নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার কিছুদিন পরেই উপেন আবার চলে এলেন *গ্রেট ন্যাশানালে*। মঞ্চস্থ হল অমৃতলাল বসুর *হীরকচূর্ণ*। মলহর রাও হোলকারের বিরুদ্ধে বরোদার ইংরেজ রেসিডেন্টকে হীরকচূর্ণ খাইয়ে হত্যার অভিযোগ আনা হয়। তাঁর রাজ্যচ্যুতি করে নির্বাসন দেওয়া হয়। এই বিষয় নিয়েই রাজনৈতিক নাটক লেখেন অমৃতলাল। এরপরে আবার *সুরেন্দ্র-বিনোদিনী* অভিনীত হয় এবং এই নাটক বাংলা থিয়েটারে ও সমাজে আলোড়ন তোলে (Shankar Bhattacharya, *Bangla Rangalayer Itihaser Upadan* 129)। অর্থাৎ *গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার* একের পর এক রাজনৈতিক ইংরেজ বিরোধী নাটক মঞ্চস্থ করে বাংলা নাট্যশালার আবহাওয়া যথাসম্ভব তপ্ত করে তুলতে পেরেছিল। ভারতের মানুষের ব্রিটিশ বিরোধী মানসিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাটকও যুগ পরিবর্তনের আন্দোলনে একসূত্রে গ্রথিত হওয়ার প্রক্রিয়ায় অংশ নিল। আর এই প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দিলেন উপেন্দ্রনাথ। বিপিনচন্দ্র পালের বক্তব্য এই সূত্রে প্রণিধানযোগ্য— '*শরৎ-সরোজিনী* ও *সুরেন্দ্র-বিনোদিনী*-র একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, 'নীলদর্পণ' ছাড়া এই দু'খানি নাটকই সর্ব্বপ্রথমে খোলাখুলিভাবে ইংরাজের সঙ্গে আমাদের যে একটা সাংঘাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা জাগিয়া আছে, ইহা বলিতে চেষ্টা করে। ইহার পূর্ব্বে আমরা ঠারে ঠোরে মুসলমান আমলে ইতিহাসের আড়ালে যাইয়া ইংরাজ-রাজের প্রতি আমাদের মনোভাব ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতাম......সাধারণভাবে ইংরাজ-রাজের বা ইংরাজ-রাজপুরুষদিগের বিরুদ্ধে *নীলদর্পণে* স্পষ্টভাবে কোনও কথা বলা হয় নাই......উপেন্দ্রনাথই প্রথমে এই ভাবটাকে প্রত্যক্ষ ও প্রকাশ্যভাবে ইংরাজ সমাজের ও ইংরাজ প্রভুশক্তির প্রতিকূলে পরিচালিত করেন' (Paul 248)।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করলেন উপেন ও তাঁর সঙ্গীরা। অতীতের কাহিনীর ছায়ায় সমকালীন শাসকের সমালোচনা নয়। তাঁরা ইংরেজদের প্রকাশ্য সমালোচনা করে একেবারে সম্মুখসমরে আহ্বান জানালেন। নাটকের সংলাপের মধ্যে অত্যন্ত ঘন ঘন প্রত্যক্ষ ইংরেজ সমালোচনা বা ইংরেজ শাসকদের প্রতি বক্রোক্তি উল্লেখযোগ্যভাবে উপস্থিত। নাটকের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ইংরেজ শাসক ম্যাক্রেণ্ডেল। আর এই নাটকের নায়ক চরিত্রের নাম হল সুরেন্দ্র। এই দুই চরিত্রের বেশ কিছু সংলাপ বিশ্লেষণ করলে সেই সময়ের নাট্যমঞ্চে কি

প্রচণ্ড ইংরেজ বিরোধিতার পদক্ষেপ নিয়েছিলেন উপেন, সে প্রমাণ দেখা যায়— 'ম্যাক্রেন্ডেলঃ (সহাস্যে) নির্ব্বোধ, আমি বাইবল চুম্বন করিয়া শপথ পূর্ব্বক যাহা বলিব, তাহার বিরুদ্ধে তোমাদের দুই শত বাঙ্গালির সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না। এতকাল ইংরাজের রাজ্যে বাস করিয়া এই সামান্য জ্ঞান উপলব্ধি কর নাই? তোমার অজ্ঞতা দেখিয়া আমি আন্তরিক দুঃখিত হইলাম্' (U. Das *Surendra Binodini* 16)।

প্রসঙ্গত অধ্যাপক রণজিৎ গুহ তাঁর *নীলদর্পণ* নাটকে আলোচনায় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেছেন। উপেন্দ্রনাথের *সুরেন্দ্র-বিনোদিনী* নাটকের আলোচনায় সেই বিশ্লেষণটি খুব জরুরী। ব্রিটিশ সরকারের আইনব্যবস্থার প্রতি উনিশ শতকের বাঙালি উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষদের কি প্রচণ্ড আস্থা বিদ্যমান ছিল সেই ব্যাখ্যায় রণজিৎ গুহ বলছেন:

> No wonder that the educated Bengali found in the law a great ally and an object of the highest admiration. Throughout much of the nineteenth century he went on propagating, defending and popularizing it. He brainwashed himself and others in favour of what he believed to be its impartiality and its powers to defend the poor. He queued up for jobs in the civil service as its junior custodian. He passed the law examination and set himself up to interpret and practise it in various roles as barrister, advocate, vakil, mukhtar and attorney. He stuffed his samiti, samaj and sammelan with lawyers. ... Above all, he made law into the most lucrative of the liberal professions. (8)

গুহের বিশ্লেষণ থেকে অনায়াসেই বোঝা যাছে, উনিশ শতকের নব্য শিক্ষিত বাঙালি নিজেদের অস্তিত্বকে ব্রিটিশ আইন ব্যবস্থার সংগে একেবারে ওতপ্রোত সংযুক্ত করে ফেলেছিল। আইন তার সবচেয়ে কাছের মিত্র ও সবচেয়ে প্রশংসাজনক বস্তু। সমগ্র উনিশ শতকে জুড়েই এই বাঙালি গোষ্ঠী আইনের মাহাত্ম্য ও কার্যকারিতার প্রচারে সময় দিয়ে গেছে। গরীবের প্রকৃত বন্ধু হিসেবে আইনকেই বিশ্বাস করতে চেয়েছে। ব্যারিস্টার, অ্যাডভোকেট হওয়ার জন্য অনবরত চেষ্টা চালিয়েছে।

অথচ উপেন্দ্রনাথ দাস তাঁর সমাজের এই প্রবণতার ঠিক উলটো পথে হাঁটতে চেয়েছেন বলে অনুমান করা যায়। তাঁর নাটকে এই ইংরেজ শাসনের বিচার ব্যবস্থার প্রতি সরাসরি অনাস্থা প্রকাশ করে গেছেন এই প্রমাণ লক্ষ্য করা গেছে নাট্যসংলাপে। তাঁর সমাজের তাঁর শ্রেণির অধিকাংশ মানুষ যেখানে আইনের সুশাসনের কামনায় অপেক্ষমান, উপেন সেই সময় ইংরেজ বিচার ব্যবস্থাকে নাট্যসংলাপের মধ্যে দিয়ে সরাসরি বক্রোক্তি করছেন। বিচারালয় নিয়ে তাঁর নিজের রাজনৈতিক ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন সুরেন্দ্রের সংলাপের মধ্যে দিয়ে। দ্বিতীয় অঙ্ক চতুর্থ গর্ভাঙ্কের একটি বিস্তৃত সংলাপ এই সূত্রে অবশ্য উল্লেখ্য:

বিরাজমোহিনীঃ যখন বিচারালয় রয়েছে, তখন সে ভার কি আমাদের নিজের হাতে নেওয়া উচিত?

সুরেন্দ্রঃ বিচারালয় যে থেকেও নেই?—আত্মসমর্থন কর্‌তে আমাদের সকলেরই স্বাভাবিক অধিকার আছে, এবং করাও একটী প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম। আত্মরক্ষা প্রকৃতির প্রথম অনুশাসন। কিন্তু সভ্যতা বিস্তারের সহিত সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্যই সেই স্বত্ত্ব ও অধিকার কতকগুলি ব্যক্তিবিশেষের হস্তে ন্যস্ত হয়। তাঁহারা সাধারণের প্রতিনিধিস্থলে অভিষিক্ত হয়ে, সত্য বিচার কর্‌বেন এই শপথপূর্ব্বক, সেই গুরুতর কর্ম্মের ভার নিজস্কন্ধে গ্রহণ করেন্। কিন্তু তাঁহারাই যখন অত্যাচারী, উৎপীড়ক ও স্বার্থপরায়ণ হয়ে উঠেন্, যখন ধর্ম্মাসনসকল পক্ষপাতদোষদুষ্ট হয়, যখন শুক্লকৃষ্ণবর্ণের তারতম্য অনুসারে বিচারফলেরও তারতম্য হতে আরম্ভ করে, যখন অজাতশ্মশ্রু, ইন্দ্রিয়সুখান্বেষী লম্পট, বিদেশীয় বালকদের উপর সহস্র সহস্র লোকের ধন, প্রাণ ও মান রক্ষা বা নষ্ট কর্‌বার্ সম্পূর্ণ ক্ষমতা নিক্ষিপ্ত হয়,--তখন আমাদের সেই আদিম স্বত্ব আমাদের হস্তে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তখন উপেক্ষা করে থাকা মূর্খতা, ভীরুতা, অমানুষতার কর্ম্ম—তখন তুষ্ণীসভাব অবলম্বন কর্‌লে ঘোর প্রত্যবায় আছে। (U. Das, *Suredra Binodini* 25)

সরাসরি আইন হাতে তুলে নেওয়ার ডাক দিচ্ছেন যেন উপেন। মানুষের প্রতিনিধিত্ব করতে যে রাষ্ট্রকাঠামো তৈরি করা হয়, সেই কাঠামোর মধ্যে যদি গলদ দেখা যায়, সেই শাসনযন্ত্রের মধ্যে যদি মানুষকে নিষ্পেষণের প্রচেষ্টা চলতে থাকে, তখন সমগ্র রাষ্ট্রকাঠামোকেই মূলোচ্ছেদ করার পক্ষে সওয়াল করছে সুরেন্দ্র। এই উদ্যমেরই প্রতিচ্ছবি হিসেবে নাটকের শেষে দেখানো হচ্ছে বন্দীবিদ্রোহ। তৃতীয় অঙ্ক পঞ্চম গর্ভাঙ্কে সমবেত হচ্ছে হুগলীর কারালয়ের বন্দীরা। একজন বন্দীর সংলাপে ধ্বনিত হচ্ছে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক প্রতিরোধী স্বর:

> ১ম বন্দীঃ এই ইংরেজের অত্যাচার আর সওয়া যায় না। হয় পায়ের শিকল ছিঁড়্ব, না হয় মর্‌ব। আর এই শেকল টেনে নিয়ে বেড়াতে পারি নে।–যে যেখানে আছিস্, দাদা—যে কেউ কখনো এই পাজি ইংরেজের জুতা লাথি খেয়েছিস্--আয়, সব, দৌড়ে আয়। এ জেলের দেল ভাঙ্গা, এ বিলিতি লোহার শেকল ছেঁড়া, এক আধ্ জনের কর্ম্ম নয়। আয়, ভাই দাদা, সক্কলে, আয়—যে যেখানে আছিস্, দৌড়ে আয়। হিঁদু হস্, মুসলমান হস্--বাঙ্গালি হস্, খোট্টা হস্--ছেলে হস্, বুড় হস্--যাঁর শরীরে এক ফোঁটা দেশী রক্ত আছে,--আয়, সব, দৌড়ে আয়। (U. Das, *Surendra Binodini* 46)

উপেনের নাট্য কর্মের আলোচনায় এই সংলাপটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নাট্যসংলাপের মধ্যে দিয়ে দ্বিধাহীন ভাবে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক আহ্বান জানাচ্ছেন উপেন। সংলাপে মনে হয়, উপেনের আহ্বানে, তাঁর একমাত্র শত্রু ইংরেজ শাসনব্যবস্থা। সরাসরি সংগ্রামে ব্রতী তিনি। একত্রিত করতে চাইছেন দেশীয় মানুষদের। একত্রিত হওয়ার ডাক দিচ্ছেন হিন্দু মুসলিম বাঙালি অবাঙালি সহ সমগ্র ভারতবাসীকে। এই ঐক্যবদ্ধতায় কোনো জাতি-ধর্ম-বর্ণের বিভেদ নেই। একটিমাত্র বিদেশি অত্যাচারী শক্তির বিরুদ্ধে সমবেত হওয়ার প্রয়াস নিচ্ছেন উপেন। এমনকী, অত্যাচারী ইংরেজের অপশাসনের মোক্ষম জবাব দিতে নায়ক সুরেন্দ্র ইংরেজ শাসক ম্যাক্রেন্ডেলকে প্রহার করতেও ছাড়ছেন না। দুশ্চরিত্র ইংরেজ প্রশাসক দেশীয় অবলা নারীর সতীত্ব নষ্ট করার দৃশ্য এর আগে *নীলদর্পণ* নাটকেও দেখা গেছে। কিন্তু জেলের বন্দীবিদ্রোহ ঘটানো ও বিদ্রোহীদের হাতে ইংরেজ শাসকের মৃত্যু—এই দৃশ্য আগে কখনো সম্ভবত বাংলা রঙ্গালয় প্রত্যক্ষ করেনি—

> ‘সুরেন্দ্রঃ আজ যে আমাকে লাথি মেরেছিস্, তার পুরস্কার এই, এই (দুই কষাঘাত।)—আমাকে যে চাবুক মেরেছিস্, তার পুরস্কার এই, এই, এই (তিন কষাঘাত।)—আর সুদের স্বরূপ এই যৎকিঞ্চিত—এই , এই, এই, এই (চারি কষাঘাত)’ (U. Das, *Surendra Binodini* 34)।

কোনোরকম দ্বিধা না রেখে, কোনো আড়াল আবডাল না রেখে, প্রত্যক্ষ সংলাপ ও মঞ্চ দৃশ্যায়নের মাধ্যমেই ইংরেজ প্রশাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করছেন যেন উপেন। শ্বেতাঙ্গ আমলাকে প্রহার করার দৃশ্য অবতরণ করে উপেন একযোগে ইংরেজ সরকার ও অতি-সাবধানী ভদ্রলোক বাঙালিদের কাছে হয়তো ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ালেন। সুমন্ত এই ঘটনা নিয়ে লিখছেন, ‘ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও দাবি আদায়ের অভিযানে আগ্রহী হলেও, ভদ্রলোক সমাজ তাকে মারামারির পর্যায়ে নিয়ে যেতে রাজি ছিলেন না’ (S. Banerjee, *Itar Santan* 237)।

অথচ আলাপ-আলোচনা বা অহিংস পন্থার সময় পেরিয়ে সরাসরি অসহিষ্ণুতার পক্ষ্যে নাট্য দর্শকসমাজকে জাগরিত করে তুলতে চাইছেন উপেন্দ্রনাথ—তাঁর নাট্য সংলাপ আমাদের সেই ব্যাখ্যার দিকেই নিয়ে যাচ্ছেঃ

‘বিরাজঃ দাদা, সকল বিচারকই কিছু পক্ষপাতী নন্, আর কোনো অন্যায়, কোনো অত্যাচারই চিরস্থায়ী হয় না। রাত্রি পর দিন হয়ই হয়। প্রতিশোধের চেষ্টা অপেক্ষা সহিষ্ণুতা ভাল নয়, দাদা?

সুরেন্দ্রঃ সহিষ্ণুতা! সহিষ্ণুতা!—আর আমার সম্মুখে সহিষ্ণুতার নাম কর না, বিরাজ! কথাটা শুনলে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠে (দন্তের উপর দন্ত স্থাপণপূর্ব্বক) সহিষ্ণুতা, সহিষ্ণুতা করে ভারতের কি অভূতপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, দেখতে পাচ্ছ ত!’ (U. Das *Surendra Binodini* 26)

ইতিমধ্যে উপেন্দ্রনাথের আরও একটি খুব বড়ো অবদানের কথা উল্লেখ করতেই হয়। সমাজে উপেক্ষিত ও ঘৃণ্য শ্রেণীভুক্ত অভিনেত্রীদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য উপেনের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে আজকের যুগের নারী স্বাধীনতাকামী মানুষের কাছেও প্রশংসার যোগ্য। *গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারের* প্রখ্যাত অভিনেত্রী ছিলেন গোলাপসুন্দরী। এই গোলাপসুন্দরীকে গৃহস্থ জীবনে প্রতিষ্ঠা করার জন্য উপেন দলেরই এক অভিনেতা গোষ্ঠবিহারী দত্তের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেন (Dasgupta 2: 276)। এই গোষ্ঠবিহারী *শরৎ-সরোজিনী* নাটকে বৈজ্ঞানিকের ভূমিকার অভিনয় করেছিলেন (Sukumar Sen 331)। *শরৎ-সরোজিনী* নাটকে সুকুমারী চরিত্রে বিখ্যাত হয়ে ‘গোলাপ’ পরিচিত হয়েছিলেন ‘সুকুমারী’ নামে। এবার গোষ্ঠবিহারী দত্তের সঙ্গে বিবাহ হওয়ায় তিনি হলেন সুকুমারী দত্ত। সমাজে উপেক্ষিত, ঘৃণিত, লাঞ্ছিত, ব্রাত্য, অবহেলিত, অযাচিত শ্রেণীর মেয়েটি সাধারণ গৃহস্থ জীবনের পথে পা বাড়াতে পেরেছিলেন উপেন্দ্রনাথ দাসের উৎসাহে। নাটকের মাধ্যমে নিজ রাজনৈতিক ভাবনা জনমানসে প্রবাহিত করার পাশাপাশি নারী মুক্তির কাজে এই উদ্যম উপেনকে প্রগতিশীল মানুষ হিসেবে এক অন্য মাত্রায় পৌঁছে দেয়। সুকুমারী সুখী হন না। স্বামী ছেড়ে চলে যান (Maitra 41)। শেষজীবনে অনেক সংগ্রামে কাটে তাঁর। কিন্তু তাই বলে উপেনের এই উদ্যম মিথ্যে হয় না। বারবণিতা গোষ্ঠীর একটি মেয়েকে তথাকথিত গৃহস্থ সুখ দেওয়ার জন্য তাঁর এই প্রয়াস ব্যর্থ হতে পারে, কিন্তু তাঁর প্রগতিশীল মননে ও সদিচ্ছায় কোনো খামতি ছিল না বলেই মনে হয়।

এই সূত্রে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা তাৎপর্য্যপূর্ণ। গোলাপসুন্দরীর বিয়ের মাধ্যমে নারীমুক্তি, বিশেষত ‘নিম্ন’ সম্প্রদায়ের নারীমুক্তির যে উৎসাহ উপেন নিয়েছিলেন, তার একটা পরোক্ষ প্রভাব হয়তো তাঁর পরিবারের নারীমুক্তির একটি ঘটনায় গিয়েও পড়েছিল। উপেনের নিজের ভাই, শ্রীনাথ দাসের আরেক ছেলে দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন

কৃতী ছাত্র। রক্ষণশীল পিতার অমতে ইংল্যাণ্ডে ব্যারিস্টারি পড়তে যান। সেই অপরাধে ছেলেকে ঘর থেকে বের করে দেন শ্রীনাথ। দেবেন্দ্রনাথ বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হলে তাঁর সঙ্গী হলেন তাঁর স্ত্রী কৃষ্ণভামিনী। শ্রীনাথের বিরোধিতায় তাঁদের কন্যাকে তাঁরা সঙ্গে নিতে পারলেন না। মেয়েকে ছেড়েই কৃষ্ণভামিনী স্বামীর সঙ্গ নেন। কিছুদিন পর দেবেন দ্বিতীয়বারের জন্য ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন, সঙ্গে যান কৃষ্ণভামিনী। মেয়েকে কলকাতাতে শ্রীনাথ দাসের অধীনে রেখেই তাঁরা ইংল্যাণ্ডে থাকেন দীর্ঘ আট বছর। ইংল্যাণ্ডে থাকাকালীন কৃষ্ণভামিনী একটি ভ্রমণ-বিবরণী লেখেন। এটিই বাঙালি রমণীর লেখা প্রথম প্রকাশিত ইংল্যাণ্ড-ভ্রমণের বৃত্তান্ত। এই রচনাটি সেই সময়ের উচ্চবিত্ত হিন্দু পরিবারের 'নতুন নারী' গড়ে তোলার ধারণাটির একটি বিশ্বস্ত দলিল বলা যায়। নারীমুক্তি উদ্যোগে উপেন্দ্রনাথ দাসের যাবতীয় প্রত্যক্ষ উদ্যোগের (যেমন-নিজের প্রথম স্ত্রীকে পিতার অমতে হাসপাতালে ভর্তি করার প্রচেষ্টা, দ্বিতীয় বিয়ে করা এক 'নিম্নজাতীয়া' বিধবা মহিলাকে, বন্ধুর বিধবাবিবাহে প্রত্যক্ষ সমর্থন, সম্ভ্রান্ত হিন্দু ছেলের সঙ্গে গোলাপসুন্দরীর বিয়ে দেওয়া) পাশাপাশি নিজের পারিবারিক পরিসরেও ভ্রাতৃবধুর সন্তানকে ছেড়ে এই ইংল্যাণ্ডপাড়ির ঘটনাটিও পরোক্ষভাবে হলেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। এই কারণেই এই পরিসরে বিষয়টির উল্লেখ করা হল। কৃষ্ণভামিনীর ভ্রমণবৃত্তান্ত নিয়ে প্রথম অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

যাই হোক, উপেনের জীবনের এর পরের ঘটনাগুলি খুব দ্রুত এগোতে থাকে বলে জানাচ্ছে ইতিহাস। *সুরেন্দ্র-বিনোদিনী, হীরকচূর্ণ, সরোজিনী* প্রভৃতি দেশপ্রেমমূলক নাটকগুলো পর পর প্রযোজনা করতে থাকে *গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার*। এই সূত্রে অমিত মৈত্র এই ঘটনার ব্যাখ্যায় লিখেছেন, 'উপেন্দ্রনাথের পরিচালনায় *গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার* রাজনৈতিক তথা দেশপ্রেম মূলক বক্তব্য প্রচারের এক মঞ্চে পরিণত হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই উপেন্দ্রনাথের শিল্পীগোষ্ঠী ক্রমশ উদবুদ্ধ হয়েছিল..... এই উত্তেজনামূলক নাটক প্রযোজনার ব্যাপারে উপেন্দ্রনাথের প্রতি নিশ্চয়ই সুকুমারী প্রমুখ শিল্পীগোষ্ঠীর সমর্থন ছিল। যদি না থাকত, তাহলে তাঁরা সরে যেতেন উপেন্দ্রনাথের পাশ থেকে' (36)। অমিত মৈত্র এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে উপেন ও তাঁর সহসাথীদের সমবেত উদ্যোগের আবেগটিকে ইঙ্গিত করতে এই কথাটি লিখেছেন বলেই মনে হয়। কারণ সহসাথীরা ঠিক কী কারণে উপেনের পাশ ছেড়ে যাননি, সে ব্যাপারে তথ্যের উল্লেখ তিনি করেননি। যাই হোক, এর পরের ঘটনায় মনোযোগ দেওয়া যাক। *সরোজিনী* নাটকের সঙ্গে অভিনীত হল *গজানন্দ ও যুবরাজ* প্রহসন (Shankar Bhattacharya, *Bangla Rangalayer Itihaser Upadan* 124)। প্রথাগত ইতিহাস জানাচ্ছে, এই প্রহসনটিই রাজনৈতিক নাটক হিসেবে তথা ইংরেজ বিরোধী দেশপ্রেমী নাটক হিসেবে

নাট্যজগৎ তথা গোটা রাজনৈতিক জগতে উন্মাদনা ছড়িয়ে দেয়। এই নাটকটির একটি প্রতিষ্ঠিত প্রেক্ষিত বর্ণিত হয়েছে নাট্য ইতিহাস গ্রন্থগুলিতে। নাটকটির পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করতে এই প্রেক্ষিতটি নিয়ে আলোচনা জরুরী বলে মনে হয়।

১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে মহারানী ভিক্টোরিয়ার পুত্র 'প্রিন্স অফ ওয়েলস' কলকাতা আসেন। রাজপুরুষের এই আগমন স্বাদেশিক বাঙালি ভালো চোখে দেখেননি। 'বিশেষভাবে রাজ-অভ্যর্থনার জন্য ইংরেজ সরকার অর্থসংগ্রহে যে নিয়মনীতি প্রয়োগ করেছিলেন, সাধারণ বাঙ্গালীর কাছে তা আতংকের কারণ হয়ে দাঁড়ায়' (P. Bhattacharya 330)। *অমৃতবাজার পত্রিকা*-য় একের পর এক প্রতিবাদী প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে থাকে। দেশের ঘোর দুরবস্থার দিনে রাজপুত্রের আমোদপ্রমোদের উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার অকারণ অর্থব্যয় করায় বিরূপ হয়েছিল স্বদেশী বাঙালি। তার ওপর সেই রাজপুত্র সম্ভ্রান্ত বাঙালি পরিবারের অন্দরমহল দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করলে হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় নিজের অন্দর মহলে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যায়। এই ঘটনায় তৎকালীন সমাজে অত্যন্ত সমালোচনার ঝড় ওঠে। *হিন্দু পেট্রিয়ট* লেখে, 'National feeling has been outraged' (Dasgupta 2: 267)। ঠিক সেই সময় এই ঘটনা নিয়ে উপেন লেখেন *গজদানন্দ ও যুবরাজ* প্রহসনটি। বাঙালি হিন্দু সম্ভ্রান্ত পরিবারের এ হেন ইংরেজ তোষণের ঘটনায় উচ্চবিত্তরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। রাজভক্ত প্রজাদের এমন হীনভাবে চিত্রিত করার অভিযোগে প্রহসনটির পুনরাভিনয় নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল (Roychowdhury 51)। যদিও উপেনের নাট্য বিষয়টি ছিল একাধারে ইংরেজ ও রক্ষণশীল হিন্দু উভয়ের বিরুদ্ধে আক্রমণ সূচক। ক্ষেপে ওঠে ইংরেজরা। গোঁড়া হিন্দুদের আক্রমণাত্মক নাটক এর আগেও হয়েছে। '...১৮৫০-এর দশকে প্রথমে বিধবাবিবাহ এবং পরে বহুবিবাহ নিয়ে কলকাতার হিন্দু সমাজে যে জোর আন্দোলন আরম্ভ হয়, তা সাহিত্যের অন্য শাখার চেয়ে নাট্যরচনাকেই বেশি প্রভাবিত করেছিল' (Murshid, *Ashar Chhalane Bhuli* 176)। রামনারায়ণ তর্করত্নের *কুলীনকুলসর্বস্ব*, উমেশচন্দ্র মিত্রের *বিধবাবিবাহ*, মধুসূদনের *বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা* নাটকগুলি তো রক্ষণশীল হিন্দুদেরও সমাজের সংস্কারের উদ্দেশ্যেই লেখা। কিন্তু সেই নাটকের মঞ্চাভিনয় নিয়ে ইংরেজরা কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করার আগ্রহ দেখায়নি। কিন্তু রাণীর ছেলে প্রিন্স অফ ওয়েলস-এর এমন অপমান ইংরেজ সরকার যার পর নাই বিব্রত করে তুলল। শিবব্রত চট্টোপাধ্যায় এই সূত্রে বলছেন, '১৮৭৬ –এর ওই ঘটনার পর আজ সোয়াশ বছর কেটে গেছে, এখনও যে-জাতি তার গণতন্ত্রী সরকারের মাথায় মুকুট পরিহিত রাণীকে মুকুটের মতো বসিয়ে রাখে,

একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও যে জাতি নিজের দেশের নাম থেকে 'Kingdom' শব্দটি বাদ দেয় না, সে জাতির পক্ষে Princeকে নেটিভ স্টেজে ক্যারিকেচার করা হলে ওইরকম অর্ডিনান্স-আইন প্রণয়ন করাই স্বাভাবিক' (26)। অতএব রাণীর পুত্রকে অপমান করার অপরাধে নিষিদ্ধ হল প্রহসনটি। রাজভক্ত প্রজার অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার কোনও সদিচ্ছা থেকে ইংরেজরা এত উদ্যোগ নেয়নি।

গজদানন্দ ও যুবরাজ প্রহসনটি নিষিদ্ধ হওয়ার পর মঞ্চস্থ হল *কর্ণাটকুমার* নাটক। সঙ্গে *হনুমানচরিত্র* প্রহসন (Shankar Bhattacharya, *Bangla Rangalayer Itihaser Upadan* 125)। *কর্ণাটকুমার*-এর সঙ্গে *হনুমানচরিত্র* নামে আবার একই নাটক অভিনীত হল বলে মনে করা হয়। চলতে থাকে ইংরেজদের সঙ্গে উপেন ও তাঁর শিল্পীগোষ্ঠীর লুকোচুরি খেলা। এই দিনের অভিনয় শেষে উপেন দাস ইংরেজিতে একটি বক্তৃতা দেন। *The Statesman* পত্রিকায় এই অভিনয়ের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল এইভাবে,

GREAT NATIONAL THEATRE

THIS EVENING

Saturday, 26th Feb, 1876

A NEW WORK BY AN ABLE HAND,

THE PRINCE OF KARNATA.

'To conclude with that Brilliant Farce

HANUMAN-CHARITRA!

An English Speech by the Director!!

Genuine Britons are most respectfully invited to attend.'

SONGS! SONGS! SONGS!!

By Srimati Sukumari Dutta and others.

(Shankar Bhattacharya, *Bangla Rangalayer Itihaser Upadan* 125)

ইতিহাস আমাদের জানাচ্ছেন, এই সময়ে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ উপেন করেন। সম্ভবত উপেন নাটকে এসেছিলেন নাটকের টানে নয়। তিনি নাটক করতে আসেন সমাজসংস্কার, জনসংযোগ ও রাজনৈতিক

গণচেতনা প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে। ইণ্ডিয়ান র‍্যাডিকাল লিগটিও তৈরি করেন শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে নানা স্থানে ঘুরে ঘুরে প্রগতিশীল বক্তৃতা দিয়ে জনগণকে সচেতন করার জন্য। সেখানে জনসমাগম না হওয়ায় সম্ভবত তাঁর থিয়েটারে আসা। তাহলে কি এইরকমই কোনো প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে নাটকের শেষে তাঁর এই ভাষণ দেওয়ার আয়োজন? পুলিন দাসের মতে, '...মঞ্চের ওপরে পুলিশের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ও রঙ্গালয়ের স্বাধীনতা রক্ষার সপক্ষে উপেন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্য নিবেদন করেন' (*Banga Rangamancha O Bangla Natak* 153)। দৈনিক পত্রিকায় ভাষণের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। একটি বিজ্ঞাপনে ভাষণের বিষয়ের উল্লেখ করা হয়নি। পরের একটি বিজ্ঞাপনে ভাষণ বিষয় ছিল 'অভিনেত্রী'।

কিন্তু বিষয় যাই প্রচারিত হোক না কেন, বক্তৃতার মূল উদ্দেশ্য কি ছিল জনজাগরণ ঘটানো? নাহলে নাট্যবিষয়ক কোনো বিশেষ বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তখনকার বাংলা থিয়েটারে অনেক প্রসিদ্ধ মানুষ ছিলেন। নাটকের যেকোনো তাত্ত্বিক বা শিক্ষামূলক বক্তৃতার জন্য তো বাংলা নাট্য দর্শকের উপেনকে প্রয়োজন ছিল কি? এমনকী *গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের* তৎকালীন ম্যানেজার অমৃতলাল বসুও নাট্য অভিজ্ঞতায় যতটা সমৃদ্ধ ছিলেন, উপেন আদৌ মাত্র কয়েক মাসের নাট্যচর্চায় ততটা নাট্য বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠতে পেরেছিলেন বলে কি আদৌ মনে হয়? অনুমান করা যায়, উপেনের এই বক্তৃতা হয়তো নাট্যসম্বন্ধীয় নয়। হয়তো বক্তৃতার দিনের নাট্যবস্তুকে কেন্দ্র করে বা সমগ্র বাংলা ও বিশ্বনাট্যসংক্রান্ত কোনো বিষয়কে উপলক্ষ্য বানিয়ে তিনি বক্তৃতা শুরু করতেন। কিন্তু বক্তৃতার প্রধান উদ্দেশ্য হয়তো থাকত জনচেতনার প্রসার। কিন্তু ধন্দ হল বক্তৃতার ভাষা ইংরেজি কেন? বাঙালি দর্শকের সামনে বক্তৃতা করার সবচেয়ে ভাল মাধ্যম তো বাংলা। সন্দেহ থেকে যায়, বক্তৃতার ভাষা কি সত্যিই ইংরেজি ছিল? নাকি সেটাও ঐ লুকোচুরি খেলার আরেকটি কৌশল মাত্র?

এরপর *কর্ণাটকুমার* ও *হনুমানচরিত্র* নাটক দুটিও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ফলে আবার *সুরেন্দ্র-বিনোদিনী* ও 'নতুন নাটক' *the police of pig and sheep* প্রহসন মঞ্চস্থ হয়। সুবীর রায়চৌধুরীর মতে এই দ্বিতীয় নাটকটিও *হনুমানচরিত্র* প্রহসনের নাম পাল্টে মঞ্চস্থ করা হয়েছিল (51)। পুলিশ কমিশনার স্যার স্টুয়ার্ট হগ ও সুপারিন্টেন্ডেন্ট ল্যামকে ব্যঙ্গ করে লেখা এই নাটক। আবার এই দিনের নাটকের শেষেও বক্তৃতা করলেন উপেন। শীর্ষক ছিল 'on actress'.

উপেনের এই কার্যকলাপ প্রতিহত করতে এর মাঝেই নাট্য নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অর্ডিন্যান্স জারি হল (Shankar Bhattacharya, *Bangla Rangalayer Itihaser Upadan* 126)। সঙ্গে সঙ্গে *গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার* এই ধরনের বিতর্কিত রাজনৈতিক নাটকের অভিনয় বন্ধ করে অন্য সামাজিক নাটক করা শুরু করল। ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ৪ই মার্চ তারিখে সেইরকমই সাধারণ একটি সামাজিক নাটক চলার সময়ে ডেপুটি কমিশনার এসে অভিনয় বন্ধ করে দিল (Maitra 39)। *সুরেন্দ্র-বিনোদিনী* নাটক 'অশ্লীল'—এই অভিযোগে নাট্যাধ্যক্ষ উপেন দাস, অধ্যক্ষ অমৃতলাল বসু, সহ-অধ্যক্ষ বন্কুবিহারী দাস, স্বত্বাধিকারী বাবু ভুবনমোহন নিয়োগী, অভিনেতা মতিলাল সুর, মহেন্দ্রলাল বসু, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, সঙ্গীতাচার্য রামতারণ স্যান্যাল, শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র দাস—এই দশ জন গ্রেপ্তার হলেন। এখানে উল্লেখ্য '*সুরেন্দ্র-বিনোদিনী-ই* প্রথম বাংলা বই, যা রাজরোষে পড়ে' (Kar 129)। অশ্লীলতার অভিযোগগুলো এইরকম:

(ক) 'উপেন্দ্রনাথ দাস (নাট্যাধ্যক্ষ) ও অমৃতলাল বসু (ম্যানেজার) ১৮৭৬ সালের ১লা মার্চ প্রকাশ্যভাবে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অশ্লীল নাটকের প্রযোজনা করিয়াছেন। অন্যান্য আসামীরা তাহাতে অংশগ্রহণ করিয়া সহায়তা করিয়াছেন। এই নাটকের অভিনয়ে, শাড়ীর সম্মুখভাগ রক্তাক্ত এমনি একটি বালিকাকে একটি সাহেব কর্ত্তৃক বহন করানো হইয়াছে, এবং প্রমাণ করানো হইয়াছে যে বালিকাটি সাহেব কর্ত্তৃক ধর্ষিতা'।

(খ) নট অমৃতলাল বসু জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাক্রেণ্ডেলের ভূমিকায় নিম্নলিখিত অশ্লীল মন্তব্য করিয়াছেন—

(১) 'তোমার একটি সুন্দর ভগ্নী আছে না? তাহাকে একদিন আমার শয্যায় পাঠাইয়া দিও। আমি তোমাকে কিছু টাকা দিতে স্বীকার আছি'।

(২) 'সুন্দরী, আর বিলম্ব করিতে পারি না। এখনও মিষ্ট কথায় বলিতেছি। প্রণয়দানে সম্মত হও, তাহা না হইলে তোমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও...'

(৩) 'সুন্দরী, আমার আলিঙ্গনের ভিতর এসো, আমাকে ভয় পাইতেছ কেন। আমি ব্যাঘ্রও নহি, ভল্লুকও নহি, শূকরও নহি, আমি তোমার প্রেম আস্বাদন করিতে চাই'। (P. Bhattacharya 345)

বিচার শুরু হলে বেশ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপেনদের পাশে দাঁড়ালেন। যেমন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, *আর্যদর্শন* পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, হাইকোর্টের

প্রধান অনুবাদক শ্যামাচরণ সরকার ও কলকাতা হাইকোর্টের দোভাষী মি. ওয়েন প্রত্যেকে বললেন, নাটকটির কোনো অংশ 'অশ্লীল' নয় (Roychowdhury 52)। তাঁরা অভিযুক্তদের পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন। মি. ওয়েন বললেন:

> I am senior interpreter, High Court. I see Surendra Venodini. I have read the book. I find it resembles a novel called twenty straves, published in 'Bow Bells'. It is a play. It is not in my opinion as obscene play for the Bengali stage. I am acquainted with Bengai play not deeply read in them. There are other more imedients. The object of the scene is to incite virtuous indignation toards the magistrate, who is depicted as villain. (Dasgupta 2: 345)

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন *হিন্দু পেট্রিয়ট*-এ লিখলেন 'অশ্লীল' হিসেবে চিহ্নিত অংশটি নাকি স্যার ওয়াল্টার স্কটের *ইভানহো* উপন্যাসের প্রভাবে রচিত। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র মত প্রকাশ করলেন যে নাটকটি সমাজসংস্কারের উদ্দেশ্যে রচিত (P. Bhattacharya 344)। সবাই মুক্ত হলেন শুধু উপেন ও অমৃত সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। হাইকোর্টে মামলা করা হল। আসামীপক্ষকে নেতৃত্ব দিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী ও কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

গ্রেট ন্যাশনালে নাটক কিন্তু চলতেই থাকল। ১১ই মার্চ অভিযুক্তদের সাহায্যার্থে অভিনীত হল *সরোজিনী* নাটক। পুলিশকে অগ্রাহ্য করে সরকারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অভিনয় ছিল সেটি। সুকুমারী ও বাকি নাট্যদল পিছু হটেনি। মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করলেন সুকুমারী। উনিশ শতকীয় বাংলা থিয়েটারে এমন বিপ্লবী পদক্ষেপ আর কখনও হয়েছে কিনা জানা যায় না। *The Statesman* পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হল:

GREAT NATIONAL THEATRE

This day, Saturday, 11 March, 1876

For the benefit of distressed Actors

That established favourite and

romantic tragedy

SAROJINI

SRIMATI SUKUMARI DUTTA

AS SARAJINI

plenty of Songs!

PATRIOT AND COUNTRYMEN

Come and Support us now!

NOW OR NEVER. (Maitra 39)

২০শে মার্চ মামলা শেষ হল। অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হল। বেকসুর খালাস পেলেন উপেন ও অমৃত। *সুরেন্দ্র-বিনোদিনী* নাটকের এই মামলার রায় যেদিন ঘোষণা হল, সেইদিনই নাট্যনয়ন্ত্রণ বিলটি Legislative Council-এ পেশ হয়েছিল। কয়েক মাসেই তা আইনে পরিণত হল।

কিন্তু মামলা মোকদ্দমায় *গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার* জেরবার হয়ে বন্ধ হয়ে গেল। দেনার দায়ে বিক্রি হয়ে গেল থিয়েটার (Shankar Bhattacharya, *Bangla Rangalayer Itihaser Upadan* 133)। থমকে গেল সুকুমারীর অভিনয় জীবন (D. Chowdhury, *Bangla Theatreer Itihas* 133)। আরেকজন অভিনেতা বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় পুলিশে চাকরি নিয়ে আন্দামান চলে গেলেন। অমৃতলালও বিলেত চলে যেতে চাইলেন। কিন্তু বাড়ির অমতে যেতে পারলেন না (Roychowdhury 53)। পরে তিনিও গেলেন আন্দামান, অবন্দী বাঙালি হিসেবে (D. Chowdhury, *Bangla TheatreerItihas* 133)। নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কন্যার বিবাহের অজুহাতে থিয়েটার ছাড়লেন। বিনোদিনী যোগ দিলেন *বেঙ্গল থিয়েটারে* (Shankar Bhattacharya, *Bangla Rangalayer Itihaser Upadan* 88)।

উপেন এই মামলা নিষ্পত্তির আগেই টিবি আক্রান্ত হয়েছিলেন। মামলায় জড়িয়ে প্রচণ্ড অর্থাভাবে এসে পড়েন। দ্বিতীয়া স্ত্রী আত্মহত্যা করেন। সবদিক থেকে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েন উপেন। শিবনাথ শাস্ত্রীও বিদ্যাসাগরের মধ্যস্থতায় পিতা শ্রীনাথ দাসের সাহায্যে উপেন অসুস্থতা কাটিয়ে লণ্ডন পাড়ি দেন। তাঁর এই পর্বের থিয়েটার জীবন এখানেই সমাপ্ত হয়। পরবর্তী কালে লণ্ডন থেকে ফিরে স্বল্পকালের জন্য তিনি থিয়েটার করলেও থিয়েটার ঘিরে তাঁর জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড এই সময়েই শেষ হয়। অধ্যায়ের এই পর্যায়ে উপেন্দ্রনাথ ও তাঁর সহসাথীদের কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে এই আখ্যানই জানায় আমাদের প্রতিষ্ঠিত নাট্য ইতিহাস।

বাংলা থিয়েটার জগত ও প্রতিবাদী নাটকের ক্ষণস্থায়ী স্ফুলিঙ্গ

কলকাতা শহরকেন্দ্রিক থিয়েটারের ইতিহাসের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল উপেন, অমৃত ও সুকুমারীদের এই নাট্যপর্ব। উনিশ শতকের বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বিপ্লবী উষ্ণতায় মহিমান্বিত করতে এই অধ্যায়ের বড় গুরুত্ব। কিন্তু সত্যি কি এটা নাট্যজগতের মানুষদের একটি আন্দোলন ছিল? নাকি এটি ছিল মুষ্টিমেয় কিছু রাজনৈতিক মানুষদের একত্র প্রতিবাদী পদক্ষেপ? এই আন্দোলনকে কি নাট্য মহলের মানুষদের সমবেত আন্দোলন হিসেবে প্রতিভাত করা যায়? নাকি নাটক হয়ে উঠেছিল এই রাজনৈতিক আন্দোলনের একটি হাতিয়ারমাত্র? আমাদের নাট্য ইতিহাস গ্রন্থগুলিতে নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন নিয়ে সমস্ত আলোচনায় যেভাবে নাট্যকর্মীদের ইংরেজবিরোধী ও দেশপ্রেমিক প্রতিবাদী ইমেজটি বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে কি এই বিশেষ ঘটনাটিকে কোনো ভাবে মহীয়ান করে তোলার উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে? নাকি এই আন্দোলন একান্তভাবেই নাট্যজগতের বাইরের কিছু মানুষের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা একটি কর্মকাণ্ড, নাটক যেখানে একটি সহায়কমাত্র? নাট্য জগতের জনপ্রিয়তা ও পরিকাঠামোকে ব্যবহার করে আসলে একটি রাজনৈতিক উদ্যোগ ছিল কি এই ঘটনা? নাকি প্রথাগত নাট্য ইতিহাসে যেমন ভাবে নাট্যজগতের সাহসী, বিপ্লবী, নির্ভীক ছবিটি চিত্রিত করা হয়েছে, সত্যিই তেমনই একত্রিত সংগ্রামী নাট্য আন্দোলন ছিল বাংলা নাট্য ইতিহাসের এই পর্যায়টি?

এই প্রশ্নের উত্তর পেতে এই সমগ্র ঘটনাটিকে আমাদের আরেকবার বিশ্লেষণ করে দেখার দরকার আছে। জমিদার আমলে শখের নাট্যশালায় নাটক হওয়ার সময় নাট্য অনুরাগী মানুষেরা সবসময় নাটক দেখতে পারতো না। অনেক সময় উচ্চস্তরের নাটকগুলোও জমিদারের অনিচ্ছেতে বন্ধ হয়ে যেত। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই দাঁড়ালেন নব্য যুবকেরা। সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপিত হল। নাম দেওয়া হল *ন্যাশনাল থিয়েটার*। নাটক হল *নীলদর্পণ*। খুব সহজেই বোঝা যাচ্ছে দেশপ্রেম ও ইংরেজবিরোধিতার শক্তিশালী সম্ভাবনা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে 'স্বাধীন' বাংলা থিয়েটার। 'সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগেই (১৮৭২) একটা জাতীয় ভাবাবেগ কাজ করেছিল। থিয়েটারের নামের মধ্যেই তার প্রমাণ রয়েছে। *ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনাল, বেঙ্গল, ওরিয়েন্টাল* ইত্যাদি' (D. Chowdhury, *Bangla Theatreer Itihas* 133)।

কিন্তু একটু তলিয়ে তথ্য অনুসন্ধান করলে দেখা যাচ্ছে, এই নাট্যগোষ্ঠীর দেশপ্রেমিক দৃষ্টিভঙ্গির অনেকটাই নির্ভর করছে কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের ওপর। দলের নাম *ন্যাশনাল থিয়েটার* রাখার পেছনে যার মূল ভূমিকা ছিল,

তিনি হলেন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের এক অন্যতম পথিকৃৎ নবগোপাল মিত্র (M. M. Basu 87)। পরে *গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার* প্রতিষ্ঠার সময় নাট্যগৃহটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনও করেছিলেন নবগোপাল। এই নবগোপালের কাগজের নাম ছিল *ন্যাশনাল পেপার*। বাঙালি যুবক ও বালকদের জন্য *ন্যাশনাল স্কুল* নাম দিয়ে তিনি একটি ব্যায়ামাগার খোলেন। এমনকি *ন্যাশনাল সার্কাস* নাম দিয়ে বাঙালি সার্কাসও খুলেছিলেন তিনি। প্রধানত তাঁর উদ্যোগেই *ন্যাশনাল সোসাইটি* বা *জাতীয় সভা* প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতি বছর *হিন্দুমেলা*-র আয়োজন করে জাতীয়ভাব প্রচারের কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন নবগোপাল। নবগোপাল শুধু এই থিয়েটারের নাম দেননি। এই নাট্যগোষ্ঠী কোন্ কোন্ নাটক করবেন সে ব্যাপারেও যথেষ্ট কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিলেন তিনি। এমনকী তাঁর হিন্দুমেলার বেশ কয়েকটি সভাও হয়েছিল *ন্যাশনাল থিয়েটারের* মহলাকক্ষে। আবার *ভারতমাতা* নামক একটি রূপক নাটক নবগোপাল *ন্যাশনাল থিয়েটারের* শিল্পীদের প্রযোজনা করার অনুরোধ করেন। সাধারণ রঙ্গালয়ে এই নাটকটি মঞ্চস্থও হয় (M. M. Basu ৪৪)। তার পরের দিন আবার *ভারত রাজলক্ষী* নাটকটি হিন্দুমেলাতেও মঞ্চস্থ করার ব্যবস্থা করেন নবগোপাল। সুতরাং এই তথ্যগুলি থেকে বোঝা যাচ্ছে *ন্যাশনাল থিয়েটারের* এই ন্যাশনালিজ্‌ম্ বা জাতীয়তাবাদের পেছনে নবগোপাল মিত্রর যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। অতএব সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপনের প্রথম নাটক *নীলদর্পণ* হওয়ার পেছনেও নবগোপালের প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকা অসম্ভব নয়। নবগোপাল তাঁর *ন্যাশনাল পেপারে নীলদর্পণ* নাটক অভিনয়ের প্রশংসা করে নাটকটিকে 'The event is of national importance' হিসেবে অভিহিত করেন (Shankar Bhattacharya, *Bangla Rangalayer Itihaser Upadan* 10)।

নাট্যজগতে ও *ন্যাশনাল থিয়েটার* গড়ে ওঠার সূচনা পর্বে নবগোপালের ভূমিকাটি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। *ন্যাশনাল থিয়েটারের* 'বিপ্লবীয়ানা'র পেছনে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন একজন রাজনীতিবিদ্ ও সমাজকর্মী নবগোপাল মিত্র। নবগোপাল প্রত্যক্ষভাবে থিয়েটারের মানুষ নন। সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা নাটকের এই নতুন প্ল্যাটফর্মটিকে তিনি রাজনৈতিক কাজে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন বলে মনে হয়। শিল্প সাধনার নিবিড় মগ্নতায় ডুবে না থেকে নাটক হয়ে উঠুক আদপেই সমাজের দর্পণ, হয়তো এই রাজনৈতিক দর্শনবোধ থেকেই তাঁর এই উদ্যোগ। ঠিক একইভাবে *গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের* বৈপ্লবিক নাট্যচর্চা ও ইংরেজবিরোধী কর্মকলাপের পেছনে যে মানুষটি সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন, অর্থাৎ উপেন্দ্রনাথ দাস, তিনিও মূলত রাজনৈতিক কর্মী ও সমাজসংস্কারক। সম্ভবত তাঁর নাট্যকর্মের উদ্দেশ্য মূলত, সমাজসংস্কার। উপেনের জীবনের গতি প্রকৃত দেখলে, নাট্যকর্মকে তিনি পেশা বা

নেশা হিসেবে প্রাধান্য দিতে নাটকচর্চায় আসেননি বলেই মনে করা যায়। ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে ও সমাজের বিভিন্ন প্রগতিশীল কার্যকলাপে বারবার উৎসাহী হয়েছেন উপেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কর্মপ্রগতি দেখে মনে হয়, উপেন্দ্রনাথ নাটককে তাঁর উদ্দেশ্যসাধনের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। অনুমান করা যেতে পারে, থিয়েটারের প্রতি আবেগ বা প্যাশনের তাড়নায় তিনি থিয়েটার জগতে যুক্ত হননি। তিনি সম্ভবত প্রত্যক্ষ রাজনীতিবিদ্ ও সমাজসংস্কারক হিসেবে সমাজে অবদান রাখতে চেয়েছেন। আর এই জন্যই হয়তো থিয়েটার হয়ে উঠেছে তাঁর প্রয়োজনের উপকরণ।

এই কারণে বাংলা থিয়েটারের এই পর্বে যে মামলা মোকদ্দমা ইত্যাদি ঘটেছিল, তা একান্তভাবেই একটি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড হিসেবে বিচার করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। সেই সময়ের রাজনৈতিককর্মী ও সমাজকর্মীরা অনেকেই সর্বসাধারণের কাছে নিজেদের বক্তব্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য থিয়েটারকে একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন, এমনটাই জানাচ্ছেন আধুনিক গবেষকরা। রিমলি ভট্টাচার্য এই সূত্রে বলছেন, ‘Detractor and defenders all saw in the theatre the potential of a new age medium to reach out to the educated elite as well as those who comprosed the *sarvasadharan*, the general public’ (*Public Women* 305)। শুধু শিল্পের আঙ্গিনায় নয়, থিয়েটারের আবেদনটি ছিল প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক এবং তার বিরুদ্ধে যে যে রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল, সেগুলি সবক’টিই বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রবিরোধী রাজনৈতিক পদক্ষেপ বলেই মনে হয়। ফলে তৎকালীন প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করলে এই ঘটনার একটি বিকল্প মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে বলে মনে হয়।

কিন্তু আমাদের প্রচলিত নাট্য ইতিহাসের নানান আপাত-অরাজনৈতিক বা তেমন কঠোর প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক নয়, এমন ঘটনাবলীর মাঝে এই রাজনৈতিক ভাবে বিপজ্জনক ঘটনাটিকে যথাযথ ব্যাখ্যা করা বেশ জটিল বলে মনে হয় না কি? উপেন ও তাঁর সমর্থক সমাজদরদী মানুষদের এই রাজনৈতিক সক্রিয়তার সঙ্গে সাধারণ নাট্যশিল্পীদের মনন ও গতিবিধিকে মিলিয়ে ফেললে ইতিহাস বিশ্লেষণে কিছু প্রশ্ন এসে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় কি? যেহেতু কিছু নাটক ঘিরেই এত ঘটনা ঘটেছিল, তাই নাট্য ইতিহাসে এর উল্লেখ অবশ্যই থাকবে। কিন্তু এই ঘটনার মূল্যায়ন করার সঠিক ক্ষেত্র হল রাজনৈতিক অঙ্গন একথা খেয়াল রাখা দরকার। উপেন ও তাঁর সহায়কদের এই রাজনৈতিক

কর্মতৎপরতাকে সাধারণ নাট্য জগতের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে মিশিয়ে বর্ণনা করে নাট্য জগতের বিপ্লবীয়ানার খ্যাতি প্রতিষ্ঠা করা গেছে ঠিকই। কিন্তু তাতে ইতিহাস রচনা যে সীমাবদ্ধ হয়ে পরে, তা সম্ভবত আটকানো যায় না।

উপেন্দ্রনাথ দাস ও নাটকে অশ্লীলতার অভিযোগ

এই সূত্রে খেয়াল করা দরকার, *সুরেন্দ্র-বিনোদিনী* নাটকের বিরুদ্ধে 'অশ্লীলতা'র অভিযোগ এনে মামলা করা হয়েছিল। রাজদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়নি। এই প্রসঙ্গে পুলিন দাসের বক্তব্য, ভারতীয় সংস্কৃতি তথা সাহিত্যে 'শ্লীলতা' বা 'অশ্লীলতা' নিয়ে ইংরেজ সরকারের বিশেষ ভাবিত হওয়ার কারণ কিছু ছিল বলে মনে হয় না। পুলিন দাসের মতে, ভারতীয়দের ওপর নীতিশিক্ষা বা মূল্যবোধের নিয়ম কায়েম করতে ব্রিটিশ সরকারের উৎসাহ ছিল না, সে কাজ তারা ইংল্যাণ্ডে করতো। ইংল্যাণ্ডেও নাটক ও মঞ্চের ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। সেই নিষেধাজ্ঞার প্রকৃতি আলাদা। ইংরেজরা নিজের দেশের সার্বভৌম জনগণের ওপর এক ভিন্ন লাইসেন্স প্রথা চালু করেছিল। ইংল্যান্ডের মানুষদের ওপর শাসন মূলত নৈতিকতার শাসন। মূল্যবোধ, নৈতিক আচরণ, শালীনতা, সামাজিক শান্তি রক্ষার নীতিশিক্ষা দেওয়াই ছিল সেই দেশের আইনের উদ্দেশ্য। ভারতের লাইসেন্স ব্যবস্থা আসলে এই দেশে সাম্রাজ্যবাদী শাসন কায়েম রাখার উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছিল। অধীন দেশের বশ্যতা সুদৃঢ় করার জন্যই এই দেশের আইন ব্যবস্থা কাজ করত। ইংল্যাণ্ডে আইন ও নিষেধাজ্ঞা প্রথার উদ্দেশ্য ছিল 'নৈতিক', ভারতে তা 'রাজনৈতিক'। পুলিন লিখছেন, 'In England the Licensing Act emerged to meet mainly the moral objections, but here the foreign rulers felt it necessary to safeguard their ruling interest, to suppress anything that threatened the British authority in India. The motive here was purely political' (*Perscecution of Drama and Stage* 3)। ফলে তাঁর বিশ্লেষণ অনুযায়ী *সুরেন্দ্র-বিনোদিনী* নাটকের ওপর 'অশ্লীলতা'র অভিযোগ আসাটা অত্যন্ত বিস্ময়ের, সন্দেহ নেই।

পুলিন দাসের এই মন্তব্যের বিষয়ে আলোচনা করার কিছুটা প্রয়োজন আছে। আর সেই সূত্রে উনিশ শতকীয় কলকাতার সমাজের অশ্লীলতার সংজ্ঞা ও ইতিহাস সম্পর্কে খানিকটা আলোচনা প্রয়োজন। সুমন্ত ব্যানার্জীর রচনায় উনিশ শতকের অশ্লীলতা সম্বন্ধীয় বিশ্লেষণে একটি কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হচ্ছে। এদেশের লৌকিক ও সাংস্কৃতিক আচার-অনুষ্ঠান ও ইংরেজদের পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মধ্যে প্রবল বিরোধ ছিল। কলকাতার নিচুতলার মানুষদের স্বল্পবাস ও নগ্ন গাত্র থাকার প্রচলিত অভ্যাসকে ইংরেজরা শোভনীয় হিসেবে গ্রহণ করতে পারেনি। ভারতীয় ও ইংরেজদের

নগ্নতা ও স্বল্পবাস সম্বন্ধীয় সংস্কৃতির এই প্রবল বিরোধ কলকাতা সমাজে অশ্লীলতা নিয়ে বিতর্ক তৈরি করেছিল। ইংরেজদের নৈতিক মানদণ্ডে ভারতীয় অনেক আচার-আচরণ অত্যন্ত অশ্লীল বিবেচিত হতে থাকে। ইংরেজদের এই অশ্লীলতা বিরোধী অভিযানে সহায়তা করতে থাকে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত বাঙালি। নিজেদের সংস্কৃতির আচার-আচরণ ও সাংস্কৃতিক অভ্যাসকে বিচার করতে থাকে ইংরেজদের অশ্লীলতার দৃষ্টিকোণ থেকে। ইংরেজ ও উচ্চবিত্তের অশ্লীলতা বিরোধী এই অভিযানে কামবিষয়ক বই ও ছবি প্রকাশ বন্ধ হল। যাত্রা হাফ আখড়াই প্রভৃতি লোকশিল্পে মেয়েদের অংশগ্রহণকে নিন্দনীয় হিসেবে সাব্যস্ত করা হতে থাকল। এমনকি *বিদ্যাসুন্দর* ছাপানোর অপরাধে জেলে যেতে হল প্রকাশকদের (S. Banerjee, *Itar Santan* 204)।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতার বাঙালি সমাজে অশ্লীলতার বিবর্তনের ইতিহাসটা সম্ভবত খুব ভালো ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে বাংলা সাহিত্যের জগতে। আর এই বিষয়টির ওপর আলোক প্রক্ষেপণের জন্য *বিদ্যাসুন্দরের* টেক্সটটিকে নেওয়া যেতে পারে। কারণ যুগ যুগ ধরে বাংলা সাহিত্য ও শিল্প সমাজে *বিদ্যাসুন্দরের* ঐতিহ্য প্রবাহিত হয়ে এসেছে। কিন্তু কোনো সময়েই *বিদ্যাসুন্দর* কোনো একটি অনড় নির্দিষ্ট টেক্সট হয়ে অপরিবর্তিত থাকেনি। বারবার নানা পরিস্থিতিতে নিজের রূপকে পাল্টে নিয়ে নিজেকে দীর্ঘদিন অপ্রতিরোধ্য করে রাখতে পেরেছিল। আর সেই কারণেই *বিদ্যাসুন্দরের* ইতিহাসটি লক্ষ্য করলে, বাংলার সাহিত্য সমাজে 'অশ্লীলতা' বিষয়ক একটি বৈচিত্র্যময় বিবর্তনকে বিচার করার সুযোগ ঘটে। তাই আলোচ্য অংশে *বিদ্যাসুন্দর* কাব্য বিষয়ে সংক্ষেপে উল্লেখ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ছে।

ষোড়শ শতকে *বিদ্যাসুন্দর কাব্য* প্রথম লেখেন কবি শাহ ববিদ খান ও দ্বিজ শ্রীধর (Sen, S. *Bangla Sahityer Itihas* 2: 281)। এর পরে রামপ্রসাদ সেন, ভারতচন্দ্র রায় এবং আরও অনেকেই এই ধারার কাব্য রচনা করেছিলেন। আর এই *বিদ্যাসুন্দর* ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়। তার মাত্র পাঁচ বছর পরেই এই কাব্যটি যাত্রা আঙ্গিকে উপস্থাপনা করেন গোপাল উড়ে। হীরা মালিনীর চরিত্রে অভিনয় করে কলকাতার দর্শক মহলে প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন তিনি। তরুণ যাত্রাশিল্পী গোপাল উড়ে যাত্রার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী মোড় আনতে পেরেছিলেন তাঁর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। যাত্রার তাৎক্ষণিক অভিনয়ের বৈশিষ্ট্যটিকে ব্যবহার করেন গোপাল। তাপ্তি রায়ের গবেষণা জানাচ্ছে, 'Gopal Ure made a few structural changes to Bidyasundar, adding new dialogues and introducing many more songs and dances. A new form of dance called khemta,

sprightly and somewhat bawdy, came to be associated with Bidyasundar jatra and songs particularly those sung by Hira Malini, the flower seller, became widely popular' (T. Roy 100)। যাত্রা জগতে গোপাল এক নতুন কাহিনী সংযোজন করেছিলেন এই *বিদ্যাসুন্দরের* বস্তুসারটিকে ব্যবহার করে। নতুন সংলাপ, নতুন গান, নতুন নাচের ব্যবহার করেন তিনি। এমনকি মূল অভিনয়ে তিনি বেশ কিছু খেমটা নাচও অন্তর্ভুক্ত করেন। হীরা মালিনীর চরিত্রে গোপালের গানগুলিও সেই সময়ের কলকাতায় প্রভূত জনপ্রিয়তা পায়।

সেই সময়ের সাহিত্য মহলে *বিদ্যাসুন্দর*-কে নিয়ে বেশ অস্থিরতা শুরু হয়। বাঙালি সাহিত্যপ্রেমীদের নিজেদের ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ এবং তাঁদের নিজেদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে আধুনিকতাকে জায়গা দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে তাঁদের মধ্যে প্রবল উদবেগ শুরু হয়ে গেছিল। আধুনিক সাহিত্যের রূপটি কী হবে, তার মানদণ্ড কী হবে, আধুনিক সাহিত্যের আওতায় কোন কোন রচনাকে ধরা হবে বা কোন রচনাকে বাদ রাখা হবে, তাই নিয়ে বাদানুবাদ শুরু হয়েছিল। একইসঙ্গে অসংখ্য প্রশ্ন ও বিতর্কে মাঝে গড়ে তোলা হচ্ছিল আধুনিক সাহিত্য। এই বিতর্কে ছিল বাংলার ঐতিহ্যবাহী সাহিত্য ও প্রাচীন রীতিগুলি সংরক্ষণ করার দায়িত্ব। তার সঙ্গে ছিল, ব্রিটিশ সাহিত্যচর্চার প্রভাবে নতুন লেখার নতুন রূপায়ন করা এবং 'যথাযথ' লেখার একটি কাঠামো তৈরি করার উচ্চাশা। বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন উপায়ে এই বিষয়গুলি মুখোমুখি হওয়ার চেষ্টা করেছে।

এই সময়েই মঞ্চে নবীনচন্দ্র বসুর *বিদ্যাসুন্দর* কাব্যের মঞ্চনাট্য রূপান্তরটির পর্যালোচনা বিষয়ক মন্তব্যটি প্রকাশিত হয়েছিল। বলাই বাহুল্য, নবীন বসু ছিলেন বাংলা ভাষায় নাট্য প্রযোজনা করার একেবারে প্রথম যুগের উদ্যোগী পুরুষ। তিনি কাহিনী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন *বিদ্যাসুন্দর* টেক্সটটিকে। কিন্তু অভিনয়ের ক্ষেত্রে তিনি প্রয়োগ করেছিলেন প্রভূত ইউরোপীয় নাটকীয় উপাদান। এমনকি নাটকীয় চমক দেওয়ার জন্য ইউরোপ থেকে তিনি মঞ্চ সামগ্রী ও কলাকৌশল ক্রয় করেছিলেন। যা তাঁর প্রযোজনাকে গোপাল উড়ের যাত্রার থেকে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য প্রদান করেছিল।

এই নাট্য প্রযোজনাটির বিষয়ে কে.সি. দে সম্পাদিত মাসিক *হিন্দু পাইয়োনিয়ারে* একটি দীর্ঘ আলোচনা প্রকাশ হয় ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে। সেখানে নবীন বসুর থিয়েটারে *বিদ্যাসুন্দর* নাটকের অভিনয়ের প্রশংসা করা হয়েছিল। এই সূত্রে এর গল্পের সঙ্গে সেই সময়ের বাংলায় শেক্সপীয়রের সবচেয়ে জনপ্রিয় নাটক *রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েটের* তুলনা করা হয়েছিল। *পাইয়োনিয়ারের* এই পর্যালোচনার প্রতিবাদে অত্যন্ত তীব্র প্রতিক্রিয়া আসে *বেঙ্গল হরকরা*

পত্রিকায়। একটি মহান ইংরেজি নাটকের সঙ্গে একটি দেশীয় ঐতিহ্যবাহী কাব্যের তুলনা করাটা নিতান্তই অনৈতিক বলে মনে করেছেন *হরকরার* লেখক। তিনি এই প্রয়াসটিকে শালীনতার অভাব হিসেবেই নির্দেশ করছেন, 'It is an abuse of English education to deceive the European public by comparing the plot of the Indian play with that of Romeo and Juliet .... I wonder that any person having pretense to decency could have disgraced it by such comparison' (T. Roy 81)। অর্থাৎ ইংরেজি শিক্ষার অপব্যবহারের ফলে একটি ভারতীয় রচনাকে *রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েটের* সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে বলে তিনি মনে করছেন। এই তুলনার ঘটনাটিকে তিনি 'শালীনতা' ও 'নৈতিকতা'-র বিপর্যয় হিসেবেই গ্রহণ করা হচ্ছে।

এখানেই থেমে থাকেনি ঘটনাটি। *পাইয়োনিয়ারের* লেখক প্রত্যুত্তর জানাচ্ছেন তাঁর পরের চিঠিতে। 'Much has been said by the correspondent of the Hurkura about Bidyasundar's being a very indecent play. Is it indecent because it is a Bengali work? Is it devoid of novelty and utility because it is a play composed in the vernacular language of the country? Surely this has proceeded from nothing else but the writer's utter ignorance of his own language' (T. Roy 82). *বিদ্যাসুন্দরকে* 'অশালীন' বলার কারণ কী সেটাই প্রশ্ন করছেন তিনি। বাংলায় লেখা বলে কি *বিদ্যাসুন্দর* অশালীন গ্রাহ্য হয়ে পড়ল? দেশীয় ভাষায় রচিত বলেই কি 'অনৈতিক' মনে করা হবে *বিদ্যাসুন্দরকে?* নিজের ভাষার সাহিত্য সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র জ্ঞান না থাকার ফলেই এমন মতামতের উদ্ভাবন করা হয়েছে, চিঠির শেষে এমনটাই মত রাখছেন রচনাকার।

উপরোক্ত ঘটনা থেকে অনুমান করা যাচ্ছে, সমাজের অন্যান্য স্তরের মতোই সাহিত্য এবং সেই সাহিত্যের মঞ্চ উপস্থাপনার ক্ষেত্রেও 'অশ্লীলতা' 'শালীনতা' 'রুচি' ইত্যাদি বিতর্কগুলো ব্যাপক প্রভাব ফেলা শুরু করেছিল সেই সময়ে। তাই উপেন্দ্রনাথের নাটকের বিরুদ্ধে 'অশ্লীলতা'-র অভিযোগ আনার বিষয়টিকে এই প্রেক্ষিতে পর্যবেক্ষণ করা খুবই জরুরি।

বিদ্যাসুন্দরের মঞ্চপ্রযোজনার বিরুদ্ধে অশ্লীলতা আরোপের ঘটনার প্রায় তিন দশক পরে স্বয়ং ইংরেজ সরকারের নজর এসে পড়েছিল নাট্যমঞ্চের 'অশ্লীলতা'র ওপর। এই সময়ে ইংরেজ ও নব্য ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির অশ্লীলতা বিষয়ক চেতনার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সুমন্ত ব্যানার্জী বলছেন, '... উনিশ শতকের শেষের দিকে 'অশ্লীলতা'র

সরকারি বা বিধিবদ্ধ সংজ্ঞা ক্রমশই একটা catch-call বা সর্বগ্রাসী অভিধা হিসেবে বাঙালি সমাজে আবির্ভূত হতে চলেছে' (*Itar Santan* 204)। অর্থাৎ ইংরেজদের অশ্লীলতা বিষয়ক অস্বস্তি ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে অশ্লীলতার প্রাদুর্ভাব নিয়ে ইংরেজরা যে একেবারে চিন্তিত ছিল না, এ কথা বোধ হয় ঠিক নয়। ইংরেজ মাপকাঠিতে যে বইগুলি অশ্লীল হিসেবে বিবেচিত হত সেগুলোর প্রকাশ বন্ধ করার আইন করা বা বাঙালি জীবনের সর্বত্র অশ্লীলতা নিয়ে ইংরেজদের ভাবাবেগকে গ্রথিত করে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে তাদের এই বিষয়ক যথেষ্ট উৎকণ্ঠার প্রমাণই মেলে। 'ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী নির্ধারিত' অশ্লীলতার সংজ্ঞাকে পাথেয় করেই বাঙালির সভ্য অসভ্যের বিচার শুরু। শহরের গণ্যমান্য বাঙালিদের একাংশ তৈরি করেন Society for the Suppression of the Public Obscenity, এই সভার পুরোভাগে ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের নেতা কেশবচন্দ্র সেন। সুমন্ত লিখছেন, '... ইংরেজ শাসকদের আদর্শগত প্ররোচনায় ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত Society for the Suppression of the Public Obscenity, অনেক বাঙালি বুদ্ধিজীবীর চোখেই সন্দেহজনক বলে মনে হওয়াটা স্বাভাবিক ছিল' (*Itar Santan* 207)।

নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন ও বিদ্রোহী বাংলা নাটকের ভবিষ্যৎ

তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, আপাতভাবে *সুরেন্দ্র-বিনোদিনী*-র ওপর 'নৈতিকতা ও শালীনতা'র অভিযোগ আনা হলেও, বাস্তবে এই মামলার প্রধান উদ্দেশ্য সম্ভবত প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক। এ কথা অনুমান করা যায় যে, উপেন ও তাঁর সহসাথীদের রাজনৈতিক ভাবে পর্যুদস্ত করার উদ্দেশ্যেই এই মোকদ্দমা করে ইংরেজ প্রশাসন। সুবীর রায়চৌধুরী এই ঘটনার বিশ্লেষণে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশ করেছেন। 'আইন পাশ হওয়ার আগে পর্যন্ত উপেন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ যেভাবে পুলিশের হুমকিকে অগ্রাহ্য করছিলেন, তাতে মনে হয়েছিল এই জাতীয় আইন বিধিবদ্ধ হলে তাঁরা সমবেতভাবে প্রতিরোধ করবেন। ... সাধারণভাবে নাট্যশালার কর্মকর্তারা এই অবস্থাকে মেনে নিলেন' (Roychowdhury 53)। এরপরে তিনি বলছেন, সংবাদপত্রের ওপর যেমন বিধিনিষেধ আরোপ করার জন্য যূথবদ্ধ প্রতিবাদ হয়েছিল, নাট্য জগতে আদৌ তেমন কিছু ঘটল না। দুই একটি নাট্যশালা বন্ধ করেও প্রতিবাদ জানানো যেত। এমনকী হিন্দুমেলা বা জাতীয়মেলার অধিবেশনেও এই ঘটনার বিরুদ্ধে কোনও প্রস্তাব গৃহীত হল না। ইংরেজ পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে বাঙালি ভদ্রলোকের কিছু ক্ষোভ ছিল। তাই নিয়ে তাঁরা কাগজে কলমে লেখালেখি করেছেন, সভা সমিতি করেছেন, *নীলদর্পণের* মতো নাটক লিখে খানিক সমালোচনাও করেছেন। কিন্তু 'প্রচলিত

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থাতেই তাঁদের শ্রেণীস্বার্থের অগ্রগতি হবে, এই বিশ্বাসে স্থির ছিলেন বলেই, তাঁরা ইংরেজ রাজতন্ত্রের প্রত্যক্ষ সমালোচনা থেকে বিরত ছিলেন খুব সচেতনভাবেই' (S. Banerjee *Itar Santan* 240)।

এই ঘটনাটি ছাড়া উনিশ শতকের বাংলা থিয়েটার জগতের তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক পদক্ষেপ চোখে পড়ে না। জমিদারের অঙ্গনে হওয়া নাট্যচর্চায় তো রাষ্ট্রবিরোধী কোনো বক্তব্য প্রকাশের তেমন কোনো পরিসরই ছিল না এবং সেই সময়ে রাষ্ট্র চেতনাও তেমনভাবে তখনও পর্যন্ত সংজ্ঞায়িত হয়ে ওঠেনি বলেই মনে হয়। জমিদারের অঙ্গন থেকে বাইরে আসার পরেও বাংলা নাটকের জগতের মানুষের মধ্যে কোনো সংগ্রামী চেতনার বিকাশের তেমন বিশেষ কিছু উদাহরণ খুঁজে পাওয়া গেল না। সেই কারণে বাংলা থিয়েটারের বৈপ্লবিক চরিত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন হওয়ার সময়কার এই রাজনৈতিক ঘটনাকে ব্যবহার করা ছাড়া গবেষকদের আর কোনও উপায় থাকলো না বলে মনে হয়। অতএব এই নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইনকালীন ঘটনাই উনিশ শতকের নাট্য জগতের সংগ্রামী ও সাহসী চরিত্র প্রতিষ্ঠার প্রতীক স্বরূপ ব্যবহার করা শুরু হল। বাংলা নাট্যকর্মীদের সমাজমুখী মনন, তাঁদের জনদরদী কার্যকলাপ ও অকুতোভয় চরিত্র হিসেবে চিত্রিত করতেই কি পরবর্তী যুগের নাট্য গবেষকদের এই রকম প্রচেষ্টা?

কিন্তু উপেনদের বিরুদ্ধে ইংরেজের মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদি ঘটনার গভীরতার সঙ্গে কি সত্যিই পূর্ববর্তী বা পরবর্তীকালের নাট্যচর্চার চরিত্রকে মেলানো সম্ভব? মূলত ধর্মমূলক বা ইতিহাসভিত্তিক বা পুরাণনির্ভর বা সামাজিক নাটকে অভ্যস্ত প্রতিষ্ঠিত বাংলার নাট্যব্যক্তিদের ওপর এই ধরনের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক বিপজ্জনক কর্মের বিশিষ্টতা আরোপ করে দেওয়ার কি আদৌ কোনো ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল? নাট্য ইতিহাস গ্রন্থগুলো যেভাবে এই ঘটনাকে সমগ্র নাট্যসমাজের প্রতিবাদীস্বরূপ হিসেবে বর্ণনা করেন, সত্যিই কি সেই ব্যাখ্যার মধ্যে কোনো সীমাবদ্ধতা থাকছে না? এত বড় ঘটনায় তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত নাট্যব্যক্তিদের ভূমিকা কী ছিল? তাঁদের তেমন কোনো প্রত্যক্ষ প্রতিবাদী ভূমিকা পালনের তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায় না কেন? উপেনদের মামলায় যে মানুষেরা পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন বলে জানা যায়, তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিদের নাম পাওয়া যায় না কেন? এই প্রশ্নগুলি আসলে আমাদের নাট্যজগতের 'সামগ্রিকভাবে বিপ্লবী' প্রতিষ্ঠিত ইমেজটির প্রতি প্রশ্ন তোলে, এ কথা বললে হয়তো ভুল হবে না।

১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের উপেনদের মামলার পর ৯ই এপ্রিল থেকে ২০ শে অক্টোবর প্রায় সাত মাস *গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার* বন্ধ থাকে। অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়নের পর *গ্রেট ন্যাশনালের* স্বত্বাধিকারী ভুবনমোহন নিয়োগী আর

থিয়েটার চালাতে পারছিলেন না। তাঁর কাছ থেকে থিয়েটারটি লিজ নিয়ে নেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ (Roychowdhury 57)। এরপর থিয়েটার খুললে সব দায়িত্ব এসে পড়ে গিরিশ ঘোষের ওপর। কিছুদিন পরে তিনিও দায়িত্ব হস্তান্তরিত করে দেন। ক্রমাগত হস্তান্তরিত হতে থাকল থিয়েটার। অনেক হাত ঘুরে ঘুরে শেষে দায়িত্ব নেন প্রতাপচাঁদ জহুরী (Shankar Bhattacharya, *Bangla Rangalayer Itihaser Upadan* 133)।

১৬ই ডিসেম্বর ১৮৭৬। নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন বলবৎ হয়ে গেল। 'AN ACT FOR THE BETTER CONTROL OF PUBLIC DRAMATIC PERFORMANCES'. আইনে বলা হল, কোনো 'প্রকাশ্য স্থানে' কোনো অভিনয়, মূকাভিনয় বা অন্য কোনো নাটক যদি কুৎসাজনক বা মানহানিকর হয়, সরকার বিরোধী হয় বা নীতিভ্রষ্টকারী হয় তাহলে সরকার তা নিষিদ্ধ করতে পারবে। 'প্রকাশ্য স্থান' বলতে 'যে ভবন বা বেষ্টনীতে জনগণকে অর্থ প্রদানের বিনিময়ে অনুষ্ঠান দেখতে দেওয়া হয়, তা এই ধারার 'প্রকাশ্য স্থান' হিসেবে গণ্য'। অর্থাৎ টিকিটের বিনিময়ে আয়োজিত নাট্যানুষ্ঠানগুলিই এই আইনের আওতায় এল। ব্যক্তিগত পরিসরে অভিনীত নাটকগুলি নয়। আবার আইনের সেকশন ৬ (ক), (খ), (গ) অনুসারে এই ধরনের অভিনয়ের অংশগ্রহণকারী, সহায়ক, মালিক এমনকি দর্শকও এই আইন মোতাবেক দোষী সাব্যস্ত হবেন (B. Mukhopadhyay 667)।

আইন পাস হওয়ার পর নাট্যকর্মীদের ভূমিকা

নিঃসন্দেহে বলা যায়, নাট্য জগতকে একেবারে কড়া আটকে বেঁধে ফেলল সরকার। ফলে নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়নের পর থেকে ইতিমধ্যে *গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে* কোন্ কোন্ নাটক চলতে থাকল? *মেঘনাদ বধ, কৃষ্ণকুমারী, পলাশীর যুদ্ধ, মৃণালিনী, দোললীলা, বিষবৃক্ষ, আলিবাবা ও চল্লিশ চোর, দুর্গেশনন্দিনী, বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ* ইত্যাদি সমসাময়িক রাজনীতির নিরিখে ঝুঁকিহীন বিষয় নিয়ে নাটক। হারিয়ে গেল *গ্রেট ন্যাশনালের* প্রত্যক্ষ বৈপ্লবিকতার সুর। সেসব নিয়ে নাট্য ইতিহাস প্রশ্ন তোলে না। গিরিশের লেখা বিপ্লবী রসে জারিত নাটকগুলো মঞ্চস্থ হয়েছিল আরও পঁচিশ বছর পর। *সিরাজদ্দৌল্লা, মীর কাশিম* ও *ছত্রপতি শিবাজী* নিষিদ্ধ হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়, অর্থাৎ বিশ শতকের গোড়ার দিকে। কিন্তু উপেনের ঘটনার সময়কালে বা তারপরেও নাট্যজগতের 'ঘরের লোক' বা বাংলা নাট্যাঙ্গনের সর্বক্ষণের কর্মীরা মোটামুটি নিশ্চুপ থাকাই শ্রেয় মনে করেছেন।

তৎকালীন বিশিষ্ট অভিনেতা অর্ধেন্দু শেখর মুস্তাফী তখন পশ্চিম ভ্রমণে গেছেন। এই রাজনৈতিক টালমাটাল পরিস্থিতিতে অর্ধেন্দু রইলেন কলকাতার বাইরে। মাঝে মাঝে আসতেন, দুই একটা শো করতেন, আবার চলে যেতেন।

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে তাঁর এই পর্যায়ের শেষ শো ছিল *হীরকচূর্ণ* নাটকে রাজা মলহার রাও চরিত্র, ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর। এরপর আবার তিনি ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে আগস্ট কলকাতা রঙ্গমঙ্গে ফেরেন বলে জানা যায়। '...১৮৭৬ সনের মাঝামাঝি অর্ধেন্দুশেখর দেশভ্রমণে বহির্গত হন। মাঝে মাঝে তিনি কলকাতায় আসতেন, শিক্ষা দিতেন, সাজতেন, আবার উধাও হতেন' (Shankar Bhattacharya, *Bangarangamancha O Ardhendushekhar* 91)। নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন ও তার সময়কার যে রাজনৈতিক টানাপোড়েন, সেখানে অর্ধেন্দুর কোনো প্রত্যক্ষ ভূমিকা দেখা যায় না। যদিও সুবীর রায়চৌধুরীর পর্যবেক্ষণ বাংলার রঙ্গমঞ্চে রাজনৈতিক বা সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে বিদ্রূপাত্মক মঞ্চাভিনয় করার পথিকৃৎ অর্ধেন্দু শেখর মুস্তাফী। একই পথে পরবর্তীকালে প্রবল জনপ্রিয় হন রসরাজ অমৃতলাল বসু (Roychowdhury 43)। *ন্যাশনাল থিয়েটারে* এই রাজনৈতিক ধারার নাটক হওয়ার পেছনেও নাট্যগোষ্ঠীর দিক থেকে মূল অগ্রণী ছিলেন অর্ধেন্দু শেখর মুস্তাফী। সমকালীন নাট্যকর্মী গিরিশচন্দ্র ঘোষের ভাষায়, 'অর্ধেন্দুর স্বদেশ-অনুরাগও বিশেষ পুষ্ট ছিল। *ভারতমাতা* প্রভৃতি *ন্যাসানাল থিয়েটারে* যাহা অভিনীত হইয়াছিল, সে সমস্ত অর্ধেন্দুর প্ররোচনায়। যে সকল পঞ্চরং অভিনয় হইত, তাহাতে বিশেষ রাজনৈতিক কটাক্ষ ছিল এবং তীব্র ব্যঙ্গ-শক্তিতে ঐ সকল পঞ্চরং রচিত না হইলেও অর্ধেন্দুর অভিনয়ে সেই শ্লেষের পূর্ণ বিকাশ হইত।। অর্ধেন্দুর ধারণা ছিল যে.....নীতিশিক্ষা, রাজনৈতিক শিক্ষা, রঙ্গমঞ্চ হইতে দেওয়া যায়, রঙ্গমঞ্চের কার্য্য –দেশের কার্য্য—তাঁহার জ্ঞান ছিল' (*Natacuhramani Swargiya Ardhendusekhar Mustafi* 37)। স্বদেশী মননে উদবুদ্ধ অর্ধেন্দুকে এইভাবে যদি নাট্য নিয়ন্ত্রণের সময় উপেনরা সঙ্গে পেতেন, তাহলে হয়তো থিয়েটার জগতের কুশীলবদের রাজনীতিগত নিষ্ক্রিয়তার প্রশ্নটি খানিক ম্লান হত।

গিরিশ তো বরাবরই রাজনৈতিক বা বাস্তভিত্তিক নাটকে প্রাণ পেতেন না। তাঁর ধারণায়, 'জাতীয় বৃত্তি পরিচালনা ব্যতীত কবিতা বা নাটক জাতির হিতকর হয় না। ভারতবর্ষের জাতীয় মর্ম্ম—ধর্ম্ম। দেশহিতৈষিতা প্রভৃতি যত প্রকার কথা আছে, তাহাতে কেহ ভারতের মর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারিবেন না। ভারত ধার্ম্মিক। যাহারা লাঙ্গল ধরিয়া চৈত্রের রৌদ্রে হলসঞ্চালন করিতেছে, তাহারাও কৃষ্ণনাম জানে, তাহাদেরও মন কৃষ্ণনামে আকৃষ্ট। ...হিন্দুস্থানের মর্ম্মে মর্ম্মে ধর্ম্ম। মর্ম্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্ম্মাশ্রয় করিতে হইবে' (*Girish Rachanabali* 1: 732)। *গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে* উপেন অমৃত সহ দশ নাট্যকর্মী যেদিন গ্রেপ্তার হলেন, সেদিন সম্ভবত গিরিশ রঙ্গালয়ে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু গ্রেপ্তারির ঘটনার আগে তিনি রঙ্গালয় থেকে বেরিয়ে গেছিলেন বলে জানা যাচ্ছে। গিরিশচন্দ্র ঘোষের

জীবনীকার অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের বর্ণনায়, ‘শুনা যায় স্টেজ-ম্যানেজার ধর্মদাস সুর মহাশয় স্টেজের ওপর সিলিং-এ উঠিয়ে লুকাইয়াছিলেন... নট-গুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষ সে সময় থিয়েটারের সহিত বিশেষরূপ সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। মাঝে-মাঝে থিয়েটারে আসিতেন এবং প্রয়োজনমত সাহায্য করিতেন... পুলিশ আসিবার পূর্ব্বেই তিনি থিয়েটার হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন’ (128)।

মামলা-মোকদ্দমার পর বিনোদিনীও ছেড়ে দিলেন *গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার*। যদিও তাঁর বয়স তখন ১১ বছর বা ১৩ বছর। নেহাতই শিশু তিনি। বয়সে বড় নাট্য অভিভাবকদের প্রভাবেই তিনি যেকোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতেন বলেই মনে হয়। নাট্য জীবনের শুরুতেই একজন রক্ষিতা বাড়ির মেয়ের এ ছাড়া আর কিই বা উপায় ছিল? তাই তাঁর রচনায় *গ্রেট ন্যাশনাল* ছেড়ে *বেঙ্গল থিয়েটারে* যাওয়ার কোনো কারণ দর্শানো হয়নি। এক জায়গায় তিনি লিখছেন, ‘তার পর বোধহয় পাঁচ ছয় মাস পরে *গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার* বন্ধ হইয়া যায়। তৎপরে আমি মাননীয় ঁশরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথমে ২৫ টাকা বেতনে নিযুক্ত হই’ (*Amar Katha O Onyanyo Rachana* 22)। পরের পাতাতেই আরেক জায়গায় লিখছেন, ‘ঠিক মনে পরে না, কি কারণবশতঃ আমি *গ্রেট ন্যাশনাল* থিয়েটার ত্যাগ করি’ (*Amar Katha O Onyanyo Rachana* 23)। হয়তো অত বড় একটি আইন হওয়া নিয়ে বাংলা থিয়েটারে যে শোরগোল হয়েছিল, তা নিয়ে বিনোদিনীর শিশুমন একেবারেই বিচলিত ছিল না। এমনকি পরবর্তীকালে নিজের নাট্যজীবন নিয়ে বর্ণনাকালেও এই আইন ও সেই সংক্রান্ত কথা এড়িয়ে যাওয়াই হয়তো শ্রেয় মনে করেছেন।

সমসাময়িক নাট্য ব্যক্তিত্বদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত উদ্যোগী প্রয়াস নিয়েছিলেন ধর্মদাস সুর। অতি সংক্ষিপ্ত একটি আত্মজীবনী লিখেছিলেন নাট্য মঞ্চাধ্যক্ষ ধর্মদাস সুর। তাঁর বিরাট নাট্যচর্চার দলিল হিসেবে এই রচনাটি অত্যন্ত ছোট্ট, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। নাট্য বিষয়ক অসংখ্য বিষয়ে আলোচনা বাদ দিয়েও তিনি তাঁর রচনায় নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইনকালীন সময়টিকে উল্লেখ করতে ভোলেননি:

> ... আমার উকীল গণেশচন্দ্র (এটর্নি গণেশচন্দ্র চন্দ্র) বলিলেন, অন্যায়রূপে মেয়াদ দেওয়া হইয়াছে (তখন Presidency Magistrate ছিলেন—Mr. Dickens.) আমি হাইকোর্টে motion করিয়া খালাস করিতে পারি। আমি তখন তাহার আপিল দাখিল করিয়া উপেনবাবু ও অমৃতবাবুকে জামিনে খালাস করি। তৎপরে হাইকোর্টের জজ ফিয়ার সাহেবের বিচারে উহারা নির্দ্দোষী প্রমাণ হয়। তাহার পরেই Dramatic Bill pass

হয়। তাহাতে যদিচ থিয়েটারের অনেকেই interested ছিলেন, তথাপি কেহই যান নাই, আমিই Government Houseএ উপস্থিত ছিলাম। (Sur 11)

আসলে পুরো ঘটনায় উনিশ শতকের নাট্যশিল্পীদের বেশিরভাগই নিষ্ক্রিয় দর্শক ছিলেন মাত্র। পুরো ঘটনাটি সম্পর্কে উৎসাহ ছিল সকলের। তাই নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে ঘটনাপ্রবাহের দিকে নজর রেখেছিলেন তাঁরা। কেউ আর গভর্নমেন্ট হাউস পর্যন্ত যাওয়ার ঝুঁকি নেননি। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলার নাট্যজগতের যে প্রবণতার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন, সেই একই প্রবৃত্তির প্রতিফলনই যেন দেখা গেছিল এই সময়ে। ‘সত্য ও মিথ্যা’ প্রবন্ধে শরৎ স্পষ্ট লিখছেন, ‘এই যে আজ আসমুদ্র-হিমাচল ব্যাপিয়া ভাবের বন্যা, কর্ম ও উদ্যমের স্রোত বহিতেছে, নাট্যাগারে তাহার এতটুকু স্পন্দন, এতটুকু সাড়া নাই’ (S. C. Chattopadhyay 2099)। ধর্মদাসের মতো খুব অল্প সংখ্যক নাট্যকর্মীই সম্ভবত নিজে উদ্যোগে ঘটনাটিতে সাধ্যমতো ভূমিকা পালনের চেষ্টা করেছিলেন। জনদরদী নাটকে মনোনিবেশ করতেই নাট্যকর্মীদের বেশিরভাগ মানুষ ভালোবাসতেন। কিছু কিছু নাটকে ইংরেজের সমালোচনা মূলক কিছু সংলাপ ব্যবহার করে থাকলেও এই নাট্যকর্মীরা পাশাপাশি উল্লেখ করে দিতেন যে, ইংরেজের স্বেচ্ছাচারী ব্যবহারের ব্যাপারে রাণী ভিক্টোরিয়া বা মহামান্য যুবরাজ জানতে পারলে নিশ্চয়ই এই স্বেচ্ছাচারী অত্যাচার বন্ধ হবে। ‘স্মরণীয়, *নীলদর্পণ* নিয়ে অত হৈ-চৈ-র পরও দীনবন্ধু মিত্র রায়বাহাদুর হয়েছিলেন’ (S. Banerjee, *Itar Santan* 240)। একটি পেশাদারী কাঠামোর মধ্যে গড়ে ওঠা নাট্য চর্চাতে কোন্ কোন্ উপকরণের জোগান দিলে বাঙালি দর্শকের মন প্রসন্ন হবে, সেই দিকেই তাদের হয়তো লক্ষ্য ছিল। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বা ব্যবসাটাই মূল এমনটা বলাই যায়। যুক্তি আসতে পারে, থিয়েটারের মালিকের লোকসানের দিকে নজর করতে গিয়ে সম্ভবত তাদের এই বাধ্যবাধকতা। সেক্ষেত্রে অবাক লাগে, উপেন অমৃত সুকুমারীরা এমন একের পর এক বিপজ্জনক নাটকের ঝুঁকি নিলেন কী করে? পাবলিক থিয়েটারের যুগে যেখানে দর্শকের পয়সায় থিয়েটার চলে সেখানে দর্শকের সামনে এই প্রতিবাদ তুলে ধরাটা নিঃসন্দেহে আমাদের বিস্মিত করে। বিশেষত এই ঘটনার পর উপেন বা সুকুমারী জীবনে একেবারেই সহায়সম্বলহীন অবস্থা হয়, সুকুমারী সারাজীবনে আর আগের মতো ঘুরে দাঁড়াতে পারেন না, আর উপেন যে বাবার রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে সমাজসংস্কারের প্রথম ধাপ পেরিয়েছিলেন, সেই বাবার কাছেই নতজানু হয়ে তাঁর পরিস্থিতি সামাল দিতে বাধ্য হন। বর্তমান গবেষক পেশাদারী নাট্যকাঠামোতে উপেন ও তাঁর সহসাথীরা ছাড়া বাকি নাট্যসমাজ কেন সমান ভাবে আলোড়িত হলেন না, সে অভিযোগ করছে না। এই অংশে

বারবার চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে যে, পেশাদারী কাঠমোতে যে বিপ্লবী নাট্যপ্রবাহের বীজটি রোপন করা গেছিল, সেটি একটি ক্ষণিকের স্ফুলিঙ্গ মাত্র। একটি পেশাদারী কাঠামোতে এর থেকে বেশি আর কিছু বিপ্লবী থিয়েটার প্রবহমানতা আশা করা বোধহয় যুক্তিযুক্তও হবে না।

অন্যদিকে বাংলা রঙ্গমঞ্চে ক্রমশ বাড়তে লাগল পৌরাণিক ও ধর্মীয় নাটকের প্রযোজনা। নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন (১৮৭৬)-এর সেকশন ১২-টি এই সূত্রে বেশ প্রয়োজনীয়। এই সেকশনে লেখাঃ ‘Nothing in this Act applies to any jatras or performances of a like kind at religious festivals’ অর্থাৎ ‘ধর্মীয় উৎসবাদিতে যাত্রা বা ঐ শ্রেণির অনুষ্ঠানের ওপর এই আইনের কিছু প্রযুক্ত হবে না’ (B. Mukhopadhyay 669)। আইন মোতাবেক ধর্মীয় বা পুরাণ-আশ্রয়ী কোনো যাত্রা এই আইনের আওতায় পড়বে না। কিন্তু আইনের এই সেকশনটি থিয়েটার জগতের মানুষদেরও রক্ষাকবচ হয়ে দাঁড়ালো। বাঙালি নাট্যকর্মীরা নাট্য নিয়ন্ত্রণ অর্ডিন্যান্সের ভয়ে ধর্ম ও পুরাণে আশ্রয় নিতে শুরু করে দিলেন। আত্মরক্ষার তাগিদে নাট্যবিষয়গুলি পালটে যেতে থাকে। ইংরেজদের কার্যসিদ্ধি হল। বিলীন হল উপেনের লড়াই। জঙ্গী জাতীয়তাবাদী ভূমিকা থেকে বিরত হয়ে যেতে হয় তাঁকে। দর্শন চৌধুরীর অভিমত, ‘...এই সময় থেকেই বাংলা মঞ্চে পৌরাণিক নাটক, সামাজিক নাটক, গীতিনাট্য অপেরা এবং পঞ্চরং প্রহসনের ছড়াছড়ি পড়ে গেল। গিরিশ থেকে শুরু করে এই সময়কার অন্য সব নাট্যকারই তাদের নাটক রচনার মধ্যে এইসব বিষয়েই ঘুরপাক খেতে লাগলেন—কিন্তু কখনো কদাপি ব্রিটিশবিরোধী প্রসঙ্গ নাটকে আনলেন না’ (*Bangla Theatreer Itihas* 137)।

নাট্য ইতিহাসের খণ্ডিত অবয়ব

আসলে পেশাদারী রঙ্গকর্মীদের অন্যতম মূল লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক স্বার্থ। তাই সুবিধেজনক পরিস্থিতিতে ঝুঁকিহীন রাজনৈতিক অবস্থায় তাঁরা প্রতিবাদী হন। বিপজ্জনক পরিবেশে দুর্গম সামাজিক অবস্থায় তাঁরা সাবধানী পদক্ষেপ ফেলেন। এমনকি ইংরেজ প্রশস্তিমূলক নাটক রচনা ও অভিনয় করতেও তাঁদের যথেষ্ট উৎসাহ চোখে পড়ে। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে মহারাণি ভিক্টোরিয়ার সাম্রাজ্য শাসনের ষাট বছর পূর্তিতে গিরিশ ঘোষ লেখেন *হীরক জুবিলী* নাটক। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী ভারত সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার পুত্র প্রিন্স ভিক্টরের অভ্যর্থনার জন্য গড়ের মাঠে *শকুন্তলা*-র অভিনয় দেখিয়ে *বেঙ্গল থিয়েটার* ‘রয়্যাল’ উপাধি পায় (Shankar Bhattacharya *Bangla Rangalayer Itihaser Upadan* 30)। ব্রিটিশদের প্রতি চরম রাজভক্তি দেখিয়ে *বেঙ্গল থিয়েটারের* এই পুরস্কার প্রাপ্তি। ১৯০১

সালে সেই *রয়্যাল বেঙ্গল থিয়েটার* রাণির মৃত্যু উপলক্ষ্যে মঞ্চস্থ করে *শোকসঙ্গীত*, গিরিশ এই উপলক্ষ্যে লেখেন *অশ্রুধারা*। মিনার্ভা থিয়েটার করছে *স্বর্গারোহন*।

আবার বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় সব থিয়েটারই শুরু করল বীরত্বব্যঞ্জক দেশপ্রমী নাটকসমূহ। 'সারা দেশে স্বাজাত্যবোধ এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের যে তরঙ্গচাঞ্চল্য উঠেছিল এই নাট্যধারায় তার প্রতিফলন সহজ ছিল। ইংরেজ রাজত্বে যবন-বিতারনের কথা বলায় বিপদের আশংকা ছিল না, অথচ স্বাধীনতার চেতনাকেও উদবুদ্ধ করা যেত' (K. Gupta, *Bangla Nataker Alochona* 1)। যেমন ক্ষীরোদপ্রসাদের *পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত, নন্দকুমার*, গিরিশ লিখলেন *মীর কাশিম, ছত্রপতি শিবাজী, সিরাজদৌল্লা* ইত্যাদি নাটক। এই নাটকগুলি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে অভিনীত কিছু বিখ্যাত নাটক। সেই সময়েও নাটকগুলি নিষিদ্ধ হয়েছিল বটে। কিন্তু সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ও রাজনৈতিক অবস্থার জেরে সেই সময়ে খানিক টালমাটাল সরকার। 'বিংশ শতকের এই প্রারম্ভকালে বাঙালির জাতীয় জীবনে স্বদেশানুরক্তির একাগ্র প্রকাশ ঘটেছিল। বঙ্গভঙ্গ নিরোধের চেষ্টায় বাঙালি জাতি বিস্ময়কর উত্তালতা অনুভব করেছিল। অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদী গুপ্তহত্যার মধ্য দিয়ে দেশমাতৃকাকে মুক্ত করবার বাসনা একদল তরুণকে উন্মত্ত করে তুলেছিল' (K. Gupta, *Bangla Nataker Alochona* 4)। খানিকটা হলেও তার জেরে ১২ই ডিসেম্বর ১৯১১ ইংরেজ সরকার রাজধানী স্থানান্তরিত করছে কলকাতা থেকে দিল্লীতে। এই সময়কার এই রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মাঝে ব্রিটিশ সরকার নাটক নিষিদ্ধ করেই ক্ষান্ত হয়েছিল। কোনো নাট্যকর্মীকে জেলে আটক বা মামলা মোকদ্দমা করার সম্ভবত দরকার মনে করেনি। তাছাড়া বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে জনমানসে সমাজচেতনা রাজনীতিবোধ ও ইংরেজবিদ্বেষ এতই প্রবল যে তখন আর নাটকে *রাবণবধ* বা *সীতার বনবাসের* কাহিনী শোনালে হয়তো টিকিট বিক্রি হত না।

পরিশেষে বলতে হয়, বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস রচনায় এক তাৎপর্যপূর্ণ পর্ব হল নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন জারি হওয়ার সময়টি। নাট্য ইতিহাস সংক্রান্ত অধিকাংশ গ্রন্থগুলি বাংলা থিয়েটারের স্বদেশী শৌর্য স্থাপনায় এই পর্যায়টিকে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এই ঘটনায় সংযুক্ত ব্যক্তিদের জীবন প্রগতি ও কর্মপদ্ধতিগুলি আলোচনা করলে মনে হয়, সম্ভবত কিছু রাজনৈতিক মানুষের একত্রিত প্রতিবাদী পদক্ষেপ হিসেবেই এই ঘটনাটিকে বিচার করা উচিৎ ছিল। কিন্তু অধিকাংশ বাংলা নাট্য ইতিহাস গবেষকরা এই ঘটনাটিকে সমগ্র নাট্য সমাজের সমবেত প্রতিবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতেই বিশেষ উৎসাহ দেখিয়েছেন বলে মনে হয়। এই ঘটনা যে হয়তো সামগ্রিক নাট্য শিল্পী মহলের

স্বদেশী কর্মকলাপের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের প্রশ্নহীন উদাহরণ নাও হতে পারে, এই ঘটনা সম্ভবত একান্তভাবেই রাষ্ট্রচিন্তা বিষয়ক প্রত্যক্ষ রাজনীতি সচেতন ও সমাজসংস্কারক কিছু মানুষদের নেতৃত্বে ও মুষ্টিমেয় কিছু নাট্যকর্মীদের সহায়তায় সংঘটিত হয়েছিল, সে ব্যাপারে প্রচলিত নাট্য ইতিহাস নিশ্চুপ থেকেছে। ফলাফল স্বরূপ, এই সময়কে ঘিরে যা যা বর্ণনা বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যার উপস্থিতি গতানুগতিকধারার নাট্য ইতিহাসে লক্ষিত হয়, তা বহুলাংশে মূলধারার ইতিহাস রচনায় বেশ কিছু ফাঁক তৈরি করেছে বলেই মনে করা যেতে পারে।

অধ্যায় ৩

বাংলা ঐতিহাসিক নাটকে জাতীয়তাবাদ

> আমরা এখন 'জাতীয়' শিক্ষা চাই। কিন্তু জাতীয় শিক্ষা কি? জাতীয় শিক্ষা অর্থে কি বটতলার বই পড়া? আর্য্য সমাজে লোকে জাতীয় শিক্ষার অর্থ করছেন বেদ পাঠ করা; কেননা তাঁদের মতে বেদ অভ্রান্ত। বিবেকানন্দের ভক্ত বল্‌বেন—বেদান্ত পাঠ কর—দ্বৈত, অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বিচার কর। আবার কেহ বা বল্‌বেন—রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ পাঠ কর। কিন্তু হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান প্রভৃতি নানা ধর্ম্মাবলম্বী ভারতবাসীগণ সকলে এই ব্যবস্থায় সমমত হবেন কি? মুসলমান 'জাতীয়' অর্থে বল্‌লেন—কোরাণ পড়। খৃষ্টান বল্‌বেন—বাইবেল পড়। এত মতের অনৈক্য হলে আসল কাজে যে বাধা পড়বেই। পরম ধার্ম্মিক হিন্দু রাজার রাজত্বকালে শূদ্র তপস্যা করছে বলে তার শিরশ্ছেদনের ব্যবস্থা হল; মনুমহাশয় ব্যবস্থা করেন যে শূদ্রের কর্ণে বেদোচ্চারণ শব্দ প্রবেশ করলে উত্তপ্ত সীসক সেই কর্ণে ঢেলে দিতে হয়। এই মনুস্মৃতি নিয়ে জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা হয় কি? বেদ, বেদান্ত পাঠ্য হলে বাঙলার শতকরা ৫২ জন মুসলমান কি করবে? দয়ানন্দ বা বিবেকানন্দ—কোন্ পন্থী হলে মুসলমান ভ্রাতাদের টেনে নেওয়া যেতে পারে? আমরা হিন্দু মুসলমান এক ব'লে আহ্লাদে নৃত্য করছি, কিন্তু মুসলমান আমাদের জল ছুঁলেই সর্ব্বনাশ। (P. C. Roy 168-169)

নাটক নিয়ে ইতিহাস লেখার অধিকার শুধু ইতিহাসবিদের নয়। পেশাদার ইতিহাসবিদ্ ছাড়াও নাটক নিয়ে ইতিহাস লেখার দাবীদার আরো অনেকেই। অভিনেতা, মঞ্চব্যবস্থাপক, প্রযোজক, সংবাদপত্রের রিপোর্টার, নাট্য সমালোচক, নাট্যকার কিংবা দর্শক সকলেই ইতিহাস লিখতে পারেন। জাতীয় ইতিহাস রচনার আহ্বান জানিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যেমন *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় ১২৮৭ বঙ্গাব্দ বা ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে লিখেছিলেন, 'বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গলার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী, তাহাকেই লিখিতে হইবে' (337)। অর্থাৎ বঙ্কিমের ধারণায় যে বাঙালি সে-ই বাঙালির ইতিহাস লেখার অধিকার পান।

এই সূত্রে প্রশ্ন আসে, তাহলে হয়তো বঙ্কিমের ধারণায় যে বাঙালি নয়, তার বাঙালির ইতিহাস লেখার অধিকার থাকে না। ঠিক তেমনই নাট্য জগতে কোনো না কোনো ভাবে সংযুক্ত থাকার অধিকারেই যে কোনো ব্যক্তিই নাটক নিয়ে ইতিহাস লিখে ফেলতে পারেন। কখনো স্মৃতিকথা হিসেবে, কখনো চরিতমালা রচনার ফাঁকে, কখনো

সাক্ষাৎকারের মধ্যে দিয়ে লিপিবদ্ধ হয়ে যায় অতীত। নাট্যমোদী যে কোনো মানুষ কোনো একটি বিশেষ অবস্থায় বিশেষ কালে নাট্যচর্চার সঙ্গে জড়িয়ে থাকার অধিকারেই ইতিহাস লেখার যোগ্যতা পেয়ে যান। কোনো একটি নাটক নিয়ে তাঁর স্মৃতি, বিস্মৃতি, মোহগ্রস্থতা বা অপছন্দ—সবটাই ইতিহাসের পাতায় স্থায়ী স্থান করে নেয়। পেশাদার ইতিহাসবিদ সব রকমের বর্ণনার মাঝ থেকে খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করেন ইতিহাসকে। নাট্যচর্চা সম্পর্কে যেসব অতীতচারণ ছড়িয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়, তার মধ্যে থেকেই ইতিহাসবিদ্ গভীর অনুসন্ধান চালান। পক্ষপাত সরিয়ে খুঁজে দেখতে চান প্রাক্তনকালকে।

কিন্তু সমস্যা হল, যে ইতিহাস প্রত্যক্ষ শব্দের মাধ্যমে বর্ণিত, সেই ইতিহাসকে স্পর্শ করা অনায়াসসাধ্য, কিন্তু যে ইতিহাস প্রত্যক্ষ নয়? যে ইতিহাস আড়াল নিয়েছে? যে ইতিহাস অব্যক্ত? যে ইতিহাস কোনো শক্তিশালী ক্ষমতার শাসন এড়িয়ে যাওয়ার কৌশল নিয়েছে? যে ইতিহাস অন্য কোনো এক ইতিহাসের আচ্ছাদনে নিরাপত্তার আশ্রয় খুঁজেছে? তার ভেতর থেকে ইতিহাসের প্রচলিত কাঠামোর বাইরের পরিসরকে খুঁজে আনা নিঃসন্দেহে আরো জটিল এক প্রক্রিয়া। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস নিয়ে ইতিহাস রচনার সূত্রে এইরকমই এক জটিল প্রক্রিয়ার নিরীক্ষণ প্রয়োজন।

কিন্তু এ ব্যাপারেও সমস্যা আছে বলে মনে করছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দেশিত 'প্রকৃত ইতিহাস' নিয়ে আলোচনায় পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলছেন, 'প্রকৃত ইতিহাস কী তা নিয়ে বঙ্কিমের মত ছিল স্পষ্ট। প্রকৃত ইতিহাস হল পূর্বপুরুষের গৌরবের স্মৃতি' ('ইতিহাসের উত্তরাধিকার' 122)। পূর্বপুরুষের কীর্তিমণ্ডিত বর্ণনাই ইতিহাস? কিন্তু সত্যি কি তাই? অতীতের উজ্জ্বল কীর্তির মহিমাময় আখ্যানকেই 'ইতিহাস' বলা হবে? নাকি ইতিহাস হিসেবে গৃহীত হবে অপকীর্তি ও ব্যর্থতার কড়চাও। অতীত সময়ে দাঁড়িয়ে একটি ঘটনা নিয়ে সেই সময়ের কথকের যা ভাষ্য, সেটাই ইতিহাস? নাকি অতীতকে নিয়ে পরবর্তী ইতিহাসবিদদের দূর থেকে দেখা পর্যালোচনার নাম ইতিহাস?

ইতিহাস কাকে বলে এই নিয়ে বিতর্কে বারবার দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে জ্ঞানতত্ত্বের মহল। ইতিহাসকে একটা ডিসিপ্লিন বা জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার একটি বিষয় হিসেবে মান্যতা দেওয়া শুরু হয় উনিশ শতক থেকে। জ্ঞানচর্চার একটি প্রতিষ্ঠিত ক্ষেত্র হিসেবে প্রকাশিত হওয়ার পরই এই 'ইতিহাস' নামক ডিসিপ্লিন বা জ্ঞানচর্চার বিষয়টির 'সমস্যা'-গুলিকে নির্দেশ করার চেষ্টা করেন অবিনির্মাণবাদীরা। তাঁরা প্রশ্ন তোলেন, Archive-নির্ভর তথ্যকেই ইতিহাস ধরা হবে? নাকি ইতিহাসের ডিসিপ্লিনটির গণ্ডীটি আরও বৃহত্তর হওয়ার পরিসর আছে? কিংবা ইতিহাস কি কেবল অতীত

সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট এক এবং একটিমাত্র বয়ান? নাকি ইতিহাসের সংজ্ঞায় নানান বয়ান, নানান স্বর, নানান অনিশ্চয়তা ও বিভিন্নতাকে মান্যতা দেওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়?

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ইতিহাসবিদদের একাংশ ইতিহাসকে বহুস্বরীয়, বহুস্তরীয়, বহুবর্গীয় দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করতে উৎসাহী হন। উৎসাহ জন্মায় মাইক্রো হিস্টরির বিষয়ে। তাঁদের জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা বলে, গ্র্যাণ্ড ন্যারেটিভ বা মহান আখ্যায়িকা অতীত ঘটনার অনেক অর্থ ও ভাষ্যকে উপেক্ষা করে চলে যায়। তাই প্রতিটা বিষয়ের ওপর পুঙ্খানুপুঙ্খ সূক্ষ্ম দৃষ্টিনিক্ষেপ করে বহুস্বরীয় ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা লেখা দরকার। তাঁরা সওয়াল করেন, শব্দের মাধ্যমে যা বর্ণিত হচ্ছে শুধু কি সেটাই ইতিহাস? নাকি যা বর্ণিত হচ্ছে না, যা লিখিত হচ্ছে না, যা রক্ষিত হচ্ছে না, তাও গভীর কোনো ইতিহাস বহন করে। অনুপস্থিতের ইতিহাস কি উপস্থিতকে বিব্রত করে? নৈঃশব্দের ইতিহাস কি শব্দ তোলার ক্ষমতা রাখে?

ভারতের জাতীয়তাবাদের ইতিহাস

জাতীয়তাবাদের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে বেশিরভাগ সময় জাতীয়তাবাদের অগ্রসরকে ভীষণরকম সরলীকৃত ভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক নিরিখে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নির্দিষ্ট কিছু বিভাগ ও গণ্ডীতে ফেলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে বিচার করা হয়েছে। আধুনিক বা রক্ষণশীল, পুনর্নির্মাণবাদী বা পুনরুজ্জীবনবাদী, ব্রিটিশ-অনুরাগী বা জাতীয়তাবাদী—এইরকম নানান বিরোধী পক্ষ তৈরি করে জাতীয়তাবাদের ইতিহাসকে পর্যালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এইরকম সুনির্দিষ্ট আপাত-স্বচ্ছ ভাগে বিভক্ত করে এই বিশ্লেষণ করা প্রায় দুরূহ বলা চলে।

এইরকমভাবে বেশ কিছু নাম ব্যবহার করে আমার একটি সুনির্দিষ্ট তর্কাতীত ক্যাটাগরি স্থাপন করে আমরা নিশ্চিত হতে চাই। আর আমরা ভাবি সেই ক্যাটাগরিটি ভীষণ ভাবে ‘আছে’। একটি বিষয়ের সঙ্গে তার নামকরণের এই প্রসঙ্গটি নিয়ে দীপেশ চক্রবর্তীর ব্যাখ্যা, ‘... সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসকল্পনায় ‘নাম’ ও ‘বস্তু’র মধ্যে একটি সম্পূর্ণ সাযুজ্য আমরা ধরে নিই। ‘ধনতন্ত্র’ একটি নাম বা ক্যাটাগরি, আবার আমরা এ-ও ধরে নিই যে, এই নাম কোনো একটি বিশেষ ঐতিহাসিক সমাজব্যবস্থার সার্থক বর্ণনাও বটে’ (*Monorather Thikana* 201)। আর এই ভাবেই আমরা অনেক দ্বন্দ্ব, বৈপরীত্য, বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করে ফেলি।

ভারতের জাতীয়তাবাদী ইতিহাস পর্যালোচনার মধ্যেও এই উপেক্ষা স্বভাবতই বিদ্যমান। এই উপেক্ষা সম্বন্ধে পঙ্কজ রাগ বলছেন, ‘... the intricacies, complexities and ambiguities in the social and political

stands that the Indian took over the national questions have often belied such sharp divisions. Elements of contradictions and ambivalence are seen to pervade contemporary attitudes, beliefs and values' (69)। এই জটিলতা, এই দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও পরস্পর-বিরোধিতাকে মান্যতা দিয়ে, এই ধোঁয়াশাময় সত্যকে গ্রাহ্য করেই আজ ইতিহাসের এক নতুন বিশ্লেষণ করা জরুরী। সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রবিন্যাস করে ইতিহাসকে বিভাজিত করা হলে সমস্যা আসতে হয়তো বাধ্য।

যদি এভাবে বলা হয়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন সমাজসংস্কারবাদী, কিন্তু তিনি পশ্চিমী ধরনে সমাজসংস্কারের কাজ করেননি। রামমোহন রায়ের মতো সংস্কারবাদীও সতীদাহ প্রথা অবলুপ্তির জন্য উপনিষদকেই আশ্রয় করেছিলেন। ফলে তাঁদের রক্ষণশীল বা উদারবাদী কোনো একটি বিভাগে নির্দিষ্ট করে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। আবার পুনরুজ্জীবনবাদীরা যে সকলেই রক্ষণশীল ছিলেন তা নয়, আবার যে তাঁরা সকলেই জাতীয়তাবাদী ছিলেন, তা-ও নয়। আসলে জাতীয়তাবাদ কোনো প্রতিষ্ঠিত মতবাদ ছিল না। পশ্চিমী জাতীয়তাবাদের ধরনে ভারতের জাতীয়তাবাদী মডেলটা গড়ে ওঠেনি। এই দেশের মডেল অন্য। এই দেশের জাতীয়তাবাদের অগ্রসরের ইতিহাস ভিন্ন ধাঁচে বহমান। এই দেশে জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞাটি পশ্চিমের থেকে ভিন্ন প্রক্রিয়ায় নির্মিত।অনেক স্ববিরোধ, অনেক ঘোরপ্যাঁচ, অনেক জটিলতা, অনেক দোটানা ভারতের জাতীয়তাবাদের বিবর্তনের ইতিহাসে বর্তমান।

ভারতের জাতীয়তাবাদের শুরু ও হিন্দুত্বের পৌরোহিত্য

ব্রিটিশ শক্তি যখন ভারতবর্ষের প্রশাসন ও অর্থনীতির সর্বস্তরে নিজের স্থান পাকা করে নিতে থাকল, ঠিক তখনই ভারতীয় শিক্ষিত সমাজে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দাবীগুলিকে তুলে ধরার জন্য একটি সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, ফিরোজ শাহ মেহতা, উমেশচন্দ্র ব্যানার্জীর মতো শিক্ষিত ব্যক্তিরা গড়ে তুলতে থাকলেন নানান আঞ্চলিক সংগঠন। এই সংগঠনের পুরোভাগে আর আগের মতো জমিদারেরা থাকল না। সংগঠনগুলির মূল গঠনকাঠামোটি নির্ধারিত হল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে। যেমন- The Indian Association (1876), Bombay Presidency Association (1875)-র মতো সংগঠন তৈরি হল দেশের জাতীয়তাবাদী ভাবনা ও দাবীদাওয়া আদায়ের জন্য (Rag 75)। এই সংগঠনগুলির প্রতিষ্ঠার ফলাফল স্বরূপ পরবর্তীকালে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই ভারতে প্রথম সারা ভারতব্যাপী একটি সুপরিকল্পিত জাতীয়তাবাদী সংগঠন প্রতিষ্ঠা হল।

হিন্দু জাতীয়তাবাদ নিয়ে হাল আমলে কয়েক বছর ধরে সারা ভারত জুড়ে আলোচনা চলছে। কংগ্রেসের নেতৃত্বে তৈরি হওয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এই হিন্দুত্বের প্রভাব ও নেতৃত্ব নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা প্রয়োজন। ভারতের জাতীয়তাবাদী চেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণে হিন্দুত্বের ঐতিহাসিক মূল্যায়নটি নিঃসন্দেহে অনিবার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু এ কথা মনে রাখা দরকার, মাত্র গত কয়েক দশক ধরেই এই হিন্দুত্ব ও হিন্দু জাতীয়তাবাদের অগ্রগতি। আজ 'হিন্দুত্ব' বলতে যা বুঝি, প্রাচীন কালে সেই 'হিন্দুত্বের' ধারণাটি সম্ভবত ভারতবাসীর চেতনায় উপস্থিত ছিল না।

সুপ্রাচীনকালের ইতিহাস জড়িয়ে আছে 'হিন্দু' শব্দটির আলোচনায়। Jaffrelot লিখছেন, 'this ism (Hindu Nationalism) is one of the oldest ideological streams in India' (3)। সিন্ধুনদীর পাড়ে বসতি ছিল যে মানুষদের তাদেরকে 'হিন্দু' নাম দিয়েছিল গ্রীক, মুসলিম ও অন্যান্য জনজাতির মানুষেরা। কিন্তু মধ্যযুগ পর্যন্ত এই মানুষদের মধ্যে 'হিন্দু জাতি' হিসেবে একত্রিত বোধ উদ্বুদ্ধ হয়নি। সমগ্র দেশ বা জাতি এক জাতীয়তার ভ্রাতৃত্ববোধে মোটেই সংঘবদ্ধ ছিল না এই মধ্যযুগ পর্যন্তও (Jeffrelot 6)। অতএব বোঝা যাচ্ছে, আজকের দিনে হিন্দুত্ব বা হিন্দু জাতি বলতে আমরা যা বুঝি, সেটি অবশ্যই ভাবে একটি আধুনিক ঘটনা। একটি নির্দিষ্ট ধরনের মতাদর্শ গঠন করে 'হিন্দু' জাতিকে নির্মাণ করা হয়েছিল। 'হিন্দু' একটি আধুনিক নির্মাণ। 'হিন্দু' একটি নির্মিত আইডিয়া বা ধারণা। অন্যান্য জাতির বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে একটি গড়ে তোলা বা বানিয়ে তোলা সংগঠন।

এই সূত্রে Jaffrelot-এর বক্তব্য, 'The development of Hindu nationalism is therefore a modern phenomenon that has developed on the basis of strategies of ideology-building, and despite the original characteristics of a diverse set of practices clubbed under the rubric of Hinduism' (6)। প্রাচীন হিন্দুর যে বিবিধ বৈশিষ্ট্য ও প্রচলিত আচার-আচরণ ছিল, সেগুলোকে মুছে দিয়ে বা অনেকটা ঘষে-মেজে পরিশীলিত করে এক নতুন মতাদর্শ গড়ে উঠল এই নতুন 'হিন্দু' নির্মাণের মধ্যে দিয়ে।

উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে সারা ভারতে নতুন হিন্দু নির্মাণ ও হিন্দু জাগরণের প্রচার শুরু হয়েছিল। ১৮৭৫ সালে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠা করলেন আর্য সমাজ। অতীতকালে হিন্দু ধর্ম থেকে যে মানুষেরা মুসলমান হয়েছে বা অন্য ধর্ম গ্রহণ করেছে তাদের ফিরিয়ে আনার ডাক দিল দয়ানন্দের আর্যসমাজ। ফলে হিন্দু ধর্মের তুলনায় অন্য ধর্ম কতটা নিকৃষ্ট, সে প্রচারে নেমে পড়ল গোঁড়া হিন্দুরা। জাতি হিসেবে হিন্দু জাতি ও ভাষা হিসেবে সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায় তারা উদ্যোগী হল। আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠার এক দশক পরে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল,

যা ভারতের 'হিন্দুত্বের' অগ্রগতির ইতিহাসে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে বালগঙ্গাধর তিলক কংগ্রেসে যোগ দিলেন। তার কিছুকালের মধ্যেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও হিন্দুধর্ম ভিত্তিক আদর্শ নিয়ে পর্যালোচনা শুরু হল ভারতের রাজনীতি মহলে। সারা ভারতকে ধর্মের ভিত্তিতে একত্রিত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হল। মধ্যবিত্ত বাঙালিও এই প্রক্রিয়ার অংশীদার হল। এই সূত্রে অমর দত্ত লিখছেন, 'উনিশ শতকের আটের দশক থেকে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ রাজনৈতিক সংগঠনগুলিকে প্রভাবিত করতে শুরু করে। ভাষা নয়, ধর্মই জাতিসত্তার বৈশেষিক লক্ষণ বলে চিহ্নিত হয়। এই ভাবধারার ধারক-বাহক হলেন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালী' (36)।

১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে তিলক 'শিবাজী উৎসব' প্রবর্তন করেন। ভারতের জাতীয় আন্দোলনে একেবারে গোড়ার দিকে 'শিবাজী উৎসব'-এর ভূমিকাটি উল্লেখযোগ্য। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে বাল গঙ্গাধর তিলক প্রমুখরা শিবাজীর রাজধানী রায়গড়ে প্রথম এই উৎসব করেন। কলকাতায় এই উৎসব হয় ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে। ১৯০৪-এ এই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'শিবাজী উৎসব' কবিতাটি। 'বর্গীর হাঙ্গামার স্মৃতি ভুলে, বাঙালি-মরাঠী ঐক্য গড়ে তোলাই ছিল এর লক্ষ্য' (Ramakrishna Bhattacharya 79)। কিন্তু মুসলমানরা বুঝতে পারেনি মারাঠী নায়ক কেন বাঙালির আদর্শ হবে? ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে মৌলবী ওসমান আলি লিখছেন, 'এখনও কলকাতার নিকটস্থ মারহাট্টা খাল দর্শন করিলে অথবা উহার কথা মনোমধ্যে উদয় হইলে, মারহাট্টা জাতির নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার, নৃশংসতা, ধনতৃষ্ণা প্রভৃতি আমাদের অবশ করিয়া ফেলে। সেই জাতিকে বিশেষত বাঙ্গালিগণ আদর্শস্বরূপ জ্ঞান করিতেছেন, ইহা অপেক্ষা আর কি আশ্চর্যের বিষয় হইতে পারে' (qtd. in Alokkumar Ghosh 63)। যাই হোক, বরিশালেও এই উৎসব ছড়িয়ে পড়ে। মুসলমান সম্প্রদায় এতে যোগ না দেওয়ায় ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে এই উৎসবের অন্যতম উদ্যোগী অশ্বিনীকুমার দত্ত বলেন, 'মুসলমান ভাইগণ! আজ তোমরা না আসিয়া প্রাণে বড় কষ্ট দিয়াছ। আমরা তোমাদিগের মহাপুরুষগণের পদে প্রণাম করিতেছি। তোমাদিগকে শিবাজী যাহা করিয়াছিল তাহা যদি তোমরা না ভোল, তবে তোমরা যাহা আমাদিগকে করিয়াছিলে তাহা আমরা কেমন করিয়া ভুলিব?' (qtd. in Ramakrishna Bhattacharya 79) মুঘল তথা মুসলমানদের হাত থেকে শিবাজী মহারাষ্ট্রকে 'মুক্ত' করেছিলেন। শিবাজীর আদর্শে উদবুদ্ধ হয়ে ভারতবাসী ব্রিটিশ শাসনে মাথা তুলে দাঁড়াবে, এই ছিল শিবাজী উৎসবের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই উৎসবের এক বীভৎস প্রভাব পড়েছিল উনিশ শতকীয় ভারতের সমাজ ও রাজনীতি মহলে। বিজয়ী শিবাজী হয়ে দাঁড়ালেন হিন্দুদের প্রতিনিধি ও হেরে যাওয়া মুঘলরা হলেন মুসলমানদের প্রতিনিধি।

সমসাময়িক উচ্চবিত্ত হিন্দু বুদ্ধিজীবী মহল্লের চোখে মুসলমানদের অবস্থানটি মোটামুটি বর্ণিত হল। এই সময়ে মুসলমান বুদ্ধিজীবী মহলের বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় সৈয়দ জামিল আহমেদের রচনায়। ঐতিহাসিকভাবে জটিল এই সময়টিকে নিয়ে আলোচনার স্বার্থে উনিশ শতকীয় উচ্চবিত্ত মুসলমান বুদ্ধিজীবী মহলের গতিপ্রকৃতি নিয়ে তাঁর বিশ্লেষণটিকে উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করছি। তাঁর মতে, ব্রিটিশদের প্রভাবে বাঙালির ইংরেজি শিক্ষার তাৎক্ষণিক প্রভাব ছিল ভদ্রলোক সংস্কৃতি। শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত ও জমিদারশ্রেণীর এই মানুষেরা, মূলত ছিলেন হিন্দু। তাঁদের কাছে সভ্যতার চূড়ান্ত প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠেছিল পশ্চিমী জীবনযাপন, আদবকায়দা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি।

অন্যদিকে মুসলমানরা, শাসক হিসেবে ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয়েছিল, তাঁদের অহংকার আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল ইংরেজ পরাক্রমে। তাই তাঁরা নিজেদেরকে একেবারে গুটিয়ে নিয়েছিলেন, নতুন শাসকের সঙ্গে মিলেমিশে গিয়ে নতুন সংস্কৃতির সঙ্গে একত্রিত বোধ করতে তাঁদের অস্বস্তি গাঢ় হয়ে উঠেছিল। মুসলমান শাসকদের যুগে হিন্দুরা অবদমিত ছিল বলে মনে করা হল এবং নতুন শাসক আসায় তাঁরা নানান সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পরেও ইংরেজদের সঙ্গে মিলিত হয়ে পড়তে পারল। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে নতুন যুগের সংস্কারবাদ এবং পুনর্জাগরণ, প্রায় ১৮৭০-এর এর দশক পর্যন্ত মুসলমানদের সঙ্গ পায়নি বললেই চলে। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বরং মুসলমান ধর্ম গুরুদের নেতৃত্বে মুসলমান সম্প্রদায় তাঁর রক্ষণশীলতা, তাঁর হৃতগৌরবের পুনরুদ্ধারের দিকে মনোনিবেশ করতে চাইল। উনিশ শতকীয় ইসলামিক প্রচারে ডাক হয়ে হয়ে উঠলো, মুসলমানদের জীবনে যা কিছু বাঙালি, যা কিছু ইসলাম ধারণা ও নীতির পরিপন্থী, তাকেই প্রত্যাখ্যান করার উদ্যোগ।

উদাহরণ স্বরূপ হাজী শরীয়তুল্লাহ ও তাঁর ছেলে দুদু মিয়ার ফারায়েজি আন্দোলন (১৮২০ থেকে ১৮৬০)--এর উল্লেখ করেছেন আহমেদ। তাঁর মতে, এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল ইসলামের আদি বিশুদ্ধতা আনার। যা কিছু পাপ তথা যা কিছু ইসলামবিরোধী, তারই শুদ্ধায়নের আশু উদ্দেশ্য ছিল এই আন্দোলনের। মধ্য-প্রাচ্যের ইসলাম সম্বন্ধীয় ধ্যান-ধারণার একটা অগভীর প্রতীতিকে ভিত্তি করেই মূলত গড়ে তোলা হয়েছিল বাংলার মুসলমানদের জীবনচর্যা আর এই ব্যাপক প্রচার প্রক্রিয়া হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে এক গভীর ভেদ তৈরি করায় বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল বলে মনে করছেন আহমেদ।

ইসলামের এই ব্যাপক প্রচারের অতি অল্পদিনেই সামাজিকভাবে প্রকাশিত হতে লাগল। মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনায় প্রভূত উর্দু ও ফার্সি শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা গেল। আপাদমস্তক ইসলামিয় পরিচয়ে পরিচিত হয়ে উঠতে চাইলেন মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজ। বর্জন করলেন হিন্দুদের ব্যবহৃত চাদর-ধুতি; পরা শুরু করলেন কুর্তা-পাজামা। ভাষা ব্যবহারের প্রশ্নটি মুসলমানদের কাছে সবচেয়ে চর্চিত বিষয় হয়ে উঠল। আহমেদের কথায়, 'The Muslim elite of Calcutta, with their vehement dislike of Bengali, began championing the cause of Urdu. All this - for a separate identity.' (*Acinpakhi* 14)।

১৮৭০ সাল থেকে মুসলমান বুদ্ধিজীবী সমাজের সমাজ ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ শুরু হয় মূলত স্যার সৈয়দ আহমেদের উদ্যোগে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে (১৮৭৫)। এইখানে ঐতিহ্যবাহী ইসলামভিত্তিক ধ্যানধারণার সঙ্গে নব্য ইংরেজ প্রভাবিত শিক্ষা সংস্কৃতি ও ভাবনার মেলবন্ধন ঘটানোর প্রচেষ্টা শুরু হয়। এর পর থেকেই বেশ কিছু সমাজ সংস্কারক মানুষেরা বাঙ্গালি মুসলমান সমাজের পুনর্গঠনের প্রয়াস শুরু করেন। নবাব আব্দুল লতিফ (১৮২৮-৯৩) ও সৈয়দ আমির আলি (১৮৪৯-১৯২৮)-এর নাম এই সূত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

নব্য হিন্দুদের পাশাপাশি নব্য শিক্ষিত মুসলিম বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের উত্থানও লক্ষ্য করা যায় একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে এই গোষ্ঠীর দাবীদাওয়া-বক্তব্য-চাহিদাকে একত্রিত করে গঠিত হয় মুসলিম লীগ। এই লীগ তৈরি হল, কংগ্রেসের থেকে আলাদা রূপে। এখানে বিশেষ ভাবে মুসলিমদের নিজেদের কথা তুলে আনার উদ্দেশ্য রইল। উচ্চবিত্ত মুসলিমদের ব্রিটিশ শিক্ষার আলোতে নিয়ে আসার উদ্যোগ নেওয়া হল। নিজেদের দাবীদাওয়াকে প্রতিষ্ঠার জন্য শাসকের সঙ্গে খানিক বোঝাপড়া করে নেওয়ার উদ্যোগ নিল মুসলিম লীগ। অল্প দিনেই হিন্দু ও মুসলিম দুইটি আলাদা অস্তিত্ব হিসেবে প্রকাশিত হল রাজনৈতিক আঙ্গিনায়। যার চূড়ান্ত রূপ প্রকটিত হয়েছিল দেশভাগের ইতিহাসে। বর্তমান গবেষণায় পরবর্তী ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের দিকে যাওয়ার পরিসর হবে না, তাই এখানেই এই আলোচনা শেষ করা হল।

বরং, এই সূত্রে শ্রমিক শ্রেণির ইতিহাসকে অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে। বিশেষ মনোযোগে এই সময়ের শ্রমিক আন্দোলনকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাচ্ছে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রথম দিকের নেতৃত্বের কেউই বাংলার রাজনৈতিক মঞ্চে শ্রমিক শ্রেণীকে সংগঠিত করার কথা ভাবেন নি। গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, '... শহরে কলকারখানার ও বস্তিবাসী শ্রমজীবীদের বিক্ষোভকে তাঁরা বেশ খানিকটা ভয়ের চোখেই

দেখেছেন’ (54)। তাঁর পর্যবেক্ষণে, ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার টালা-চিৎপুর অঞ্চলে প্রধানত মুসলিম শ্রমিক ও বস্তিবাসীদের যে গণবিক্ষোভ হয়েছিল, তার মূল লক্ষ্য ছিল পুলিশ ও ব্রিটিশ শাসকরা। কিন্তু এই মুসলিম গণবিক্ষোভে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন সেই সময়কার হিন্দু জাতীয়তাবাদীরাও। অর্থাৎ মুসলমান মানুষদের বিক্ষোভ বা প্রতিবাদী পদক্ষেপ শুধুমাত্র ইংরেজ রাজপুরুষদের বিব্রত করেছিল, তা-ই নয়, এই ধরনের আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থেকেছে হিন্দু জাতীয়তাবাদী শক্তিগোষ্ঠীও। নিম্নবর্গের শ্রমিক বা বস্তিবাসী মুসলমানদের সংঘটিত আন্দোলনের কার্যকলাপ থেকে নিজেদের দূরে রাখাই শ্রেয় মনে করেছে। তাঁদের প্রতিবাদী আন্দোলন ভয়ার্ত করে তুলেছে জাতীয়তাবাদী বিশিষ্টদেরও। যদিও পরবর্তীকালে অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় পরিস্থিতিটা খানিক পাল্টেছিল বলে মনে করছেন গৌতম চট্টোপাধ্যায়। তাঁর মতে, কিছু ক্ষেত্রে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে বাংলাদেশের শ্রমিকশ্রেণীর কিছু অংশের মানুষের অংশগ্রহণ হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গবিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের সময়, জাতীয় আন্দোলনের সমর্থনে বাংলাদেশে শ্রমিককে বহু ধর্মঘট হয়। হাওড়ার বার্ণ কোম্পানীতে, বাউড়িয়ার চটকলে, ছাপাখানায় অথবা রেলে এই ধর্মঘটের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। শ্রমিক শ্রেণির এই ধর্মঘটী আন্দোলনকে গৌতম চট্টোপাধ্যায় মোটেই কেবলমাত্র শ্রমিক আন্দোলন হিসেবে মনে করছেন না। এই ধর্মঘটের পেছনে আরও ব্যাপকতর প্রেরণা আছে বলে তিনি মনে করছেন। তিনি লিখছেন, ‘... এইসব ধর্মঘটী শ্রমিক ও কর্মচারীদের শতকরা নব্বুই ভাগেরও বেশী ছিলেন বাঙ্গালী। অতএব এইসব ক্ষেত্রে শ্রমিক ও শ্রমজীবীদের শ্রেণীচেতনা থেকে তাঁরা কতটা এই সব ধর্মঘট করেছিলেন, আর কতটা বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের প্রভাব, তা অবশ্যই বিবেচ্য’ (54)। তবে জাতীয় আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণির এই অংশগ্রহণের উদাহরণ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত সীমিত। শ্রমিক শ্রেণির মানুষদের মধ্যে হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের খানিক প্রভাব এসে পড়লেও উনিশ শতকের শেষের দশক বা বিশ শতকের গোড়ার সময় পর্যন্ত জাতীয় আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণিকে সংঘটিত করার উদ্যোগের তেমন কোনো উৎসাহ দেখা যায়নি।

উনিশ শতকের শেষের দিক থেকে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব মূলত হিন্দু জাতীয়তাবাদের আদর্শ রূপটি গঠন করার প্রক্রিয়ায় বেশি মনোনিবেশ করেছিলেন। আলাদা করে শ্রমিক বা কৃষক বা উচ্চবিত্ত ইত্যাদি ভাগে নয়, সমগ্র ‘দেশীয় ও জাতীয় ভারতীয়’ জাতির রূপটিকে নিয়ে চর্চাতেই তারা বিশেষ গুরুত্ব দিতে চেয়েছিলেন। তার ফলস্বরূপ, ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ প্রকৃত হিন্দু-র আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী হবে, তা নির্দিষ্ট ভাবে নির্ধারিত হতে থাকল। ‘হিন্দু’-কে ও হিন্দুত্বকে মহীয়ান করে তুলতে একটি জোরদার ‘শত্রুপক্ষ’ গড়ে

তোলার দরকার হয়ে পড়ল। সমগ্র হিন্দু জাতির মধ্যে নানা বিরোধ নানা বিভিন্নতা নানা সংঘর্ষ। সমস্ত বিরোধ সংঘর্ষকে ধামাচাপা দিতে একটি শক্তিশালী শ্রেণিকে শত্রুপক্ষ হিসেবে চিহ্নিত না করলে 'হিন্দু' নামক ছাতার তলায় গোটা জনজাতিকে এক করে তোলা যাচ্ছিল না। Jaffrelot বলছেন, 'Hindu nationalism crystallized in action to a threat subjectivity felt if not concretely experienced' (13)। হিন্দু জাতির প্রতি এই 'threat' হিসেবে গড়ে তোলা হল মুসলমান সমাজকে। মুসলমান-বিরোধিতার শর্তে সমগ্র হিন্দু সমাজ একত্রিত হয়ে উঠল। এই নবভাবে জাগ্রত হিন্দুচেতনা পরিণত রূপ পায় ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (RSS) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। বলা দরকার, ভারতের প্রথম কম্যুনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার মাত্র কিছুদিন পরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল RSS।

জাতীয়তাবাদী সাহিত্যের গ্রহণযোগ্যতা

উনিশ শতকের সারা ভারতব্যাপী নানান ভাষায় লিখিত সাহিত্যকে সেই সময়কার ভারতের জাতীয়তাবাদী, আঞ্চলিক ও সাম্প্রদায়িক চরিত্রটিকে বোঝার জন্য বিশ্লেষণ করা জরুরী। সময়, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও জাতীয়তাবাদী ভাবনার আলোচনায় এই সময়ের সাহিত্যগুলিতে অজস্র Ambiguity ও ধোঁয়াশা ধরা পড়ে। এই সময়কার সবচেয়ে বড় দ্বিধা তৈরি হয়েছিল, 'ভারত, একটি নেশন' হিসেবে যে ধারণাটি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চলছিল, সেই ধারণাটির বিভিন্নতা নিয়ে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জাতীয়তাবাদীরা বুঝে গিয়েছিলেন, ভারতবর্ষ নানা জাত-ধর্ম-গোষ্ঠীতে বিভাজিত একটি দেশ, তাই ধর্ম-নিরপেক্ষ একটি আন্দোলন তৈরি করতে গেলে সমস্ত ধর্মের মানুষদেরই প্রসন্ন করে তুলতে হবে। তাই ভারতকে একটি সংঘবদ্ধ দেশ হিসেবে তৈরি করতে গেলে ভারতীয়দের একটি একত্রিত জাতি হিসেবে বেঁধে ফেলতে হবে। আর এই বাঁধনের ভিত্তিটি হবে সব ভারতীয়ের জন্য একটিমাত্র অখণ্ড ধর্ম।

পঙ্কজ রাগের বক্তব্যটি এই সূত্রে অত্যন্ত জরুরী, 'Though the emergence of national consciousness... recognized the need in a plural, multi-religious society for dissolving all tensions that could threaten to be politically divisive, yet the search for a solution meant envisaging a common political front and many writers found it difficult to reconcile this with their traditional thinking and value system' (88)। জাতীয় ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করতে ভারতবাসীর সামনে নানা জাতির মিশ্রণে গড়ে তুলতে হবে একটি সর্বধর্ম-সমন্বয়ী এক নতুন ধর্ম। এই নতুন ধর্ম কোনো

রাজনৈতিক বিভেদ থাকবে না। সকল ধর্মের ভারতীয় এই একই ধর্মে দীক্ষিত হবেন। ভারতীয়দের এক সূত্রে গেঁথে তৈরি করতে হবে নতুন ভারত, এমনটাই মনে করেছিলেন জাতীয়তাবাদীরা। এই নতুন সর্বসাধারণের ধর্মের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিতেই অনেকাংশে ব্যর্থ হয়ে পড়েছিলেন অনেক সাহিত্যিকেরা। আজন্মচর্চিত মূল্যবোধ ও ভাবনার সঙ্গে লড়াই করে এই নতুন ধর্মকে নিজেদের জীবনে তাঁরা স্থান দিতে পারলেন না। তাঁদের কাছে ভারত ও ভারতীয় মানে 'হিন্দু'; তাঁদের জাতীয়তাবাদের শ্লোগান মানে 'হিন্দি, হিন্দু, হিন্দুস্থান'। বঙ্কিমের মতো প্রাজ্ঞ সাহিত্যিকও তাই বাঙালি বা ভারতবাসীর লজ্জাজনক পরাহত চরিত্রের ইতিহাস খুঁজছেন ইসলাম আমলে মুসলমানদের কাছে হিন্দুজাতির পরাজয়ের সময় থেকেই। পঙ্কজ রাগের স্পষ্ট বক্তব্য, 'The thematic and semantics of such writings, though apparently patriotic, did little to hide the implications that Muslims were trespassers on the homeland that was the 'Mother India' of the Hindus alone' (89)। দেশাত্মবোধক রচনাগুলিতে তাই মুসলমানরা বর্ণিত হল বহিরাগত হিসেবে, এবং হিন্দুরা হয়ে উঠল ভারতমাতৃভূমির একমাত্র সন্তান।

এই প্রসঙ্গে মুসলমান বুদ্ধিজীবী সমাজের একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করা প্রয়োজন। বিশিষ্ট্য চিন্তক, লেখক, সাংবাদিক বিচারপতি আবদুল মওদুদ বাংলার সমাজে সাম্প্রদায়িকীরণের ইতিহাস রচনার প্রেক্ষিত আলোচনা করতে গিয়ে লিখছেন, 'হিন্দু ও বৌদ্ধের কতো অজ্ঞাত অশ্রুত পৌরাণিক কাহিনী, শিখ, মারাঠা, রাজপুতের কতো উপকথা বাণীমূর্তি পেলো (রবীন্দ্রনাথের রচনায়)... তাঁর বিপুল কবিতাকর্মে, শুধু বেড়ার পাশের মুসলমানই রয়ে গেল অপাংক্তেয় ও উপেক্ষিত, ইসলামই রয়ে গেল তাঁর কবিতার ভাষায় অনুচ্চারিত ও অবজ্ঞাত' (Maudud 351)। মওদুদ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে রবীন্দ্রসাহিত্যের বিস্তারিত আলোচনা করে আশাহত হয়ে বলছেন, সাহিত্যচর্চা বা রাজনৈতিক বা সামাজিক ক্রিয়াকার্যে রবীন্দ্রনাথ ইসলামকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন; কিন্তু তাঁর বিশাল কর্মকাণ্ডের পরিধিতে যেটুকু মুসলমান বিষয়ক ছবি উঠে এসেছে, তা খুবই ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থেকেছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বিষয়ে মওদুদের বিশ্লেষণ, 'রবীন্দ্রভাবের পটভূমিতে আছে বেদোপনিষৎ, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম, শিখ, রাজপুত, মারাঠা, জৈন... ইংরেজী সাহিত্যের বর্ণচ্ছটা... ফরাসী ও রুশসাহিত্য, স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ার সাহিত্যিক দানও... জার্মান কবি হাইনে, গয়টে এবং শিলারের রচনাও... খ্রীস্ট ও খ্রীস্টধর্মের উপরেও বহু প্রবন্ধ ও কবিতা রচনা করেছেন। অথচ নিকট প্রতিবেশী অতি পরিচিত মুসলমান 'কাব্যে উপেক্ষিতা' হয়ে রুদ্ধদ্বারে বারবার আঘাত করেও কবির ভাবরাজ্যে তরঙ্গ তুলতে ব্যর্থ হয়েছেন' (Maudud 351)। রবীন্দ্রনাথের নেশন সম্পর্কিত সংহতি ও একতার ধারণাটি নিয়ে পরে

খানিক আলোচনা করা হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রবীন্দ্র সাহিত্যের বিশাল পরিধি ও ব্যাপকতার তুলনায় যে মুসলমান সমাজের গভীর প্রতিচ্ছবি খুব বেশি পাওয়া যাচ্ছে না, এ কথা বোধহয় পুরোপুরি অস্বীকার করা যায় না। এই সূত্রে আবুল ফজলের ব্যাখ্যা, 'রবীন্দ্রনাথ যখন জীবনে পুরোপুরি সক্রিয় তখনো সচেতন মুসলিম মধ্যবিত্ত তথা বুদ্ধিজীবী সমাজের আবির্ভাব ঘটেনি। তখন বাংলাদেশে যে স্বল্পসংখ্যক মুসলিম অভিজাত পরিবার ছিল তাদের বা তাদের বংশধরদের বাংলা ভাষা বা সাহিত্যের সঙ্গে ছিল না কোনো রকম যোগাযোগ। ফলে সামাজিকভাবে মুসলমান সমাজের খুব কাছাকাছি আসার তেমন সুযোগ রবীন্দ্রনাথ জীবনে পাননি' (Fajal 50)। এ কথা মনে রাখা দরকার যে, রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তা ও ধর্মচিন্তা নিয়ে এই রকম বহু বিতর্ক বিদ্যমান। বর্তমান গবেষণা প্রসঙ্গে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, রবীন্দ্রনাথের মতো বিশিষ্ট প্রাজ্ঞ সমাজচিন্তকের কাছে 'নেশন'-এর ধারণাটির ব্যাখ্যা। এ বিষয়ে অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও শুধুমাত্র রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে এই বিতর্ক নয়। সাহিত্য ক্ষেত্রে 'নেশন' ও 'জাতীয়তা' ধারণাটির গতিপ্রকৃতি নিয়ে এই বিতর্কটি রয়েছে। 'নেশন' ও 'জাতীয়তা' ধারণাটি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সীমাবদ্ধ অর্থেই প্রতিষ্ঠিত হতে থেকেছে বলে মনে করা যায়। 'জাতীয়তাবোধ' উদ্বুদ্ধ করার উদ্যোগ নিয়েও অতীতের হিন্দুর গর্ব ও মহিমা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকল। পাশাপাশি পুরো ভারতবাসীকে এক সূত্রে বাঁধার জন্য একটি সুবিধেজনক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তোলার প্রস্তুতি শুরু হল। আর তাই অধিকাংশ ভারতীয়কে এক সূত্রে সূত্রায়িত করার জন্য বেছে নেওয়া হল ভারতবাসীর হিন্দুত্বের পরিচয়টিকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে এক ধর্মের অধীনের বাঁধতে হলে ভারতবর্ষে হিন্দুত্বের নিগড়েই যে বাঁধতে হবে সে কথা জাতীয়তাবাদীরা বেশ ভালোই বুঝে গিয়েছিলেন। 'জাতীয়তা'-র ধারণাটি সংজ্ঞায়িত হল 'জনপ্রিয়তা'-র নিরিখে।

বহু ভাষাভাষি, বহু জাতিগোষ্ঠী ও বহু জাত ও ধর্মের দেশ এই ভারতবর্ষ। ভাষা বা জাতির ভিত্তিতে এই দেশের মানুষকে একত্রিত করা অসম্ভব। এইখানেই Hinduism বা হিন্দুত্ববাদ একটি অত্যন্ত শক্তিশালী সাংস্কৃতিক সম্ভাবনা তৈরি করতে সক্ষম হল। '... this quest found in Hinduism a strong possible candidate to emerge as the cultural nationalism... This cultural ideal, however, meant a clear hostility towards Islam' (Rag 90). এই জাতীয়তাবাদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলটি অবধারিতভাবে নিঃসন্দেহচিত্তে ইসলাম বিরোধী স্বাতন্ত্র্যে প্রকাশিত হল।

রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ ও বঙ্কিমের হিন্দু-চিন্তা

হিন্দু সমাজকে এক করার সমস্যাটা নিয়ে রবীন্দ্রনাথও বারবার কলম ধরেছেন। ভারতের জনগোষ্ঠীর বহুবর্ণ বহুজাতির বিভিন্নতার মাঝে ঐক্যবদ্ধ করার কাজটি যে বেশ দুরূহ তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তা বিষয়ক লেখাগুলোতে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এই লেখাগুলো নিয়ে আলোচনা সূত্রে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণ, '...(রবীন্দ্রনাথের মতে) এই বহুবর্ণ বহুজাতিকে এক করার চেষ্টায় হিন্দুসমাজের পক্ষে ইউরোপীয় কায়দায় নেশন গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। হিন্দু সভ্যতাকে তাই এক ভিন্ন প্রকারের ঐক্য সৃষ্টি করতে হয়েছে। সে ঐক্য রাষ্ট্রভিত্তিক নয়, সমাজভিত্তিক' ('Rabindrik Nation Ki?' 77)। রবীন্দ্রনাথের লেখায় আদর্শ জাতিব্যবস্থা ও হিন্দু সমাজের আইডিয়ায় সর্বধর্মের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বিধানের কথা বলা হচ্ছে। 'হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীস্টান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পরস্পর লড়াই করিয়ে মরিবে না—এইখানে তাহারা একটা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইবে। সেই সামঞ্জস্য অহিন্দু হইবে না, তাহা বিশেষভাবে হিন্দু। তাহার অঙ্গঅপ্রত্যঙ্গ যতই দেশবিদেশের হউক, তাহার প্রাণ তাহার আত্মা ভারতবর্ষের' (*Rabindrarachanabali* 13: 59)। তাঁর মতে আদর্শ হিন্দু সমাজে বৌদ্ধ জৈন মুসলমান খ্রিস্টান সকলেরই স্থান থাকবে। অন্যদিকে খ্রিস্টান ও মুসলমান সমাজ সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ, 'পৃথিবীতে দুটি ধর্মসম্প্রদায় আছে অন্য সমস্ত ধর্মমতের সঙ্গে যাদের বিরুদ্ধতা অত্যুগ্র-সে হচ্ছে খৃস্টান আর মুসলমান ধর্ম। তারা নিজেদের ধর্মকে পালন করেই সন্তুষ্ট নয়, অন্য ধর্মকে সংহার করতে উদ্যত। এইজন্য তাদের ধর্মগ্রহণ করা ছাড়া তাদের সঙ্গে মেলবার অন্য কোনো উপায় নেই' (*Rabindrarachanabali* 13: 672)। রবীন্দ্রনাথের এই ধর্ম আলোচনা ও সমাজনীতি আলোচনার বিশ্লেষণ করে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বলছেন, রবীন্দ্রনাথের বিচারে আদর্শ হিন্দুসমাজ সাভরকর বা স্বামী বিবেকানন্দ বর্ণিত হিন্দুত্বের সমগোত্রীয় নয়। '...হিন্দুত্ব তাঁর কাছে হিন্দুসমাজের 'আইডিয়া' বা 'মানসরূপ', কোনো আচার বা ধর্মমতের লক্ষণ দিয়ে তার ব্যাপ্তি বিচার করা যাবে না' ('Rabindrik Nation Ki?' 85)। পাশাপাশি অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের নিরীক্ষণ, রবীন্দ্রনাথের হিন্দু আদর্শের মতাদর্শটি কিন্তু আজকের হিন্দুত্ববাদীরা নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করে নিতে পারে। এমন সম্ভাবনা নেই বলা যায় না। 'তাঁর সমসাময়িক অনেক মনীষীর মতো, এবং তাঁর নিজের সুস্পষ্ট অনিচ্ছা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের হিন্দুত্ব-চিন্তা কিন্তু এই নব্য রাজনৈতিক মিছিলে শামিল হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি বহন করছে' ('Rabindrik Nation Ki?' 86)।

পাশাপাশি এই প্রেক্ষিতে বিবেকানন্দের ধর্ম ও সমাজচেতনাটিতে মনোনিবেশ করারও দরকার আছে। কারণ উনিশ শতকের হিন্দুসমাজের অবক্ষয় ও হতাশার মুহূর্তে দাঁড়িয়ে স্বামী বিবেকানন্দের নব উদ্দীপনার হিন্দু-ওজস্বিতা নিঃসন্দেহে বাঙালির জাতীয় চেতনাকে নাড়িয়ে দিয়েছিল, তাকে স্বাবলম্বী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। ভারতের জাতীয়তাবাদী মননের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের হিন্দুধর্মভাবনার সম্পর্কভুক্ত হয়ে পড়াটাই কি উনিশ শতকীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের এক অন্যতম সীমাবদ্ধতা হয়ে পড়ে না? শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণ, '...সেই জাতীয়তাবাদের সঙ্গে তথাকথিত হিন্দুধর্ম অচ্ছেদ্য সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলার দরুন কি নানা আত্মঘাতী স্ববিরোধেরও সৃষ্টি হয়নি—এর জন্য কি আমাদের যথেষ্ট মাসুল গুনতে হয়নি, এখনও হচ্ছে না?' (251)। বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের জাতীয়চেতনায় আসলে ধর্ম একটি মূল বুনিয়াদ। জাতীয়তাবাদ ও ধর্ম একত্র সন্নিবিষ্ট হয়ে এক বিশিষ্ট রূপে প্রচারিত হয়েছিল। এই চেতনায় সমগ্র ভারতবাসীকে একটি সূত্রে বাঁধার ডাক আছে। তাঁরা 'এক জাতি'র সূত্রে বাঁধতে চেয়েছিলেন ভারতবাসীকে; ''শ্রেণী' নয়, 'বর্ণ' নয়, 'লিঙ্গ' নয়, এক ও অদ্বিতীয় 'জাতি'' (S. Bandyopadhyay 253)। এই সূত্রে শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিস্তৃত বিশ্লেষণটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনার স্বরূপ উদঘাটনে এই আলোচনাটি খুব জরুরী। তাঁর মতে, 'মোদ্দা কথা, খণ্ডবৈচিত্র্যের ব্যাপকতা নয়, দরকার সুসংবদ্ধ, কেন্দ্রীভূত ধর্মব্যবস্থা : লোকায়ত নির্মাণের সৎকার ঘটিয়ে, 'অপকৃষ্ট লৌকিক ধর্মের' উচ্ছেদ করে, লোকাচার-দেশাচারের অনর্থক জটিলতা ঘুচিয়ে, বানাতে হবে সুসংহত 'হিন্দুধর্ম', দিতে হবে তাকে প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা—সেই নব্য সমাজসংহিতার প্রণোদনাতেই তৈরি হবে নতুন মাপের, নতুন জাতের সমাজসংহতি' (255)। আর এই সমাজসংহতিকে সত্য করে তুলবে উচ্চবর্গীয় সমাজ। '...মুচি, মেথর... তোমার ভাই'—এই 'তোমার' সম্বোধন নিঃসন্দেহে উচ্চবর্গীয়দের প্রতিই, কারণ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন এই উচ্চবর্গীয় হিন্দু শিক্ষিত সমাজ। স্বামীজির ইতিহাস ও সমাজচেতনাকে ছাপিয়ে গিয়েছিল তাঁর বেদান্তভিত্তিক ধর্মচিন্তা। জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর্যবেক্ষণ, 'তিনি বার বার বলেছেন, সারা দেশে প্রথমে ধর্মের বন্যা বইয়ে দিতে হবে, তারপর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রগতি স্বচ্ছন্দে সৃষ্টি করতে হবে' (69)। বিবেকানন্দের সমাজ গঠনে এই হিন্দুধর্মভিত্তিক চিন্তা নিঃসন্দেহে ভারতের মতো বিবিধ জাত-ধর্মের দেশে খণ্ডিত বলে মনে হয়। বিবেকানন্দের এই 'অখন্ড ভারতীয় জাতি' গঠনের প্রচেষ্টা আসলে সনাতনী হিন্দুধর্মের চিরাচরিত জাতিভেদকে নবতর প্রক্রিয়ায় রক্ষা করে। 'নতুন হিন্দু' গঠনের এক প্রায়োগিক কৌশল হিসেবে গৃহীত হয় অপেক্ষাকৃত উদারবাদী যুক্তিভঙ্গী।

অন্যদিকে উনিশ শতকের গোড়ায় প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য ও হিন্দুদের মাহাত্ম্য প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি ছিল তর্কাতীত। কিন্তু স্বদেশের রূপটি ছিল হিন্দু জাতীয়তা থেকে উদ্ভূত। পরাধীন দেশের দুঃখ দুর্দশা মোচনের চাবিকাঠি যেন 'হিন্দুত্বের উন্মেষ', 'হিন্দু জাতীয়তাবাদের জয়'। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নিরীক্ষণ— 'পরাধীন স্বজাতির কথা বলতে গিয়ে বঙ্কিম যদিও কখনও বলছেন 'বাঙালী', কখনও বলছেন 'ভারতবর্ষীয়', উভয় ক্ষেত্রেই কিন্তু মুসলমান শাসক বিদেশী, আক্রমণকারী' ('ইতিহাসের উত্তরাধিকার' 122)। এই সূত্রে *আনন্দমঠ* উপন্যাসটিকে পরিমার্জনার কাজের মধ্যে বঙ্কিমের জাতীয়তার ভাবটির বিবর্তনকে পর্যবেক্ষণ করেছেন শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বিচার, ১৮৮২ থেকে ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বারবার সংশোধন করার হয় উপন্যাসটি। প্রথম সংস্করণের যেখানে যেখানে ইংরেজ-বিদ্বেষী বিবৃতি ছিল, সেগুলিকে ক্রমে বদল করেন বঙ্কিম। 'অনেক জায়গায় 'ইংরেজ', গোরা' বা 'ব্রিটিশ' কেটে বসান 'মুসলমান', 'যবন', 'নেড়ে', 'বিধর্মী'... কিন্তু সব ক্ষেত্রেই যে বঙ্কিম 'ইংরেজে'র পরিবর্তে 'মুসলমান' লেখেন না, 'যবন' বা 'বিধর্মী' শব্দচয়নের ভেতরে যে সমস্ত অহিন্দুর দিকেই ইঙ্গিত থেকে যায়, এও লক্ষণীয়' (S. Bandyopadhyay 225)। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, বঙ্কিমের স্বদেশচেতনা যে ভীষণরকমভাবে সেই সময়কার হিন্দু পুনরুজ্জীবন ও 'হিন্দুত্বে'র ভাবনার সঙ্গে ওতপ্রোত সম্পর্কযুক্ত ছিল, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

স্বদেশী আমলের খানিক আগে থেকেই হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ শুরু হয়। ক্রমে উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা ও হিন্দু ধর্মীয় চেতনার পাকা জায়গা হয়ে যায়। অমলেন্দু দে লিখছেন— 'উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ধর্ম ও সমাজ জীবনে হিন্দু জাতীয়তাবাদের ও পুনরুজ্জীবনের প্রভাব যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। অনেকেই জাতীয়তাবাদ বলতে হিন্দু জাতীয়তাবাদই মনে করেন। হিন্দুয়ানি ও জাতীয়তা প্রায় সমার্থক হয়ে পড়ে' (150)। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের স্বদেশী আন্দোলন কিংবা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়েও এই হিন্দুধর্মভিত্তিক রাজনীতি চেতনা প্রবল শক্তি ধারণ করেছিল। বাংলায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ভারতে তীব্র রূপ পায় মূলত হিন্দু উচ্চবর্গীয় জনগোষ্ঠীর হাত ধরে। এই আন্দোলন প্রেরণা ও ব্যবহারিক দিক থেকে সর্বতভাবে হিন্দু ধর্মের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (J. Banerjee 36)। তপোধীর ভট্টাচার্য বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে মুসলমানদের অংশগ্রহণ করা নিয়ে আলোচনায় এক জায়গায় বলছেন, '১৯০৫-এর ২৩শে সেপ্টেম্বর ছিল মহালয়া; সেদিন ঝড়বৃষ্টি উপেক্ষা করে হাজার হাজার মানুষ কালীঘাটে পুজো দিয়ে দেশমাতার অঙ্গহানি প্রতিরোধ করতে সংকল্পবদ্ধ হয়েছিল।

অজস্র কীর্তনের দল কলকাতার রাজপথে বেরিয়েছিল, অনেকে গাইছিল বন্দেমাতরম্ গান। ধর্মীয় ভাবাবেগের সঙ্গে দেশ-চেতনার এমন সমন্বয় হয়তো অভিনব; কিন্তু এতে যে মুসলমানদের দূরে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে—বিহ্বলতার মুহূর্তে কেউ মনে রাখেননি' (119)।

নাট্যজগতে জাতীয়তাভাবের সূচনা

ইংরেজ শাসনে থাকা বাঙালি নাট্যমোদীদের মধ্যে দেশীয় ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে 'আধুনিক' দেশহিতবাদী ভাবনার ইঙ্গিত উনিশ শতকে নতুন নয়। একটু পেছনে তাকিয়ে দেখা যাক। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ। *ওরিয়েন্টাল থিয়েটার*। প্রিয়নাথ দত্ত, দীননাথ ঘোষ, কেশব গাঙ্গুলি নামের কিছু বাঙালি ছাত্রের উদ্যোগে আর সাহেবপাড়ার নাট্যবিশারদের মি. ক্লিঙ্গারের তত্ত্বাবধানে এই নাট্যশালা শুরু হয়। একের পর এক ইংরেজি নাটকই হতে থাকে সেখানে। মধুসূদন দত্তের জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখছেন, 'কিন্তু, নানা কারণে, ইহার অনুষ্ঠাতৃগণ বাঙ্গালা নাটকের অভিনয় সুবিধাজনক মনে না করায়, তথায় কোন বাঙ্গালা নাটক অভিনীত হয় নাই' (151)। মাত্র একবারই এই নাট্যশালার দুই অভিনেতার উদ্যোগে বাংলা নাটক *কুলীনকুলসর্বস্ব* অভিনীত হয়। এরপর কোন্ ভাষায় অভিনয় হবে সেই নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। ফলে নাট্যশালা উঠে যায়। বিষ্ণু বসু লিখছেন— 'মনে হয় উদ্যোক্তাদের মধ্যেই মতান্তর শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং মতান্তরের কারণ এ থিয়েটারে কোন ভাষার নাটক অভিনীত হবে—বাংলা না ইংরেজি—তাই নিয়েই গোলমাল বেঁধে গিয়েছিল' (*Babu Theatre* 44)। *বেলগাছিয়া নাট্যশালা*-র স্বত্ত্বাধিকারী ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ তৎকালীন বিখ্যাত অভিনেতা ও নাট্যপ্রশিক্ষক কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলিকে একটি চিঠি লেখেন। সেই চিঠিতে এই বক্তব্যের প্রমাণ পাওয়া যায়:

> My Dear Keshub,
>
> ...three or four years ago when you all quarreled with the proprietor of The Oriental Theatre Seminary we all proposed to have a native drama written out and acted; and such was our earnestness in the cause that we all asked you to select and hire a site, and a native gentleman was asked either for the loan or hire of his premises. Somehow or other the subject dropped here and was never thought of more till a year and half ago, when we found some youngsters getting up a

> representation of a native drama. .... Rutnaballee was fixed upon as the best drama ... that our Sanskrit could boast of. (J. Basu 155)

ইংরেজি ভাষায় নাটক করার বিরোধিতা করে দল ভাঙ্গেন কেশবচন্দ্ররা। কয়েক বছর অপেক্ষা করে ঠিক করলেন অন্য ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে আটক করবেন তাঁরা। বেছে নিলেন সংস্কৃত নাটক *রত্নাবলী*। সুবীর রায়চৌধুরীর মন্তব্য, 'যতোদিন পর্যন্ত বাংলা রঙ্গালয়ের অনুকরণের যুগ ছিলো, ততোদিন পর্যন্ত সমস্যাটি স্পষ্ট হয়নি। আমরা ইংরেজিতে 'সেক্ষপীরে'র নাটক করেই পরিতৃপ্ত ছিলাম। কিন্তু যখন মাতৃভাষায় নাটক-অভিনয়ের তাগিদ অনুভব করলাম, তখন কোন্ নাটক আমরা গ্রহণ করলাম?—প্রধানত সংস্কৃত নাটক' (31)।বাংলা নাটক করতে হলে মূলত সংস্কৃত নাটককেই গ্রহণ করার মধ্যে থেকে কী প্রবণতা দেখা যায়? সেই প্রাচীনের মধ্যে থেকেই সমকালীনের গৌরব খুঁড়ে বের করার প্রবণতা। ঔপনিবেশিক শাসনের পদানত থেকে প্রাচীন হিন্দু সাহিত্যকে নির্ভর করে নিজ গরিমা খুঁজে পাওয়ার এক ঐকান্তিক প্রয়াস।

এর কিছুকাল পরে নানান ঘটনার বাধ্যতায় ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ *বেলগাছিয়া নাট্যশালায়* কিছু ইংরেজি প্রহসন (*Princes for an hour, Power and Principle, Fast train, high pressure, express*) অভিনয় করার প্রস্তুতি শুরু করেন। কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলি মধুসূদন দত্তের স্মৃতিকথায় এই সূত্রে লিখছেন:

> ...Raja I. C. Sing made every preparation for having some English farces acted on the boards of the Belgachia Theatre and rehearsals actually commenced. ... Babu (now Maharaja Bahadur Sir) Joteendra Mohun Tagore was all along opposed to the acting of English plays or farces on the boards of a Bengalee Theatre. (J. Basu 491)

ঔপনিবেশিক সময়ে শাসকের ভাষাকে বাংলা মঞ্চে ঢুকতে না দেওয়ার মানসিকতা শুরু হয়েছিল সেই সময় থেকেই, অর্থাৎ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগের গোড়া থেকেই। বাংলা ভাষায় থিয়েটার করার প্রস্তাব উঠছে পত্রিকাতেও। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করছেন ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখের *হিন্দু পেট্রিয়টের* একটি মন্তব্য। 'সেই সময় বোম্বাইয়ের গ্রান্ট রোড থিয়েটারে দেশীয় ভাষায় অভিনয় হইতেছিল। 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-সম্পাদক কলিকাতাতেও যাহাতে বাংলা নাটকের অভিনয় হয়, সে জন্য ওরিয়েন্টাল থিয়েটারের কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে অনুরোধ

করিয়াছি' (*Bangiya Natyashalar Itihas* 31)। ১৮৫৭ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখের *সমাচার চন্দ্রিকা* কাগজেও বাংলা ভাষায় *শকুন্তলা* নাটকের মঞ্চাভিনয় প্রসঙ্গে আলোচনায় লিখেছে:

> ...এক্ষণকার ছাত্রদিগের ইংরেজী নাটকের প্রতি যাদৃশী শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে তাহার কণামাত্রও কি সংস্কৃত কি বাঙ্গালা কোন নাটকের প্রতিই নাই, প্রতি বৎসর প্রসিদ্ধ ইংরেজী কবি সেকস্‌পীয়র নাট্যক্রীড়া ইস্কুলের ছাত্রেরা প্রায় করিয়া থাকেন কিন্তু কেহ এরূপ বাঙ্গালায় নাট্যক্রীড়ার চেষ্টা করেন নাই, সাহেবরা কি কখন বাঙ্গালা কি সংস্কৃত সুমধুর রস পূরিত নাটকের ক্রীড়া করিয়া থাকেন, তবে বাঙালি বাবুরা স্বজাতীয় ভাষায় নাট্যক্রীড়া করিয়া কেন ইংরেজদিগের অনুগামী হন না, ইহাতে এই উপলব্ধি হয় ইয়ং বাঙ্গালবাবু সাহেবেরা নিশ্চয় করিয়াছেন আমারদিগের বাঙ্গালির কোন শাস্ত্রাদিতে পারমার্থিক রস ঘটিত কিছুই নাই যাহা আছে ইংরেজীতেই আছে... অতএব বিশিষ্ট শিষ্ট হিন্দু সন্তানেরা যদ্যপি কিঞ্চিত নিবিষ্ট হইয়া সংস্কৃত শাস্ত্রের অন্তর্গত নাটকাদি অনুপম শাস্ত্র দৃষ্টি করেন তাহার কি পর্য্যন্ত রসমাধুর্য্য আস্বাদে আশ্চর্য্য হইবেন অতএব আমরা বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষকে ধন্যবাদ করিতেছি যে স্বজাতীয় আমোদে রসাস্বাদন গৃহীতা হইয়াছেন।

সমাচার চন্দ্রিকার এই রিপোর্টেও সেই একই প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। দেশীয় ভাষায় দেশীয় নাটক করার জন্য সংস্কৃত নাটককে বেছে নেওয়ার কথাই বলা হচ্ছে। এবং 'দেশ' বা 'স্বজাতীয়'তার ভাবনায় ব্যাপৃত হয়ে আছে 'হিন্দুত্ব'। নাট্যবিষয় থেকে শুরু করে 'শিষ্ট' নাট্যকর্মীদের কর্তব্য নির্ধারণে লেখক অকপট নির্দ্বিধায় 'হিন্দুজাতির' ভাবনাতেই নিমজ্জিত।

নাটক *রিজিয়া* লেখার সময়ে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মধুসূদনের বচসাটিও এই সূত্রে মূল্যবান (M. Dutta 88)। সম্রাট আলটামাসের দুহিতা সুলতানা রিজিয়াকে নিয়ে মধুসূদন দত্ত বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনয়ের আশায় একটি নাটক লেখা শুরু করেছিলেন। কিন্তু সেই নাট্যশালার নাট্যাধ্যক্ষ কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলি মহারাজা যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নাট্যালয়ের সত্ত্বাধিকারী ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ এই নাটকটি সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহিত হননি। কারণ হিসেবে কেশব তাঁর চিঠিতে লেখেন:

> My Dear Dutt,
>
> ...Baboo Jotindra thinks, and the Raja (Iswarchandra Singha) seems to participate in the opinion, that Mahomedan names will not perhaps hear well in a Bengalee Drama,

and they doubt whether an experiment of doubtful success,....Can't we cull out a subject from the history of the Rajputs? I believe the field is pretty extensive and may yield innumerable hints for the imagination of a writer like yourself

Your affectionately,

Keshob Chandra Ganguly. (J. Basu 302)

কেশবের কথা মেনে নিলেন মধু। ১৮২৯-৩২ খ্রিস্টাব্দে লেখা কর্ণেল জেমস টডের *The Annals and Antiquities of Rajasthan* বইটি পড়ে ফেললেন। কিছুটা ইতিহাস আর বেশিরভাগটাই চারণকবিদের গাথা ও সঙ্গীত আর নানান অলৌকিক কাহিনিকে ভিত্তি করে টড এই বইটি লেখেন। এই বইটির মূল বক্তব্য ছিল, রাজপুতরা পরাজিত হলেও বীর এবং ধার্মিক, অন্যদিকে মুসলমান শাসকরা ছিলেন অত্যাচারী এবং অধার্মিক। মধুসূদন এই কাহিনি পড়ে লিখে ফেললেন রাজস্থানের হিন্দু ইতিহাস অবলম্বনে নাটক *কৃষ্ণকুমারী*। 'মহমেডান' রিজিয়াকে সরিয়ে রেখে মধুসূদন বাধ্য হয়ে গ্রহণ করলেন 'হিন্দু' কৃষ্ণকুমারীকে। কিন্তু ভুললেন না *রিজিয়া*-র কথা। চিঠি লিখলেন কেশবকে:

My dear Gangooly,

...We ought to take up Indo-mussulman subjects. The Mahomedans are a fiercer race than ourselves, and would afford splendid opportunity for the display of passion. Their women are more cut out for intrigue than ours.... we must look to 'Rizia". — I hope that will be a drama after your own heart! The prejudice against Moslem names must be given up. (J. Basu 322)

মধুসূদনের স্মৃতিকথাতে কেশব লিখলেন, 'Even after his return from England in 1867, he talked to me of 'Rizia' and Rizia' only, but he did not live to write it' (J. Basu 492)।

মুসলমান সমাজ ও চরিত্র নিয়ে এই ভারতবর্ষে প্রথম নাটক লেখার সাহস দেখান মধুসূদন দত্ত (Lal 85)। পর্দা ও জেনানার প্রভূত প্রচলন রয়েছে যে ভারতীয় সমাজে, তার মাঝে দাঁড়িয়ে একজন মুসলমান মহিলা চরিত্রকে কেন্দ্রীয় স্থান দিয়ে নাটকটিকে বুনেছিলেন দত্ত। পুরুষের সমান সুলতানের আসনে বসেছিলেন রিজিয়া,

ভালোবেসেছিলেন নিম্নবর্গের এক ক্রীতদাসকে। অভিজাত বাঙালি নাট্য নেতৃত্ব মধুসূদনের এই উদ্যোগকে গ্রহণ করতে পারেননি। আনন্দলাল লিখছেন, 'Dutt consciously made her a fourfold 'captive ladie': as a woman, a Muslim for 19th century Indian audiences, one who assumed power above her gender role, and one who loved below her socio-racial station' (85)। মুসলমান নারীর এই শক্তিশালী অবস্থান কঠোর ভাবে বাতিল করেছিলেন জমিদারগোষ্ঠী। নিজেদের দেশীয় পরম্পরার বাইরে বেরিয়ে বিধর্মীয় *রিজিয়া*-কে গ্রাহ্য করার প্রয়োজন মনে করেননি তাঁরা।

অর্থাৎ, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কাঠামোয় নাট্যমোদী বাঙালি স্বনির্ভর হওয়ার প্রচেষ্টা শুরু করেছে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই। কিন্তু সমস্যা হল সেই দেশীয় নিজস্বতার গঠনটি ঠিক কেমন হবে সেটি নিয়ে স্পষ্ট ধারণা কিছু গড়ে ওঠেনি। মোটামুটি দেখা যাচ্ছে, নাট্য সমাজের কাণ্ডারিরা হিন্দু উচ্চবিত্ত শ্রেণিভুক্ত। হিন্দু জাতির আত্মগরিমা খুঁজে বের করতে তারা সংস্কৃত সাহিত্যের ওপর নির্ভরশীল। রিমলি ভট্টাচার্যের মতে, 'Their productions of classical pieces which were intended to set up new or modern Indian aesthetic models, were also aimed at constructing a 'Hindu' identity... to establish 'real' Hindu culture as opposed to the popular culture of the streets and of the jatra' (*My Story and My life as an Actress* 7)।

সাহিত্য-আশ্রয়ী, ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক নাটকের গুপ্তবেশ

উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে বিশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত সময়ে বাংলায় প্রভূত ঐতিহাসিক নাটক লেখার প্রচলন ঘটে। ঐতিহাসিক নাটক কী, বাংলায় প্রচলিত নাটকগুলিকে ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে আদৌ শ্রেণিভুক্ত করা যায় কিনা, নাকি সেগুলিকে ইতিহাসভিত্তিক রাজনৈতিক নাটক বললেই যথাযথ হয়, সেসব আলোচনা পরে করা যাবে। মূল কথা হল, বাংলা তথা কলকাতায় সহসা প্রচলিত ঐতিহাসিক নাটকগুলিও বাংলা নাট্য ইতিহাস রচনার ইতিহাস বিশ্লেষণে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই নাটকগুলি এক আধারে বিবিধ রাজনৈতিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক বৈপরীত্য ধারণ করে। ইতিহাসের রাজারাণীর সাধারণ দিগ্‌বিজয়ী আখ্যানের থেকেও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে নাটকগুলির মধ্যেকার নীতিগত পারস্পরিক সংঘাত, ঔপনিবেশিক টানাপোড়েন ও সামাজিক-রাজনৈতিক বিচিত্রতা।

বাংলা রঙ্গমঞ্চে এই ঐতিহাসিক নাটকের প্রচলনের পথটি ঠিক সরাসরি আসেনি। অনুবাদ নাটক, মৌলিক নাটক ও সাহিত্যভিত্তিক নাটকের পথ বেয়ে কীভাবে নাট্যমঞ্চে জায়গা করে নিল ঐতিহাসিক নাটক এবং কীভাবে তার মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার মিশ্রণ ঘটতে থাকল, সংক্ষেপে সে বিষয়ে আলোচনা করা দরকার। সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রতিষ্ঠার গোড়ার দিক থেকেই মৌলিক নাটক ও অনুবাদ নাটকের পাশাপাশি বাংলা রঙ্গমঞ্চে জায়গা করে নিয়েছিল সাহিত্যের নাট্যরূপ। বাঙালির নাট্যচর্চার শুরু থেকেই মাইকেল-দীনবন্ধু-গিরিশের মৌলিক নাটকের যথেষ্ট জনপ্রিয়তা এসেছিল। কিন্তু বাঙালি ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান নাট্যচর্চার চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রচুর পরিমাণে নতুন নতুন মৌলিক নাটকের জোগান পাওয়া হয়ে গেছিল অত্যন্ত দুষ্কর। সীমিত কিছু নাট্যকারের নাট্যরচনাগুলি চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট ছিল না। নাট্যচর্চার শুরুর সময় থেকেই ইংরেজি বা সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করে অভিনয় হয়েছিল। ১৮৩১ সালে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের *হিন্দু থিয়েটারের* পথ চলা শুরু ইংরেজি শেক্সপীয়ারের *জুলিয়াস সীজার* ও সংস্কৃত ভবভূতির নাটক *উত্তররামচরিত*-এর ইংরেজি অনুবাদের অভিনয়ের মাধ্যমে। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে নবীন বসু প্রথম বাংলায় নাট্য প্রযোজনা শুরু করেন *বিদ্যাসুন্দর*-এর অনুবাদের মধ্যে দিয়ে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে একটা নতুন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেল। ১৮৫৭ সাল থেকে কলকাতায় একসঙ্গে পর পর অনেকগুলি বাংলা নাটকের অভিনয়ের উদ্যোগ নেওয়া হতে লাগল (B. Banerjee *Bangiya Natyashalar Itihas* 28)। এরপর থেকে বাঙালি নাট্যমোদী মানুষদের নাট্যচর্চার মাধ্যম হয়ে উঠল একের পর এক বাংলা নাটকের অভিনয়। *অভিজ্ঞান শকুন্তলা, প্রবোধচন্দ্রোদয়, আত্মতত্ত্ব কৌমুদী*—একের পর এক বাংলা ভাষায় নাটক অভিনয় হতে থাকে। এরপরের পর্যায়ে বঙ্গ নাট্যশালার জন্য লিখিত হতে থাকে কিছু মৌলিক নাটক। এই সূত্রে অবশ্যই মধুসূদন দত্তের *শর্মিষ্ঠা, একেই কি বলে সভ্যতা* বা *কৃষ্ণকুমারী*, রামনারায়ণ তর্করত্নের *কুলীন কুলসর্বস্ব, মালিনীমাধব* বা *নবনাটক*, উমেশচন্দ্র মিত্রের *বিধবা বিবাহ* নাটক বা দীনবন্ধু মিত্রের *সধবার একাদশী* বা *নীলদর্পণ*-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

আর তারপরেই বিপুল সংখ্যায় নাট্য জোগানের স্বার্থে ক্রমশ মৌলিক নাটকের পাশাপাশি সাহিত্য থেকে নাট্যরূপান্তরের পরিকল্পনা নেওয়া শুরু হয়। এই সময় বাংলা রঙ্গমঞ্চে একটার পর একটা গল্প বা উপন্যাস থেকে নাট্যরূপ দিয়ে সেই নাট্যরূপের মঞ্চায়নের রীতি প্রচলিত হয়। এই সূত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাসের নাট্যরূপান্তরগুলি। বঙ্কিমের একটার পর একটা জনপ্রিয় উপন্যাসের নাট্যরূপ বংলা

রঙ্গমঞ্চের এক নতুন জোয়ার এনেছিল। কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ্য। ১৮৭৩ সালে *ন্যাশনাল থিয়েটারে* হচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্রের *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসের নাট্যরূপ। ওই বছরেই ডিসেম্বরে *বেঙ্গল থিয়েটারে* হচ্ছে *দুর্গেশনন্দিনী*। ১৮৭৪-এর *ন্যাশনাল থিয়েটার* আবার মঞ্চস্থ হচ্ছে বঙ্কিমের উপন্যাস, এবং এ বার নেওয়া হচ্ছে *মৃণালিনী*। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমের *রজনী* ও *সীতারাম* উপন্যাস দুইটি মঞ্চস্থ হচ্ছে *রয়্যাল বেঙ্গল থিয়েটারে* এবং ১৮৯৭-তে সেখানেই প্রযোজিত হচ্ছে *দেবী চৌধুরাণি*। ১৮৯৯-এ *ক্লাসিক থিয়েটারে* অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রযোজনা করছেন *কৃষ্ণকান্তের উইল* উপন্যাসের নাট্যরূপ *ভ্রমর*। অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল নাটকটি।

বঙ্কিমের উপন্যাসগুলোর সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চস্থ হতে থাকে রমেশচন্দ্র দত্তের বিখ্যাত কিছু উপন্যাসের নাট্যরূপও। ১৮৭৯ সালের সময় থেকে *ন্যাশনাল থিয়েটারে* মঞ্চস্থ হতে থাকল *বঙ্গ বিজেতা*, *মাধবী কংকন*-এর মতো উপন্যাসাশ্রয়ী নাটকগুলো। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯০৮-এ নাট্যরূপ দেন রমেশচন্দ্রের *জীবন সন্ধ্যা*। এর পাশাপাশি অমৃতলাল বসু নতুন ধরনের কিছু উপন্যাসের নাট্যরূপ দেওয়া শুরু করলেন। থিয়েটারকে বাঁচানোর জন্য তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা রমেশচন্দ্র দত্তের মতো রোমান্টিক বা ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুকে বাদ দিয়ে সাধারণ সামাজিক বিষয় কেন্দ্রিক একটি উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন। এর জন্য তিনি তারকনাথ গাঙ্গুলির *স্বর্ণলতা* উপন্যাসটিকে বেছে নেন। উপন্যাসের নায়িকার নামে সেই নাটকটির নাম দেওয়া হয় *সরলা*। স্টার থিয়েটার থেকে ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে নাটকটি মঞ্চস্থ হয় এবং ভীষণ রকম জনপ্রিয়তা পায় এই নাটকটি।

কিছু বছর পরেই বাংলা মঞ্চে জায়গা করে নিচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। *বউ ঠাকুরানির হাট* উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে *রাজা বসন্তরায়* নাটক ১৮৮৬-তে *গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে* (S. Mukherjee 544) অথবা *চোখের বালি* উপন্যাসের নাট্যরূপ দিচ্ছেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে। অর্থাৎ থিয়েটারের প্রথম যুগেই বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য হয়ে উঠছে বাংলা নাটমঞ্চের এক অন্যতম মূল সহায়। বিশ শতকের প্রথম অর্ধে সাহিত্য থেকে নাট্যরূপ দিয়ে প্রযোজনা করার রীতিটি আরও জনপ্রিয় হতে দেখা হচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের পাশাপাশি বাংলা রঙ্গমঞ্চে জায়গা করে নিচ্ছেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে স্টার থিয়েটারে অভিনীত হচ্ছে *বিরাজ বৌ*। *পল্লীসমাজ* উপন্যাস থেকে নাট্যরূপান্তর হচ্ছে *রমা* নামে, *দেনাপাওনা* মঞ্চস্থ হচ্ছে *ষোড়শী* নামে।

এইভাবে নানা বিষয়বস্তুর নাটককে নাট্যমঞ্চে স্থান দেওয়ার পর বাংলা দর্শকের সামনে উনিশ শতকের একেবারে শেষ লগ্নে পরিবেশিত হতে শুরু করেছিল ইতিহাস-আশ্রয়ী নাটকগুলি। এই সূত্রে উল্লেখ্য, ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে

নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের কঠিন ফাঁসে আটকে পড়েছিল বাংলা থিয়েটারের শাসকবিরোধী কণ্ঠস্বর। বাংলা নাটকের জেহাদী উদ্যম অতি অনায়াসে বিহ্বল হয়ে পড়ল। শাসকের সমালোচনাকারী নাটক, নাট্যকার, নাট্যপ্রযোজক, এমনকি প্রেক্ষাগৃহের অধিকারী, সেই নাটকের দর্শক—সকলেই এই আইনের আওতায় পড়ল। ব্রিটিশ রাজের ভাবমুর্তি খণ্ডনের কোনো রকম প্রচেষ্টা করলেই তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হবে, এই ছিল আইনের উদ্দেশ্য। বিপ্লবী যাত্রা এবং সংগ্রামী থিয়েটারকে অবরুদ্ধ করার জন্য লাগু হল কঠিন এই আইন। নিস্তার দেওয়া হল শুধু ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানে আয়োজিত যাত্রা বা সেইরূপ সাংস্কৃতিক আসরগুলোকে। দেবমহিমা কেন্দ্রিক যাত্রাপালা ও পার্ফর্মেন্স-গুলো সরকারের চোখে নির্বিষ নিরুপদ্রব নির্ঝঞ্ঝাট অনুষ্ঠান হিসেবে গৃহীত হল। বাকি সব রাজনৈতিক বা সামাজিক নাটক ও পালাগুলো সরকারের চক্ষুশূল হয়ে রইল। আইনের ১২ নম্বর সেকশনে EXCLUSION OF PERFORMANCE AT RELIGION FESTIVALS অংশে লেখা হল, 'NOTHING IN THIS ACT APPLIES TO ANY JATRAS OR PERFORMANCES OF A LIKE KIND AT RELIGIOUS FESTIVALS' (B. Mukhopadhyay 667)। অর্থাৎ ধর্মীয় উৎসবে আয়োজিত কোনো যাত্রা বা সেইরকম অনুষ্ঠানের ওপর এই আইন প্রযোজ্য হবে না।

আইনের এই অংশটিকে ব্যবহার করল বাংলা নাট্যশালা। ধর্মীয় যাত্রা বা সেইরকম অনুষ্ঠানকে আইনের আওতার বাইরে রাখার সুযোগ নিল বাংলা থিয়েটার মহল। ধর্মীয় নাটক প্রযোজনা করে, ভক্তিরসের যোগান দিয়ে জনগণকে পরিতৃপ্ত করার কাজে লেগে পড়ল।*চৈতন্যলীলা* (১৮৯৪), *বিল্বমঙ্গল কাব্য* (১৮৮৮), *অভিমন্যুবধ* (১৮৮১), *জনা* (১৮৯৪), *পাণ্ডব গৌরব* (১৯০০) পর পর অসংখ্য পৌরাণিক ধর্মীয় নাটকের প্রযোজনা হতে থাকল মঞ্চে। থিয়েটার ও থিয়েটারের দর্শক সরকারের কাজের প্রতি উদাসীন হয়ে রইল। ব্রিটিশ রাজের প্রতি তারা যেন নির্বিকার! সমসাময়িক রাজনীতির ব্যাপারে তারা যেন নিস্পৃহ! বস্তুজগতের তুচ্ছ দিনলিপি নিয়ে তারা যেন নির্লিপ্ত! সমস্যা উৎপাদনকারী বিদ্রোহী থিয়েটারি আমেজ নিশ্চিহ্ন হয়েছে। ধর্মভীরু অলৌকিক যাপনে তারা অনুরক্ত!

'রাজনীতিহীনতা'র রাজনীতিকে বেছে নিল বাংলা থিয়েটার জগত। ইংরেজ সরকারের শাসননীতির ব্যাপারে নিরপেক্ষ অবস্থানকে বেছে নিয়ে অস্তিত্ব রক্ষা করতে চাইল থিয়েটার। উনিশ শতকের শেষ ভাগে অসংখ্য ধর্মীয় পৌরাণিক নাটকের ভক্তিরসে গা ভাসিয়ে চলতে থাকল নাট্যস্রোত। এই নিরপেক্ষ রাজনীতির, বা বলা ভালো রাজনীতি এড়িয়ে চলার রাজনীতির ধারাটি আরো পরবর্তীকাল অবধি বয়ে নিয়ে যাওয়ার সহায়ক হয়ে উঠল বাংলা ইতিহাস-আশ্রয়ীও সাহিত্য-আশ্রয়ী নাটকগুলি।

মূলত উনিশ শতকের একেবারে শেষভাগ থেকে শুরু হল বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের জয়যাত্রা। এই সময়ে লেখা নাটকগুলোতে কতটা প্রাচীন ইতিহাস অনুসৃত হয়েছে, কতটা সমসাময়িক সমাজ প্রতিফলিত হয়েছে, কতটা দর্শকের বিনোদন সম্পন্ন হয়েছে, সে বিশ্লেষণ অত্যন্ত জরুরী। নাট্যতত্ত্বগ্রন্থে এই নাটকগুলিকে 'ঐতিহাসিক নাটক' হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়ে থাকে। এমনকি বাংলা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস এই নাটকগুলিকে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে শক্তিশালী সংগ্রামী নাটক হিসেবেও বর্ণনা করেছে। এই নাটকগুলিকে নাকি রীতিমত ভয় পেয়েছিল ব্রিটিশ সরকার, এমনটাই দাবী করে ইতিহাস। কিন্তু সত্যি কি এই নাটকগুলি সমসাময়িক জাতীয়তাবোধের উষ্ণতায় জারিত হয়েছিল? নাকি এগুলি ছিল শুধুমাত্র প্রাচীন সম্রাটের বীর্যকাহিনী? বা ইতিহাসের রাজারাণির প্রেমকাহিনি? নাকি তার অন্তরালে আছে গভীর কোনো সমসাময়িক রাজনীতি? নাট্য জগতের পেশাদারি চরিত্রটাকে অক্ষত রাখতে কি কোনো রাজনীতির বা রাজনীতিহীনতার অবয়ব নিয়েছিল বাংলা থিয়েটার? পরোক্ষ রাজনীতি। লুক্কায়িত রাজনীতি। প্রশ্ন এসে যায়, কোনোভাবে হিন্দু জাতীয়তাবাদী রাজনীতির রঙ কি ছড়িয়ে পড়ে না কি এই ঐতিহাসিক নাট্য বিন্যাসগুলির মধ্যে দিয়ে? বিষয়টা বিস্তৃত আলোচনা দরকার।

নাট্যক্ষেত্রে হিন্দু-চেতনা

শুধু রাষ্ট্রনীতি তত্ত্বে বা সাহিত্য আসরে বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ নয় বা রাজনীতি ক্ষেত্রে তিলক নয় বা ধর্মালোচনায় দয়ানন্দ বা বিবেকানন্দ নয়—তৎকালীন বাংলা থিয়েটার মহলের মূল ঝোঁকগুলিকেও এই পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষ্য করা দরকার। বাংলা থিয়েটার কর্মের জাতীয়তাবাদী লক্ষণগুলো বিশ্লেষণ করলে, মূলত ঐতিহাসিক নাটকগুলির বিষয়বস্তু আলোচনা করলে, নাট্যকর্মীদের সেই সময়কার রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি গভীরে যাচাই করলে বঙ্কিম বা তিলকের নির্ধারিত 'হিন্দুত্বের' ধারণাটি তাঁদের কাজ ও মননে কী রূপ ধারণ করেছিল, সেটি আন্দাজ করা সম্ভব। নাট্য ইতিহাসের বিকল্প বিশ্লেষণের আলোচনায় তৎকালীন নাট্যকর্মীদের হিন্দুত্ব বিষয়ক ঝোঁকটিকে বিশেষভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়।

বিশেষ করে উনিশ ও বিশ শতকের গোড়ার দিকের সমগ্র বাংলা নাট্য ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করলে হাতে-গোনা কয়েকজন মাত্র মুসলমান বা অন্যান্য অ-হিন্দু নাট্যকর্মীর নাম পাওয়া যায়। এই বিষয়টিও আমাদের ইতিহাসভাবনাকে প্রভাবিত করেছে বলে মনে হয়। আজকের পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের নাট্যকর্মীদের মধ্যে অসংখ্য মুসলমান নাট্যকর্মীর উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। আধুনিক বাংলাদেশের বাংলা থিয়েটার জগতের বিশ্ববন্দিত সাফল্যটিকে

ভাবনায় আনলে তার ঐতিহাসিক সূত্রটি সম্পর্কে সন্দিহান হতেই হয়। 'বাংলা থিয়েটার'-এর শুরু থেকে দেশভাগের আগে পর্যন্ত অতিসীমিত সংখ্যক অ-হিন্দু মানুষদের নাম পাওয়া যায়। অথচ আজকের পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের নাট্যজগতের এত সমৃদ্ধি নিঃসন্দেহে বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস রচনার বিষয়ে অনেক প্রশ্ন তুলতে পারে।

কলকাতা ছিল অসংখ্য জাতিগোষ্ঠীর মানুষের শহর। এর মাঝে থিয়েটারের মতো একটি শক্তিশালী মাধ্যমে অ-হিন্দুদের কোনো অংশগ্রহণ কি একেবারেই ছিল না? রিমলি ভট্টাচার্যের অনুমান, সম্ভবত অনেক মুসলমান মেয়েরা কাজ পাওয়ার জন্য হিন্দু নাম নিয়ে নাট্যজগতে যুক্ত হতেন। ফলে মুছে যেত তাঁদের প্রকৃত অস্তিত্ব। ইতিহাসে স্থান পেত না তাঁর ধর্মীয় পরিচয়টি। এমনকি, প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ উস্তাদ আলাউদ্দিন খান (১৮৬২-১৯৭২) কলকাতায় এসে সাধারণ রঙ্গালয়ে বাঁশি, বেহালা, তবলা বাজাতেন। সেই সময়ে তিনি মিনার্ভা থিয়েটারে কাজ পাওয়াকালীন হিন্দু নাম নেন। একইরকমভাবে, পাশ্চাত্য বা খ্রিস্টান নামধারী মেয়েদের নামগুলিও আমাদের নাট্য-ইতিহাসচর্চার জাতীয়তাবাদী রূপটিকে প্রকট করে। রিমলি ভট্টাচার্য উদাহরণ হিসেবে বলছেন, '... Rosy, who acted in *Babar Shah* (1917), is only mentioned as a 'certain foreign beauty used to attract an audience'' (*Public Women* 87)। সম্ভবত নাটকের পোশাক, মঞ্চসজ্জা ও নানান কারিগরী ক্ষেত্রে এই মুসলমান বা অন্যান্য অ-হিন্দু কর্মীদের যথেষ্ট উপস্থিতি ছিল। প্রশ্ন আসে, বাংলা থিয়েটারের আধুনিক ইতিহাস এই সমস্ত 'অ-হিন্দু' নামগুলির ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করতে না পারলে, সেই গতানুগতিক ধারায় জাতি-বর্ণ-ধর্মের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ থেকে যাওয়ার ঝুঁকি বহন করবে না কি?

অ-হিন্দু, মূলত মুসলমান জাতিকে নিশ্চুপ করে দেওয়ার প্রক্রিয়াটি নাট্য জগতের অন্যান্য ক্ষেত্রেও লক্ষ্যণীয়। বিশেষ করে, বিশ শতকের গোড়ার দিকে নাটকের বিষয় বাছাইয়ের মধ্যে দিয়েই এই খণ্ড-জাতীয়তাবাদী ভাবনাটি প্রকটিত হয়ে ওঠে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কয়েক বছর আগে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ লেখেন *প্রতাপ-আদিত্য* নাটক। ষোড়শ শতকের রাজা প্রতাপাদিত্য মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্রতী হন। মোগল রণবাহিনীর বিরুদ্ধে বাংলার এই হিন্দু রাজার নির্ভীক লড়াই ও পরাজয় নিয়ে উনিশ শতকীয় বাঙালী সমাজে বেশ কিছু সাহিত্য চর্চা শুরু হয়। যেমন রবীন্দ্রনাথের লেখা উপন্যাস *বৌঠাকুরাণীর হাট*, রামরাম বসুর লেখা *প্রতাপাদিত্য চরিত্র* ইত্যাদি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে যে জাতীয় ভাবাবেগের চর্চা শুরু হয়েছিল, সেই সময়কার প্রথম নাটক *প্রতাপ-আদিত্য*। বাংলার জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগের এক প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রতাপাদিত্য চরিত্রটি। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে

বাঙালী জাতীয় বীরের সন্ধানে 'শিবাজী উৎসবে'র আদলে 'প্রতাপাদিত্য উৎসব' শুরু করেছিলেন সরলা দেবী চৌধুরাণী এই প্রতাপাদিত্যের নামেই। তিলকের 'শিবাজী উৎসব'-এর মতোই রাজা প্রতাপাদিত্য হয়ে উঠেছিলেন সমসাময়িক হিন্দুদের প্রতিনিধি আর পরাজিত মুঘলরা হয়ে গেল মুসলমানদের প্রতিনিধি। (এই সময়ে থেকেই সরলা দেবীর সঙ্গে তাঁর মামা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বিরোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পথে নেমে প্রকাশ্যে মেয়েদের রাজনীতিতে অংশ নেওয়া রবীন্দ্রনাথের পছন্দ ছিল না।) সরলা দেবীর এই জাতীয় বীরের খোঁজ করার প্রচেষ্টা বাংলা বুদ্ধিজীবী মহলেরর সর্বত্র আলোচিত ছিল। নতুন ভাবধারায় স্ফুরিত বাঙালি তথা দেশবাসীর আধুনিক জাতীয় বীরের রূপটি কেমন হবে, তার কর্মধারা কেমন হবে, তার শরীর মনের প্রকৃতি কেমন হওয়া উচিৎ, তার নৈতিক চরিত্র কেমন হবে, তার সামাজিক কর্তব্য কী হবে, তাই নিয়ে গোটা শিক্ষিত সম্প্রদায় ভাবনা শুরু করে। এই প্রসঙ্গে জাহিরুল হাসান লিখছেন, '...জাতীয়তার নির্মাণে হিন্দু রাজাদের সাহসী বীর হিসেবে চিত্রিত করতে চেয়েছিলেন এবং মুসলমান রাজাদের দেখিয়েছিলেন খলনায়ক রূপে—যাঁরা বিদেশি, হামলাকারী, দস্যু, ধর্মবিনাশী, কামুক ও অত্যাচারী। এই মুসলমান রাজাদের সঙ্গে সাধারণ মুসলমানদের কোনো সম্পর্ক ছিল না এবং তাঁদের নিন্দা দেখে ব্যথিত হবারও কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয় যে ওই রাজাদের সূক্ষভাবে গোটা সম্প্রদায়েরই প্রতীক করে তোলা হয়েছে' (82)।

সেই আদর্শ জাতীয় বীরের সন্ধানে একটার পর একটা রাজকাহিনি উপস্থাপিত করতে থাকে বাংলার নাট্যশালাও। পুরনো ইতিহাসের বিক্রমশালী চরিত্রকে খুঁজে বের করে এনে সমসাময়িক যুগের পরোক্ষ প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে জাতীয়তাবাদী আদর্শ পুরুষ গঠনে সংকল্প নিল থিয়েটার। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের *দুর্গাদাস* নাটকে সংলাপ আসছে, 'উঠেছিল এই আর্য্যজাতি—যে দিন ব্রাহ্মণের তপোবল ছিল, ক্ষত্রিয়ের ত্যাগ ছিল, বৈশ্যের নিষ্ঠা ছিল, শূদ্রের কর্ত্তব্যজ্ঞান ছিল। সে সব গিয়েছে; আর ফির্ব্বার নয়। এখন আবার নূতন উপাদানে জাতীয় চরিত্র গঠন কর্ত্তে হবে, নূতন তেজে কম্পমান হ'তে হবে' (*Dwijendra Rachanabali* 214)।এই 'জাতীয় চরিত্র' গঠনের আকাঙ্ক্ষা নিঃসন্দেহে উনিশ শতকীয় হিন্দু পুনরুজ্জীবনের আকাঙ্ক্ষা। হিন্দুদের আদর্শ 'জাতীয় বীর'ই পারবে পরাধীনতার যন্ত্রণায় খানিকটা প্রলেপ দিতে। চতুর্বর্ণপ্রথার অবক্ষয়ে আজকের হিন্দুদের এত দুর্গতি। আজকের ভারতের স্বাধীনতার অভিলাষ পূর্ণ করতে হলে চাই নূতন তেজ; নূতন হিন্দুত্বের তেজ। দুর্গাদাসের এই সংলাপ অবশ্যই তৎকালীন

সমাজের জাতীয়তাবাদী কামনারই প্রতিফলন। শিবাজী উৎসব বা প্রতাপাদিত্য উৎসবের মতো জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক উদ্যোগগুলির আরেক ধরনের রূপই প্রতিভাত হয় এই ধরনের সংলাপগুলিতে।

এখানে উল্লেখ্য, এই বীর পুরুষেরা সকলেই প্রাচীন ইতিহাস থেকে আধৃত। কখনো মোগলদের বিরুদ্ধে প্রতাপাদিত্যের লড়াই, কখনো ছত্রপতি শিবাজির বিরোধ, কখনো রাণা প্রতাপের যুদ্ধ, কখনো সৎনাম সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহ, কখনো পুরনো ইংরেজ প্রতিপক্ষের সঙ্গে সিরাজ-উদ-দৌল্লা বা মীর কাশিমের মোকাবিলা—এই ছিল নাট্যবস্তুর কেন্দ্রবিন্দু। বিশ শতকের শুরুতে বাংলা নাটকে ষোড়শ শতকের রাণা প্রতাপকে ঘিরে বেশ কিছু বাংলা নাটকের নাট্যবস্তু আবর্তিত হল, বা সতেরো শতকের ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ বাংলার নাট্য আঙ্গিনায় আধিপত্য কায়েম করল, কিংবা আঠেরো শতকের সিরাজ-উদ-দৌল্লার ইতিহাস স্থান নিল। কিন্তু সমসাময়িক রাজনীতি সম্পর্কে অথবা সমকালীন রাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে একটিও নাটক লেখা হল না। প্রতিটি নাটকের আবর্তন-বিন্দু প্রাচীন ইতিহাস। ইতিহাসের রাজার বীরত্বের মধ্যে দিয়ে নিজের যুগের বীরকে খুঁজে দেখার চেষ্টা। চলে যাওয়া কালের গৌরবান্বিত অধ্যায়ের মধ্যে দিয়ে নিজের কালের অস্তিত্ব সন্ধান করা। যা নেই, ছিল কখনো, তার মধ্যে দিয়ে, যা আছে তাকে, যা হতে পারে বা যা হওয়া উচিৎ, সেই দিকে প্রবাহিত করানোর পরীক্ষা। 'আমাদের আধুনিকতা' প্রসঙ্গে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের লেখার একটি অংশ এই সূত্রে প্রণিধানযোগ্য:

'... বর্তমান যে পরিবর্তনের অপেক্ষা রাখে, তাকে পরিবর্তন করা যে আমাদের কর্তব্য, এই ইচ্ছার জন্ম দেয় হৃত অতীতের প্রতি মায়া... একালের অসন্তোষ, অপূর্ণতা, অপ্রাপ্তির উলটো প্রান্তে আমরা নির্মাণ করে নিই এমন এক সেকাল যা সুন্দর, কল্যাণময়, সুস্থ সামাজিকতার আবাসভূমি, এবং যা ছিল আমাদেরই সৃষ্টি, যেখানে আমরাই ছিলাম কর্তা। আমাদের এই সেকাল আদৌ কোনো ঐতিহাসিক অতীত নয়, বর্তমানের ভিন্নতা প্রতিষ্ঠা করার জন্যই কেবল এর নির্মাণ' ('Itihaser Uttaradhikar' 184)।

তাহলে এমন কথা হয়তো বলা যেতে পারে যে, বর্তমানের ভিন্নতা প্রতিষ্ঠাতেই জাতীয়তাবাদীদের জাতীয় ইতিহাসকে বানিয়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল; আর সেই বানিয়ে তোলা ইতিহাসে ভর করে সম্ভবত বাংলা ঐতিহাসিক নাটকগুলির প্রচলন ও ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করার দিকে মনোনিবেশ করা হয়েছিল।

মুসলমান বীরেরা

প্রশ্ন আসতে পারে, জাতীয়তাবাদী চরিত্র গঠনে রাণা-প্রতাপ বা ছত্রপতি শিবাজি-র পাশাপাশি সিরাজ-উদ-দৌল্লা বা মীরকাশিমের নাম আসাটা তো ধর্ম সমন্বয়ের ইতিহাসকেই সূচীত করে। তবে কি রাজনীতি ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের বিভাজন, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মুসলমানদের অংশ না নেওয়া বা দেশের ডাক দিতে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষদের একাত্মবোধ না করা ইত্যাদি অভিযোগগুলিকে হারিয়ে দিয়েছিল থিয়েটার জগৎ? ভারতবর্ষের 'জাতীয় বীর' গঠন বা 'জাতীয় ইতিহাস রচনা' বা 'জাতীয় রাষ্ট্র' চিন্তায় যে হিন্দুত্ববাদী প্রভাব দেখা যায়, বাংলা নাট্য অঙ্গনে কি তার ছায়া পড়েনি? সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আদর্শ ধারক-বাহক হিসেবে বাংলা থিয়েটারের পতাকা উড্ডীন হয়েছিল? প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের দেখানো পথ ধরেই।

গিরিশ ঘোষের ইতিহাস-আশ্রিত নাটকগুলি নিয়ে আলোচনায় প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য লিখছেন, '১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে নবীনচন্দ্র সেনের *পলাশীর যুদ্ধ* আখ্যানকাব্য রচনার পর থেকে প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরে স্বাদেশিক চিন্তাসমৃদ্ধ ঐতিহাসিকেরা সিরাজ-উদ-দৌল্লা ও মীরকাসিম সম্পর্কে অনেক অজ্ঞাত তথ্য অনুসন্ধান করেন। বিশেষভাবে, ইংরেজ বর্ণিত সিরাজ চরিত্রের কলঙ্ক খণ্ডনই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। যুগধর্মে বিশ্বাসী গিরিশচন্দ্র অনুরূপ ভাবাদর্শে আন্দোলিত হয়েছিলেন। তাঁর *সিরাজদ্দৌল্লা* নাটক রচনাতে জাতিগত মনোলোকের প্রতিফলন হয়েছে' (420)। জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চার প্রধান বক্তব্যই হল, বিদেশী শাসকদের লেখা ইতিহাসে ভারতীয়রা নিজেদের জাতির গৌরবময় বর্ণনা খুঁজে পায় না। অষ্টাদশ শতকের শেষে বা উনবিংশ শতকের শুরুতে লেখা ইংরেজ লিখিত ভারতের ইতিহাস বইগুলি অনেক সময়ের ইংরেজের জাতীয়তাবাদী ঔদ্ধত্যের 'উলঙ্গ প্রকাশ' হয়ে উঠেছিল (D. Chakraborty *Monorather Thikana* 172)। এই দাম্ভিক ইতিহাস ভারতীয়দের পক্ষে মনোগ্রাহী ছিল না। দীপেশ লিখছেন, '... ইংরেজের এই দম্ভ-প্রসূত ইতিহাস কখনোই আমাদের নিজস্ব জিনিস হতে পারত না... জাতীয়তাবাদী ভারতবাসী ইংরেজ-রচিত ভারতেতিহাস পড়ে স্বভাবতই কোনো ভারতীয় কণ্ঠস্বর খুঁজে পেতেন না। তাঁদের ইতিহাস-সচেতন মন তৃষিত হতো 'ভারতীয়' ইতিহাসের আকাঙ্ক্ষায়' (*Monorather Thikana* 172)। স্বজাতির পূর্বপুরুষদের কীর্তিময় গাথা প্রতিষ্ঠা করতে বাঙালি তথা ভারতীয়দের নিজেদেরকেই ইতিহাস রচনা দায়িত্ব নিতে হবে। সেই দায়ভার থেকেই 'স্বাদেশিক চিন্তাসমৃদ্ধ' ঐতিহাসিকদের কাজ শুরু হয়। জাতিকে জাতীয় বন্ধনে একত্রিত করার উদ্দেশ্যে রচিত ইতিহাস জাতীয়তাবাদী ইতিহাস। এই সূত্রে দীপেশ চক্রবর্তীর তিনটি পর্যবেক্ষণ— 'আমাদের' আধুনিক ইতিহাস-চেতনা

সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষা থেকে পাওয়া, ইংরেজদের লিখিত বয়ানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে 'আমাদের' ইতিহাস-ভাবনা শুরু হয়েছিল, জাতির প্রগতি প্রতিষ্ঠা করার জন্যই এই ইতিহাস লেখা। দীপেশের ব্যাখ্যা, 'সেই অর্থে এই ইতিহাসবোধ হাড়ে হাড়ে জাতীয়তাবাদী' (*Monorather Thikana* 173)।

এই জাতীয়তাবাদী ইতিহাস রচনার আলোচনায় পার্থ চট্টোপাধ্যায় ১৮৭০-এ প্রকাশিত কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জনপ্রিয় পাঠ্যবইয়ের উদাহরণ দেন। সিরাজের ঘটনা বর্ণনায় কৃষ্ণচন্দ্র লিখেছিলেন, 'সিরাজউদ্দৌল্লা কি অশুভক্ষণেই কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াছিলেন, তিনি এই অন্ধকূপ-হত্যার বিন্দু-বিসর্গও জানিতেন না। তাঁহার আজ্ঞানুসারে কিছু ইংরেজ বন্দী দিগের ঐ কারাবাস নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, অথচ ইহা হইতেই তাঁহার সর্বনাশ উপস্থিত হইয়াছিল' (qtd. in Bhadra and Chatterjee 137)। সিরাজের কার্যকলাপের যুক্তিগ্রাহ্য রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়াস চোখে পড়ে। গিরিশ এই ইতিহাসকেই অনুসরণ করে তাঁর নাটক লিখেছিলেন। নাটকের ভূমিকাতে গিরিশের স্পষ্ট বক্তব্য থেকে সেই জাতীয়তাবাদী ভাবনাই অনুরণিত হয়—'বিদেশী ইতিহাসে সিরাজচরিত্র বিকৃত বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়... প্রভৃতি শিক্ষিত সুধিগণ অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে বিদেশী ইতিহাস খণ্ডন করিয়া রাজনৈতিক ও প্রজাবৎসল সিরাজের স্বরূপচিত্র প্রদর্শনে যত্নশীল হন। আমি ঐ সমস্ত লেখকগণের নিকট ঋণী' (*Sirajuddaula* 3)। 'নিজেদের ইতিহাস' অবলম্বন করে 'জাতীয় বীর'-এর খোঁজ করতে গিরিশের এই নাট্যচিন্তা। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিকথায় এই সময়টিকে ব্যাখ্যা করছেন এইভাবে, 'খ্রীষ্টাব্দ ১৯০৪-০৫। বাঙ্গলা জাগিয়াছে! কোনদিন এই অন্নগত প্রাণ বাঙ্গালীর বাহুতে যে বল ছিল, ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া বাঙ্গালী তাহার নিদর্শন খুঁজিতে আরম্ভ করিয়াছে। অক্ষয়চন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা', নিখিলনাথের 'মুরশিদাবাদ কাহিনী'-বাঙ্গলায় একটা নূতন হাওয়া বহাইয়া দিয়াছে' (A. Mukherjee 106)। কিন্তু প্রশ্ন এই, নিজেদের ইতিহাসের অনুসন্ধান করে জাতীয় বীর প্রতিষ্ঠায় গিরিশ সহসা একটি মুসলমান চরিত্রকে বরণ করলেন কেন? সনাতন হিন্দুসংস্কৃতির নিমগ্ন সাধক গিরিশের এ হেন বিধর্মীয় চরিত্রের গৌরবগাথা রচনা করাটা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর, সন্দেহ নেই। নাট্যচিন্তা থেকে শুরু করে দেশচিন্তা—সর্বত্র গিরিশ ধর্মের উচ্চস্থানেই বিশ্বাসী ছিলেন। জোরের সঙ্গে যে গিরিশ লিখছেন, 'কোন কোন মুসলমান রাজার সংকল্পই ছিল কাফের দূর করিবে। দিগবিদিক্‌ব্যাপী বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুস্থানে রহিয়াছে, তবু আজও আবাসস্থানের নাম হিন্দুস্থান। হিন্দুধর্ম্মমূল হিন্দু হৃদয়, হিন্দুধর্ম্ম এতই বিজরিত করিয়া রাখিয়াছে' (Girish Rachanabali 1: 732)। অর্থাৎ'সার্বজনিক' নাটক অবশ্যই ভাবে কৃষ্ণনামেই সমৃদ্ধ হওয়া

প্রয়োজন, এই ছিল গিরিশের মনন। তাহলে নাট্য রচনার ক্ষেত্রে মুসলমান চরিত্রকে 'জাতীয় বীর'-এর উচ্চাসনে বসানোর মধ্যে কোন্ উদ্দেশ্য ছিল?

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে *সিরাজদ্দৌল্লা* ও ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে লেখা *মীর কাশিম* নাটক দুটি লেখা হয় ও মঞ্চস্থ হয়। সেই সময়ে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটি এই নাট্যচরিত্র দুটিকে জাতীয় বীরের প্রতীক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা হিসেবে বেছে নেওয়ার কারণগুলি প্রতিফলিত করে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে আন্দোলিত হিন্দু বাঙালিরা ছিলেন মূলত উচ্চবিত্ত। কলকাতায় বসে তারা পূর্ববঙ্গের জমিদারী চালাতেন। বাংলা ভাগ হলে তাদের জমিদারীর অনেক ব্যবসায়িক স্বার্থ খণ্ডিত হত বলে তারা মনে করলেন। হিন্দু ছাড়া বাকি বাঙালি সম্প্রদায়ের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু জমিদারের কাছে খেটে খাওয়া গরীব মুসলমান প্রজা। বাংলা ভাগ হওয়া বা না-হওয়ায় তাদের বিশেষ কিছু অবস্থার হেরফের হত না। প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী ইংরেজরা, সমাজের সর্বত্র সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ছিল উচ্চবর্ণ হিন্দুদের হাতে, এসব যা ছিল তা-ই থাকবে। বাংলা ভাগ হলে অসুবিধেতে পড়তে হবে হিন্দুদেরই। তাই উচ্চবর্ণ হিন্দু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে মুসলমানদের ডাক দিলেন। শাসক ইংরেজদের বিরুদ্ধে শক্তিবৃদ্ধি করতে এ ছাড়া আর কোনো উপায় তাদের ছিল না। উচ্চবর্ণ হিন্দুদের সহায়ক হিসেবে চাইল তারা মুসলমানদের (Hasan 76)। হিন্দু জমিদারশ্রেণির মানুষেরা গরীব মুসলমান কৃষকের কথা চিন্তা করে কোনো কর্মসূচী নিয়ে উঠতে পারেনি। ধর্মভেদ ও শ্রেণিভেদে দীর্ণ এই বঙ্গসমাজকে জাতীয়তার ডাকে একত্রিত করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত স্বদেশপ্রেমের ধারণাটির গোড়ার সমস্যাটিই তুলে ধরছেন *ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম* গ্রন্থের মধ্যে এক অনবদ্য বিশ্লেষণে, 'ভারতবর্ষের ন্যায় দেশে রাজা হইতে চাষা পর্যন্ত সকলকে স্বদেশপ্রেমিকতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা সমর করিব—যে যেমনটি আছে, সেই অবস্থাতেই সে থাকিবে, তাহার ইতরবিশেষ হইবে না, অথচ সকলে নিজের নিজের গদিতে থাকিয়া নিজের স্বার্থের ব্যতিক্রম না করিয়া ভ্রাতৃভাবে সর্বশ্রেণী মিলিত হইয়া দেশ স্বাধীন করিব,--ইহাই আমাদের দর্শনশাস্ত্রের বিসমোল্লায় গলদ' (qtd. in N. Guha 133)।

কিন্তু কেমনভাবে তারা হিন্দুদের সহায়তা করতে পারে, তার একটা গতি নির্দেশ লক্ষ্য করেছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তিনি লিখছেন— '...হিন্দু নয় অথচ ভারতের অধিবাসী, এমন জনগোষ্ঠীর স্থান কোথায়? ... রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণে সংখ্যালঘুদের কর্তব্য সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব এবং প্রাধান্য মেনে নেওয়া' ('ইতিহাসের উত্তরাধিকার 154)। প্রায় একই রকম কথা অনুরণিত হয় বিনায়ক দামোদর সাভারকর-এর *Hindutva: Who is*

a Hindu? বইতে। এই বইতে সাভারকর স্পষ্টভাবে 'হিন্দু'-র সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। নিজেকে 'নাস্তিক' বলে পরিচয় দিয়ে তিনি বলছেন, ধর্মীয় পরিচয় হিন্দুর একমাত্র পরিচয় নয়; একটি মানুষের পিতৃপুরুষের ভিটে, তার পূর্বপুরুষের ঐতিহাসিক গোষ্ঠীগত পরিচয় ও তার ভাষাকে বিচার করে তার 'হিন্দুত্বের' বিচার করতে হবে। সাভারকরের নিদান, ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষেরা ব্যক্তিগত পরিসরে নিজেদের ঈশ্বর সাধনা করতেই পারেন, কিন্তু সর্বসমক্ষে হিন্দু সংস্কৃতি ও ধর্মীয় আচারের প্রতি তাদের সম্মান প্রদর্শন করাই কর্তব্য। কারণ হিন্দু সংস্কৃতিই ভারতের একমাত্র জাতীয় সংস্কৃতি, বাকি সকলেই বহিরাগত, অ-ভারতীয়। জাতীয়তাবাদের একেবারে শুরুর দিকের একটি গ্রন্থ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের (১৮৭৬) *স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস* থেকে পার্থ চট্টোপাধ্যায় উদ্ধৃতি দিচ্ছেন, 'ভারতভূমি যদিও হিন্দুজাতীয়দিগেরই যথার্থ মাতৃভূমি, যদিও হিন্দুরাই ইহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ...মুসলমানেরাও ইহার পালিত সন্তান' ('ইতিহাসের উত্তরাধিকার' 155)। অর্থাৎ এ ভারত হিন্দুদেরই স্থান, মুসলমানরা বাইরের লোক হলেও ব্রাত্য নয়, আপন ভাই না হলেও ভাইয়ের মতোই। এ ভারতভূমিতে 'পালিত সন্তান' হিসেবেই একমাত্র মুসলমানের স্থান। অতএব সেই 'পালিত সন্তান'-এর মন পেতেই হয়তো জাতীয়তাবাদী জননায়কদের অনুকরণে বাংলা নাট্য আঙ্গিনায় সিরাজ ও মীর কাশিম বা সাহাজাহান-এর মতো মুসলমানদের 'অনুপ্রবেশ'। পাশাপাশি *আলিবাবা*-র মতো 'রঙ্গনাট্য' কিংবা *আবু হোসেন*-এর মতো লঘু 'কৌতুকপূর্ণ গীতিনাট্য'গুলিতে মূল চরিত্রে মুসলমান চরিত্রদের কিছু আনাগোনা লক্ষ্যণীয়।

আবার দ্বিজেন্দ্রলালের *মেবারপতন* নাটকে স্বামী দয়ানন্দের 'আর্য সমাজ'-এর কণ্ঠস্বরই যেন শোনা যায়। এই নাটকের মহাবৎ চরিত্রের মধ্যে দিয়ে যেন নাট্যকারের স্বকীয় চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে। মহাবৎ বলছে: 'এত বিদ্বেষ!—এত আক্রোশ! আশ্চর্য্য নয়, যে এই জাতি বারবার মুসলমানের পদদলিত হয়েছে। আশ্চর্য্য নয়, যে এই ঘৃণা মুসলমান সুদ সমেত ফিরিয়ে দিচ্ছে! এই এঁদের উদার—অত্যুদার সনাতন হিন্দুধর্ম্ম! মুসলমান ধর্ম্ম আর যাই হোক্, তার এ মহত্ত্বটুকু আছে যে, সে যে-কোন বিধর্ম্মীকে নিজের বুকে করে, আপন করে' নিতে পারে। আর হিন্দু ধর্ম্ম? –একজন বিধর্ম্মী শত তপস্যায় হিন্দু হতে পারে না' (*Mebar Patan* 83)। আত্মসমালোচনামূলক ভঙ্গিতে আসলে আর্য সমাজের 'নতুন হিন্দু' গঠনের ডাকেই সাড়া দিলেন নাট্যকার। ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দুসমাজ ততদিনে বুঝে গেছে সমাজের আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণের সনাতনধর্মাবলম্বী নেতারাও কিন্তু হিন্দুসমাজের আধুনিকীকরণের পক্ষেই প্রচার শুরু করেছেন। হিন্দুদের অবক্ষয়ে যে মানুষেরা এক সময়ে হিন্দুজাতির

ছেড়ে মুসলমান হয়েছে বা অন্য ধর্ম গ্রহণ করেছে, তাদের আপন করে নাও, আরও একবার তাদের 'হিন্দু' হিসেবে গ্রহণ করো। 'বিদেশীয়' মুসলমান বা শাসক খ্রিস্টানদের সঙ্গে 'যুঝতে' এই একটিই পথ। অনায়াসে বোঝা যাচ্ছে দয়ানন্দের আর্যসমাজ বা বিবেকানন্দের উদারবাদী 'নতুন' হিন্দুজাতি গঠনের প্রয়াসে অংশ নিচ্ছে নাট্যসমাজ। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, এই 'নতুন হিন্দু'-র ধারণাতে বিশেষ কোনো ধর্মীয় কঠোরতা নেই। আচার-আচরণ বা ধর্মীয় নিয়মনীতি মেনে চলার বাধ্য-বাধকতা নেই। 'নতুন হিন্দু' ধারণাটি একান্তভাবেই সমগ্র ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে ঐক্যবন্ধনে বেঁধে ফেলার একটি কৌশলমাত্র। সেই কৌশলী হিন্দুত্বের প্রচারে অংশ নিল থিয়েটার।

ইতিহাসের অন্তরাল ও জাতীয়তাবোধ

প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরে থাকার জন্য ঐতিহাসিক নাটকের আচ্ছাদন গ্রহণ করল থিয়েটার মহল। সরাসরি কোনো সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনা বা রাষ্ট্রনীতি নিয়ে নির্বিকার থেকে তারা আশ্রয় করল প্রাচীন ইতিহাসকে। তা সত্ত্বেও ইংরেজ সরকার বেশ কিছু নাটক বাজেয়াপ্ত করল। ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে লিখিত হয়েছিল নাটকগুলি। তা সত্ত্বেও নাটকগুলির মধ্যে বিশ শতকের ইংরেজ রাজের বিরোধিতার গন্ধ পায় সরকার। কারণ নাটকগুলি প্রাচীন রাজার কাহিনি বর্ণনা করলেও আসলে তার অন্তরালে থেকে যাচ্ছিল সমকালীন জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগ। সিরাজের বীরত্ব বা রাণা প্রতাপের সাহসিকতা বা শিবাজির বীর্যের কাহিনির ছায়ায় প্রকৃতপক্ষে অনুপ্রাণিত হচ্ছিল স্বাদেশিক ভাবনা, উদবুদ্ধ হচ্ছিল দেশভক্ত জনগণ। ইতিহাসকে আশ্রয় করে তৈরি করা হয়েছিল বাইরের পরিধানটি অন্তরের ফল্গুধারা বেয়ে বয়ে যাচ্ছিল স্বদেশী চেতনা। আপাদমস্তক ঐতিহাসিকতার কাঠামোকে ব্যবহার করে বাংলা নাট্যসমাজ জাতীয়তাবাদী রাজনীতির আবেদনটিই বহন করে যাচ্ছিল।

কিন্তু প্রশ্ন আসে, এতদিন যে নাট্য জগৎ নিশ্চিন্ত নিরূপদ্রব ধর্মীয় পৌরাণিক নাটকের নিরাপদ আশ্রয়ে দিন যাপন করছিল, হঠাৎ ঐতিহাসিক নাটকগুলোর মধ্যে দেশভক্তি প্রচার করে ইংরেজের শূল নজরে যাওয়ার ঝুঁকি নিল কেন? বিশেষত যে নাট্য সমাজ কয়েক দশক আগেই উপেন দাস সুকুমারী দত্ত বা অমৃতলাল বসুর ইংরেজবিরোধী নাট্যকাণ্ডে একেবারে নিশ্চুপ ছিল, সেই সমাজই সহসা ইংরেজরাজের উদ্যত ফণাকে উপেক্ষা করার সাহস পেল কোথা থেকে? একই সঙ্গে উল্লেখ্য যে নাট্য সমাজে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে রাণি ভিক্টোরিয়ার সাম্রাজ্য শাসনের ষাট বছর পূর্তিতে অভিনীত হচ্ছে *হীরক জুবিলী* নাটক, ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে বুয়র যুদ্ধের অবসানে ইংরেজদের করা সন্ধিকে স্বাগত জানিয়ে অভিনীত হচ্ছে *শান্তি* নাটক, রাণি ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে অভিনীত হচ্ছে *শোকসঙ্গীত* নাটক, *স্বর্গারোহণ* নাটক,

অশ্রুধারা নাটক, সম্রাট এডওয়ার্ডের ক্ষমতায় আসার উপলক্ষ্যে অভিনীত হল *অভিষেক* নাটক, *রামপূজা* নাটক, সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষ্যে অভিনীত হল *রত্নমালা* নাটক—সেই নাট্যসমাজেই আকস্মিকভাবে কী মন্ত্রবলে স্বদেশিয়ানা কর্তৃত্বস্থাপন করল? কোন্ বিশেষ কারণে রাজনীতির ব্যাপারে সর্বদা সাবধানী নাট্য মহল দেশমাতৃকার পূজায় উদবুদ্ধ হয়ে উঠল? কেনই বা বাজেয়াপ্ত হওয়ার মতো একটি বিপজ্জনক অবস্থায় নিজেকে সঁপে দিতে পিছপা হল না?

কারণটা সম্ভবত একাধারে রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক। তৎকালীন জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বিপজ্জনক সামাজিক ঝোঁকটাকে অস্বীকার করা কলকাতার নাট্য মহলের পক্ষে হয়তো সম্ভব ছিল না। নাট্য জগতের ব্যবসায়িক দিকটা সবসময়েই খুব অস্থায়ী ছিল। নাটকের কোন্ কোন্ উপকরণ বিক্রিয়োগ্য হয়ে উঠবে আর ব্রিটিশ সরকারকে বেশি ক্ষুব্ধ না করেও দেশ-জাতি-সমাজের স্বার্থে কোন্ কোন্ বিষয়কে নাট্যমঞ্চে নিয়ে আসা দরকার, তাই নিয়ে নাট্যকর্মীদের সবসময়েই একটা টানাপড়েনের মধ্যেই চলতে হত। রিমলি ভট্টাচার্যের ব্যাখ্যা, ‘The business of the stage, even in ‘the golden age’ of the Bengali theatre was always an unstable one, negotiating an uneasy alliance between ideals of regenerating the Bengali jati and between what would sell those ideals to an emergent heterogenous audience, without provoking the wrath of the colonial Government’ (*Public Women* 312)। নাটকের দর্শক যে শ্রেণির মানুষেরা ছিলেন তারা সেই সময়ে মূলত এই জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদবুদ্ধ হতে চাইছিলেন। তাই তাদের চাহিদাকে অবজ্ঞা করে দশকের পর দশক ভক্তিরসের নাটকের যোগান দিতে থাকলে থিয়েটারগুলির বাণিজ্যিক মুনাফা হয়তো একেবারেই বন্ধ হয়ে যেত। জাতীয়তাবাদী ভাবে জেগে ওঠা মানুষের মনের মতো করে ঠিক ঠিক নাটকের সরবরাহ জারি রাখতে নাট্যকর্মীরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তাতে ইংরেজ সরকারের বিষ নজরে পরার খানিক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ব্যবসায়িক লাভটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে তারা এই ঝুঁকির কাজটা করেই ফেলল। এই সূত্রে নাটকগুলির টিকিট বিক্রির খতিয়ান পাওয়া গেলে আরও ভালোভাবে এই বিষয়ে আলোচনা করা যেত। কিন্তু বাংলা থিয়েটারের আকরগ্রন্থগুলিতে বারবার এই নাটকগুলি সম্বন্ধে মঞ্চ-সাফল্যের কথা উল্লিখিত থাকলেও নাটকগুলির বাণিজ্যিক সাফল্য নিয়ে খুব বিস্তারিত বর্ণনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। সামান্য কিছু উল্লেখের মধ্যে দেখা যায়, ঐতিহাসিক নাটকগুলি বেশ কিছুদিন রঙ্গমঞ্চগুলিকে ব্যবসায়িক সাফল্য দিয়েছিল। যেমন, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, ‘ইহার (*সিরাজদ্দৌল্লা*) প্রথম রাত্রির বিক্রয় ৮২১ টাকা, দ্বিতীয় রজনীর বিক্রয় ৭৯৮ টাকা, তৃতীয় রজনীর বিক্রয় ৭৭৩ টাকা। *সিরাজদ্দৌলা* একাদিক্রমে ২৫

রাত্রি চলিয়াছিল। ইহার পঞ্চবিংশ রাত্রির ... বিক্রয় ৩৬১ টাকা। *সিরাজদ্দৌলা*-র ২৫ রাত্রির গড়পড়তা বিক্রয় প্রতি রাত্রে ৭০০ টাকা' (125)। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আরও জানাচ্ছেন,

> '*মীরকাসিমের* প্রথম রাত্রের বিক্রয় এক হাজার আশী টাকা। দ্বিতীয় রাত্রে এক হাজার ষোল, তৃতীয় রাত্রে এক হাজার পনের, চতুর্থ রাত্রে এক হাজার আটাশ টাকা। ইহাও *সিরাজদ্দৌলার* ন্যায় একাদিক্রমে পঁচিশ রাত্রি চলিয়াছিল এবং ইহার শেষ রাত্রির বিক্রয় পাঁচ শত সত্তর টাকা। ইহার গড়পড়তা প্রতি রাত্রির বিক্রয় নয় শত টাকা। *সিরাজদ্দোলা* হইতে *মীরকাসিমে* টাকার দিক হইতে দুই শত টাকা সুর চড়িয়াছে' (149)।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তখন সাত-আট শত টাকার বিক্রি হলেই হাউজ-ফুল ধরা হত (A. Mukherjee 55)। যাই হোক, সামান্য কিছু যা ব্যবসায়িক খতিয়ান পাওয়া গেল, তা থেকে এ কথা অনুমান করা যেতে পারে যে, উনিশ শতকের শেষ সময় থেকে বিশ শতকের প্রথমভাগ পর্যন্ত সময়ে একের পর এক ঐতিহাসিক নাটকের মঞ্চায়ন সেই সময়কার জনরুচির সঙ্গে সামঞ্জস্যরক্ষাকারী হয়েছিল এবং সেইগুলি বাণিজ্যিকভাবে সাফল্যও সূচিত করেছিল বলেই ধারণা করা যেতে পারে।

জাতীয়তাবাদী নাটকের সাবধানী সম্ভাবনা

ইংরেজি ভাষার থিয়েটারকে অনুসরণ করে কলকাতার হিন্দু উচ্চ ও মধ্যবিত্ত 'বাঙালি' নাট্যকর্মীদের যাত্রা শুরু হয়ে থাকলেও তারা বাঙালির স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠার তাগিদে বাংলা ভাষায় নাটকের চর্চাতেই অধিক উৎসাহী। 'হিন্দু সংস্কৃতি ও সংস্কৃত ভাষার প্রতি অনুরক্ত হিন্দু উচ্চবিত্ত বাঙালি' নাট্যকর্মীদের মধ্যে তখনো তেমন জাতীয়তাবাদী চেতনা বা ভারতীয়ত্বের কোনো পরিষ্কার ছবি গড়ে ওঠেনি। উনিশ শতকের শেষে তথা বিশ শতকের গোড়ার দিকে সেই ধারণাটি যথেষ্ট প্রকট হয়ে উঠল। দেশের জাতীয় বীরের খোঁজ শুরু হল, জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটল, জাতীয়তাবাদী থিম গড়ে তোলার প্রস্তুতি নেওয়া হল।

কিন্তু মনে রাখা ভাল, জাতীয়তাবাদী ভারতের এই থিমটি কিন্তু কখনোই ব্রিটিশ রাজকে বিরক্ত করে গড়ে তোলা নয়। বরং ব্রিটিশ রাজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে গড়ে তোলা। ভারতমাতা ও রাণী ভিক্টোরিয়ার মধ্যে বিরোধ নেই। তারা যেন একই মায়ের দুই রূপ। শাসকের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে ওঠার কোনো প্রচেষ্টা নয়; আবার শাসকের অন্ধ পদানত ভক্তও নয়; শাসকের গুণগ্রাহী থেকে কিছু পাওনা গণ্ডা বুঝে নেওয়া। নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইনের জেরে উপেন অমৃতদের মতো 'সরকারবিরোধী'-র তকমা লাগাতে নারাজ নতুন বাঙ্গলা থিয়েটার। বরং 'জাতীয়তাবাদী'

আচ্ছাদনকে গায়ে চড়িয়ে আত্মশক্তির বিকাশের ডাক দিতে তৎপর হল তারা। সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণ, 'The 'glory' of India was being conceived, constructed, and presented as something that could fit in with the unchanging reality of Britain's India Empire. The visage of Queen Victoria, thus, was being produced by the Bengali Stage as a companion surrogate mother to the Indian native, existing non-problematically side by side with vision of Mother India' (263)। অটুট থাকুক ইংরেজরাজ, কিন্তু হিন্দুজাতি হোক বলিষ্ঠ--এই ছিল উদ্দেশ্য।

এই পরিস্থিতিতে বাংলা থিয়েটার জগৎ আরও সতর্কভঙ্গি অবলম্বন করে। ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সরাসরি বোঝাপড়ার ডাকও তারা দিল না। বরং তারা অতীত রাজাকে উদ্দেশ্য করে সমসাময়িক সমাজের নানান চাওয়া পাওয়ার প্রতিফলন ঘটালো। ইতিহাসের আড়াল আশ্রয় করে তাদের শিল্পসাধনা চলতে থাকল। ইংরেজ সরকার তাতেও ক্ষুব্ধ হল। বাজেয়াপ্ত করল নাটকগুলো। কিন্তু আগেরবারের নাট্য নিয়ন্ত্রণ ও এই বারের নাট্য নিষেধাজ্ঞার একটি বড় প্রভেদ দেখা গেল। ১৮৭৬-এর নাট্য নিয়ন্ত্রণের পর বাংলা নাটক ভীত হয়ে রাজনৈতিক বা সামাজিক নাটক করা বন্ধ করে পৌরাণিক নাটক বেছে নিয়েছিল। নাটকের একটা মোড় ঘুরে গিয়েছিল। কলকাতা কেন্দ্রিক বাংলা নাট্য জগতে যে নতুন পর্যায়ের নাট্যচেতনার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছিল। অবাক করা বিষয় হল, এই বারের বাজেয়াপ্ত নাটকগুলি নিষিদ্ধ হওয়ার পরেও অভিনীত হতে থাকল। শিবব্রত চট্টোপাধ্যায় লিখছেন, '*রাণা প্রতাপ* মোট অভিনীত হয়েছে পঞ্চাশ রাত্রি; এর মধ্যে আদেশ জারির আগে ছাব্বিশ রাত্রি, আর পরে চব্বিশ রাত্রি। *দুর্গাদাস* মোট অভিনীত হয়েছে একাশি রাত্রি। আদেশ জারির আগে আটচল্লিশ রাত্রি, পরে তেত্রিশ রাত্রি। *মেবার পতন* মোট অভিনীত হয়েছে ছিয়াশি রাত্রি। আদেশ জারির আগে সাঁইত্রিশ রাত্রি, পরে উনপঞ্চাশ রাত্রি' (29)।

যদিও ক্ষীরোদপ্রসাদের *পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত* ও *নন্দকুমার* নাটক দুটি এবং গিরিশচন্দ্রের *সিরাজদ্দৌল্লা*, *মীরকাশিম* ও *ছত্রপতি শিবাজি* নাটকগুলি নিষিদ্ধ হওয়ার পর আর অভিনয় হয়নি। কিন্তু সেক্ষেত্রে উল্লেখ্য, নাটকগুলি নিষিদ্ধ হওয়ার অনেক আগেই বহুবার অভিনয় হয়ে গেছে এবং এমনিতেই নাটকগুলির অভিনয় আর হচ্ছে না। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে, বাংলা ঐতিহাসিক নাটকগুলি ইংরেজ সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল বটে, কিন্তু সেই নাটকগুলি বাজেয়াপ্ত করার পেছনে খুব কঠোর মনোভাব তাদের ছিল, সেটা মনে হয় না। এর আগে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলায়

শাসকবিরোধী নাটক বন্ধ করতে ইংরেজ সরকার নাট্যকর্মীদের গ্রেপ্তার করেছে। অভিনয় চলাকালীন তাঁদের তুলে নিয়ে গিয়ে জেলে পাঠানো হয়েছে। দীর্ঘদিন তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা চলেছে। সেই ঘটনার সূত্রেই অত্যন্ত তৎপর হয়ে ইংরেজ সরকার নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইনটিও প্রণয়ন করেছেন। ঘটনার গভীরতা এতোই প্রবল ছিল যে তার পর থেকে প্রায় দুই দশক বাংলা রাজনৈতিক নাটক সাহস করে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। ভক্তিরসে নিমজ্জিত হয়ে আত্মরক্ষা করেছে।

কিন্তু এইবারের বাংলা ইংরেজবিরোধী সাহসী নাটক বা নাট্যকার বা নাট্যব্যবস্থাপক বা অধিকারী বা দর্শক কেউই ইংরেজ সরকারের কাছে হয়তো তেমন বিপজ্জনক হয়ে উঠল না। তাঁদের নিয়ে সরকারের তেমন কোনো উৎকণ্ঠা হয়তো ছিল না। আগেরবার ইংরেজ তৎপরতার কারণ ছিল এই যে বাংলা নাটকে কিছু রাজনৈতিক কর্মী ও তাঁর সহযোদ্ধা কিছু নাট্যকর্মী একত্রিত হয়ে সরাসরি বর্তমান ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে আঙ্গুল তোলে। কোনো ঐতিহাসিক কাহিনির মধ্যে নিজ বক্তব্যকে মিশিয়ে তাঁদের নাটক লেখা হয়নি। কোনো রাজা রাণির প্রেম কাহিনির আড়াল থেকে তাঁদের নাট্যবস্তু সংঘঠিত হয়নি। এক যুগের অরাজকতা বর্ণনায় আরেক যুগের রাজপাটের অব্যবস্থাকে আশ্রয় করা হয়নি। তাই নাটকের ক্ষমতা ছিল অপরিসীম। সেই নাটক নিয়ে শাসকের ভয় ছিল অনেক।

কিন্তু এবারের অর্থাৎ বিশ শতকের নাট্য ঘটনা অনেক বেশি নির্বিষ ছিল বলে মনে হয়। তাই এবারের নাটক, তা সে যতই রাজনৈতিক হোক না কেন, ইংরেজ সরকারের কাছে তেমন ভয়ংকর হয়ে ওঠেনি, উঠতে চায়নি। উনিশ শতকের শেষ ভাগ ও বিশ শতকের শুরু দিকে বাংলা ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে কীভাবে তৎকালীন উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত কলকাতার ইংরেজি শিক্ষিত স্বাদেশিক ভাবনায় উদবেলিত মানুষদের মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে সে ব্যাপারে প্রভাতকুমার ভট্টাচার্যের গ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তাঁর গ্রন্থে নাটক ভেদে এই বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন। তাঁর রচনায় মধুসূদন দত্তের রচনা থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও তৎপরবর্তী কিছু 'গৌণ নাট্যকার'-দের স্বাদেশিক চেতনা ও নাট্যকর্মে তার প্রভাব সম্বন্ধে বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ রয়েছে। সেই কারণে, বর্তমান গবেষণায় সেই সময়কার প্রতিটি নাটকের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত ও তার টেক্সট বিষয়ক আলোচনা করা হল না।

এইবারে জাতীয়তাবাদী নাটকের গতিপ্রবাহকে বুঝতে ভারতীয় রাজনীতিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অংশগ্রহণের ঘটনাটি নিয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা জরুরি বলে মনে হয়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ইংরেজ পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতীয় মধ্যবিত্তের শিক্ষা রুচি ইত্যাদির প্রশিক্ষণ চলতে থাকে। ফলে ইংরেজদের রাষ্ট্রনীতি,

শিক্ষানীতি বা আইনব্যবস্থা কোনোটাই আর তাদের কাছে জটিল বা বিজাতীয় মনে হয় না। তারা এই ব্যবস্থার অংশগ্রহণকারী হয়ে ওঠে। আর এই ঔপনিবেশিক শাসনের একটা অন্যতম ফলাফল হিসেবেই মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ হয়। দেশীয় সংস্কৃতিকে 'দূষিত' না করে ইংরেজদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসার উদ্দেশ্য ছিল এই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মহলের। সর্বশক্তিময় ইংরেজ সরকারের অবস্থান থাকবে সবার ওপরে আর তার অধীনে অবনত ভারতীয়রা ছোট ছোট অসংখ্য গণতান্ত্রিক গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে সরকারের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে নিজেদের দাবিদাওয়া আদায়ের কাজ করবে। মোটামুটি এমনটাই ছিল গোড়ার দিকের জাতীয়তাবাদীদের পরিকল্পনা।

এই কারণে একে একে অনেকগুলি ভারতীয় সংগঠন গঠিত হয় এবং এই সংগঠনগুলির কার্যধারাকে মোটামুটি অপরিবর্তিত রেখে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম জাতীয় কংগ্রেস। জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম কুড়ি বছরটি ছিল অনেকটাই নরমপন্থী পর্ব। প্রতি বছর তিনদিনের জন্য কংগ্রেস মিলিত হত। ইংরেজ সরকারের প্রশাসনিক কর্মপদ্ধতি নিয়ে মূলত সংস্কারমূলক আলোচনা করা হত এই অধিবেশনে। এর একটা অন্যতম কারণ হল কংগ্রেসের , সদস্যরা সকলেই ইংরেজদের সম্পর্কে তখনও অনেক দ্বিধায় ছিল। সরকারের কিছু কিছু নীতি বা কর্মধারা সম্পর্কে তারা মাঝে মাঝে প্রশ্ন তুলত ঠিকই কিন্তু সাধারণভাবে ব্রিটিশের অপরাজেয় ক্ষমতাকে স্বীকার করেই তাদের , রাজনৈতিক কাজকর্ম পরিকল্পিত হত। যদিও কংগ্রেসের সর্বস্তরের সদস্যদের মধ্যেই যে ব্রিটিশদের প্রতি একইরকম অনুগত অবস্থান ছিল তা নয়। বিশেষ করে বিশ শতকের শুরুর দিক থেকে ক্রমেই কংগ্রেসের ভেতরে ও বাইরে উভয়স্তর থেকেই ধীরে ধীরে চরমপন্থী বিশেষত্বগুলো জোরালো হতে থাকে।

কংগ্রেসের সঙ্গে সরকারের এই বোঝাপড়ার সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে উনিশ শতকের একেবারে শেষের লগ্নে। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা পৌরসভায় পরিবর্তনে আনায় নির্বাচিত ভারতীয় সদস্যের সংখ্যা কমে যায়। এরপর ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়ন হয়, স্কুল কলেজের অনুমোদন ও স্বীকৃতির ক্ষেত্রে মূল দায়িত্ব দেওয়া হয় সরকারি আমলাদের যাতে হ্রাস হয় ভারতীয় প্রতিনিধিত্ব। এর পাশাপাশি আরও একটি বিষয় জাতীয়তাবাদী ভারতীয় শক্তিকে সংঘটিত করেছিল। সেটি হল বঙ্গভঙ্গ। বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তটি জাতীয়তাবাদীদের কাছে জাতীয় অবমাননা হিসেবে দেখা দিল আর নরমপন্থী আন্দোলনের ক্ষুদ্র ফললাভের কার্যকলাপে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে লাগল চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীরা। ক্রমে ব্রিটিশ দ্রব্য বয়কট অরন্ধন ,রাখীবন্ধন উৎসব , ইত্যাদি পদ্ধতিতে জাতীয় আন্দোলন তার চরম রূপ নিতে থাকল।

জাতীয়তাবাদীদের এই রাজনৈতিক নীতি বদলের প্রেক্ষিতে নাট্য আন্দোলনের একটি সুস্পষ্ট চিত্র ফুটে ওঠে। কংগ্রেসের নরমপন্থী সময়েরও পূর্বে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে উপেন্দ্রনাথ দাসের প্রত্যক্ষ চরম ব্রিটিশবিরোধী কর্মপদ্ধতি-নিঃসন্দেহে একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস বলে মনে হয়। বঙ্গভঙ্গের সময়ে চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের যে রাজনৈতিক তীব্রতা দেখা গেছিল এমনটা বলাই যায়। সেই অর্থে দেখতে গেলে ,অনেকটা সেই ধারারই পূর্বসূরী ছিলেন উপেন , উপেন বস্তুত যুগের দাবীর অনেক আগেই তার রাজনৈতিক পদক্ষেপ পরিকল্পনা করে ফেলেছিলেন। প্রায় তিন দশক পরে ভারতীয়রা যে দাবী ও স্বাভিমান নিয়ে ব্রিটিশের মুখোমুখি হওয়ার সাহস দেখিয়েছিল উপেন সেই প্রতিবাদী , চেতনা নিয়েই তাঁর নাট্য ও রাজনৈতিক কর্মের উদ্যোগ নিয়ে ফেলেছিলেন বলে মনে করাই যায়।

১৮৭৬-এর রাজনৈতিক নাটক ছিল সময়ের তুলনায় অনেকটা এগিয়ে থাকা নাটক। নাট্য দর্শকের মধ্যে জাতীয়তাবাদ বা দেশভক্তি বা স্বদেশচেতনার বোধ গড়ে ওঠার আগেই উপেন্দ্রনাথরা তাঁদের নাট্যক্রিয়া ঘটিয়ে ফেললেন। আগের পরিচ্ছেদে সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। এবারের রাজনৈতিক নাটক হল ‘যুগোপযোগী সাবধানী’ নাটক। সরাসরি রাজনৈতিক নাটক বলাও ভুল। এই নাটক হল খানিক ইতিহাসের আমেজ মিশ্রিত, খানিক দেশাত্মবোধের উত্তাপে জারিত, খানিক রাজনৈতিক ইঙ্গিত বাহিত এবং অনেকটাই ব্যবসায়িক গুণের মিশেল ঘটিয়ে আপাদমস্তক জনদরদী ভাবসম্বলিত নাটক। আগেরবারের বৈপ্লবিক নাটকে ব্যবসায়িক স্বার্থ জড়িয়ে থাকেনি তা নয়। উপেন অমৃত বা সুকুমারীরা যে নাটকের মাধ্যমে যুগবদলের ডাক দিয়েছিল, সেই নাটকের অর্থনৈতিক লাভের দিকেও তাঁদের মনোযোগ রাখতে হয়েছিল। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনগুলিই তার প্রমাণ। *অমৃতবাজার পত্রিকায় হীরক-চূর্ণ* নাটকের বিজ্ঞাপনের ধরনটি লক্ষণীয় (B. Banerjee *Bangiya Natyashalar Itihas* 191)। নাটকের বিক্রিযোগ্য বিষয়গুলি কিভাবে বিজ্ঞাপিত করা হত, তা এই উদাহরণেই স্পষ্ট হবে—

GREAT NATIONAL THEATRE

Sensational Attractions!!

Saturday, 25th December, 1875.

হীরক-চূর্ণ নাটক

THE DEPOSED GAEKWAR!!

The subject is of ‘National’ interest, and the

Performance will be sustained with zeal

And ardour by all the actors and actresses

Of the Theatre.

'Railway train on the Stage'!!

The author himself has kindly consented

To take part in the play.

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, রাজনৈতিক নাটকের ব্যবসায়িক প্রয়োজনকে অস্বীকার করে বাংলা রাজনৈতিক নাটক অনুষ্ঠিত হয়নি। চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন বা মঞ্চে ট্রেন তোলা—সমস্ত নাটকীয় উপাদানের সমাহার ঘটিয়ে নাটককে জমজমাট করে তোলার প্রচেষ্টা তাঁদের ছিল। কিন্তু পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্বপালনের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক বক্তব্যকে প্রবাহিত করে দেওয়ার দায়বদ্ধতা পালন করেছিল বাংলা থিয়েটার। তা সত্ত্বেও আগের বারের নাটকে মানুষ জাগেনি। নাটক সেই ঘুমন্ত মানুষকে জাগ্রত করার প্রয়াস নিয়েছে। বস্তুতই, শুধুমাত্র বিনোদন নয়, নাটকের মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক বক্তব্যকে বাহিত করে জনজাগরণের প্রচেষ্টা করেছে উপেন্দ্রনাথরা। প্রকৃতই শিক্ষকের ভূমিকায় দেখা গেছিল নাট্যজগৎকে। একান্ত আন্তরিক তাগিদ থেকে তাঁদের এই রাজনৈতিক প্রয়াস ছিল। নাট্য জগতের জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনের অঙ্গীকার করেছিলেন তাঁরা।

কিন্তু এবারের নাটক? কেবল সাধারণ অনুসরণকারী? যুগের অনুসরণকারী? সমাজের অনুসরণকারী? দর্শকের অনুসরণকারী? পথপ্রদর্শক নয়, প্রদর্শিত পথের অনুসরণকারী? সম্ভবত দর্শককে পথ দেখানোর গুরুদায়িত্ব নাটক নেয়নি। দর্শক যে পথে হাঁটছে, হাঁটতে চাইছে, সেই পথেই হয়তো সঙ্গ দেওয়ার কাজ করেছে নাটক; আর এই সঙ্গ দেওয়ার কাজের ফাঁকেই সে বুঝে নিয়েছে তার মুনাফা। এই স্বদেশী-রাজনৈতিক নাটকের সঙ্গে নাট্যকার বা নাট্যকর্মীর কোনো আন্তরিক সংযুক্তি হয়তো নেই। দেশের জাতীয় চেতনার দিনে বাংলা নাটকের কর্মী ও কর্মচারীরা স্বাদেশিক ভাবধারায় তেমনভাবে হয়তো মেতে ওঠেনি; সে মূলত অর্থনৈতিক লাভের কথা মাথায় রেখেছে। তার ব্যবসায়িক স্বার্থ চরিতার্থ হয়েছে, ইংরেজ সরকার তেমন ক্ষুব্ধও হয়নি, আবার জাতীয়তাবাদী উদ্যমে হাজিরা দেওয়াও অনায়াস হয়েছে।

প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য খুব সহজভাবেই বলেছেন, 'যে সংগ্রামী মনোভাব দেশবাসীর বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মের মধ্যে রূপায়িত হয়ে উঠেছিল, রঙ্গশালা ও নাটকে তারই প্রতিফলন দেখতে সবাই ছিলেন উদ্‌গ্রীব' (367)। উদ্‌গ্রীব দর্শক যা দেখার জন্য উদগ্রীব, সেই চাহিদাই পূরণ করতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল বাংলা থিয়েটার। গিরিশ ঘোষের একটি বক্তব্য এই সূত্রে মূল্যবান। 'দেখ, যুগধর্ম্ম বলে একটা জিনিষ আছে। এই স্বদেশী যুগে যে প্রবল দেশহিতৈষণার বন্যা ছুটে আসছে, আমাদের রঙ্গালয়কেও সেইভাবে টেনে নিয়ে যেতে হবে। আমার মনে হচ্ছে নাটকের ভিতর দিয়ে দেশহিতৈষণা preach করি। রঙ্গালয়কে powerful করতে এই একটা মস্ত সুযোগ' (qtd. in P. Bhattacharya 403)। রঙ্গালয়কে কী ধরনের 'powerful' করার কথা তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন তা বোঝা কঠিন নয়। যুগের চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে, দেশের মানুষ যা দেখতে চাইছে, ঠিক সেই সেই উপাদানগুলোর যোগান দেওয়া গিরিশের মতো শক্তিশালী নাট্যকারের পক্ষে অত্যন্ত অনায়াস কাজ ছিল। তবে দেশহিতৈষণার যুগের সর্বপ্রকার 'সুযোগ' নেওয়ার ব্যবসায়িক বুদ্ধিকেও অবহেলা করার কোনো উদ্দেশ্য একেবারেই তাঁর ছিল না। আর এই বুদ্ধি বলেই, কি ব্যবসায়িক কি সামাজিক কি রাজনৈতিক সর্ব অর্থেই, 'powerful' হয়েছে বাংলা থিয়েটার। দর্শক যা দেখতে চাইছে ঠিক সেই উপাদান পরিবেশন করতে হলে খানিকটা শাসকের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। কিন্তু তার থেকেও বেশি সুযোগ থাকে জনপ্রিয়তা লাভের। বাংলা নাটক তাই হিন্দু জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ বাঙালি উচ্চবর্ণ ও মধ্যবিত্ত দর্শকের মনের মতো করে হিন্দু জাতীয়তাবাদী সংলাপ ও নাট্যক্রিয়ার বিমোহিত করে 'ন্যাশনালিজম'-এর ডাকে সাড়া দিয়েছে। নামমাত্র ঝুঁকি ও বিরাট জনপ্রিয়তার সম্ভাবনাকে লুফে নিয়ে কয়েক বছরের জন্য বাংলা থিয়েটার সাহসী হয়েছে। সাবধানী সাহসী। সবদিকের হিসেব মিলিয়ে দেখা সাহসী।

নাট্য জগতের এই আপাত-নিরপেক্ষ রূপ ইংরেজ সরকারকে বিশেষ ভাবিত করে তোলেনি বলেই মনে হয়। তাদের রাষ্ট্রনীতির নিয়ম রক্ষার্থে কিছু নাটক বাজেয়াপ্ত হয় ঠিকই। কিন্তু প্রকৃত অর্থে আইনের কঠিন শাসনে বাঁধার কোনো উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না। ১৮৭৬-এ প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক নাটকের মৃত্যু হল। বঙ্গভঙ্গের সময়েও সেই প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক বাংলা নাটকের তেমনভাবে পুনরুজ্জীবন ঘটলো বলে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। রাজনীতি রইল নিশ্চই, কিন্তু সেই রাজনীতির রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক রূপটি হয়তো আর রইলো না। রইলো না, যথেষ্ট প্রত্যক্ষ রাজনীতি। প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক নাটক আর লেখা হল না। যেটুকু রাজনীতি বেঁচে রইল, তা রইল 'নান্দনিক রাজনীতি' হিসেবে। সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায়, 'aestheticized politics'। নাট্যব্যক্তিরা অতি সাবধানী

অবস্থান নিয়ে সরকারকে বুঝিয়ে দিতে চাইল, তাদের কাজ কোনো রাজনৈতিক ক্রিয়া নয়, তাদের কর্মকাণ্ড নিরূপদ্রবভাবে শিল্পসাধনার স্তিমিত গণ্ডিতেই আবর্তিত হবে। সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায় বলছেন, 'Commerce, for this theatre, became the watchword and nation, its fashion' (249)। সরকারের পক্ষে কোনো বিপদ ডেকে আনার উদ্দেশ্য সম্ভবত তাদের নেই। অতি ক্ষীণ তার প্রভাব, অতি দুর্বল তার পরাক্রম, অতি নিস্তেজ তার রেশ।

যাই হোক, একথা উল্লেখ্য যে, প্রথাগত নাট্য ইতিহাস সংক্রান্ত গ্রন্থগুলিতে বাংলা নাট্যকর্মীদের তৈরি করা দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক নাটকের প্রয়াসগুলিকে তাদের নিজেদের আন্তরিক তাগিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার কিছু নিদর্শন দেখা যায়। যেমন, প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য জানাচ্ছেন, 'যুগধর্মের প্রভাবে নাট্যকারেরা কিভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে নাটক রচনা করেছিলেন, দেশপ্রীতির স্বার্থে কারাবরণ করেছিলেন, সখকে সাধনায় পরিণত করে দেশে দেশে জাতীয়তার প্রচার চালিয়েছিলেন, তাকেও বর্তমান আলোচনাতে বাণীবদ্ধ করা হয়েছে (P. Bhattacharya 14)। এই সূত্রে তিনি নাট্যকারদের দেশনেতা ও দেশসেবক হিসেবে বর্ণনা করছেন। লেখকের মতে, নাট্যকারদের এই সাধনা শুধুমাত্র বাণিজ্যিক নয়, তাদের এই উদ্যম 'জাতিগতমূলক ঐক্যভাবনা'কে সূচিত করে। গিরিশ ঘোষের স্বদেশপ্রেমের আলোচনায় প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য বলছেন, 'দেশ ও জাতির প্রতি কর্তব্যের অকৃত্রিম তাগিদ মনেপ্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই... রণরঙ্গমুখর ঐতিহাসিক কাহিনীতে দৃষ্টিপাত করেন' (411)। আবার দর্শন চৌধুরীর ভাষায়, '১৯০৫-এর ৬ সেপ্টেম্বর, যেদিন 'বঙ্গভঙ্গ' করার কথা ঘোষোণা করলেন লর্ড কার্জন, সেদিন সমগ্র বাঙালি জাতির সঙ্গে বাংলা রঙ্গালয়গুলিও অশৌচ পালন করেছিল' (D. Chowdhury *Bangla Theatretreer Itihas* 197)। কিংবা আরও এক জায়গায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষের স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠের ঘটনাকে দর্শন চৌধুরী এইভাবে ব্যাখ্যা করছেন 'যে গিরিশ বিগত ২৫ বছর ধরে আর কোনো ঐতিহাসিক বা দেশপ্রেমমূলক নাটক লেখেননি, তিনিও ১৯০৫-এর উন্মাদনার সময়ে পরপর তিনখনি এই ধরনের নাটক লিখে ফেললেন। পুলিশের রক্তচক্ষু তখন তাঁকে ভীতসন্ত্রস্ত করতে পারেনি' (*Bangla Theatretreer Itihas* 158)।

এই সূত্রে একটি প্রশ্ন এসে যায়। নাটককে বলা হয় 'সমাজের দর্পণ'। সেই কারণে নাটকের মধ্যে দিয়ে তৎকালীন সমাজের একটা ছবি দেখতে পাওয়া যায়, এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই নাট্য সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে নাট্যকার বা নাট্যজগতের আন্তরিকতাকে খুঁজে বের করাটা কতটা সঠিক সে বিষয়ে সন্দেহ থেকে যায়। নাটক নিয়ে ইতিহাস লিখতে গিয়ে এই এক মহা সমস্যা। নাট্য জগৎ যে যে নাটক যে যে সময়ে উপস্থাপিত করেছে, তার মাধ্যমে

জনগণের চাহিদা ও রুচির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় ঠিকই। কিন্তু তাই বলে সে নাটকটি নাট্যকর্মীদেরও মানসিকতার প্রতিফলন হিসেবে ধরলে ইতিহাস বিশ্লেষণটি খণ্ডিত হয়ে পড়তে পারে। লিখিত বা প্রযোজিত নাটকের সঙ্গে নাট্যকার ও কর্মীদের আন্তরিকতা না থাকাটা অসম্ভব নয়। নাটক তাদের কাছে পেশা। পেশাকে টিঁকিয়ে রাখার তাগিদে তাদের সমস্ত মনোজগৎ অনেকাংশেই নিবেদিত থেকে যেতে পারে। অন্তত বিশ শতকীয় ঐতিহাসিক নাটকগুলি সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে। সেই নাটকে যদি সামাজিক রাজনৈতিক বা ধর্মীয় প্রতিচ্ছায়া উঠে আসে তাহলে নিঃসন্দেহে সেটা দর্শকসমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের চাহিদাকেই প্রতিফলিত করে। কিন্তু তাই বলে সেটা নাট্যগোষ্ঠী ও নাট্যকারের চাহিদাকেও প্রতিফলিত করে—এমন কথা বাংলা নাটকের প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস দাবী করলেও, তাকে হয়তো নিঃসন্দেহ চিত্তে মানা যায় না।

এই সূত্রে ক্ষেত্র গুপ্তের একটি পর্যবেক্ষণ অবশ্য আলোচ্য। ১৯০৫ থেকে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের মাঝে গিরিশ ঘোষ মোট এগারোটি নাটক লিখেছিলেন। ‘তার মধ্যে মাত্র তিনটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। অপর আটটি নাটকে এই আন্দোলন-উত্তেজনার কোনো বক্র প্রতিফলনও নেই। চারদিকে যে উৎসাহ-উদ্দীপনা চলছিল গিরিশের চিত্তকে তা স্পর্শ করেছিল, ব্যক্তিত্বকে ভেদ করতে পারেনি... সুচতুর মঞ্চপরিচালকরূপে তিনি জনতার উদ্দীপনা ভাঙ্গিয়ে ব্যবসা করার সম্ভাবনা দেখেছেন’ (K. Gupta, *Sirajuddaula* 11)।

প্রথাগত নাট্য ইতিহাসকাররা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে রচিত ও নির্দেশিত বাজেয়াপ্ত নাটকগুলিকে বাংলা নাট্যকর্মীদের স্বদেশিয়ানায় উদ্বুদ্ধ চরিত্র প্রতিষ্ঠায় উল্লেখ করেন। তাঁদের এই প্রয়াসগুলিকে স্বদেশী আন্দোলনে অংশ নেওয়ার সমান হিসেবে ধরে থাকেন। নাট্য ইতিহাসে লেখা থাকে না যে, তৎকালীন নাট্য ব্যক্তিরা এই নাটক লিখেছিলেন সম্ভবত দর্শকের স্বার্থে। হয়তো বা দর্শকের চাহিদামাফিক সৃষ্টি হয়েছিল তাঁদের নাট্যক্রিয়া। নিজেদের তাড়না থেকে হয়তো উদ্‌ভূত হয়নি তাঁদের নাটকাবলী। তাঁদের নাটক সমাজের দর্পন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের নাটক তাঁদের নিজেদের দর্পন নাও হতে পারে। সৃষ্ট নাটক সবসময়ে তার সৃষ্টিকর্তার ছবি হয়তো তুলে ধরে না। সৃষ্ট যতই দুঃসাহসিক হোক, সৃষ্টিকর্তা লুকিয়ে থাকতেও পারেন সাবধানতার অন্তরালে।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক রাজনীতি

মার্ক্সবাদী ইতিহাসবিদ্ কে. এন. পানিক্কর ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে লেখা তাঁর Culture and Communalism নামে একটি প্রবন্ধে এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিটিকে যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তা আজকের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি

ও সংস্কৃতিকর্মীদের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তিনি বলছেন, আজকের হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার উত্থানকে সাধারণত একটি রাজনৈতিক ঘটনা হিসেবে মনে করা হয়। ফলে তার প্রতিরোধের পদ্ধতিগুলিও এই রাজনৈতিক গণ্ডীর ভেতরেই খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়। অ-সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলি, যেমন রাজনৈতিক পার্টি, দল, সংগঠনগুলি প্রতিবাদের হাতিয়ার স্বরূপ মিছিল মিটিং অনশন ইত্যাদি রাজনৈতিক পন্থাগুলিকেই অবলম্বন করে থাকে। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার মূল লক্ষ্য শুধু রাজনৈতিক নয়। ভোটে জেতা বা ক্ষমতায় আসাটা বরং পুরো সাম্প্রদায়িকীকরণের শেষ ফলাফল হিসেবে ধরে নেওয়া দরকার। বরং বিষয়টিকে তিনি এইভাবে ব্যাখ্যা করছেন যে, সাংস্কৃতিক পরিসর ও দেশের মানুষের জীবনাদর্শে সাম্প্রদায়িকতার সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার ফলস্বরূপ ভোট প্রক্রিয়ায় তারা সফল হচ্ছে। তার মানে দাঁড়ায় এই, সাধারণ মানুষের নিজস্ব জীবনের সংস্কৃতিকে বশে আনাই হল হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার মূল লক্ষ্য। রাজনীতির সঙ্গে এই ধর্ম-সংস্কৃতির জগৎকে অবিচ্ছিন্ন করে দিয়ে তাদের এই সাফল্য সূচিত হচ্ছে (24)।

বিভিন্ন সময়ে সংস্কৃতির সংজ্ঞাটিকে নানান ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। অসংখ্য এর সংজ্ঞা। Clifford Geertz যেমন সংস্কৃতির সংজ্ঞা আলোচনার ক্ষেত্রে যেভাবে বলছেন, '...the image of a constant human nature independent of time, place, and circumstance, of studies and professions, transient fashions and temporary opinions, may be an illusion, that what man is may be so entangled with where he is, who he is, and what he believes that it is inseparable from them. It is precisely the consideration of such a possibility that led to the rise of the concept of culture and the decline of the uniformitarian view of man' (*The Interpretation of Cultures* 35).

গিয়ার্টস-এর কথার সূত্রে ধরে বলা যায়, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাও তার মতো করে একটি সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে। এই সংজ্ঞার মধ্যে একটি সামগ্রিকতার ভাব আছে; রাজনীতি, ধর্ম ও সমাজকে একত্রিত করে সংস্কৃতির সংজ্ঞাটি গড়ে তোলা হয়েছে। ফলে সংস্কৃতি আর জাতীয় জীবনের একটি ক্ষুদ্র উপকরণ মাত্র নয়। বরং সংস্কৃতিই হল জাতীয় জীবনের একটি সামগ্রিক প্রতিনিধি স্বরূপ। অর্থাৎ হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা রাজনীতি ও সংস্কৃতির মাঝে কোনও পার্থক্য রাখে না। বরং সংস্কৃতিকে রাজনীতিরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে মনে করতে চায়। এই হিন্দু সাম্প্রদায়িক ভাবনাটিকে নানা সময়ে নানাভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। ১৯৩০ থেকে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে

গোলওয়ালকরের লেখাগুলিকে নিঃসন্দেহে এই ভাবনাগুলি গড়ে তোলার পথপ্রদর্শক বলা যেতে পারে। গোলওয়ালকরের ভাষায়, 'The foreign races in Hindusthan must either adopt the Hindu culture and language, must learn to respect and hold in reverence Hindu religion, must entertain no idea but those of the glorification of the Hindu race and culture, i.e., of the Hindu nation and must lose their separate existence to merge in the Hindu race, or may stay in the country, wholly subordinated to the Hindu Nation, claiming nothing, deserving no privileges, far less any preferential treatment -not even citizen's rights.' (55)।

এই সূত্রে মনে করা যায়, আমরা হয়তো ভুলে গেছি যে রাজনীতি হল আমাদের জীবনের একটি অংশ মাত্র। জীবন রাজনীতির থেকে আরও অনেক মহৎ ও বৃহত্তর। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ রাজনীতি নয়, সংস্কৃতি। যদিও মনুষ্য জীবনে সংস্কৃতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা গোলওয়ালকরের উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি আসলে ধর্মকে মূল মঞ্চের মধ্যে এনে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সংস্কৃতিকে ব্যবহার করেছেন মাত্র। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তাঁর মতে ধর্ম ও সংস্কৃতি একই জিনিস। তাঁর মতে, ধর্ম হল জীবনের সমস্ত কিছুর আধার। আমাদের জীবনের সব কাজ, রাজনৈতিক, ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা সামাজিক, সব কাজই আসলে ধর্মীয় কাজ। আমরা যা, তা সম্পূর্ণভাবে আমাদের ধর্ম দ্বারাই বানানো। তাই আমাদের ধর্মই আমাদের সংস্কৃতিকে গড়ে তুলেছে। ধর্মেরই শরীরের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হল সংস্কৃতি। ধর্ম ও সংস্কৃতিকে আলাদা করা অসম্ভব। গোলওয়ারের ভাবনাগুলিকে এভাবেই বিশ্লেষণ করে দেখেছেন পানিক্কর।

আজকের ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির স্বার্থে পানিক্করের এই সাবধানবাণীকে সতর্ক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করা দরকার হয়ে পড়ে বলে মনে হয়। আজকের ধর্মীয় উন্মাদনা ও সাম্প্রদায়িক দলাদলির মুহূর্তটির শিকড় খুঁজতে গেলে ফিরে তাকাতেই হয় উনিশ বিশ শতকীয় সমাজের দিকে। 'নতুন' ভারতের সংজ্ঞা নির্ধারণে যেভাবে সাবেকি হিন্দুয়ানির বৈশিষ্ঠ্যগুলি ওতপ্রোত জড়িয়ে পড়েছিল, আজকের সংস্কৃতি ও সেই উপকরণগুলিকে ছাড়িয়ে উঠতে পারেনি। উনিশ শতকীয় বাংলা নাট্য প্রবাহের যে বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাতে নাট্যকর্মীরা চলেছে যুগের তালে তাল মিলিয়ে; তাঁদের ব্যক্তিগত কোনো রাজনৈতিক তাগিদ তাঁদের প্রায় তেমন ভাবে অনুপ্রাণিত করেনি বললেই চলে। খুব সামান্য কয়েকজন নাট্যকর্মী ও সংস্কৃতিকর্মীরা স্বাদেশিকতার প্রবাহে উৎসাহিত হয়ে থাকলেও মূলত সেটা ছিল বিক্ষিপ্ত কিছু প্রয়াস। সামগ্রিক নাট্যসমাজকে এই প্রবাহের অংশীদার মনে করার মধ্যে হয়তো সীমাবদ্ধতা থেকে যায়।

আজকের সমাজে দাঁড়িয়ে বিভেদকামী হিন্দুত্বের প্রতিরোধী আন্দোলন উনিশ শতকীয় পথে চললে গভীর বিপদ আসবে একথা বলতে দ্বিধা থাকে না। নিজেদের সংস্কৃতিচর্চাকে আর রাজনীতির রণাঙ্গন থেকে নিরাপদ দূরত্বে না রেখে সংস্কৃতি, রাজনীতি ও সামাজিক আদর্শের সম্মিলনে গড়ে তুলতে হবে প্রতিরোধী কণ্ঠস্বর। রাজনীতিকে বাদ রেখে সংস্কৃতি অথবা সংস্কৃতিচর্চাকে বাদ রেখে রাজনীতি, কোনোটাই আর হওয়ার উপায় নেই। হিন্দু জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠুক সংস্কৃতির আঙ্গিনা থেকেই; এ ছাড়া আর পথ নেই।

অধ্যায় ৪

বাংলা নাটকের মঞ্চসজ্জাঃ বিকল্প ইতিহাস রচনার সম্ভাবনা

বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস রচনার কাজে নাট্য প্রযোজনাগুলির মঞ্চস্থাপত্য ও মঞ্চসজ্জা নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার ছিল। প্রায় সমস্ত নাট্যতত্ত্ব গ্রন্থগুলিতে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের নাট্য মঞ্চায়ন নিয়ে কোনো বিশ্লেষণ নেই বললেই চলে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, উনিশ ও বিশ শতকের কলকাতার থিয়েটারের ইংরেজি ও বাংলা মঞ্চসজ্জাগুলি নিয়ে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু যেটুকু তথ্য পাওয়া যায়, তার মধ্যে থেকেও কোনও ইতিহাস খুঁজে আনার প্রচেষ্টা বাংলার অধিকাংশ নাট্য ইতিহাসবিদ্‌রা করেননি বলেই মনে হয়। এমনকি বহু ক্ষেত্রে সেই প্রামাণ্য তথ্যগুলির নামমাত্র উল্লেখও দেখা যায় না। একটি স্পেস বা স্থান কীভাবে ইতিহাস তৈরি করে বা একটি সমাজ কীভাবে একটি স্থানের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করে, এই বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে হয়তো বাংলা নাট্য প্রযোজনাগুলির মঞ্চসজ্জাগুলির যথেষ্ট ভূমিকা পালনের ক্ষমতা ছিল। শুরুতে সাদামাটা মঞ্চনির্মাণ, ক্রমে দৃশ্যপটের ব্যবহার ও তারপর বাংলা নাট্য প্রযোজনার মধ্যে কীভাবে বিদেশি প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্তি ঘটতে থাকল, নানান চমকপ্রদ মঞ্চ কৌশলের ব্যবহার হতে থাকল, এই নিয়েও বিস্তৃত বিশ্লেষণ সম্ভব ছিল বলে মনে হয়। দৃশ্যপট অঙ্কনের জন্য যে পটুয়াদের বাংলা রঙ্গমঞ্চে আনা হয়েছিল, পরবর্তীকালে তাঁদের সঙ্গে কলকাতার থিয়েটারের সমীকরণটি কীরকম হয়ে দাঁড়ালো, সেই আলোচনাও ইতিহাস রচনায় যথেষ্ট প্রয়োজনীয় ছিল। অথচ বাংলা নাট্য ইতিহাস রচয়িতাদের কর্মকাণ্ডে প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ বা মঞ্চস্থাপত্য ও মঞ্চসজ্জা নিয়ে এক ধরনের অন্যমনস্কতা চোখে পড়ে। নাটকের মঞ্চসজ্জাকে কেন্দ্রে রেখে ইতিহাস বিশ্লেষণের কোনো প্রয়াস করা হয় না বলেই মনে হয়।

উনিশ শতকের শেষভাগ ও বিশ শতকের সূচনার সময়টি ঐতিহ্যবাহী পুরোনো ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির তুলনায় অনেকটাই পৃথক। শিল্প ক্ষেত্রে স্টাইল বা টেকনিকের দিক থেকে শুধু নয়, প্রতিটি শিল্পীর শিল্পকর্ম, তাঁর শিল্প আদর্শ, তাঁর শিল্প বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল স্বতন্ত্র। একজন শিল্পী অপর শিল্পীর থেকে দর্শনগত ও শিল্পগত ভাবে হয়ে পড়েছিল অনেকটাই আলাদা। ঐতিহ্যবাহী পুরাতন সংস্কৃতির সঙ্গে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শুরু হয়েছিল নতুন প্রযুক্তির যুগ। বিশ শতকীয় অঙ্কন রীতির আলোচনায় রতন পারিমু বলছেন, 'The confrontation of the traditional society and its established set of values with the values thrown up by the modern technological age has resulted in many conflicts and problems' (1)। ঐতিহ্যের সঙ্গে এই প্রবল

সংঘর্ষের বিষয়ে অনেক কাজ করেছেন সমাজবিজ্ঞানীরা। কিন্তু নাট্য ইতিহাসের ক্ষেত্র থেকে এই সংঘর্ষের বিশ্লেষণ করার যথেষ্ট পরিসর আছে বলে মনে হয়। বিশেষত নাট্য স্থাপত্যশিল্প বা মঞ্চসজ্জার আলোকে এই বিষয়টিকে বিচার করার প্রয়োজন ও সুযোগ অবশ্যই আছে বলেই বর্তমান অধ্যায়টির অবতারণা।

বাংলা থিয়েটারের জন্ম কলকাতার ইংরেজি থিয়েটারের অনুকরণে। সুতরাং সেই কলকাতার বিদেশি রঙ্গালয়গুলি বাংলা নাটকের মঞ্চসজ্জার বিশেষ সহায়ক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা বহন করে। কলকাতার বিদেশী রঙ্গালয়গুলিতে যে ধরনের অভিনয় হত, তার কিছুটা প্রভাব যে বাংলা রঙ্গমঞ্চে পড়তে বাধ্য, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এই অধ্যায়ের ‘সাধারণ মঞ্চাঙ্গনে শিল্পভাবনা ও নিম্নবর্গের প্রস্থান’ অংশে সে ব্যাপারে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে। আবার এই বিদেশী রঙ্গালয়গুলি হুবহু ইংল্যান্ডের তৎকালীন থিয়েটার ঐতিহ্যকে বহন করত। ইংল্যাণ্ডের অনেক অভিনেতা বা তাঁর সন্তান বা পরিবারের লোকেরা এই কলকাতার ইংরেজি থিয়েটারে অভিনয়ও করতেন। তাঁদের এই অভিনয় ও তাঁদের নাটকের মঞ্চায়নের পদ্ধতিগুলিই হল বাংলা থিয়েটারের পথ প্রদর্শক। যদিও কলকাতার বিদেশি রঙ্গালয়ের নাট্য প্রযোজনার প্রত্যক্ষ প্রভাব বাংলা রঙ্গালয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল খুব কম। কারণ বিদেশি ও এদেশি নাট্য কুশীলবরা খুব কম ক্ষেত্রেই একত্রিত হয়ে কোনো নাট্য প্রযোজনা করেছেন। সে বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে। কিন্তু বিদেশি রঙ্গালয়ের পরোক্ষ প্রভাব যে বাংলা মঞ্চের পরিসরে খুব ভালো ভাবেই পড়েছিল, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, এই অধ্যায়ে বিভিন্ন আলোচনায় সে প্রসঙ্গ উত্থাপিত হবে। ফলে বাংলা নাট্য প্রযোজনার মঞ্চসজ্জার আলোচনায় সেই সময়কার ইংল্যাণ্ডের নাট্য প্রযোজনাগুলিকেও বিশ্লেষণের আওতায় আনা যেতে পারত। অথচ এই ধরনের কোনো চেষ্টাই তেমন ব্যাপকতা পায়নি। দুই একজন নাট্যতাত্ত্বিক এই প্রচেষ্টা করেছেন ঠিকই। যেমন নীরদবরণ হাজরা ও কৌশিক স্যান্যাল বাংলা নাটকের মঞ্চসজ্জা ও মঞ্চসজ্জা নিয়ে একটি ধারাবাহিক ইতিহাস লেখার উদ্যোগ নিয়েছেন। রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাটকগুলির আলোচনায় কোনো স্থানে মঞ্চসজ্জা নিয়ে খানিক আলোকপাত করেছেন। কিন্তু এই সমস্ত প্রচেষ্টাই অত্যন্ত একক ব্যক্তি ভিত্তিক। বাংলা থিয়েটারের প্রথাগত ইতিহাসের মধ্যে এই বিবরণীর স্থান হয়নি।

কেন এই অবহেলা? মঞ্চসজ্জার ইতিহাসকে কেন মূল স্রোতে স্থান দেওয়া হল না? নাটক তো কেবল স্ক্রিপ্ট নয়। নাটকের ইতিহাস গ্রন্থে তো কেবল টেক্সট-এর ঐতিহাসিক আলোচনা করা হয় না। কবে কোন মঞ্চে নাটকটি মঞ্চস্থ হল, কোন অভিনেতা কোন চরিত্রে অভিনয় করলেন, নাটকটি কেমন খ্যাতি পেল সমস্ত আলোচনাই নাট্য

ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। কিন্তু নাটকগুলির মঞ্চসজ্জা নিয়ে নামমাত্র উল্লেখ করেই নাট্য ইতিহাস গ্রন্থগুলি নিশ্চুপ থেকেছে। কেন এমন হল? মঞ্চসজ্জা নিয়ে ইতিহাস খুঁড়ে দেখার কোনো প্রয়াস কেন নেওয়া হল না, সেই প্রশ্ন থেকে যায়। বর্তমান অধ্যায়ে নাটকের মঞ্চায়ন প্রসঙ্গে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে থাকা তথ্যগুলিকে একত্রিত করা হবে এবং তৎকালীন যুগের আলোয় সেই তথ্যগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করা হবে। প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসের বিদ্যাশৃংখলায় দৃশ্যসজ্জা ও মঞ্চসজ্জার ইতিহাসের স্থান হল না কেন, সে প্রশ্নের উত্তর খোঁজারও একটি প্রয়াস করা হবে।

ইংল্যান্ডের স্মৃতি ও কলকাতার ইংরেজি থিয়েটার

আঠেরো শতকের কলকাতার বাসিন্দা ইংরেজ কর্মচারীদের কাছে লণ্ডন ছিল তাদের পুরাতন অস্তিত্বের মতো। লণ্ডন জীবনের নস্টালজিয়া, লণ্ডনে থাকাকালীন জীবনের অভ্যাস ও লণ্ডনবাসী জীবনের রুচি ও পছন্দ মতো তারা কলকাতাকে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিল (Sudipto Chatterjee 17)। গড়ে উঠল 'সাদা শহর'। কলকাতার একটি প্রান্তকে তারা নিজেদের আমোদ প্রমোদের সুবিধে মতো বানিয়ে নেওয়ার জন্য নির্ধারণ করে নিল। সেখানে 'কালো' ভারতীয়ের প্রবেশ নিষেধ। সে অঞ্চল শুধু ইংরেজদেরই। সেখানে কিছু অন্যান্য ইউরোপীয় মানুষও বসবাস করতেন ঠিকই। কিন্তু এইসব জায়গায় ইউরোপীয়ানদের মধ্যে মূল আধিপত্য ছিল ইংরেজদেরই। মধ্য কলকাতার ক্লাইভ স্ট্রীট-এসপ্ল্যানেড-ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট-বৌবাজার-চাঁদনী চক-আর্মেনিয়ান স্ট্রীট এলাকা সহ বিস্তৃত ক্ষেত্রকে তারা বেছে নিল নিজেদের জায়গা হিসেবে।

ন্যাশনাল অ্যাটলাস এণ্ড থিমেটিক ম্যাপিং অর্গানাইজেশন থেকে প্রকাশিত ১৭৮৪ ও ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দের কলকাতার মানচিত্রে এই স্পষ্ট বিভেদটি প্রতিফলিত হয়েছে। Lt. Col. Mark Wood-এর আঁকা ম্যাপটিতে একটি ছোট বিবৃতি লেখা আছে (Lt. Col. Mark Wood সংযোজনী ৩)। বিবৃতিটি এইরকম,

'EXPLANATION

Those parts of the Town which are inhabited by Europeans are dotted (except Chowringhy) to distinguish them from those inhabited by the Natives'. (14-15)

অর্থাৎ শহরের মানচিত্র নির্মাণেও এদেশীয়দের আলাদা অবস্থান দিতে চেয়েছিল ব্রিটিশরা। কলকাতার মানচিত্রে সাহেব পাড়ার বসতি ও কালো মানুষের বসতিগুলোকে একেবারে আলাদা আলাদা নক্সা দিয়ে চিহ্নিত করা

হয়েছিল। শহরের এই অংশের মধ্যে তারা গড়ে তুলতে থাকল লণ্ডনের প্রতিচ্ছায়া; ঔপনিবেশিক লণ্ডন। ভৌগলিক অবস্থানের দিক থেকে তারা লণ্ডনের দূরে, কলকাতার আবহাওয়াও লণ্ডনের মতো নয়—তবু লণ্ডনের স্মৃতিকে অটুট রেখে হুবহু তার অনুকরণে তাদের ইংরেজ কায়দার জীবন চলতে থাকল। জীবনের সর্বত্র তারা তাদের পুরনো অস্তিত্বকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইল। এমনকি স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও তারা লন্ডনের স্থাপত্য আঙ্গিককেই অনুসরণ করতে থাকল।

উনিশ শতক থেকে এই স্থাপত্য আঙ্গিকটাই হয়ে উঠল তাদের প্রশাসনিক শক্তি প্রদর্শনের প্রতীক। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ হয়। ভারতীয় সৈনিকদের বিদ্রোহকে দমন করে শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জফরকে উৎখাত করে সাম্রাজ্যের দায়িত্ব পেল ব্রিটিশ। তারা নতুন শাসক হিসেবে নিজেদের শক্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাইল। শক্তি প্রদর্শনের একটি ধরন হিসেবে তারা বেছে নিল স্থাপত্য নির্মাণ পদ্ধতিকে। Thomas Mecalf এই প্রসঙ্গে বলছেন, 'In the colonial environment the bricks and mortar carried with them especially far-reaching significance. The choice of styles, the arrangement of space within a building, and of course the decision by the government to erect a particular monument, all testified... to a vision of empire' (37)। এই স্থাপত্যগুলি শুধু প্রশাসনিক কাজের জন্যই তৈরি হল না। এগুলি আসলে ব্রিটিশ রাজের শাসনের স্তম্ভ। এ তাদের শাসক হিসেবে অহংকার প্রতিষ্ঠার কীর্তিস্বরূপ। এদেশীয় মানুষের কাছে বিস্ময় ও শ্রদ্ধা আদায় করার এবং নিজেদের উন্নততর জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার এক অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে তাদের এই প্রয়াস (Metcalf 39)। পাশাপাশি তারা এদেশীয় জলবায়ু ও জীবনধারণের ধরনটিকেও মিলিয়ে মিশিয়ে দিল তাদের স্থাপত্যশিল্পে। মেটকাফ বলছেন, 'As a result, all agreed that successful colonial building involved the incorporationor or adaptation of some elements of indeginous design' (38)। হিন্দু ও মুঘল স্থাপত্যকলার সঙ্গে ইউরোপীয় ঘরানার স্থাপত্যশৈলীর মিশ্রণে গড়ে উঠেছিল এক নতুন স্থাপত্য আঙ্গিক। গথিক ও নিও ক্ল্যাসিক্যাল স্থাপত্য আঙ্গিকের সঙ্গে মিশে হিন্দু ও মুঘল শিল্পের একটি বিশেষ তাৎপর্য তৈরি হয়েছিল সেই কলকাতায়।

ইংরেজরা নিজেদের প্রমোদের জন্য লালবাজারে দুইটি আলাদা বাড়ি তৈরি করেছিল। 'এই বাড়ী দুইটির নাম ছিল, *The Harmonicum* ও *The London Taverns*। *The London Taverns* বাড়িটির নামটি থেকেই বোঝা

যাচ্ছে ইংরেজদের মধ্যে লণ্ডন জীবনের স্মৃতি তখনো কতটা প্রকট হয়ে উপস্থিত ছিল। 'এই দুই প্রমোদাগারে মধ্যে মধ্যে নাচ, গান, কনসার্ট, বাজী ইত্যাদির আয়োজন ও অনুষ্ঠান হইত'। (D. Mukhopadhyay, *Rangamancha Shraban*)। এই বাড়ী দু'টির পাশাপাশি তৈরি হল নাট্যশালা। ফেলে আসা লণ্ডন জীবনের সঙ্গে সূত্রায়িত থাকার এক অন্যতম আশ্রয় হিসেবে ইংরেজরা তৈরি করল নাট্য অভ্যাস। লণ্ডনের মতো আভিজাত্য রইল না, লণ্ডনের মতো পেশাদার অভিনেতা জুটল না। তবু আমেজটা বাঁচিয়ে রাখতে, অভ্যাসটা অটুট রাখতে তৈরি হল প্লে-হাউস। ইতিহাসে যাকে আমরা *ওল্ড প্লে-হাউস* হিসেবে চিনি। প্রশাসনিক কাজের একঘেয়েমি আর বৈচিত্র্যহীন বিদেশ জীবনে ক্লান্ত ইংরেজরা কাজের শেষে বিনোদনের উপায় হিসেবে খুলে ফেলল প্লে-হাউস। আঠেরো শতকের মাঝামাঝি (১৭৫৩) লালদীঘির পূর্বদিকে বর্তমান মার্টিন বার্ণ অফিস বাড়ির স্থানটিতে তৈরি হয়েছিল এই রঙ্গালয় (S. Mukherjee 2)। সেই সময়কার অন্যান্য অট্টালিকার মতো নাট্যশালাও তৈরি হয়েছিল ইংল্যাণ্ডের গঠনরীতি অনুসরণ করে। এটি কবে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। যদিও ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে এই নাট্যশালায় অভিনয়ের প্রমাণ মেলে। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে নয়, নাট্যশালাটি তৈরি হয়েছিল ইংরেজ জনগণের চাঁদার টাকায় এবং চলতও কলকাতা নিবাসী থিয়েটার উৎসাহী ইউরোপীয় মানুষদের ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায়। এই নাট্যশালায় যে নাটক হত, তাতে কোনো লাভ থাকত না। শিল্পী ও নাট্য উদ্যোক্তারা সকলেই ছিল শখের নাট্যকর্মী। এমনকি অভিনয় করে বেশিরভাগ সময় খরচের টাকাটাও উঠত না। জনগণের চাঁদায় জনগণের উৎসাহে জনগণের প্রয়োজনে এই নাট্যশালা বেশ অনেক বছর কলকাতায় নাট্যাভিনয় করেছিল। ১৭৫৬–তে সিরাজ-উদ-দৌল্লা কলকাতা আক্রমণ করে। সেই সময় সিরাজ এই থিয়েটারটি অনেকটাই ধ্বংস করে দেয় ও সঙ্গে সঙ্গে এই থিয়েটারে সমস্ত নাট্যচর্চা বন্ধ হয়ে যায় (Amal Mitra 5)। বিশ শতকের শুরুর সময়েও সেই নাট্যশালাটির কিছু অবশেষ পড়ে ছিল বলে জানা যাচ্ছে। ব্যোমকেশ মুস্তাফী জানাচ্ছেন, 'কলিকাতার নবগঠিত ঐতিহাসিক সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক মিঃ ফার্মিঞ্জারের তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে ইহার স্থান এবং গৃহাবশেষ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে...... তাঁহার অনুসন্ধানে এই প্রাচীরটিই সেই আদি নাট্যশালার সম্মুখের প্রাচীর বলিয়া নির্ণীত হয়' (D. Mukhopadhyay *Rangamancha Shraban* 25)।

ওল্ড প্লে-হাউসটি ধ্বংস হওয়ার পর ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে প্রায় এক লাখ টাকা খরচ করে তৈরি হয় নিউ প্লে-হাউস বা *ক্যালকাটা থিয়েটার*। 'তখনকার প্রধান প্রধান সাহেবেরা প্রত্যেকে ১০০্ টাকা করিয়া চাঁদা দিয়া এই টাকা উঠাইয়া ছিলেন' (D. Mukhopadhyay, *Rangamancha Shraban* 44)। বলা বাহুল্য এদেশের মাল-মশলা,

অর্থনৈতিক অবস্থা, দেশীয় কারিগর, আবহাওয়া ইত্যাদি সমস্ত কারণে প্লে-হাউসগুলো লণ্ডনের নাট্যশালাগুলোর মতো আকারে ও আয়তনে তেমন বড়ো হত না বলেই মনে করা হয়। বিদেশী স্থপতি ও নাট্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে এই রঙ্গালয়গুলি বানানো হত ঠিকই, কিন্তু লণ্ডনের নাট্যশালাগুলোর মতো জাঁকজমক কলকাতার এই নাট্যলয়গুলিতে সম্ভবত ছিল না। ব্রিটিশ থিয়েটারের প্রভাবশালী অভিনেতা ডেভিড গ্যারিক অনেক সময়েই কলকাতা থিয়েটারের জন্য অনেক সাহায্য ও পরামর্শ পাঠাতেন। নিউ প্লে-হাউস তৈরি হওয়ার পর তিনি বার্নাড মেসিংক নামের এক অভিনেতাকে পাঠান। সেই অভিনেতা নাকি গ্যারিকের কাছ থেকে মঞ্চে ব্যবহারের জন্য কয়েকটি অঙ্কিত দৃশ্যপট নিয়ে এসেছিল (Amal Mitra 7)। অনুমান করা হয়, প্রতি-উপহার স্বরূপ, 'এই নাট্যশালার অধ্যক্ষগণ বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা ডেভিড গ্যারিককে দুই পিপা 'মেদিরা' নামক উৎকৃষ্ট মদ্য পাঠাইয়া দেন' (D. Mukhopadhyay, *Rangamancha Shraban* 24)।

পরবর্তীকালে আরও বেশ কিছু ইংরেজি থিয়েটার তৈরি হতে থাকে। মিসেস ব্রিস্টোর থিয়েটার, হোয়েলার থিয়েটার, এথেনিয়াম থিয়েটার, দমদম থিয়েটার, সাঁসুচি থিয়েটার, বৈঠকখানা থিয়েটার, চৌরঙ্গি থিয়েটার এইরকম নানান থিয়েটারে ধীরে ধীরে কলকাতা ভরে উঠতে থাকে (S. Mukherjee 3-5)। নব্য ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি বাবুরা সাহেবদের এই থিয়েটারে আগ্রহী হয়ে উঠল। শহরের গণমান্য বিশিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তি মিলে তৈরি করল অ্যামেচার ড্রামাটিক সোসাইটি। এদেশীয়দের মধ্যে একমাত্র সদস্য ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। আঠেরো শতকের শেষের দিকে এই বাঙালি বাবুরা ব্রিটিশদের নাট্যশালায় নাটক দেখা শুরু করল। যদিও নাট্যশালাগুলির নাটক ও অভিনয়ের মূল দর্শক ছিল ব্রিটিশ ও কলকাতা নিবাসী ইউরোপীয়ানরাই। বাঙালি দর্শকের কথা ভেবে নাটক নির্ধারিত হত না। নাটকগুলি প্রযোজনা করা হত একান্ত ভাবেই ইউরোপীয় দর্শকের বিনোদনের কথা মাথায় রেখে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাঙালি বড়লোক বাবু সেই থিয়েটারের শেয়ার কিনতেন, নাট্যশালার লাভ ক্ষতির ভাগ নিতেন। কিন্তু সেই বাবুদের দর্শক হিসেবে ব্রিটিশ রঙ্গালয়গুলি কখনোই গ্রহণ করেনি। বাঙালিরা তাদের উদ্দিষ্ট দর্শক ছিল না। বাঙালি ও ব্রিটিশদের মধ্যে এই স্পষ্ট সাংস্কৃতিক বিভাজনটিকে মেনে নিয়েই বাবু সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ ব্রিটিশ থিয়েটারের সাক্ষী থাকতে যেত। ব্রিটিশদের থিয়েটারে এই বাবুদের অনুপ্রবেশ থেকেই পরবর্তীকালে জন্ম নিয়েছিল বাঙালির থিয়েটার।

প্রিন্সেপের ব্রিটিশ থিয়েটারঃ বিদেশী ভাষা, বিদেশী শরীর, বিদেশী মঞ্চ এবং দেশী কারিগর

নিজের শহর থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছিল ইংরেজরা। সেই শূন্যস্থান ভরাট রাখার কোনো খামতি রাখেনি তারা। ইংল্যাণ্ডের রঙ্গশালার তুলনায় হয়তো জাঁকজমক ও আয়তনে অনেক ছোট ছিল কলকাতার রঙ্গশালাগুলো। কিন্তু তাতে মলিনতার কোনো জায়গা ছিল না। চৌরঙ্গি থিয়েটার বাড়িটির বাইরের চেহারা তেমন সুন্দর ছিল না। অমল মিত্রের অনুমান, 'মনে হয় তাড়াতাড়ির মধ্যে তৈরী করার জন্যেই এরকম হয়েছিল' (Amal Mitra 55)। কিন্তু থিয়েটার ঘরের ভেতরে পরিপাটি ব্যবস্থা ছিল। চৌরঙ্গি থিয়েটারের একটি ছবি খুঁজে পাওয়া গেছে। ছবিটি আঁকেন উইলিয়াম প্রিন্সেপ (১৭৯৪-১৮৭৪) (দ্রষ্টব্য সংযোজনী ৪)। প্রিন্সেপ ছিলেন একজন শখের চিত্রশিল্পী ও ব্রিটিশ কর্মচারী। প্রাচ্যবিদ জেমস প্রিন্সেপ, যাঁর নামে কলকাতার প্রিন্সেপ ঘাট নির্মিত হয়েছিল, তাঁর পাঁচ বছরের বড় দাদা ছিলেন উইলিয়াম। উইলিয়াম কলকাতার রাস্তা ঘাট, ঘর বাড়ি, নাগরিক জীবনের অসংখ্য ছবি এঁকেছিলেন। চৌরঙ্গি নাট্যশালারও একটি ছবি আঁকেন তিনি। তাঁর সেই ছবিটি দেখে এবং চৌরঙ্গি থিয়েটার নিয়ে তাঁর সংক্ষেপে লিখিত বর্ণনা পড়ে মনে হয় এই নাট্যশালাটির আভ্যন্তরীণ চাকচিক্যের দিকে ইংরেজরা যথেষ্ট মনোযোগী ছিল (Losty 101)। এক হাজার বসার জায়গা ছিল। তার মধ্যে আটশো বক্স ও দুইশো পিট ছিল। তাঁর *দ্য ব্লাইন্ড বয়* নাটকটির একটি বিস্তৃত বর্ণনা তাঁর অপ্রকাশিত স্মৃতিকথাতে পাওয়া যায়। সেখানে তিনি জানাচ্ছেন, নাটকটির জন্য নির্দিষ্ট পোশাক-আশাক ও দৃশ্যপটের আয়োজন করা হয়। তিনি আরও জানান যে এগুলি সবই এদেশীয় শিল্পী ও কারিগর দ্বারাই তিনি বানিয়েছিলেন। নাট্য প্রযোজনা করতে অনেক ধরনের ছোটখাটো বিপদেরও সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁকে। তাঁর *ব্লুবিয়ার্ড* নাটকের একটি ঘটনা তিনি বিবৃত করেছেন এই লেখায়। এই নাটকে ভারততত্ত্ববিদ্ হোরেস হেইমন উইলসন একটি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। ঘটনাটি এইরকম-একটি দৃশ্যে তুর্কী সৈন্যদের একটি ব্যাটেলিয়ানকে মঞ্চের পেছন দিকে দেখা যাবে:

> I had designed a wonderful march of the Turkish army over the mountains with **different sized figures made of pith and painted by an ingenious workman** whom I had often employed to make masks and other things. He had never failed me and I felt sure of his bringing the whole apparatus in good time. I had set the scenery with great care—the house was crammed—the well known overture was playing but

> no army appeared... when in walked my man with 50 coolies carrying **my precious battalions on the end of bamboos to hold behind the art mountains**, but alas they were all British soldiers in black hats. We declared this would never do, we sent a gentleman around to the pit to encore the overture, and in the short space of time all the white muslin in the wardrobe... was torn into shreds and made into turbans around their black hats... We were amply rewarded by uproarious applause at the beauty of the effect. **Our nearest row on the slopes were small Bengalee boys dressed to match our puppets**. (Losty 101)

প্রিন্সেপের এই বিবরণী থেকে থিয়েটারটির মঞ্চকলার একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। এমনকি চরিত্রানুগ পোশাক, নাটকে মুখোশের ব্যবহার, অঙ্কিত দৃশ্যপট সবকিছু নিয়ে ইংরেজি থিয়েটার যে বেশ জমজমাট আকারে পরিবেশিত হত সে ধারণাও বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ওপরের এই বর্ণনা থেকে কৌশিক স্যান্যাল ইংরেজি থিয়েটারের মঞ্চে পারস্পেকটিভ মঞ্চসজ্জা রীতির ব্যবহার নিয়ে একটি বিশ্লেষণ করেছেন। জে. পি. লস্টির লেখা *সিটি অফ প্যালেসেস* বইটিতে প্রিন্সেপের আঁকা ছবি ও তাঁর ডায়েরির কিছু অংশ পাওয়া যায়। এগুলি দেখে কৌশিক স্যান্যালের ব্যাখ্যা:

> মঞ্চের একেবারে পেছনে ঝোলানো দৃশ্যপটে আঁকা–জলরাশি, সামনে জলের ধারে আঁকা রয়েছে একটি নৌকা, দূরে পাহাড় আর আকাশের আভাস। পশ্চাৎপটের পারস্পেকটিভের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে আঁকা হালকা ফ্রেমের চবুতরা বসানো হয়েছে সিনারির সামনে, ডানদিকে—যেন পাশের কোনও বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে। তার পেছনে এক-সেট, আর সামনে, দু-সেট গাছপালার দৃশ্য আঁকা কাটা ফ্ল্যাটের উইংস। দৃশ্যের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে বাঁদিকে চবুতরার লাইনে একটি গাছের কাট-আউট। (99)

এই মঞ্চসজ্জার ওপরে পারস্পেকটিভ তৈরি করার জন্য প্রিন্সেপ মঞ্চে তিনটি স্তর তৈরি করেন। প্রথম স্তর দর্শকের একেবারে কাছের স্তর, আজকের পরিভাষায় যাকে ডাউন স্টেজ বলা যায়। প্রথম স্তরটি হল মূল অভিনয় ক্ষেত্রটি। এর পরের মঞ্চক্ষেত্রটিতে, আজকের পরিভাষায় সেন্টার স্টেজ বরাবর বসানো হয়েছিল বানানো পাহাড়ের সারি বা প্রিন্সেপের কথায় 'art mountains'। তার পেছনে ছোট ছোট বাঙালি ছেলের দল। এরা তুর্কী সেনা বাহিনীর

পোশাক পরা। তারও পেছনে, অর্থাৎ একেবারে আপ স্টেজে আরও একটি 'art mountain'। তার পেছনে বাঁশের ওপর আটকানো তুর্কী পোশাক পড়ানো ছোট ছোট পুতুলগুলি। পুতুলের সারির পেছনে অঙ্কিত দৃশ্যপটটি। এই মঞ্চসজ্জা থেকে বোঝা যাচ্ছে প্রিন্সেপ এই দৃশ্যায়নের মধ্যে দিয়ে মঞ্চের পারস্পেকটিভটিকে গভীর করার চেষ্টা করেছিলেন। দর্শকের একেবারে কাছের দিকের জিনিসগুলো বড় ও ক্রমশ পেছনে ও দূরের দিকের জিনিসগুলোকে ছোট করতে থেকেছেন প্রিন্সেপ।

প্রিন্সেপের নাটকের বর্ণনা থেকে শুধু নাট্যসজ্জার আলোচনাটুকুই উঠে আসে না। কলকাতার ব্রিটিশ নাটকে দেশীয় কারুশিল্পী ও চিত্রশিল্পীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের প্রমাণ মেলে। প্রিন্সেপের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, মঞ্চসজ্জা, মুখোশ, পোশাক সবটাই ব্রিটিশ নাট্যকর্মীদের তত্ত্বাবধানে দেশীয় শিল্পীরাই বানিয়ে দিত (Losty 100)। এই দেশীয় শিল্পীরা সম্ভবত সকলেই নিম্নবর্গের লোকশিল্পীরাই ছিলেন। কারণ তখনও উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির বাঙালি মানুষেরা নাট্যচর্চায় জড়িত হননি। এই মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির বাঙালি তখনও ভাস্কর্য ও অঙ্কনকে তাদের স্থায়ী পেশা হিসেবে গ্রহণ করার প্রশিক্ষণও তখনও পায়নি। যে কয়েকজন উচ্চবিত্ত বাঙালি ব্রিটিশ থিয়েটারে যুক্ত হয়েছিলেন তারা সকলেই মূলত সাধারণ দর্শক বা অর্থ বিনিয়োগকারীর মতোই যুক্ত ছিল। শিল্পী হিসেবে নাট্যচর্চায় তাদের কোনো অবদান ছিল না বলেই মনে হয়। ব্রিটিশদের থিয়েটারে শিল্প সংক্রান্ত কাজে এই উচ্চবিত্তকে দরকার পড়েনি। দরকার হয়েছিল নিম্নবর্গের শিল্পী তথা কারিগর গোষ্ঠীকে। তাঁরা তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতির মধ্যে তখনো বহন করে চলেছিলেন নিজেদের লোকসংস্কৃতির মুখোশ ও পুতুল নির্মাণ প্রণালী। শোলা মাটি বাঁশ ডোকরার মুখোশ বা বিভিন্ন ধরনের পুতুল নাচের পুতুল বানানোর কৌশল এই নিম্নবর্গের শিল্পীরাই জানত। তাই ব্রিটিশ থিয়েটারে প্রয়োজনীয় মঞ্চসামগ্রীর নির্মাণে ভারতীয় হিসেবে প্রথম হাত লাগিয়েছিল এই নিচুতলার কারিগর ও শিল্পীরাই। ব্রিটিশদের শিল্পচর্চার অন্যতম ভরসাযোগ্য সহায়ক হয়ে উঠেছিল এই গোষ্ঠী। প্রিন্সেপের নাটকের বিস্তৃত বর্ণনা থেকে এ কথা আন্দাজ করা যায় যে, তাঁর নাটকে বিদেশী অভিনেতা, বিদেশী নাট্যবিষয়, বিদেশী ভাষা, বিদেশী দর্শকের জন্য মঞ্চ সাজিয়ে দিয়েছিলেন দেশী শিল্পী সম্প্রদায়। তারা ইংরেজি জানত না, থিয়েটার কী জানত না, এমনকি মঞ্চসজ্জার 'পারস্পেকটিভ' রীতি নিয়েও হয়তো তাঁদের মাথাব্যথা ছিল না। তাঁরা তাঁদের সংস্কৃতিবাহিত শিল্পকলার আশ্রয়ে থেকে ব্রিটিশ থিয়েটারের কাজে পরিষেবা দিয়েছেন। কলকাতার ব্রিটিশ থিয়েটার সংস্কৃতির একেবারে গোড়া থেকেই

লোকবাংলার ঐতিহ্যকে অবলীলায় মিশিয়ে দিয়েছেন তাঁদের কাজের মধ্যে। সম্ভবত, ব্রিটিশ ও কলকাতার সংস্কৃতির মিশ্রণে গড়ে ওঠা থিয়েটার সংস্কৃতির এই ছিল প্রথম ধাপ।

লেবেদফের বাংলা থিয়েটারঃ দেশী ভাষা, দেশী শরীর, দেশী মঞ্চ এবং বিদেশী নাট্যাধ্যক্ষ

নিউ প্লে-হাউস প্রতিষ্ঠার আরও কুড়ি বছর পর কলকাতার মাটিতে ইংরেজি কায়দায় বাংলা থিয়েটার চর্চা শুরু হল। উদ্যোক্তা একজন রাশিয়ান সঙ্গীতজ্ঞ। নাম গেরাসিম লেবেদফ (১৭৪৯-১৮১৭)। মাদ্রাসে দুই বছর কাটানোর পর ১৭৮৭ খিস্টাব্দে তিনি কলকাতা আসেন। কয়েক মাস পরেই তিনি তাঁর কনসার্টের আয়োজন করেন। সাম্প্রতিক সংবাদপত্রে তাঁর বেহালা ও চেলো বাজানোর প্রশংসাও হয়। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি নাটক প্রযোজনা করার কথা মনস্থ করেন। দুইটি বিদেশী নাটক এদেশীয় ভাষায় অনুবাদও করলেন তিনি। নাটক দুটি হল *The Disguise* ও *Love is the Best Doctor*। ২৫, ডোমতলা লেন-এ তিনি একটি বাড়ি মাসিক ষাট টাকায় ভাড়া করে নাট্যমঞ্চ বানানো শুরু করেন। হায়াৎ মামুদের ব্যাখ্যা, 'এই টাকার অঙ্কটি আমাদের ধারণা করতে সাহায্য করে, বাড়ির চৌহদ্দি নিশ্চয়ই বিশাল ছিল। এ বাড়িতে তিনি থাকতে শুরু করলেন। ... লিয়েবেদেফ্ ভাড়াবাড়ি সংস্কার করে নাট্যশালা বানান নি, তিনি খুব সম্ভব বাড়ির চৌহদ্দির ভিতরে খালি জমিতে থিয়েটারের নতুন বাড়ি তৈরি করেছিলেন' (23)। তিনি নিজেই এই নাট্যমঞ্চের নির্মাতা, স্থপতি এবং কাঠমিস্ত্রী, ছুতোর, রাজমিস্ত্রী, কারুশিল্পী, সবার ওপরের একমাত্র অধিকর্তা এবং তদারককারী। তিনি লিখছেন, 'I also decided to become my own architect, the commander and manager over carpenters, cabinet-makers, bricklayers and other workers' (*Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialects* xxxv)। তিন মাস পরে নাট্যমঞ্চ ও অভিনেতাদের তৈরি করে ফেললেন। নাট্যশালার নাম দিলেন *বেঙ্গলি থিয়েটার*। বাংলা ভাষায় মঞ্চস্থ হল *The Disguise* (বাংলায় যার নাম *কাল্পনিক সংবদল* দিয়েছিলেন লেবেদফ)। নাটকটি ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর এবং তার দ্বিতীয় শো হল ২১শে মার্চ ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে। ঘটনাচক্রে এই দুইটি শো ছাড়া নাটকটির আর কোনো মঞ্চায়ন সম্ভব হয়নি। লেবেদফকে ভারত ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল।

লেবেদফের নাট্যপ্রযোজনার দৃশ্যায়ন নিয়ে প্রায় কিছুই জানা যায় না। শুধু জানা যায়, নাট্যশালাটি বাঙালি ধরনে তৈরি। নাটকটির প্রথম মঞ্চায়নের বিজ্ঞাপনে এই বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে। ৫ই নভেম্বর ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে *ক্যালকাটা গেজেটে* বিজ্ঞাপন বেরোয়:

By permission of the Honourable Governor General

MR. LEBEDEFF'S

New Theatre in the Doomtullah

Decorated in the Bengalee Style

Will be opened very shortly with a play called

THE DISGUISE

The characters to be supported by Performers of both sexes

To commence with Vocal and Instrumental Music, called

THE INDIAN SERENADE (B. Banerjee *Bangiya Natyashalar Itihas* 15)

এই 'বেঙ্গলি স্টাইলে সাজানো নাট্যমঞ্চ' কথাটি থেকে বেশ কিছু সূত্র আন্দাজ করা যায়। তৎকালীন নাট্যচর্চার প্রেক্ষিতে লেবেদফের মঞ্চ সম্পর্কে খানিক ধারণা করাও অসম্ভব নয়। তথ্য হিসেবে একটি কথা বলা দরকার, লেবেদফ প্রথমে কিছু কোম্পানি থিয়েটারের কর্মীদের নিয়ে থিয়েটার পরিবেশনা করতে চেয়েছিলেন। কোম্পানি থিয়েটার বলতে তখনকার একটিই থিয়েটার কলকাতায় বিদ্যমান ছিল। সেটি *ক্যালকাটা থিয়েটার*। লেবেদফ লিখছেন:

> After the translation of the above comedies was finished, it was necessary for me to announce them, and for this I asked the Governor General Sir John Shore for permission to present them to the public which was granted. Then on the first chance, I begged for some Company's emplyoees from the Manager of the theatre but as he refused, and with his friends laughed at the supposed foolish venture. (*Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialects* xxxv)

কিন্তু অনুমতি না মেলায় সেখানে থিয়েটার করতে পারলেন না লেবেদফ। অর্থাৎ থিয়েটার করার অনুমতি মিলল, অথচ থিয়েটার করার স্থান মিলল না। ফলে লেবেদফের নতুন থিয়েটার প্রেক্ষাগৃহ বানানোর উদ্যোগ নিতেই হল। তিনি লিখছেন, 'I boldly decided to build my own theatre ... which accommodated three hundred persons'. (*Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialects* xxxv)

কোম্পানি থিয়েটার কর্মীদের নাট্য প্রয়োজনায় চাওয়ার মধ্যে বোঝা যাচ্ছে, লেবেদফ তখনকার *ক্যালকাটা থিয়েটার* সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন, কারণ প্রথমে তিনি *ক্যালকাটা থিয়েটার*-এর অভিনেতাদের নিয়েই নাট্য উপস্থাপনা করতে চেয়েছিলেন আগের অংশে সে কথা আলোচনা করা হয়েছে। ফলে তাঁর নাট্যকলার মধ্যে *ক্যালকাটা থিয়েটারের* একটি প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকবে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। যদিও এ কথা মনে রাখা দরকার *ক্যালকাটা থিয়েটার* তখন যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত একটি নাট্যশালা। সকলেই প্রায় বিনোদনমূলক নাট্যদর্শক ও শখের নাট্যকর্মী হলেও তার মধ্যে একটি পেশাদারিত্ব এসে যাওয়াই সম্ভব। তখনকার বাজারদর হিসেবে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করে যে নাট্যশালা তৈরি হয়েছে তার নাট্যকর্মগুলি খুব একটা অ্যামেচার না হওয়ারই কথা। ইংল্যাণ্ডের নাট্যকর্মের তুলনায় *ক্যালকাটা থিয়েটারের* ব্যাপ্তি ও ক্ষমতায় অনেক প্রভেদ থাকতেই পারে। তাই বলে প্রবাসী ইংরেজদের বিনোদনের প্রয়োজনটি খুব একটা হালকা বিষয় হিসেবে মনে করার কারণ নেই। নিয়মিত নাট্যপ্রযোজনা, প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি, বিরাট দর্শক সমাগম, এমনকি খোদ ব্রিটেন থেকে মঞ্চ সামগ্রীর আমদানি *ক্যালকাটা থিয়েটারের* পেশাদারিত্বকেই প্রমাণ করে। এই *ক্যালকাটা থিয়েটারের* মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নাট্যমঞ্চ খোলার স্বপ্ন দেখলেন লেবেদফ। তাই তাঁর নাট্যকাণ্ডে *ক্যালকাটা থিয়েটারের* পেশাদারিত্ব ও চাকচিক্যকে চ্যালেঞ্জ করার প্রবণতা ছিল, এ কথা আন্দাজ করাই যায়। তিনি কতটা সফল হয়েছিলেন, বা তাঁর ভারতে থাকাকালীন তাঁর ভাবনার কতটুকু তিনি বাস্তবে রূপায়ণ করে উঠতে পেরেছিলেন সেটা পরের কথা। অন্তত তাঁর প্রস্তুতির মধ্যে যে *ক্যালকাটা থিয়েটারের* নাট্যচর্চার একটা প্রভাব থাকার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে, এ কথা অনস্বীকার্য।

তাঁর নাটকের বিজ্ঞাপনে বাঙালি ধরনে সাজানো নাট্যশালার কথা বলা হয়েছে। লেবেদফের নিজের লেখায়, '... I tried in Calcutta, as if in Moscow, to decorate the floor reserved for staging scenes with painting according to Bengali tastes'. (*Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialects* xxxv) লেবেদফের বাঙালি কায়দায় মঞ্চক্ষেত্রটি সাজানোর বর্ণনা থেকে অহীন্দ্র চৌধুরীর অনুমান, মঞ্চের বাইরে বঙ্গীয় সংস্কৃতির দ্যোতক আলপনা, মঙ্গল কলস, কলাগাছ প্রভৃতি দিয়ে সাজানো হয়েছিল এবং দৃশ্যপট বাংলাদেশের পরিবেশ অনুযায়ী অঙ্কিত হয়েছিল (36)। গবেষক সুবীর রায়চৌধুরীর অনুমান, বিজ্ঞাপনের এই অংশটি একটি চমক ছাড়া আর কিছুই নয় (17)। কারণ লেবেদফের নাটকের টিকিটের মূল্য ছিল প্রথম রজনীতে বক্স আট সিক্কা ও গ্যালারি চার সিক্কা; দ্বিতীয় রজনীতে তা হয়ে দাঁড়ালো এক মোহর করে। সাধারণ বাঙালি দর্শকের কাছে এই দাম

ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। সুবীর আরও বলছেন, লেবেদফের সাহেবি বাংলা নাটকটি সাধারণ বাঙালির কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার কথা নয়। যাত্রা হাফ-আখড়াই ফেলে তারা এই কঠিন বাংলার নাটক দেখতে এসেছিলেন এমন মনে করছেন না তিনি।

কিন্তু প্রশ্ন এই, ইংরেজি ধরনের থিয়েটারে বাঙালি স্টাইলে মঞ্চসজ্জা করে বাংলা ভাষায় যে নাটকটি অভিনীত হচ্ছে, সেটি দেখতে ইউরোপীয়রাই বা কেন উৎসাহিত হবেন? যদিও ইউরোপীয় দর্শকও যাতে তাঁর নাটক দেখেন সে ব্যাপারে লেবেদফ সচেতন ছিলেন, তাই সে ব্যাপারে অনুমতিও নিয়েছিলেন। এই বিষয়ে তিনি লিখছেন, 'I therefore, to bring to view my undertaking, for the benefit of the European public, without delay, solicited the Governor-General Sir John Shore, (now Lord Teignmouth) for a regular licence, who granted it to me without hesitation' (*Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialects* viii)। লেবেদফের নাটকের প্রথম দিনে অভিনয় হয়েছিল মূল নাটকের একটি সংক্ষিপ্ত অংশ এবং সেটি বাংলা ভাষায়। বাংলা ভাষায় এই অভিনয়টি দেখতে ইউরোপীয় দর্শকদের ভালো না লাগতে পারে ভেবে ছোট অংশটি অভিনীত হয়। পরের রজনীতে অবশ্য একেকটি অঙ্ক একেক ভাষায় অভিনীত হয়েছিল। কিছুটা বাংলা, কিছুটা ইংরেজি এবং কিছুটা মুর বা হিন্দুস্তানী ভাষায়। এই রকম একটি মিশ্র ভাষার নাটক দেখতে ব্রিটিশরা কেন উৎসাহিত হবেন, এ প্রশ্ন এসে যায়? লেবেদফের নাটকের প্রধান উদ্যোক্তা ও উৎসাহদাতা ছিলেন বাঙালি পণ্ডিত গোলোকনাথ দাস। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা ছিলেন এদেশীয়। অনুবাদিত নাটকটির সিংহভাগই বাংলায় অভিনয় হয়েছিল। নাটকে ভারতচন্দ্রের গানের ব্যবহার, বা ভারতবর্ষীয়দের রুচি মাফিক অনুবাদিত নাটকে লঘু মেজাজের চরিত্র ও দৃশ্যের প্রণয়ন, নাটকের শুরুতে যাত্রার কনসার্টের মতো করে বাজনার আসর আয়োজন করা এগুলি সবই প্রধানত বাঙালি দর্শককে মাথায় রেখেই পরিকল্পনা করা বলে মনে হয়। *ক্যালকাটা থিয়েটারের* তুলনায় টিকিটের দাম অপেক্ষাকৃত কম হলেও মূলত এদেশীয় দর্শকের কথা মাথায় রেখে বানানো থিয়েটারে সাহেব ইংরেজরা উৎসাহ নেবেন বলে মনে হয় না। আরও একটি বিষয় এই সূত্রে উল্লেখ্য। লেবেদফ এই নাটকের তৃতীয় অভিনয় করবেন বলে স্থির করেছিলেন। লেবেদফের ইচ্ছে ছিল তিনি কলকাতা ও বাইরের গ্রামাঞ্চলে এই নাটকটির অভিনয় করে বেড়াবেন। এই তৃতীয় অভিনয়টি হওয়ার কথা ছিল সম্পূর্ণত ভারতীয় ভাষায়। একটি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন এই রকম:

মে0 লেবেদফ অত্যন্ত গৌরবের সহিত

অদ্যবধি চিষ্টীত আছেন বিজ্ঞ করিতে কিবল

দেসি এসিয়ার বাসীন্দা সকলকে কলিকাতার এবং

বাহির গ্রামের উপস্থীত হইতে এক নতুন উপাদয়

কাব্য দেখিবার কারণ—লেখা হইয়াছে বাঙ্গালি

এবং হিন্দুস্থানী জবানেতে—ইহাতে দেখিয়ারদিগের

তুষ্ট করা জাইবেক উত্তম বাঙ্গালী গান ও বেলাতি

নানান জন্ত্রের সহিত—নাচের ঘরের

পর্দা সকল বিলক্ষণ রূপে চিত্রিত হইয়াছে এবং

সমস্ত সাজানো গিয়াছে।

-(Lebedeff, *Kalpanik Sangbadal* 5)

খেয়াল করার বিষয় হল, আগের বিজ্ঞাপনটি ইংরেজিতে এবং এই বিজ্ঞাপনটি বাংলা ভাষায় লিখিত। অর্থাৎ এবারের উদ্দিষ্ট দর্শক বিশেষভাবেই বাঙালি। কিছু ইউরোপীয় দর্শক এই নাটক দেখতে এসেছিলেন ঠিকই। লেবেদফের নিজের লেখাতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়:

> In the course of five years and with the help of my teachers I succeeded in translating two English dramas into Bengali, one of which I had the honour of staging twice under my direction and in a Theatre of my own construction with Bengali actors of both the sexes, thus entertaining the European and Asiatic inhabitants alike. (*Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialects* xxxiii)

কিন্তু লেবেদফের নাট্যপ্রযোজনার মূল উদ্দিষ্ট দর্শক যে বাঙালি সম্প্রদায়ের মানুষেরাই ছিলেন, সে কথা সহজেই অনুমেয়। তাই মনে রাখা ভালো, লেবেদফের থিয়েটার বাঙালি দর্শকের রুচি-চাহিদা-পছন্দ মতো তৈরি করা হয়েছিল। বাঙালি দর্শকের সংস্কৃতিবোধকে গুরুত্ব দিয়েই নাটকের সমস্ত ভাবনা প্রবাহিত হয়েছিল। নাট্যসজ্জা থেকে শুরু করে অভিনেতা নির্বাচন, নাটকের ভাষা, পোশাক ও মুখোশের ব্যবহার, ঐকতান বাদন সর্বত্রই বাঙালি রুচিকে

তৃপ্ত করার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল। এই সূত্রে ব্যোমকেশ মুস্তাফীর বিশ্লেষণটি উল্লেখযোগ্য, 'মিঃ লেবেডেফ হঠাৎ বাঙালীর রুচি অনুযায়ী এতগুলি ব্যাপার একবারে অবলম্বন করিলেন কেন? এই সকল উপায়ে তাঁহার রঙ্গালয়ে বাঙ্গালী-দর্শক আকর্ষণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, ইহা স্পষ্টতঃ কোথাও উল্লিখিত না থাকিলেও ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই' (D. Mukhopadhyay *Rangamancha Ashwin-Kartik*)।

তাহলে অনুমান করা যায়, লেবেদফের নাটকের মূল উদ্দিষ্ট দর্শক বাঙালি। এই বাঙালি দর্শকের পছন্দ মতো মঞ্চসজ্জা করতে লেবেদফকে কী কী পদ্ধতি মাথায় রাখতে হয়েছিল? এ কথা বলা বাহুল্য, লেবেদফ কিন্তু বাংলার লোকসংস্কৃতির একেবারে হুবহু অনুরূপে মঞ্চায়ন নিশ্চয় করতে পারেননি বা সেটা করা তাঁর মতো একজন রাশিয়ানের পক্ষে হয়তো সম্ভবও ছিল না। প্রসেনিয়াম মঞ্চস্থাপত্যের মধ্যেই তাঁর বাঙালিয়ানা আনার চেষ্টা ছিল। হায়াৎ মামুদের মতে বাঙালিয়ানা আনার প্রধান কৌশল ছিল তিনি নাটকের দৃশ্যপটগুলি বাঙালি কায়দায় আঁকিয়েছিলেন (43)। লেবেদফ নিজে তাঁর নাটকের বাঙালির রুচি অনুযায়ী পরিকল্পিত দৃশ্যপট নিয়ে লিখছেন, '... I admit it was not so beautiful as should have been, but nevertheless sufficiently pleasing ...' (*Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialects* xxxv-xxxvi)।

অঙ্কিত দৃশ্যপটের পাশাপাশি আরও একটি দৃশ্য উপকরণ তিনি ব্যবহার করেছিলেন বলে মনে হয়। সেটি হল, নানা মুখোশের ব্যবহার। প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের শুরুতে তিনি লিখেছেন, 'নানান বাজিয়ারা ভিন্ন ভিন্ন পোসাখেতে আর মখসের কাব্য করেন জানালার সম্মুখে' (*Kalpanik Sangbadal* 142)। অর্থাৎ নানা ধরনের পোশাক ও মুখোশ পড়ে বাদ্যযন্ত্রীরা নাচ গান করছেন। এ কথা আন্দাজ করা যায় যে মঞ্চশিল্পীদের এই মুখোশ ও পোশাকের মধ্যে দিয়ে লেবেদফ বাঙালিয়ানা বজায় রাখতে চেয়েছেন। তাছাড়া তিনি মূল ইংরেজি নাটকটির আদ্যন্ত বঙ্গীকরণ করেছিলেন। *The Disguise* নাটকটির দ্বিতীয় অভিনয়ের দিন প্রচারিত নাট্যপরিচিতির প্রথম পৃষ্ঠাতেই লেখা, 'In the original, the scenes are laid out in Spain; but in the translation, the scenes are changed to this country' (Lebedeff, *Kalpanik Sangbadal* 141)। মূল নাটকের মাদ্রিদ (Madrid) আর সেভিইয়া (Seville) শহরের স্থানে কলকাতা ও লক্ষৌ শহরকে নেওয়া হয়েছে। নাট্য পরিচিতিতে আরও একটি কথা লেখা হয়েছে যে, সমস্ত চরিত্রের ইউরোপীয় নামগুলিকে এই দেশীয় মানুষের নামে পরিবর্তিত করা হয়েছে।

এত সব কিছু থেকে লেবেদফের বাঙালি স্টাইলে নাট্য মঞ্চায়নের অর্থ খানিকটা ধরতে পারা যায়। এ কথা খেয়াল রাখা দরকার লেবেদফ ছিলেন মূলত সঙ্গীতশিল্পী। ঘটনাচক্রে তিনি বাংলা ভাষা শেখেন। ফলে তাঁর কাছে খুব বেশি নাট্য আঙ্গিকের প্রাজ্ঞতা আশা করার কোনো কারণ নেই। তাঁর নাটক করার বাসনা ছিল আকস্মিক। কোনো দীর্ঘলালিত স্বপ্ন থেকে তাঁর নাট্য পরিকল্পনা নয়। নাটক পরিকল্পনা ও মঞ্চনির্মাণের উদ্যোগ মূলত অর্থকরী ব্যবসায়িক ভাবনা থেকে উদ্ভূত বলে মনে হয়। নিজের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির আকাঙ্ক্ষাতেই তিনি কলকাতা এসেছিলেন। এবং নাট্য প্রযোজনার মধ্যে দিয়েই তিনি এই উন্নতির পথ খুঁজে বার করার একটা চেষ্টা করেছিলেন বলে মনে হয়।

যাই হোক, দ্বিতীয় অভিনয়ের সাফল্যের পর তিনি মঞ্চসজ্জার উন্নতির জন্য একজন অঙ্কনশিল্পীর খোঁজ করেছিলেন। নিঃসন্দেহে তিনি বাঙালি দর্শকের কথা মাথায় রেখে দৃশ্যপট অঙ্কনের কথা ভেবেছিলেন। কারণ তৃতীয় অভিনয়ের বিজ্ঞাপনে তিনি খানিকটা বিস্তৃত ভাবেই বিষয়টি উল্লেখ করেন। ‘নাচের ঘরের/ পর্দা সকল বিলক্ষণ রূপে চিত্রিত হইয়াছে এবং/ সমস্ত সাজানো গিয়াছে’। বিজ্ঞাপনের এই অংশটিতে নাচের ঘর অর্থাৎ প্রেক্ষাগৃহের পর্দা বা পশ্চাৎপট ও পার্শ্বপটগুলি বাঙালি কায়দায় চিত্রিত হয়েছে এবং সমস্ত সাজানো হয়েছিল, এমনটাই বলা হচ্ছে। এইভাবে মঞ্চসজ্জার জন্য তিনি জোসেফ ব্যাটেল নামক এক চিত্র শিল্পীকে নিয়োগ করেন। যদিও তাঁর নাটকের তৃতীয় মঞ্চায়ন আর সম্ভব হয়নি।

লেবেদফের নাট্য প্রচেষ্টার মধ্যে মঞ্চসজ্জা নাট্য আঙ্গিক অভিনেতা নির্বাচন সঙ্গীতের ব্যবহার সর্বত্রই বাঙালি দর্শকের রুচিকে পরিপূর্ণ করার একটা তাগিদ চোখে পড়ে। লেবেদফের নাট্যধারায় আবশ্যিকভাবে ইউরোপীয় ও বাঙালি সংস্কৃতির একটি মিশ্রণ ঘটে গিয়েছিল। ঔপনিবেশিক কলকাতায় রাশিয়ান ব্যক্তি লেবেদফের পক্ষে এই মিশ্রণকে এড়িয়ে থাকার উপায়ও ছিল না। তিনি সেটা সম্ভবত করতেও চাননি। প্রিন্সেপের থিয়েটারে দেশীয় শিল্পীদের শিল্পভাবনা যেভাবে মিশে গিয়েছিল, লেবেদফের থিয়েটারে তার আরও পরিবর্ধন ঘটল। তাঁর এই মিশ্র সংস্কৃতির সংকরজাত থিয়েটারের পরবর্তী নাট্যচর্চায় এই হাইব্রিডিটি বা সংকরায়নের পদ্ধতিটি আরও গভীর হতে থাকে।

নবীন বসুর থিয়েটারঃ দেশী শরীর, দেশী নাট্যাধ্যক্ষ, দেশী ভাষা, মিশ্র মঞ্চায়ন

‘বাঙালি’ হিসেবে প্রথম নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর। তাঁর *হিন্দু থিয়েটার* প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে (B. Banerjee *Bangiya Natyashalar Itihas* 21)। *জুলিয়াস সীজার* নাটকের একটি অংশ এবং *উত্তররামচরিত* নাটকের একটি অংশ অভিনীত হল। দুইটি প্রযোজনাই হল ইংরেজিতে। সংস্কৃত *উত্তররামচরিত*

নাটকটি ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন উইলসন। অভিনয়ের নির্দেশক ছিলেন উইলসন নিজে। বাবু গৌরদাস বসাক লিখছেন, 'The drama Uttara Ram Charita, translated by Dr. Horace Hayman Wilson, from the original Sanskrit of Bhababhuti was acted on the stage by the former under the direction and personal superintendence of the Doctor' (Dasgupta 281)। ৩১শে মার্চ ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে *ইণ্ডিয়া গেজেটে হিন্দু থিয়েটারের* দ্বিতীয় প্রযোজনা *নাথিং সুপারফ্লুয়াস* নাটকের প্রশংসা বেরোয়। সমালোচনা হয় শুধু মঞ্চসজ্জার। '... the scenery although inferior to that of the principal theatres was yet arranged with much taste' (Dasgupta 283)। এই অংশটি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে অনুবাদ করেছিলেন এইভাবে, 'দৃশ্যপটাদি প্রধান ইউরোপীয় নাট্যশালাগুলির সমকক্ষ না হইলেও বেশ রুচিসম্মত হইয়াছিল' (23)। অর্থাৎ রুচিশীল হলেও বিদেশি রঙ্গালয়গুলির মতো তেমন উন্নত মানের হয়নি মঞ্চসজ্জা। প্রসন্ন ঠাকুর নিজের বাড়ির ভেতরেই একটি ছোট মঞ্চ গড়ে তুলেছিলেন বলে জানা যায়। *ক্যালকাটা ক্যুরিয়র* লিখছে, 'Babu Prasanna Kumar Tagore has fitted up a neat little stage in his house in Narkeldangah ...' (qtd. in S. Mukherjee 14)।

প্রসন্ন কুমারের দর্শক ছিল উচ্চবর্গীয় ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি ও কিছু ইংরেজ। বাঙালি কর্তৃক ইংরেজি নাটকের অভিনয় হওয়াটা মেনে নিতে পারেনি তখনকার সমালোচক সমাজ। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত দুইটি চিঠি এই সূত্রে উল্লেখ্য। প্রবল সমালোচনা বেরোয় *ইস্ট ইণ্ডিয়ান*-এ—'...We hear that the performances are to be in the English language. Who advised this strange proceeding we know not, but it is surely worth re-consideration—what can be worse than to have the best dramatic compositions in English language murdered outright, night after night, foreign manners misrepresented and instead of holding the mirror upto nature caricaturing everything human?' (qtd. in Dasgupta 283)। *এশিয়াটিক জার্নাল*-এ এক ইংরেজ লেখক এই বিষয়ে লিখলেন—'...the performance or rather the attempted performance of English plays by Hindu youths; an undertaking which as may readily be supposed was not crowned with much success... native aspirants for the honours of the sock and buskin may perceive the propriety of confining themselves to the

representation of dramas to which their complexion would be approapriate' (qtd. In Dasgupta 285)।

প্রসন্ন ঠাকুরের *হিন্দু থিয়েটারের* প্রচেষ্টাটি ইংরেজদের কাছে সমালোচিত হলেও এই থিয়েটারই বাঙালি নাট্যকর্মের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। দুই বছর পরেই প্রসন্ন ঠাকুরের নাট্য প্রযোজনার তুলনায় অনেক বেশি স্থির ভাবনা ও প্রস্তুতি প্রসূত নাট্য প্রযোজনা করলেন নবীন বসু। নবীন বসু নাটক হিসেবে বেছে নেন ভারতীয় সাহিত্যের অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি নাটককে। *বিদ্যাসুন্দর*-এর প্রযোজনা করান তিনি। তাঁর নাট্য প্রযোজনাটি প্রসন্ন ঠাকুরের প্রচেষ্টার আগেই মঞ্চস্থ হয়েছিল কিনা সে ব্যাপারে অবশ্য স্থির করে কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, নবীন বসুর নাট্য প্রচেষ্টাটি মঞ্চ ভাবনা, নাট্য নির্বাচন, অভিনেত্রী প্রণয়ন সবদিক থেকে একটি যুগান্তকারী ঘটনার সাক্ষ্য বহন করে। বাংলা নাটকের ইতিহাস, তার ঔপনিবেশিক পরম্পরা, নাট্য মঞ্চায়নের সংকরায়ন, দেশি টেক্সট, বিদেশি নাট্য প্রযুক্তি সব কিছু নিয়ে পর্যালোচনার ক্ষেত্রে নবীন বসুর এই নাট্য অনুষ্ঠানটি বিশেষ আলোচনার অবকাশ রাখে।

হিন্দু পাইয়োনিয়ার পত্রিকায় নবীন বসুর নাট্য প্রযোজনাটির বিস্তৃত বিবরণী ছাপা হয়েছিল (Dasgupta 289)। সেখান থেকে জানা যাচ্ছে, নবীন বসুর বাড়িতে প্রাচ্য পাশ্চাত্য দুই রীতির মিশ্রণে মঞ্চভাবনা গড়ে তোলা হয়েছিল। ড্রপকার্টেন, অ্যাক্ট কার্টেন ছিল আবার নাটকের শুরুতে ঈশ্বরবন্দনাও ছিল (P. Sarkar 255)। শ্যামবাজারের নবীন বসুর প্রথম নাট্যানুষ্ঠানের জন্য সম্ভবত আলাদা করে মঞ্চ বানানো হয়নি। এমনকি নাট্যদৃশ্যগুলির জন্য আলাদা করে কোনো দৃশ্যপটও চিত্রিত করা হয়নি। তাঁর বিশাল অট্টালিকার বিভিন্ন প্রান্ত ব্যবহার করা হয়েছিল নাট্যদৃশ্যগুলো অভিনয় করার জন্য। ফলে দর্শক বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে নাটকটি দেখেছে। একেকটি দৃশ্য দেখতে দর্শককে একেক জায়গায় যেতে হত (S. Mukherjee 15)। বকুল গাছের তলায় সুন্দরের বসে থাকার দৃশ্যে বাগানের একটি গাছ ব্যবহার করা হয়েছিল। রাজার বাড়ি ও মালিনীর ঘরের মধ্যে একটি সুড়ঙ্গও তৈরি করা হয়। গভীর রাত থেকে পরদিন ভোর সাড়ে ৬টা পর্যন্ত নাটক চলেছিল। বাড়ির ভেতরে ও সামনের কয়েকটি জায়গায় সত্যিকারের আসবাব ও জিনিসপত্র বসিয়ে দৃশ্যগুলি অভিনয় হয়েছিল। নাট্যমঞ্চ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল বৈঠকখানা, সামনের পুকুর, দালান ইত্যাদি। দ্বিতীয় অভিনয়ে সম্ভবত একটি মঞ্চ বানানো হয়েছিল যেখানে পাশ্চাত্য নাট্যরীতির কায়দায় কার্টেনের ব্যবহার ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় অভিনয়তেও কিছু কিছু দৃশ্য দর্শকেরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে অভিনয় দেখেছে বলে

জানা যায়। বড় বৈঠকখানার একদিকে সাজানো হয়েছিল বীরসিংহের দরবার। আর একটি বড় হল ঘরে বানানো হয়েছিল বিদ্যার ঘর। মালিনীর বাগানের দৃশ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল নবীন বসুর বাড়ি সংলগ্ন বাগানটি। বজ্রপাত ও মেঘ গর্জন দেখানোর জন্য ইংল্যাণ্ড থেকে যন্ত্র কিনেছিলেন নবীন। এভাবে বছরে ৪ - ৫টি মঞ্চাভিনয় হত।

বিদ্যাসুন্দর নাটকের দৃশ্যপট ভালো হয়নি বলেই লেখা হয়েছে *হিন্দু পাইয়োনিয়ার*-এ। 'The scenery was generally imperfect, the perspective of the pictures, the clouds, the water were all failures, they denoted both want of taste and sacrifice of judicious principles and the latter were scarcely distinguished except by the one being placed above the other. Though framed by native painters, they would have been much superior had they been executed by careful hands. The house of Raja Birsingha and the apartment of his daughter were, however, done tolerably well' (qtd. in Dasgupta 291). এই নাটকের মঞ্চসজ্জার জন্য যে পশ্চাৎপট ও সিনারি আঁকা হয়েছিল সেগুলো সবই দেশীয় শিল্পীরা এঁকেছিলেন। তাঁদের আঁকা সিনারি তেমন 'ভালো' হয়নি; তাঁদের এই দৃশ্য অঙ্কন তেমন রুচিশীলতা প্রমাণ করে না; দেশীয় শিল্পীদের দিয়ে আঁকা হলেও তা যোগ্য হাতে পড়লে আরও 'ভালো' হতে পারত বলে মতামত দিচ্ছেন লেখক। এই রুচির প্রশ্নের সূত্রে কিছু কথা বলা আবশ্যক। দেশীয় শিল্পীদের অঙ্কনরীতি ও রুচিবোধ নিয়ে তৎকালীন নব্য পাশ্চাত্য শিক্ষায় আলোকিত বাঙালির বেশ কিছু নব্য ভাবনার সূচনা হয়েছে। জীবনে ও সমাজের সমস্ত স্তরে 'রুচিশীল' সংস্কৃতি তৈরির কাজে নিয়োজিত উচ্চবিত্ত বাঙালি তাই দেশীয় শিল্পীর অঙ্কনরীতিতে 'রুচিহীনতা' খুঁজে পায়। সমাজের সর্বত্র 'শ্লীলতা'- 'অশ্লীলতা', রুচিশীলতা-রুচিহীনতা, ভালো-মন্দর বিচার করতে উদ্যোগী হয়ে ওঠে নতুন বাঙালি। বাঙালির পুরনো ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিচর্চার ইতিহাসকে নব্য পাশ্চাত্য চেতনার কায়দায় যাচাই করে নিতে চেয়েছে নব্য বাঙালি। তাই 'রুচিশীল' বা 'ভালো' মঞ্চ দৃশ্য অঙ্কন থেকে শুরু করে 'অভিনয় যোগ্য' ও 'ভালো' নাটক খুঁজে বের করতে নব্য বাবু সম্প্রদায় অত্যন্ত উদ্যমী হয়ে উঠেছিল।

উচ্চবিত্ত বাঙালির নাট্য চর্চার এক অন্যতম প্রতিবন্ধকতা ছিল ইংরেজি নাট্য মঞ্চে অভিনয় উপযোগী 'যথার্থ' বাংলা নাটকের যোগান। 'ভালো নাটক' খুঁজে পাওয়া দুষ্কর ছিল। পূর্বকালের যাত্রাপালায় নব্য বাঙালির নাগরিক রুচির পূর্ণতা হচ্ছে না। ইংরেজি নাটক থেকে বেরিয়ে বাংলা নাটক করতে গেলে তাহলে একটিই পথ বাকি থাকে। সেটি হল, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে ভিত্তি করে আধুনিক মঞ্চায়ন করার। *বিদ্যাসুন্দর* অভিনয় করার মধ্যে দিয়ে নবীন

বসু এই পথটিই নিলেন। কিন্তু নবীন বসুর পরে আর কেউ এই সাহিত্যগুলিকে মঞ্চে অভিনয়ের উপযোগী মনে করলেন না। এই সূত্রে পবিত্র সরকারের বিশ্লেষণটি গুরুত্বপূর্ণ, 'মনে হয় উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের নাট্যসম্ভারই বাঙালি অনুবাদকদের বেশি আকর্ষণ করেছিল, বাংলা তখনও তাদের কাছে এক প্রাদেশিক এবং গ্রাম্য সাহিত্য মাত্র। তার উপকরণ ব্যবহারের কথা প্রাথমিকভাবে তাঁদের মনে আসেনি! হয়ত ভারতচন্দ্রের কাব্যের আদিরস নব্যশিক্ষিতকে একটু নিরুৎসাহী করেছিল। এ ছাড়া, বাংলা সাহিত্যের ওইসব উপাদানের সঙ্গে যাত্রার সম্পর্ক ছিল বিশেষ ঘনিষ্ঠ, ফলে যাত্রার সম্মানহানির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ওইসব আখ্যানের মূল্যও অনুবাদকদের কাছে কমে গিয়েছিল' (P. Sarkar 243)। নাট্যমঞ্চকে যাত্রার তুলনায় শুদ্ধ পবিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তৎকালীন নাট্য সমালোচকরা ও নাট্য উদ্যোগীরা। বিশেষত অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কাগজ *দ্য হরকরা* বা *ইংলিশম্যান* ইত্যাদি কাগজগুলি তীব্র অশালীন হিসেবে তকমা লাগিয়ে দিচ্ছে বিদ্যাসুন্দর-কে। *দ্য হরকরা* লিখছে, 'such theatricals far from being attended with any advantage moral or intellectual to the Hindus, it behoves every friend to the people to discourage such exhibitions, which are equally devoid of novelty, utility and even decency' (qtd. in Dasgupta 293)। প্রভু ইংরেজদের অনুকরণে তৈরি করা নাট্যমঞ্চে তাই উচ্চাঙ্গের সাহিত্যকেই বেছে নিতে চেয়েছেন তাঁরা। যে *বিদ্যাসুন্দর* যাত্রাওয়ালাদের কাছে আদরণীয়, সেই *বিদ্যাসুন্দরকে* থিয়েটার মঞ্চে গ্রহণ করার বিষয়ে তাঁদের দ্বিধা থেকে গেল। ব্রিটিশ প্রবর্তিত 'পবিত্র' নাট্য ঘরানায় 'অশ্লীল' *বিদ্যাসুন্দর*-এর আধিপত্য যাতে না পড়ে হয়তো সে ব্যাপারে সচেতন থেকেছিল নবীন বসু পরবর্তী নাট্য সমাজ।

কোনটা ভালো কোনটা মন্দ কোনটা অশ্লীল কোনটা শ্লীল কোনটা সমাজের উন্নতির পরিপন্থী কোনটা সমাজের উপকারী এই ঝাড়াই বাছাইয়ের কাজ করতে করতে উচ্চবিত্ত নব্য বাঙালি নিজেদের তৈরি করতে থাকল। বাদ পড়তে থাকল বৃহত্তর সমাজের লোকায়ত সংস্কৃতি। ঘৃণ্য হতে থাকল লোকসমাজের গান নাচ যাত্রা এমনকি অঙ্কন শিল্পও। উচ্চবিত্ত বাঙালি গড়ে তুলতে থাকল 'আদর্শ'বাঙালি আর্ট ও আর্টিস্টদের। উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সমাজের মাঝে স্পষ্ট বিভাজন ক্রমশ আরও প্রকট হতে থাকল। লেবেদফ ও প্রিন্সেপের নাটকে যে লোকায়ত সংস্কৃতির অনায়াস উপস্থিতি দেখা গেছিল, ক্রমে সেই 'প্রাদুর্ভাব' থেকে নাট্যমঞ্চকে মুক্ত করার উদ্যোগ নিল উচ্চবিত্ত নাট্য সমাজ; নিম্ন ও উচ্চ শ্রেণিতে বিভাজিত হতে থাকল সাংস্কৃতিক মণ্ডলী।

বাঙালির শিল্পী ও শিল্প নির্মাণঃ নিম্নবর্গীয় কারিগর বনাম উচ্চবর্গীয় শিল্পী

আঠেরো শতকের শেষভাগ থেকে 'শিল্পী' ও 'কারিগর'—এই দুই বিভাগ শিল্পসমাজে তৈরি হতে থাকে। যে শিল্পীরা উচ্চশিল্প বা উচ্চবিত্তের শিল্পে মনোনিবেশ করেছিলেন, তাঁরাই প্রকৃত 'শিল্পী' হিসেবে সমাজে কদর পেতে থাকেন। বাকি আপামর শিল্পী সম্প্রদায় হয়ে যায় Artisan বা কারিগর গোষ্ঠীভুক্ত। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ইউরোপীয় অঙ্কনশিল্পীরা কলকাতায় থাকতে শুরু করেন। কলকাতার উচ্চবিত্ত বাঙালি মানুষেরা ইউরোপীয় স্কুলিং-এর অঙ্কনবিদ্যায় প্রশিক্ষণ নিয়ে সমাজে উচ্চপ্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করেন। সম্মান ও পদমর্যাদায় তাঁরা 'শিল্পী' হিসেবে উচ্চস্থানে আসীন হতে থাকেন। সাধারণ লোকশিল্পীদের কারিগরী বিদ্যার জ্ঞানের তুলনায় অনেক বেশি আদৃত হতে থাকে উচ্চবিত্ত শিল্পীদের 'সৃজনশীলতা'। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে সরকারি স্কুল অফ আর্ট-এর প্রতিষ্ঠা হয়। এখানেই মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত শিল্পীদের গড়ে তোলা শুরু হয় (Guha-Thakurta 11)। বাঙালিদের আর্কিটেকচারাল ড্রয়িং, মডেল বানানো ইত্যাদি নানান প্রশিক্ষণ দেওয়া হতে থাকে। বাঙলার প্রথম শিল্প পত্রিকা *শিল্পপুষ্পাঞ্জলি* লিখছে, বাঙালিদের এই প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে ইংরেজরা উচ্চশিল্পের সঙ্গে বাঙালির পরিচয় ঘটানোর চেষ্টা করছেন না। বরং তাঁরা মূলত বাঙালিদের জীবনে একটি পেশার সুযোগ খুলে দিচ্ছেন। মাসে ১৬ থেকে ১৭ টাকা বৃত্তি দেওয়া হত এই আর্ট স্কুলের ছাত্রদের। সরকারি এলাকায় বা রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বা কালিপ্রসন্ন সিংহদের মতো ধনকুবেরদের বাড়িতে তাঁরা নানান মডেল বানানোর কাজ পেতে থাকেন (S. Banerjee, *The Parlour and the Streets* 191)। তপতী গুহ ঠাকুরতার ব্যাখ্যায়, নিজ শ্রেণিগত ধর্মকে অক্ষুণ্ণ রেখে আর্টকে সম্মানজনক পেশা হিসেবে বরণ করে নিতে পেরেছিলেন তাঁরা। সমাজে তৈরি হতে থাকল দুই স্পষ্ট বিভাজিত শ্রেণীঃ ১। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শিল্পী গোষ্ঠী, ২। ভারতীয় নিম্নবর্গের শিল্পকর্মের বাহক কারিগর গোষ্ঠী। সুমন্ত ব্যানার্জীর পর্যবেক্ষণ, 'Along with new literary forms, the nineteenth century Calcutta elite sought distinct expressive forms in the visual arts too. Here also their tastes and attitudes were shaped by the English Educationists and at connoisseurs'. (*The Parlour and the Streets* 190)

সাহিত্য ক্ষেত্র হোক বা শিল্পক্ষেত্র সর্বত্র ইংরেজদের মতো 'শিক্ষিত' হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া শুরু হল। সাধারণ গরীব লোকশিল্পীদের তুলনায় ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত শিল্পীরা অনেক বেশি 'পরিশোধিত'; তাঁরা ইংরেজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ নিয়েছে, তাঁদের 'শুদ্ধিকরণ' সম্পূর্ণ হয়েছে। তাই তাঁরা জনসমাজে অনেক বেশি দখল দাবী

করতে পারে। ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পীদের তুলনায় তাঁরা অনেক বেশি বরণীয়। ইতিহাসবিদ জেমস মিলের মতে ভারতীয় শিল্প ছিল অত্যন্ত ‘unnatural, offensive and not infrequently disgusting’। ইংরেজ শিল্প-শিক্ষকেরা জেমস মিলের এই মতকেই মান্যতা দিয়ে বাঙালিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করল। সেই সময়কার ইংল্যাণ্ডের আর্ট স্কুলের সিলেবাসকে অনুসরণ করে চলতে লাগল ‘Euro-Centric’ এই শিক্ষাপ্রণালী। বাঙালি শিল্পীদের বাস্তববাদী শিল্পচর্চার শিক্ষা দিতে থাকল ইংরেজরা। বাস্তববাদী অঙ্কনরীতিতে পিছিয়ে থাকা শিল্পীদের সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিল ইংরেজ। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর *ফ্রেণ্ডস অফ ইণ্ডিয়া*-তে এক ইংরেজ বলছেন, বাস্তববাদী অঙ্কনরীতিতে ‘a Bengalee is peculiarly deficient in the power’। তিনি আরও লিখছেন, ‘He has naturally as little knowledge of perspective as a Chinese, while he is embarrassed by that inability to copy shadows which seems peculiar to Orientals’ (S. Banerjee, *The Parlour and the Streets* 190)। পারস্পেক্টিভ রীতিকে অবলম্বন করে আঁকতে না পারার অস্বস্তি কাটানোর জন্য উচ্চবিত্ত বাঙালি ইংরেজদের স্মরণাপন্ন হল।

কোম্পানি পেন্টিংঃ মুর্শিদাবাদ, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, পাটনা ইত্যাদি এলাকার শিল্পীরা বিগত মুঘল দরবারের মাইনে করা শিল্পী ছিলেন(Guha-Thakurta 13)। তাঁদের বংশধরেরা ইংরেজ আমলে নিজেদের অঙ্কনশিল্পের ঘরানাটা ইংরেজদের পছন্দ মতো পাল্টে নিতে চাইলেন। ‘সঠিক’ পদ্ধতিতে ইংরেজ তথা ইউরোপীয় ধরনে শেডিং, পারস্পেকটিভ ও বাস্তববাদী ধরনে তাঁদের চিত্রগুলিকে আঁকতে থাকলেন। কলকাতাবাসী ইউরোপীয় নাগরিকেরা নিজেদের কলকাতা জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য নথিকরণ করে রাখতে চাইতেন। কলকাতার শহরের, অট্টালিকা, রাস্তা ঘাট, গাড়ি ঘোড়া, আমোদ প্রমোদ, জীবনের সমস্ত উপকরণগুলির নিখুঁত প্রমাণ রাখতে চাইতেন তাঁরা। সেই কারণে তাঁরা বেছে নিলেন এই মুঘল দরবারের শিল্পী গোষ্ঠীকে। ইউরোপীয় শিল্পীদের তুলনায় অল্প খরচে এই ভারতীয় শিল্পীরা তাঁদের প্রভুদের কলকাতা জীবনের ছবি আঁকতে থাকলেন। রতন পারিমুর ব্যাখ্যায়, ‘The British artist was very expensive and amateur painting had its own limitations, nor were there opportunities to learn sketching technique in India in the absence of art tutors. Hence the search for Indian substitutes’ (23)। ঐতিহ্যশালী মুঘল যুগের শিল্পীরা হয়ে পড়লেন অনুকরণকারী। ইউরোপীয় কায়দায় ইউরোপীয়দের কলকাতা জীবনের অনুকরণ করতে থাকলেন তাঁরা। তাঁদের ‘শিল্পী সত্তা’র স্থানে জায়গা

করে নিল তাঁদের অনুকরণের ক্ষমতা। উজ্জ্বল আলোক-দুর্ভেদ্য রঙের (opaque) স্থানে তাঁরা গ্রহণ করলেন হালকা অনুজ্জ্বল জলরং। আলো ও ছায়ার মিশেল ঘটালেন সাবেকি অঙ্কনরীতির সঙ্গে। স্টাইলাইজড রীতির মনুষ্য অবয়বের বদলে আঁকা হতে থাকল সমানুপাতিক বাস্তববাদী শরীরের অবয়ব। বস্তুর পেছনে তার আয়তন মাফিক ছায়া আঁকার প্রচলন হল। তাঁদের বংশপরম্পরায় বাহিত মুঘল শিল্পকলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ইউরোপীয় কায়দার বাস্তববাদী অঙ্কনরীতির মিশ্রণ ঘটিয়ে ফেললেন।

কোম্পানি শিল্পীদের এই পরিবর্তনের প্রভাবে বাঙলার দেশীয় সাংস্কৃতিক জীবনেও বদল আসে। দেশীয় উৎসবানুষ্ঠানে ব্যবহার শুরু হয় ব্যাকড্রপের বা পশ্চাৎপটের। যথাসম্ভব বাস্তবানুগ রীতিতে আঁকা নীল আকাশ, সবুজ বন আর দিগন্ত বিস্তৃত গাছের সারি অঙ্কিত হওয়া শুরু হল দেশীয় অনুষ্ঠানগুলিতে। পরবর্তী কালে ক্যামেরার আগমনে এই কোম্পানি পেইন্টাররা কাজ হারাতে শুরু করেছিলেন। অথবা তাঁদের জায়গায় চলে আসেন স্কুল অফ আর্ট-এর শিক্ষিত ড্রাফটম্যান, এন্‌গ্রেভার ও লিথোগ্রাফাররা। ব্রিটিশ শিল্পের প্রভাবে দেশজ শিল্পকলার এই ব্যাপক বিবর্তন বাংলা থিয়েটারের মঞ্চচিন্তাকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। পরে এই নিয়ে আলোচনা করা হবে।

লোককলার চিত্রঃ কালিঘাটের পটশিল্প শহর কলকাতার কালো অংশের বাজারি শিল্প বলা যায়। কোম্পানি শিল্পীরা নিজেদের সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ শিল্পকলার কাছে সমর্পিত করেছিল। ব্রিটিশদের নির্দেশিত শিল্পপদ্ধতিতে নিজেদের অঙ্কনরীতিকে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। পটুয়ারা কিন্তু নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে শিল্পধারাকে বাঁচিয়ে রাখতে থাকল। দেশীয় অভ্যাস ও রুচিকে প্রাধান্য দিয়েই তাঁদের শিল্পপ্রবাহ অব্যাহত রয়ে গেল। উচ্চবর্গের ‘উচ্চশিল্প’ বা ব্রিটিশদের পাশ্চাত্যশিল্প কোনো প্রবাহের মধ্যেই নিজেদের ভাসিয়ে দিতে পারল না। পটুয়ারা নিজেদের ঐতিহ্যের প্রাচীনতা ও বৈশিষ্ট্যকে মোটামুটি অপরিবর্তিত রেখেই চলতে থাকল। কলকাতা শহরের বাজার শিল্পজগতে তাঁদের অপ্রতিরোধ্য গতি অব্যাহত থাকল। সমাজের নিম্নবর্গীয় গোষ্ঠীর কাছে আদরণীয় মূল শিল্প হিসেবে বেঁচে রইল পটুয়ারা। উচ্চশিল্প থেকে স্পষ্ট বিভাজনে দাঁড়িয়ে ‘দেশীয়’ ও ‘ঐতিহ্যবাহী’ শিল্পধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠা নিল কালিঘাটের পটশিল্প। রতন পারিমু বলছেন, ‘... Kalighat paintings of Calcutta wherein the forms have been brought out in emphatic volume by means of large brush-strokes of rudimentary colour and thick bold outlines’ (23)।

কখনো কখনো উজ্জ্বল আলোক-দুর্ভেদ্য Opaque রঙের পাশাপাশি জলরঙও তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। এমনকি মানুষের মুখমণ্ডল অঙ্কনে আলো-ছায়ার ব্যবহারও কিছুটা করেছিলেন। কিন্তু কোনোটাই বিদেশীয় বাস্তবতা প্রতিষ্ঠার জন্য নয়। এই ব্যবহারগুলির কারণ আলাদা ছিল, পটচিত্রে এই ব্যবহারগুলির প্রভাবও আলাদা ছিল। ব্রিটিশ শিল্পরীতির মতো বাস্তবতা অঙ্কন করেননি পটশিল্পীরা। গ্রহণ করেছেন এক স্বতন্ত্র বিশিষ্ট পথ। দেশীয় নিম্নবর্গ ও বেশ কিছু উচ্চবর্গের কাছে কালিঘাট পটের চাহিদা ছিল প্রচুর। ফলে পটুয়াদের অল্প খরচে অতি দ্রুত পট অঙ্কন করে ফেলতে হত। এই কারণেই তাঁরা নিজেদের ঐতিহ্যবাহী অঙ্কনরীতির কিছু পরিবর্তন এনেছিলেন। কাপড়ের বদলে নিলেন কাগজ; পুরোনো ভেষজ রঙের বদলে নিলেন জলরঙ; গোটানো বিশাল পটের বদলে তৈরি করতে থাকলেন টুকরো টুকরো একক ছবি; দেবদেবীর ছবি ছাড়াও আঁকা হতে থাকল সামাজিক সমস্যা নিয়ে নানান পট (Guha-Thakurta 19)।

পটুয়ারা এই কলকাতা শহরের ব্রিটিশ সংস্কৃতির আগমনকে মন থেকে গ্রহণ করেননি। উচ্চবিত্ত বাঙালিদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে ব্রিটিশ আদব-কায়দায় প্রভাবিত হতে চাননি। তাই তাঁদের পটে প্রায়শই দেখা যায় নব্য ইংরেজি শিক্ষিত বাবুদের বিরুদ্ধে তীব্য ঘৃণা, তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ। নিজেদের অতীত গ্রামীণ জীবন থেকে তাঁরা সরে আসতে বাধ্য হয়েছে ঠিকই; কিন্তু তাঁরা তাঁদের শিল্পকলায় বহন করে নিয়ে গেছে অতীত গ্রাম্য জীবন, রক্ষণশীল গ্রামীণ হিন্দু সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব। তপতী গুহ ঠাকুরতার বিশ্লেষণ, 'While the context in which the Kalighat pats flourished was colonial and urban, the basic values which they reinforced (both visually and socially) remained largely rural and traditional' (23)। ব্রিটিশদের বাস্তববাদী শিল্পরীতিতে পটুয়ারা প্রভাবিত হতে চাননি। তাঁদের শিল্পের রসজ্ঞ ক্রেতা কিছু ক্ষেত্রে উচ্চবর্গের বাঙালি হলেও, মূলত নিম্নবর্গের সাধারণ গরীব মানুষই ছিল পটশিল্পের লক্ষিত উপভোক্তা। নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ—এই তিন ভাগে স্পষ্টভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল কলকাতার শিল্প সমাজ। যামিনী রায় লিখছেন, 'For the common people, there were the Kalighat Pats and lithographs of Battala. For the educated middle class there were the Bowbajar Art Studio reproductions of pats and oil paintings; and for the rich, the landlords and the 'rajas' and 'maharajas', there were the painting of Ravi Varma' (qtd. in S. Banerjee *The Parlour and the Streets* 194)। সাধারণ খেটে খাওয়া নিম্নশ্রেণীর মানুষদের কাছে আদরণীয় শিল্প ছিল কালিঘাটের পট ও

বটতলার ছাপা ছবি; শিক্ষিত মধ্যবিত্তের শিল্পের চাহিদা মেটাত বৌবাজার আর্ট স্টুডিও-র মহাভারত বা রামায়ণ বা এই জাতীয় উচ্চ সাহিত্যের লিথো-ইলাস্ট্রেশন; আর কেরালার রাজবংশীয় শিল্পী রবি বর্মার শিল্পকর্ম ছিল একান্তভাবেই রাজা মহারাজাদের জন্য।

নব্য ইংরেজ প্রভাবিত কলকাতা শহরের নতুন সংস্কৃতির এই চলনের সঙ্গে নিম্নবর্গের খেটে খাওয়া গরীব মানুষও খাপ খাওয়াতে পারেনি। মেনে নিতে পারেনি নতুন ‘প্রগতিশীল’’বিজ্ঞানভিত্তিক’ নব উদ্যোগকে। এই নতুন সমাজে তাঁরাও থেকে গেছে ‘বিচ্ছিন্ন’। ফলে কালিঘাটের পট চিত্র তাঁদের মনের চাহিদা মেটাতে সাহায্য করেছে। নব্য বাবু সংস্কৃতিকে ঘেন্না করতে সাহায্য করেছে। গ্রাম্য জীবনের পুরাতন অস্তিত্বকে নিয়ে বেঁচে থাকতে সাহায্য করেছে। পটুয়ারা তাই ‘ব্যঞ্জনাধর্মী’ স্টাইলাইজড শিল্পেই মগ্ন থাকল। তপতী গুহ ঠাকুরতার মতে, ‘Artistically, too, they continued to work within a markedly non-naturalistic, two-dimensional style, transforming on their own terms whatever new elements they drew on’ (23)।

পটুয়া সম্প্রদায়ের এই শিল্পীদের কারিগর হিসেবেই বেশি মান্যতা দেওয়া হয়েছিল। শিক্ষিত সমাজ তাঁদের ‘শিল্পী’র পর্যায়ভুক্ত করতে চায়নি। একই শিল্প বারে বারে উৎপাদন, ব্যাপক চাহিদা মেটাতে প্রচুর পরিমাণে একই জিনিষ এঁকে যাওয়াকে উচ্চশিল্পের কাণ্ডারিরা একজন কারিগরের কাজ হিসেবেই চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। দেশীয় উপকরণ নিয়ে দেশীয় পদ্ধতিতে আঁকা ব্যাপক পরিমাণে অঙ্কিত এই উৎপাদিত বস্তু উচ্চশিল্পের উচ্চতায় পৌঁছতে চাইল না। কোম্পানি পেইন্টারদের মতো পটুয়াদের নামও জানা গেল না। তাঁরা ইতিহাসের কাছে ‘অজ্ঞাত’ হয়েই থেকে যেতে চাইলেন। উচ্চবিত্ত শিল্পীদের মতো ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ‘শুদ্ধিকরণ’-এর প্রক্রিয়ায় নাম লেখালেন না তাঁরা। ফলে তাঁদের নামও অজানা রয়ে গেল ইতিহাসের কাছে। আর ‘যথার্থ শিল্পী’র মর্যাদা সম্পন্ন গোষ্ঠী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকলেন ব্রিটিশ বাস্তববাদী রীতিতে প্রশিক্ষিত নব্য প্রাণিত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির অঙ্কনশিল্পীরা। কখনো কখনো ইউরোপের চাপে তেল রঙ ব্যবহার করতে হয়েছে পটুয়াদের, ক্যানভাস ব্যবহার করতে হয়েছে; কিন্তু তাঁরা জানতেন, তাঁদের নিজেদের শিল্পক্ষেত্রে এইসব উপকরণ অত্যন্ত বিজাতীয়, অপ্রচলিত। তপতী গুহ ঠাকুরতার ব্যাখ্যা, ‘The use of oil and the cultivation of a realistic illusionist style had become synonymous with the identity of an ‘artist’, with the Calcutta School of Art as the central

forum for training in this medium and style' (35)। এই তেল রঙের ব্যবহার ও বাস্তববাদী অঙ্কনরীতিটিই 'পরিশোধিত শিল্পী' হিসেবে উত্তীর্ণ হওয়ার চাবিকাঠি হয়ে দাঁড়ালো।

সাধারণ মঞ্চাঙ্গনে শিল্পভাবনা ও নিম্নবর্গের প্রস্থান

বড়লোকের ঘরের আঙ্গিনা থেকে বেরিয়ে এল বাংলা নাট্যালয়। প্রতিষ্ঠা হল সাধারণ রঙ্গালয়। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে তার পথ চলা শুরু। তার কয়েক বছর আগে থেকেই চলছিল সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রস্তুতি পর্ব। বাগবাজারের যুবকরা সমবেত ভাবে যে *লীলাবতী* নাটকের অভিনয় করেছিলেন, তার মঞ্চব্যবস্থা নিয়ে প্রশংসাই বের হয় *এডুকেশন গেজেট*-এ ২৪ মে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে– 'রঙ্গভূমি অতি প্রশস্ত ও সুন্দর; আটখানি দৃশ্য ছিল, তন্মধ্যে প্রথম (ড্রপকে বোঝাচ্ছে) ইংলণ্ডের রাজপ্রাসাদ, 'সিদ্ধেশ্বরের পুস্তকালয়', ও 'অনাথবন্ধুর মন্দির' এই কয়খানি অতি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছিল' (Hazra 182)। এই দৃশ্যপটগুলি নিঃসন্দেহে দ্বিমাত্রিক কাপড়ের ঝোলানো পট। এর পর ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে বড়লোকের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বেরিয়ে সাধারণ মানুষের জন্য থিয়েটারের উদ্যোগ শুরু। প্রথম নাটক *নীলদর্পণ*। দলের নাম *ন্যাশনাল থিয়েটার*। প্রধান উদ্যোক্তা বাঙালি মধ্যবিত্ত যুবকরা। নিতান্ত দরিদ্র অবস্থা ছিল এই রঙ্গালয়ের। 'ন্যাশনাল' থিয়েটার নাম হওয়ার মতো উন্নত মঞ্চব্যবস্থা ছিল না। মধুসূদন স্যান্যালের বাড়িতে *নীলদর্পণ* নাটকের যে অভিনয় হয়েছিল সেই প্রসঙ্গে *এডুকেশন গেজেট* ১৩ই ডিসেম্বর ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে লিখছে, 'অধিকাংশ দৃশ্যগুলি ন্যাশনাল থিয়েটারের উপযুক্ত হয় নাই। কারণ জাতীয় চিত্রের আদর্শ-সকল স্থাপণ করাই কর্তব্য। 'গোলা ঘরের সম্মুখ', ও 'কুটির দপ্তরখানার সম্মুখ' চিত্র দুইখানি মন্দ নহে। অনেক গৃহের পার্শ্ববর্তী চিত্র না থাকাতে গৃহের সৌন্দর্য্য হ্রাস হইয়াছিল, এবং কোন কোন গৃহের দৃশ্যও অভিনয়ের উপযোগী হয় নাই' (Hazra 183)।

স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, নাট্য দর্শকের মধ্যে মঞ্চসজ্জা ও অভিনয় প্রসঙ্গ নিয়ে একটি সচেতনতা তৈরি হতে চলেছে। নাটক শুধু টেক্সট নির্ভর হয়ে থাকতে চাইছে না। 'জাতীয় চিত্রের আদর্শ' অনুযায়ী দৃশ্যগুলি অঙ্কন করা যায়নি বলে সমালোচনাও হচ্ছে। ক্রমাগত অধ্যবসায় ও সদিচ্ছায় নাট্য কলা কুশলী ও দর্শক নাট্য প্রযোজনার সাহিত্য-নির্ভরতার বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। দৃশ্যের ওপরে চর্চা শুরু হচ্ছে। নাট্য প্রযোজনার সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়ের দিকে সচেতনতা বাড়তে চলেছে। বাঙালি মধ্যবিত্ত যুবকেরা থিয়েটারের সমস্ত উপকরণের দিকে মনোযোগী হচ্ছে। শুধু প্রযোজনা সংক্রান্ত সচেতনতা নয়; বাঙালি নাট্যকর্মীরা একটি স্থায়ী রঞ্চমঞ্চ গড়ে তোলার জন্য উৎসাহী হয়ে ওঠেন। কলকাতার ইংরেজদের থিয়েটারের অনুকরণে নিজেদের প্রচেষ্টায় ধনীবাড়ির ছেলে শরৎচন্দ্র ঘোষের উদ্যোগে

তৈরি হয় *বেঙ্গল থিয়েটার* এবং মধ্যবিত্ত বাড়ির কিছু নাট্যকর্মী যুবকরা *গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার* গড়ে তোলার উদ্যম নেন। দ্বিতীয় রঙ্গালয়টি বানানোর জন্য ধর্মদাস সুর ও অমৃতলাল বসুর ঐকান্তিক উদ্যোগের বর্ণনাটি বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

ব্রিটিশ থিয়েটারের অনুকরণে এতদিন নাটক বাছাই করা হয়েছে, ব্রিটিশ অভিনেতাদের কায়দায় অভিনয় পদ্ধতি আয়ত্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে, ব্রিটিশ প্রভাবে কিছু কিছু মঞ্চসজ্জার আয়োজনও করা হয়েছে। অমৃতলাল বসু তাঁর রচনায় এই সময়কার খানিক বর্ণনা দিয়েছেন:

> ইংরাজী নাটক অভিনয় আমাদের বাঙ্গালীকে ভাল ক'রে দেখিয়ে যান প্রথমে জি. ডাবলিউ. লুইস ব'লে একজন। ...বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটে এক শুঁড়ি... নাম ছিল সুলতানা, ভাড়া পাবার আশায় গড়ের মাঠে মনুমেন্টের কাছে একখানি থিয়েটারের ঘর তৈয়ারী ক'রে দেন। করগেটের চাল, করগেটের বেড়া...ঐ থিয়েটারে লুইসের দল প্রতি শীত কালে এসে মাস ৫-৬ অভিনয় দেখিয়ে চ'লে যেত (A. Basu *Smriti O Atmasmriti* 187)।

গিরিশ ঘোষের জীবনে যাত্রার সাবেকি অভিনয় ধারা থেকে বেরিয়ে এসে সমকালীন ইউরোপীয় বাস্তবতাধর্মী অভিনয়ের প্রেরণা এই *লুইস থিয়েটার*, এমনটা বললে বোধহয় ভুল হবে না। গিরিশের চাকুরি সূত্রে প্রখ্যাত অভিনেত্রী মিসেস লুইসের সঙ্গে আলাপ এবং ঘনিষ্ঠতার কথা জানাচ্ছেন অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। সেই সূত্রে লুইস থিয়েটারের অভিনয় দেখে সেই ব্যাপারে মিসেস লুইসের সঙ্গে আলোচনা ও মতামত বিনিময় তাঁর অভিনয়চেতনাকে গড়ে তুলেছিল, এমনটাই জানা যাচ্ছে। অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের বয়ানে,

> মিসেস্ লুইসের সহিত ঘনিষ্ঠতায় এবং 'লুইস থিয়েটারে' প্রায়ই অভিনয় দর্শনে যুবক গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভা স্ফুরিত হইয়া থাকে। তৎপরে কলিকাতায় আগত লব্ধপ্রতিষ্ঠ বহু বিলাতী থিয়েটারে সেক্সপীয়রের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির অভিনয় দেখিয়া তিনি পাশ্চাত্য নাট্যকলায় বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। সেই অভিজ্ঞতায় ও স্বভাবপ্রদত্ত নাট্যপ্রতিভায় তিনি 'ম্যাকবেথে'র শিক্ষাদানে এবং স্বয়ং ম্যাক্‌বেথের ভূমিকা অভিনয় করিয়া প্রতিপন্ন করেন বাঙ্গালীর দ্বারা বাঙ্গালা ভাষাতেও বিলাতের সুবিখ্যাত অভিনেতৃগণের ন্যায় রস সৃষ্টি করা যায়। নাটকের প্রত্যেক ভূমিকাই সুন্দর এবং নির্দোষভাবে অভিনীত হইয়াছিল (266)।

নাটকের অভিনয়ের 'সুন্দর' ও 'নির্দোষ' হওয়ার কোনো মহাফেজখানার নিদর্শন তো পাওয়া যায় না। কিন্তু, এও প্রসঙ্গে সেই সময়ে *ম্যাকবেথ* নাটকটির মঞ্চপ্রযোজনা প্রসঙ্গে *ইংলিশম্যান*-এর একটি রচনা উল্লেখযোগ্য, '... the reality is an admirable reproduction of all the conventions of an English stage' (qtd. in A. Gangyopadhyay 266)। অর্থাৎ, ইংলিশ স্টেজের সমস্ত উপকরণ যেন খুঁজে পাওয়া গেছিল গিরিশ পরিকল্পিত *ম্যাকবেথ* নাটকে। 'ইংলিশ স্টেজের সমস্ত উপকরণ' বলতে অভিনয় বা মঞ্চসজ্জার ক্ষেত্রেও যে এই ইংলিশ উপকরণের ছাপ পড়ে থাকতে পারে এমন অনুমানের দিকেই সম্ভাবনা নির্দেশ করে *ইংলিশম্যান*-এর এই ব্যাখ্যা।

ব্রিটিশ অনুপ্রেরণায় নাটক বাছাই করা বা অভিনয় পদ্ধতি আয়ত্ত করার পাশাপাশি ব্রিটিশ প্রেক্ষাগৃহের যথাসম্ভব হুবহু অনুকরণে গোটা একটা রঙ্গালয় তৈরী করার উদ্যোগটি নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ একটি ঘটনা। প্রথম বাঙালি স্থায়ী রঙ্গালয় তৈরি করেন শরৎচন্দ্র ঘোষ, নাট্যশালার নাম *বেঙ্গল থিয়েটার*। এই রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার সময়ে খোলার চাল অর্থাৎ টালির চাল ছিল। খোলার চাল, মাটির মেঝে, শালের খুঁটি দিয়ে তৈরি হয়েছিল *বেঙ্গল থিয়েটার*। পরবর্তীকালে করগেট বা ঢেউ খেলানো লোহার পাত ব্যবহার করা হয়েছে। বিনোদিনীর বর্ণনায়— 'বেঙ্গল থিয়েটারে আগে খোলার চাল ছিল, এবারে গিয়ে দেখলুম, খোলার বদলে করগেট হ'য়েছে, বাইরেরও অনেক অদল বদল হয়েছিল। কিন্তু হ'লে কি হয়। প্লাটফরম সেই মাটির ঢিপিই ছিল। প্লাটফরমের আগাগোড়া মাটি—মাঝে খানিকটা তক্তা বসান, নীচে সুড়ঙ্গ। সেই সুড়ঙ্গপথ দিয়ে ষ্টেজের ভেতর হতে বরাবর অডিটোরিয়ামে যাওয়া যেত। যারা কনসার্ট বাজাত তাঁরা ঐ পথ দিয়েই যাতায়াত করত। মাটির প্লাটফরমের কারণ এই—বেঙ্গল থিয়েটারের ষ্টেজে অনেক নাটকে ঘোড়া বার করা হ'ত' (Dasi 84)। বর্ণনাটি থেকে নিঃসন্দেহে বোঝা যায়, নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা নিয়েই এই মঞ্চ বানানো হয়েছিল। শখের থিয়েটারের যুগ পেরিয়ে নাট্যকর্মীরা এই সময় অনেক মনোযোগী থিয়েটার চর্চায় উদ্যোগী হতে চলেছে। বানানো হচ্ছে নতুন রঙ্গালয়। পরীক্ষা নিরিক্ষা মাধ্যমে বাঙালীর থিয়েটারের উপযুক্ত গঠন বিন্যাসটিকে খুঁজে বের করে আনার চেষ্টা হচ্ছে ।

বেঙ্গল থিয়েটারের পর *গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার* গড়ে তোলার আয়োজনে নেমে পড়লেন অমৃতলাল বসু, ধর্মদাস সুর ও ভুবনমোহন নিয়োগীর মতো নাটক-পাগল যুবারা। ব্রিটিশ থিয়েটার মঞ্চের অনুকরণে গড়ে তুললেন সাহেবি কায়দায় বানানো নাট্যমঞ্চ *গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের* ভবনটি। এই সূত্রে বলে রাখা দরকার, ধর্মদাস সুরের উদ্যোগে ব্রিটিশ কায়দায় তৈরি মঞ্চ ও মঞ্চসজ্জার মূল পথপ্রদর্শকও ছিল এই *লুইস থিয়েটার*। অমৃত তাঁর স্বভাবসিদ্ধ

রসিক ভঙ্গিতে লিখছেন, 'আমরা কভেন্ট গার্ডেন, ড্রুরী লেন, হে মার্কেট, লাইসিয়াম প্রভৃতি দু-পাঁচটা লণ্ডন থিয়েটারের নাম শুনেছিলেম মাত্র; মনে মনে ভাবতেম, গড়ের মাঠের ঐ টিনের বাক্সটি বোধ হয় দেশী কভেন্ট গার্ডেন' (*Smriti O Atmasmriti* 187)। নাটক পাগল মধ্যবিত্ত যুবকেরা আজ এই ধনীর বাড়ি, কাল ওই ধনকুবেরের বদান্যতায় মাঝে সাঝে অভিনয় চালাতেন। কখনো মল্লিকদের ঘড়িওয়ালা বাড়ি, কখনো কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়িতে রঙ্গমঞ্চ বাঁধা হত। হাবড়া, চুঁচুঁড়া, বর্ধমান, ঢাকা সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে অভিনয় চলতে থাকল। 'কিন্তু কল্‌কেতায় অভিনয় করবার ঘর আর জোটে না' (A. Basu *Smriti O Atmasmriti* 188)।

এই সময় ভুবনমোহন নিয়োগীর অর্থানুকুল্যে একটি জমি লিজ নিয়ে থিয়েটার গড়ার কাজে লেগে পড়লেন অমৃতলাল-ধর্মদাসেরা। তাঁদের পরিকল্পিত নাট্যশালার আদর্শ ছিল সেই করগেটের *লুইস থিয়েটারটি*। করগেট অর্থে সম্ভবত corrugated iron sheet বা ঢেউ খেলানো লোহার পাত। টিকিট কেটে নাটক দেখতে গিয়ে দূর থেকে দেখা মঞ্চ ব্যবস্থাকে অনুসরণ করেই নাট্যশালার পরিকল্পনা করা। 'ষ্টেজের সামনেটা কত বড় হবে, তার মাপ ঠিক করবার জন্য ধর্মদাস পিটের একটা সিটে আমার পাশেই ব'সে বেজ্‌কার্টেনের পার্টগুলো সেলাইয়ে সেলাইয়ে গুণে নেয়, পরে বাজারে গিয়ে সেই কাপড়ের বহর মেপে প্রোসিনিয়ামের ব্যবস্থা করে' (A. Basu *Smriti O Atmasmriti* 191)। বিদেশি *লুইস থিয়েটারের* অনুকরণে তৈরি হয় নাট্যশালা। ইংরেজদের নাট্যশালা ছিল করগেটের, বাঙালির নাট্যশালা হল কাঠের। শুধু দৈর্ঘে দশ ফুট তফাৎ ছিল।

এই সূত্রে, বাংলা নাটকের মঞ্চপরিকল্পনার প্রগতির আলোচনায় ব্যোমকেশ মুস্তাফির *বঙ্গীয় নাট্যশালা* বইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নাট্য প্রযোজনার প্রতিটি বিভাগ নিয়ে ব্যোমকেশের বিশ্লেষণ সেই সময়কার নাট্য কুশলীদের পেশাদারি উদ্যমের প্রমাণ বহন করে। ব্যোমকেশের পুরো বইটি গভীর মনোযোগে পড়লে বোঝা যায়, বাঙালির নাট্যচর্চা আর সখের সময় যাপনের পর্যায়ে নেই। নাটকের টেক্সট থেকে শুরু করে পোশাক গীত বাদ্য মঞ্চসজ্জা দৃশ্যপট সবদিক নিয়ে ভাবনার প্রচলন শুরু হয়েছে এই সময় থেকেই। উনিশ ও বিশ শতকীয় মঞ্চভাবনার আলোচনায় এই বইটির দৃশ্যপটাদি অধ্যায়টির বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন বলে মনে হয়। শুরুতেই লেখকের আক্ষেপ, '... দেশ-কাল-পাত্রোচিত পোশাক-পরিচ্ছদ না থাকায়, বঙ্গীয় নাট্যশালায় ভাব ফুটাইবার যেমন ব্যাঘাত হয়, দেশ-কাল-বিষয়োচিত দৃশ্যপটের ব্যবস্থাও হয় না বলিয়া ভাবসুদ্ধ অভিনয়ের ঠিক তেমনই ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে' (D. Mukhopadhyay *Bangiya Natyashalar Itihas* 51)। অর্থাৎ দৃশ্যপট আর শুধু লেবেদফের মঞ্চের মতো বাঙালি

কায়দায় বানানো সাধারণ অলংকরণ নয়। সেটি এখন নাট্য প্রয়োজনার অবিচ্ছেদ্য অংশ। অভিনয়কে সুপরিস্ফুট করতে দৃশ্যের প্রয়োজন। দৃশ্য এখন শুধু 'সুন্দর', 'মনোহারিণী' বা 'চমৎকার' হলে চলবে না। দৃশ্য হতে হবে অভিনয়ের সঙ্গে 'মানানসই', 'যথাযথ'।

ব্যোমকেশের রচনায় একটা বড় অংশ পার্শ্বপট (wings) অঙ্কনের পারস্পেকটিভ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। দৃশ্যপট মানে মঞ্চের একেবারে পেছনে টাঙ্গানো বিশাল পর্দা। আর পার্শ্বপট মানে মঞ্চের ডান দিকে ও বাম দিকে ঝোলানো অপেক্ষাকৃত সরু ফ্রেমে আটকানো কাপড়ের সারি। ব্যোমকেশের কথায়, পেছনের দৃশ্যপটের সঙ্গে পাশের উইংসের অঙ্কনরীতি এমনকি রঙও সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া জরুরী। '... অধিকাংশ স্থলেই আমরা দেখিয়াছি, মূল পটখানির সহিত তাহার পার্শ্বপটের দৃশ্যের মিল থাকে না' (D. Mukhopadhyay *Bangiya Natyashalar Itihas* 51)। তাঁর পর্যবেক্ষণ, ঘরের দৃশ্যের মূলপটের দরজা-জানলা-প্রাচীরের সঙ্গে উইংসের রঙ ও ডিসাইনের মিল থাকে না। কিংবা রাজসভার স্তম্ভের পার্শ্বপট ব্যবহার হয় অন্য নাটকেও। '... তা কে জানে গরিব কেরানির অন্তঃপুর; আর কে জানে কৃষকের শয়নগৃহমধ্য' (D. Mukhopadhyay *Bangiya Natyashalar Itihas* 52-53)।

গ্রিনরুম ও মূল মঞ্চকে আলাদা করার জন্য যেকোনো পট ঝুলিয়ে দিলেই তাকে দৃশ্যপট বলা যাবে না। মূল মঞ্চের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই তার অলংকরণ হওয়া কাংক্ষিত। কিন্তু সব সময় বিভিন্ন নাটকের জন্য আলাদা আলাদা দৃশ্যপট বা পার্শ্বপট আঁকানো সম্ভব হয়ে উঠত না। তাই '... এই একটি মাত্র দৃশ্যের উপযুক্ত আয়োজন করিয়া রাখিয়া স্টার থিয়েটার সকল পুস্তকের সমস্ত কক্ষের দৃশ্যের বেশ সদ্ভাব উদ্ভাবনের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন' (D. Mukhopadhyay *Bangiya Natyashalar Itihas* 51)। যদিও প্রতিটি নতুন নাটকের জন্যই নতুন কিছু দৃশ্যপট আঁকিয়ে নেওয়ার প্রথা ছিল। কিন্তু মুশকিল হল, '... মঞ্চাধ্যক্ষেরা অনেক সময় ইউরোপিয় স্টিল এনগ্রেভিং ও ফটো হইতে দৃশ্যের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া থাকেন—কাজেই দূর্গের পরিবর্তে 'কাসল' (castle), বাগানের পরিবর্তে 'ভিলা' (villa), বারান্দার পরিবর্তে 'করিডোর' (corridor), রাজসভার পরিবর্তে 'ড্রইংরুম' (drawing room) প্রভৃতির অবাধ অনুকরণ দেখিতে পাই' (D. Mukhopadhyay *Bangiya Natyashalar Itihas* 53)।

দৃশ্যপট হয়ে উঠেছিল মূল মঞ্চেরই একটি বাড়তি অংশ। কেবল অভিনয় এলাকার পেছনের একটি সাধারণ পশ্চাৎপট মাত্র নয়। ফলে অঙ্কনরীতির বাস্তবতাসম্পন্ন পারস্পেকটিভ ঠিক রাখার পরামর্শ দেন ব্যোমকেশ। একটি কাল্পনিক বাগানের দৃশ্যের বর্ণনায় একটি চমকপ্রদ নিরীক্ষণ বিবৃত করেন তিনি:

...যে সকল বাগানের দৃশ্যে মূল পটখানিতে বাগানের ফটক আঁকা থাকে; জিজ্ঞাসা করি; অভিনেতৃবৃন্দ সে বাগানের দৃশ্যে বাগানে প্রবেশ করে কীরূপে? রঙ্গমঞ্চতল বাগানের ফটকের সম্মুখে পড়িয়া থাকে, সেখানে দাঁড়াইলে বা বেড়াইলে বাগানে বেড়ানো হয় না... যাঁহারা মূল দৃশ্যপটের সম্মুখে কিয়দ্দূরে রঙ্গমঞ্চতলে টুকরা দৃশ্য জুড়িয়া বাগানের ফটক সাজাইয়া দেন, তাঁহারা তবু কতক রীতি বজায় রাখিয়া চলেন;... যাঁহারা আবার ওইরূপ বাগানের ছবির সম্মুখে রঙ্গমঞ্চতলে কৃত্রিম লতামণ্ডপ ও ফুলগাছের টব ইত্যাদি সাজাইয়া দেন, তাঁহাদের বুদ্ধি আরও বলিহারি মানিতে হয়। কোথায় বাগানের জমি, আর কোথায় সে সকল সাজানো হয় তার সামঞ্জস্য কী, তাহা কেহ একবার ভুলিয়াও চাহিয়া দেখেন না' (D. Mukhopadhyay *Bangiya Natyashalar Itihas* 54-55)।

ব্যোমকেশের বিশ্লেষণ থেকে এই দীর্ঘ বর্ণনাগুলো না তুলে সেই সময়কার মঞ্চভাবনার দর্শনটি সম্পর্কে আলোচনা করা সম্ভব ছিল না। এই রচনা থেকে একটি নাটকের মঞ্চসজ্জা নিয়ে যে গভীর মনোনিবেশের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, তা নিঃসন্দেহে সেই সময়কার নাট্যমগ্ন কুশীলবদের মঞ্চ বিষয়ক চেতনার প্রামাণ্য দলিল। এই রচনাটি যখন লেখা হয়েছে, অর্থাৎ ১৩১৭ বঙ্গাব্দে বা ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে, তখন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী মারা গেছেন, কিন্তু গিরিশ তখনও সেই সময়কার তারকা অভিনেতা ও নাট্যাধ্যক্ষ। ফলে সেই যুগের মঞ্চভাবনার প্রগতির আলোচনায় এই বইটির মূল্য অপরিসীম। যদিও বঙ্গরঙ্গমঞ্চের মঞ্চসজ্জার সীমাবদ্ধতা নিয়ে অনেক আগেই গিরিশ ঘোষের সচেতনতা প্রকাশ পায় তাঁর 'নটের আবেদন' প্রবন্ধে। ১৩০৭ বঙ্গাব্দ বা ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে এই প্রবন্ধে তিনি মঞ্চসজ্জার এই দুর্দশার কারণ হিসেবে তিনি টিকিটের দামকেই দায়ী করছেন। ইংরেজি থিয়েটারের সঙ্গে তুলনা করে তিনি লিখছেন, '... সাধারণের নিকট অর্থ সাহায্য পাইলে অতি সুন্দর দৃশ্যপট প্রস্তুত করা বাঙ্গালী নাট্যাধ্যক্ষের অসাধ্য নয়। পাশ্চাত্য অভিনেতার যে অর্থাগম একরাত্রে হয়, বাঙালী নাট্যাধ্যক্ষের এক সপ্তাহের আয় তাহা অপেক্ষা ন্যূন' (*Girish Rachanabali* 1: 737)। তিনি আরও বলছেন, বাংলার রঙ্গমঞ্চে যে আসনের দাম আট আনা, কলকাতার ইংরেজি থিয়েটারে সেই আসনে বসতে এক টাকা দিতে হয়। অর্থাৎ বাংলা নাট্যমঞ্চে সীমিত অর্থাগম, সেই অনুযায়ী দৃশ্যভাবনা এবং তার সীমাবদ্ধতা নিয়ে গিরিশ ও তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের নাট্যকর্মীরা যথেষ্ট সচেতন ও অবহিত।

এইরকম বাস্তবের মতো মঞ্চসজ্জা, বলা ভালো বাস্তবের মায়া তৈরি করার যে প্রচেষ্টা, সেই মায়াবাদী মঞ্চসজ্জার (illusionist) অনুরূপ আরেকটি সমালোচনা দেখি অবনীন্দ্রনাথের লেখায়। *জোড়াসাঁকোর ধারে* গ্রন্থে

লিখছেন, '... স্টার থিয়েটারে কি-এক সিনে আর-এক আর্টিস্ট রাজসভার সিন এঁকে পিছনে ঝুলিয়ে দিয়েছে, বৃহৎ সভা, ঘরের থাম আসবাবপত্র কিছুই বাদ রাখেনি আঁকতে। এখন সেই সিনে রাজার সিংহাসন পড়েছে। রাজা বসলেন এসে সিনের পার্সপেকটিভে যেখানে পাপোশটি রাখা আছে ঠিক সেইখানে একটা চৌকিতে। অতিরিক্ত পার্সপেকটিভের ফল দেখো ছবিতে। রাজার স্থান হল পাপোশের জায়গায়' (Thakur, *Jorasankor Dhaare* 94)। মঞ্চ আয়োজনে বাস্তবের মতো পরিবেশ তৈরি করার এই ঝোঁক যে কী প্রবল হয়ে উঠেছিল, তার আরও একটি উদাহরণ পাই অমৃতলাল বসুর নাট্য প্রয়াসে। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে ব্যোমকেশ মুস্তাফীকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অমৃত বলছেন, 'Champagneএর বোতল খুলিবার সময় ঠিক সেই শব্দের অনুকরণ করিবার জন্য তখনকার সেই কাকের ছিপি দেওয়া বোতল Simultaneously খুলিবার জন্য একটা লোক রিহার্সেল দিয়া রাখা হইত' (*Nautchghar* 6)।

ব্যোমকেশ, অমৃত ও অবনীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ থেকে যেমন তখনকার মঞ্চভাবনার গাফিলতি ধরা পড়েছে, পাশাপাশি নাট্য মনজ্ঞ শিল্পীর মঞ্চসজ্জার বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে শিল্প ইতিহাসের সঙ্গে নাট্যমঞ্চের একটি প্রত্যক্ষ সংযোগ সূত্রও পাওয়া যাচ্ছে। ব্যোমকেশ তাঁর রচনার শেষের দিকে 'শিক্ষিত' চিত্রকরদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতায় ক্ষোভে ফেটে পড়ছেন:

> শুনিয়াছি মিনার্ভা থিয়েটারে ও স্টার থিয়েটারে দুইজন শিক্ষিত চিত্রকর এ বিষয়ে পরিদর্শনের জন্য নিযুক্ত আছে। কিন্তু তাঁহাদের কি কেবল পটুয়াগণের কাজ বিলি করা, কাজ বুঝিয়া লওয়া আর হাজিরা লেখা ব্যতীত অন্য কোনও কাজ নাই?... তবে তাহাদের মতো শিক্ষিত ব্যক্তির নাট্যমঞ্চে থাকিবার আবশ্যকতা কী? (D. Mukhopadhyay, *Bangiya Natyashalar Itihas* 56)

ব্যোমকেশের ভাবনায়, পটুয়াদের তুলনায় বেশি শিক্ষিত চিত্রকরেরা বাংলা মঞ্চব্যবস্থার তদারকি করার জন্য নিযুক্ত ছিলেন। তাঁরা যে উন্নত শিক্ষায় শিক্ষিত সেই শিক্ষার আলোকে বাংলা মঞ্চকে আলোকিত করে তুলতে না পারলে যে তাঁদের শিক্ষা একেবারে বিফলে যায়, সে কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন ব্যোমকেশ মুস্তাফী। বাংলা নাট্য মঞ্চের গোড়ার অবস্থায় পটুয়াদের দিয়েই দৃশ্যসজ্জার কাজ চালাচ্ছিল নাট্য উদ্যোক্তারা। ক্রমে ক্রমে আর্ট স্কুল ও ইউরোপীয় অঙ্কনধারার প্রভাব পড়তে থাকে অঙ্কন জগতে। যথারীতি সেই ইউরোপীয় ভাবধারার অঙ্কনশৈলির কদর বাড়তে থাকে বাংলা নাট্য মঞ্চের মঞ্চসজ্জার ভাবনাতেও। 'জাতীয় চিত্রের আদর্শ' ধারায় নাটকের মঞ্চসজ্জাকে সাজিয়ে

তোলার দাবী উঠছে সমাজে। কলকাতার শিল্প ইতিহাসের যে প্রেক্ষিত এই অধ্যায়ের আগের অংশে আলোচনা করা হয়েছে, সেই 'জাতীয়' শিল্প গড়ে তোলার উদ্যোগের এক অন্যতম স্থান হয়ে উঠছে বাংলা থিয়েটার জগতের মঞ্চ-অলংকরণ। বিলাতি পার্স্পেকটিভ রীতিতে আঁকা মঞ্চদৃশ্যগুলির মধ্যেকার খামতিতে সচেতন হয়ে উঠছে মনজ্ঞ দর্শক সমাজ। ইউরোপীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মঞ্চসজ্জাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে সমালোচনায় বিদ্ধ করছে অনবরত।

যদিও এই বিষয়ে একটি কথা উল্লেখ্য। দৃশ্য অঙ্কনের এই বাস্তবতার প্রয়োগটি কোনো একমুখী প্রবাহ নয়। পাশ্চাত্য বাস্তববাদী পারস্পেকটিভ রীতির অঙ্কনধারার প্রভাব যেমন নাট্যমঞ্চে এসে পড়েছে, একইভাবে নাট্যমঞ্চের দৃশ্যায়নের বৈশিষ্ট্যগুলিও সেই সময়কার কলকাতার অঙ্কনশিল্পের গণ্ডীতে স্থান করে নিয়েছে। সেই সময়কার বাংলা মঞ্চের নাট্যদৃশ্যগুলি যেভাবে সাজানো হত, প্রায় সেই একইরকমের দৃশ্যভাবনা করা হয়েছিল সেই সময়কার অনেকগুলি ছবি আঁকার ক্ষেত্রেও। বিশেষ করে পৌরাণিক বাংলা নাটকের দৃশ্যের বেশ কিছু প্রত্যক্ষ প্রভাব দেবদেবীর ছবির দৃশ্যায়নের ওপর ব্যাপক ভাবে পড়েছিল। ক্রিস্টোফার পিনি এই বিষয়ে গভীর পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁর মতে, উনিশ ও বিশ শতকীয় সমাজের দৃশ্যভাবনায় সবসময়েই ক্রোমোলিথোগ্রাফি, নাট্যমঞ্চ ও ফোটোগ্রাফি পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত হয়ে পড়ে। ক্রিস্টোফার পিনি লিখছেন:

> The 'conversation' between the idioms of chromolithography, theatre and photography in late nineteenth- and early twentieth-century India created mutually reinforcing expectations. These different visual fields crossed each other through processes of 'inter-ocularity' – a visual inter- referencing and citation that mirrors the more familiar process of 'inter-textuality'. (34)

আসলে ১৮৩০ দশকের শেষের দিকে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে আসা ফোটোগ্রাফির চল হয়েছিল। ফলে কলকাতার চিত্রকলা জগতে ফ্রেমের পরিসরের মধ্যে আঁকা ছবির জনপ্রিয়তা বাড়তে শুরু করেছে। অশোক মিত্রের বিশ্লেষণ, 'এই ধরনের ছবি বিলেতী ইজেল-চিত্রণের সামিল, ভারতীয় প্রাচীর চিত্রের, এমনকি মিনিয়েচরের ক্রমান্বয় বিবরণ বা কনেক্টিং-লিংক কম্পোসিশন থেকে তফাৎ' (Ashoke Mitra 68)। আর এই ফ্রেমের সীমাবদ্ধ অংশের মধ্যেই সেই সময়ের অঙ্কনশিল্পীরা পারস্পেকটিভ অনুযায়ী ছবি আঁকছেন। একইভাবে নাট্যমঞ্চের চারধারের প্রসেনিয়াম আর্চ বা প্রসেনিয়াম মঞ্চের মূল ফ্রেমটুকুর মধ্যেই নাট্যশিল্পীরা মঞ্চসজ্জা করার প্রচলন করছেন।

উনিশ ও বিশ শতকের দৃশ্যজগতের এই বিবর্তন ও নাট্যমঞ্চ, ফোটোগ্রাফি ও লিথোগ্রাফির পরস্পর সম্বন্ধ নিয়ে ক্রিস্টোফার পিনি অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি উদাহরণ তুলে এনেছেন। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে গিরিশচন্দ্র ঘোষের লেখেন *রাবণবধ* নাটক। রামায়ণ অনুসারে রাবণের বিরুদ্ধে রাম ও হনুমানের যুদ্ধের ঘটনাটিকে নিয়েই এই নাটকটি লেখা হয়েছিল। এই নাটকের যুদ্ধ দৃশ্যটি যেভাবে দেখানো হয়েছিল তার একটি প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যায় সেই সময়কার চোরবাগান আর্ট স্টুডিওর আঁকা একটি ছবিতে। রাবণ একটি রথে বসে আছে। তাঁর সঙ্গে আছেন দেবী কালী। রাম রথের নীচ থেকে রাবণের দিকে তাক করে তির ছুঁড়ছেন। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন হনুমান। এই ছবিটির গভীর পর্যবেক্ষণ করে পিনি বলছেন:

> It seems highly likely that this image was inspired by Girish Chandra Ghosh's play and the scenery used therein. In the background, beyond the ranks of battling monkeys, is a cluster of Italianate buildings such as one could imagine might have been used in one of Girish Chandra's earlier Shakespeare productions and then reused in Ravana Bad. (36)

অর্থাৎ চোরবাগান স্টুডিওর ছবিটি সম্ভবত গিরিশ চন্দ্র ঘোষের নাটকের মঞ্চসজ্জা দ্বারা বেশ অনুপ্রাণিত হয়েছিল। কারণ ছবিটির পশ্চাদপটে এক গুচ্ছ ইতালীয় অট্টালিকার অবয়ব আঁকা হয়েছিল। সম্ভবত গিরিশ ঘোষ যখন শেক্সপীয়ারের নাটক করেছিলেন, তখন কোনো দৃশ্যের জন্য হয়তো তিনি এই ধরনের পশ্চাৎপট অঙ্কন করিয়েছিলেন। পরে *রাবণবধ* নাটকে হয়তো সেই একই পশ্চাৎপট ব্যবহার করা হয়েছিল। *রাবণবধ* নাটকের সেই হাইব্রিড দৃশ্যটি হয়তো দেখেছিলান অঙ্কনশিল্পী। যার ফলে তাঁর ছবিতেও সেই হাইব্রিড বা সংশ্লেষিত দৃশ্যায়নের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে। পিনির এই উদাহরণ থেকে তখনকার অঙ্কনশিল্প ও নাট্যমঞ্চের এক গভীর আত্মিক সম্পর্কটি প্রতিফলিত হচ্ছে। একই সঙ্গে পাশ্চাত্য পারস্পেকটিভ রীতির বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করে কেমনভাবে দেশীয় দৃশ্যায়নের ভাবনা গড়ে উঠছিল সে বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

দেশের ইউরোপ প্রভাবিত জাতীয় শিল্পের আদর্শে গড়ে তোলা এই হাইব্রিড বা সংকরায়িত শিল্প কাঠামোর মধ্যে পটুয়াদের জায়গা হল না। পটুয়াদের দেশীয় অঙ্কন কৌশল, দেশীয় রঙ তুলির ব্যবহার, দেশীয় পটের কাপড়ের গুণগত বৈশিষ্ট্য এবং সর্বোপরি দেশীয় ঐতিহ্যবাহিত বিমূর্ত অঙ্কন শৈলী উনিশ ও বিশ শতকীয় সমাজের কাছে

'সুন্দর' বা 'যথাযথ' হয়ে উঠতে পারল না। কলকাতা শহরের শিল্পের ইতিহাসের বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, পটুয়ারা তাঁদের সৃজনকে ব্রিটিশ প্রভাবিত 'বাস্তববাদ'-এর প্রবাহে ভাসিয়ে দিতে চাইল না। ফলে তাঁরা বাদ পড়লেন ব্রিটিশ অনুগামী বাংলা রঙ্গমঞ্চ থেকে। তাঁদের স্থানে ডাক পড়ল ইউরোপীয় শিল্পীদের। *মেট্রোপলিটান থিয়েটারে* কেশবচন্দ্র সেনের বিধবা বিবাহ নাটকে দৃশ্যপট আঁকার দায়িত্ব নিলেন এক ইউরোপীয়। নাম মিস্টার হলবাইন। *বেঙ্গল হরকরা* লিখল, '...দৃশ্যপট সুচিত্রিত হইয়াছিল এবং এতটা সুচিত্রিত হইবে তাহা আশা করা যায় নাই' (S. Mukherjee 22)।

ধর্মদাস সুর ছিলেন বাংলা থিয়েটারের প্রথম স্টেজ ম্যানেজার। তিনি ছিলেন সাধারণ রঙ্গালয়ের মঞ্চসজ্জার দায়িত্বপ্রাপ্ত নাট্যকর্মী। উনিশ ও বিশ শতকীয় মঞ্চবিজ্ঞানের আলোচনায় ধর্মদাস সুরের সৃষ্টিকর্ম একটি বড় স্থান অধিকার করে আছে। ধর্মদাস সুর সম্পর্কে স্মৃতিচারণায় খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখছেন:

> খেলা ও পরীক্ষাচ্ছলে তিনি পল্লীস্থ অন্নপূর্ণার মন্দির সহ চারিটী অত্যুচ্চ শিবমন্দিরের ছবি স্বীয় কল্পনাবলে পরিপ্রেক্ষিত বিজ্ঞানের কৌশলে আঁকিতে আরম্ভ করেন। ... তিনি কোনও শিক্ষকের নিকট একদিনের জন্যও রেখাটীমাত্রও টানিতে শিক্ষা করেন নাই। ... পটুয়াদিগের অঙ্কিত দৃশ্যপট দেখিয়া, উহা আঁকিবার একটা ভাব সঞ্চয় করিয়া লইয়াছিলেন মাত্র। (*Rangamancha Shraban* 26)

খগেন্দ্রনাথের লেখাতে ধর্মদাসের অঙ্কন শৈলির মধ্যে একইসঙ্গে ইউরোপীয় পরিপ্রেক্ষিত বিজ্ঞান ও পটুয়াদের ঐতিহ্যবাহী অঙ্কনরীতির সহাবস্থানের কথা বর্ণিত হয়েছে। পটুয়াদের থেকে ভাব সঞ্চয় করে অঙ্কিত হয়েছে ইউরোপীয় কৌশল অবলম্বিত মঞ্চচিত্র। ধর্মদাস সুর একটি ছোটোদের স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। কিন্তু তাতে মঞ্চের কাজে সময় দেওয়া মুশকিল হচ্ছিল বলে তাঁর বদলি হিসেবে তাঁর দুই নাট্য সহকর্মী অমৃতলাল বসু ও অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তাফি অনেক সময়েই ক্লাস নিয়ে আসতেন। ধর্মদাস প্রথম দিকে পটুয়াদের দিয়ে দৃশ্যপট অঙ্কনের চেষ্টা করলেন। তারপর এক গরীব ইউরোপীয় সাহেবের সাহায্য নিলেন। তিনি জাহাজের কাজ করতেন এবং ব্রিটিশ কায়দায় ছবি আঁকতে পটু ছিলেন (S. Mukherjee 747)। তাঁর সঙ্গে ধর্মদাসের রফা হল, তিনি বাংলা *লীলাবতী* নাটকের জন্য প্রয়োজনীয় ছবি এঁকে দেবেন। ধর্মদাসের কথায়:

> একদিন এক ইংরাজ ভিক্ষুক আসিয়া কিছু খাইতে চাহিল। আমি তাহাকে বলিলাম, ভাত খাও তো দিতে পারি। তাহাতে সে সম্মত হইল ও পরিতোষ সহ ভাত খাইল। পরে তাহার পরিচয়ে অবগত হইলাম, সে জাহাজে রংএর কাজ করিত। আমার কাছে থাকিতে প্রস্তুত, যদি আমি তাহাকে খাইতে দিই। সে আমার

বাটীতে ভাত খাইত ও আমার সমস্ত রং ফলাইয়া দিত এবং রাত্রিকালে Platformএ শুইয়া থাকিত ও পাহারা দিত। এই রকমে দুইমাসের মধ্যে 'লীলাবতী'র উপযোগী সমস্ত Stage আমি শেষ করিলাম। (Sur 8)

ধর্মদাসের তত্ত্বাবধানে এইভাবে ইংরেজ শিল্পী কর্তৃক বাংলা নাটকের দৃশ্যপট আঁকার কাজটি করা হল। এছাড়াও বাঙালির থিয়েটারেও ইংরেজদের থিয়েটারের মতো আরও কিছু পরিকাঠামো গড়ে তোলা হল। বিদেশী চিত্রশিল্পীকে দিয়ে যে সিনগুলি আঁকিয়ে নেওয়া হয়েছিল, সেই সিনগুলি ওঠাতে নামাতে ঘুড়ির লাটাইয়ের অনুকরণে হালকা রোলারের পরিকল্পনাও করেছিলেন ধর্মদাস।

এরপর *গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের* সময়ে *কাম্যকানন* নাটকের অনেকগুলি সিন ডেভিড গ্যারিক নামক এক ইউরোপীয় শিল্পীকে দিয়ে আঁকিয়ে নেন ধর্মদাস সুর। এই গ্যারিক প্রথমে ছিলেন আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ। পরে তিনি স্বাধীন শিল্পী ও ফটোগ্রাফার হিসেবে কলকাতায় থাকতেন (S. Mukherjee 41)। চারটি ফ্ল্যাট দৃশ্যপট এঁকেছিলেন ডেভিড; একটি গৃহের অভ্যন্তর, একটি কোর্টের দৃশ্য, একটি বাগান ও একটি জঙ্গল। অমৃতলাল লিখছেন, 'তিনি ৮০ টাকা করে প্রত্যেক খানির মজুরী নিয়ে চারখানি ফ্লাট সিন আমাদের এঁকে দেন, কাঠ, কাপড়, রং সব আমাদের' (*Smriti O Atmasmriti* 192)। অমৃতলাল বসুর স্মৃতিকথায় আরও লিখছেন, '...আইরিশ ড্রপ কাপড়ের উপর তিনি একখানি ড্রপসিন এঁকে দেন, এর জন্য তাঁকে মজুরী দিতে হয় সাড়ে ছ'শ টাকার কিছুর উপর। সিনে ছাপবার জন্য সোণার পাতই লাগে প্রায় ৭০, ৭৫ টাকা;' (*Smriti O Atmasmriti* 191) এত ব্যয়ে জর্জরিত হয়ে পড়ছিল মধ্যবিত্ত যুবকেরা। থিয়েটারের জন্য টাকা বাঁচাতে শেষে ধর্মদাস নিজেই তুলে নিলেন তুলি। নাটকের ব্যয় বহন করা দুঃসাধ্য বুঝে মঞ্চনির্মাণের উদ্যোগ নেন ধর্মদাস ও তাঁর সহকর্মীরা। নানান লোকের থেকে চাঁদা তোলা শুরু হল। সেই চাঁদার টাকায় রঙ্গালয়ের জন্য দৃশ্য এক চিত্রকরকে দিয়ে আঁকানোর পরিকল্পনা নেওয়া হল। ধর্মদাসের নিজের আত্মকথায় লিখছেন:

এইরকমে আমাদের ভিতর আমার ও নগেনের (নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) টাকা লইয়া আশি টাকা জোগাড় হইল। তাহাতে কয়েকখানি সিনের উপযোগী কাপড় ও রঙ কেনা হইল। গোবর্ধন নামক এক চিত্রকরকে একখানি বাটির সম্মুখ আঁকিতে দেওয়া গেল। সেই সিনখানি আঁকিতেই আমাদের সমস্ত টাকা প্রায় শেষ

হইয়া আসিল, কাজেই আঁকার কাজ বন্ধ হইয়া গেল; তখন আমি অন্য উপায় না দেখিয়া নিজে আঁকিব স্থির করিলাম ও একখানি চেম্বার আঁকিতে আরম্ভ করিলাম (৪)।

এ ব্যাপারে ধর্মদাস সুরের আত্মজীবনীর শেষে শিশির বসু লিখিত প্রসঙ্গ কথায় জানা যায়, রাধামাধব তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'ধর্মদাস তুলি ধরলেন। ঠিক কথা; কিন্তু একা নয়, ক্ষেত্র ও আর্ট স্কুলের অন্যান্য ছাত্ররা সিন আঁকিয়া দিয়াছিল' (D. Sur 14)।

থিয়েটারের প্রয়োজনে দৃশ্যপট অঙ্কন করার শিল্পী দরকার। স্থানীয় শিল্পী বা ইউরোপীয় শিল্পীদের দিয়ে সে কাজ করাতে খরচ পড়ছিল অনেক। পয়সা বাঁচাতে নাট্যকর্মীরা নিজেরাই সে কাজে লেগে পড়ল। কিন্তু নাটকের সিন আঁকতে হলে সিন আঁকার দক্ষতা থাকা দরকার। ফলাফলস্বরূপ, স্বশিক্ষিত হতে থাকল নাট্যশিল্পীরা। ধর্মদাস নিজের গোড়ার দিকে নাট্যজীবনের বর্ণনায় বলছেন, '...কালীকৃষ্ণ প্রামাণিকের যত্নে ও ব্যয়ে 'শকুন্তলা'র অভিনয় হয়। আমি কোন সুযোগে একখানি টিকিট সংগ্রহ করিয়া দেখিতে যাই ও দৃশ্যপটগুলি দেখিয়া এত মোহিত হই যে তখন হইতে ঐ কার্য কিরূপে শিখিব—এই চিন্তা সদাই আমার অন্তরে জাগরিত রহিল' (7)। ইউরোপীয় ধরনের নাটকে মঞ্চসজ্জার প্রয়োজন বুঝল এই মধ্যবিত্ত নাট্য শিল্পী গোষ্ঠী। প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ না থাকলেও ইউরোপীয় শিল্পধারার নানান কলা কৌশলে স্বশিক্ষিত হয়ে উঠতে থাকল এই শিল্পী দল।

মঞ্চসজ্জার নানান অত্যাধুনিক চমকপ্রদ প্রযুক্তি বিদ্যাও ধর্মদাস ধীরে ধীরে শিখে নেন। অজিত কুমার ঘোষ জানাচ্ছেন, নাটকের মঞ্চে তিনি 'মেক্যানিক্যাল ডায়োরামা' পদ্ধতিতে সমুদ্রের একটি দৃশ্য বনে রূপান্তরিত করতে পারতেন। এমনকি গিরিশচন্দ্রের নাটকে তিনি 'প্যানোরামা' ও 'আমেরিকান প্যানোরামা' পদ্ধতিও প্রয়োগ করেছিলেন (A. Ghosh, *Bangla Nataker Prayog* 110)। উনিশ শতকের ইউরোপের সাধারণ মানুষের কাছে ডায়োরামা ও প্যানোরামা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তখনো সিনেমা আসেনি। খুব লম্বা ক্যানভাসে অনুভূমিক ভাবে আঁকা ছবির সারি পুলির মাধ্যমে মঞ্চের ডান পাশ থেকে বাম পাশ পর্যন্ত সরে সরে যেত। আর এই সচল ছবির ওপর আলো ফেলে নানান মঞ্চক্রিয়া তৈরি করা হত। এইভাবে নানান বিখ্যাত গল্পের দৃশ্যায়ন করে তোলার পদ্ধতিকে বলা হত প্যানোরামা। আর এরকম বিশাল সচল ছবির সঙ্গে বেশ কিছু সত্যি জিনিসপত্র ব্যবহার করে ফটো শো-এর নাম ডায়োরামা। ডায়োরামার ছবিগুলি এমনভাবে আঁকা যাতে আলো প্রক্ষেপণের কৌশলে ছবিটি দিন থেকে রাত বা রাত থেকে দিন কিংবা সমুদ্র থেকে পাহাড় বা পাহাড় থেকে সমুদ্র হয়ে যেতে পারতো। একটি ছবির নানান অংশ অস্বচ্ছ

ও স্বচ্ছ রঙ দিয়ে আঁকা থাকতো। ফলে সামনে থেকে আলো ফেললে একটি ছবি দেখা যেত এবং পেছনে থেকে আলো ফেললে প্রথম ছবিটি মুছে গিয়ে আরেকটি ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠতো। এই ধরনের অত্যাধুনিক কলাকৌশলে প্রয়োগপদ্ধতি শিখে সেগুলি বাংলা রঙ্গমঞ্চে ব্যবহার করে দর্শককে মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন ধর্মদাস।

মঞ্চে এইরকম নানান জাদু তৈরি করার কাজে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন আরও একজন মঞ্চশিল্পী। তাঁর নাম জহরলাল ধর (A. Ghosh, *Bangla Nataker Prayog* 110)। *নল দময়ন্তী* নাটকে পদ্মফুল ফুটে অপ্সরাদের আবির্ভাব ঘটিয়েছিলেন জহরলাল। অথবা একটি পাখির আকাশে উড়ে যাওয়ার দৃশ্যটিও অত্যন্ত চমক সৃষ্টি করেছিল বলে জানা যায়। ডায়োরামা পদ্ধতি ব্যবহার করে *কমলে কামিনী* নাটকে সমুদ্রে ঝড় ও সূর্যোদয়ের দৃশ্য বা মুহূর্তে চণ্ডীর কালীতে রূপান্তর বা বৃদ্ধাকে চণ্ডীতে রূপান্তর এইসব অদ্ভূত ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। এছাড়াও যোগেন্দ্রনাথ মিত্র বা শশিভূষণ দে-ও সেই সময়ের বাংলা মঞ্চে ইল্যুশনিস্ট মঞ্চসজ্জার কাজে অনেক ভূমিকা রেখেছিলেন। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে *এমারেল্ড থিয়েটারে* গোপাললাল শীল ডায়নামো নামক বৈদ্যুতিক যন্ত্র বসিয়ে বাংলা থিয়েটারে প্রথম বৈদ্যুতিক আলোর প্রবর্তন করেছিলেন (A. Ghosh, *Bangla Nataker Prayog* 110)।

কম খরচে 'পছন্দসই' 'যথাযথ' 'আধুনিক' ইউরোপীয় বাস্তবতাভিত্তিক মঞ্চসজ্জার দায়িত্ব সামলাতে ধর্মদাস ও সেই সময়কার অন্যান্য নাট্যকর্মীরা নিজেরাই এই চমৎকার নাট্যকৌশলগুলি আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। ইউরোপীয় ধরনের কলা কৌশল শিখে নেওয়া ছাড়া বা নিজেই দৃশ্যপট অঙ্কনের তুলি তুলে নেওয়া ছাড়া বিশেষ কোনো উপায়ও ছিল না নব্য ইউরোপীয় শিল্পভাবনায় প্রাণিত মধ্যবিত্ত নাট্যকর্মীদের। এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন ব্রিটিশ স্টাইলে অঙ্কন শিক্ষার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আর্ট কলেজের ছাত্ররা। ইউরোপীয় চিন্তা ও রুচিশীলতায় পুষ্ট নব্য বাঙালি নাট্য যুবকের দৃশ্য পরিকল্পনায় তাই সেই সময়কার নিরিখে আধুনিক ও নতুন আঙ্গিকের শিল্পকলার যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

বাংলা মঞ্চের মঞ্চসজ্জার ইতিহাস রচনায় গিরিশচন্দ্র ঘোষের *ম্যাকবেথ* নাটকটির মঞ্চায়নের পরিকল্পনা নিয়ে আলাদা করে আলোচনা প্রয়োজন (A. Ghosh, *Bangla Nataker Prayog* 126-127)। এই নাটকটির অভিনয়ে বিশ শতকীয় বাংলা নাট্যশালায় ইউরোপীয় ধারার মঞ্চায়ন কৌশলের প্রভাবটি অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ভাবে বিদ্যমান। ঔপনিবেশিক সময়ে একটি ঔপনিবেশিক কলার চর্চায় কীভাবে একজন দেশীয় শিল্পীর উদ্যোগ পরিকল্পিত হয়েছিল, এই নাটকের আলোচনায় সে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। গিরিশ ঘোষ নিজে কলকাতার ইংরেজি নাটকের নিয়মিত

দর্শক ছিলেন। *লুইস থিয়েটার*-এ শেক্সপীয়ারের নাটকের শো তিনি প্রায়শই দেখতে যেতেন। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই তিনি ব্রিটিশ মঞ্চকলা ও আঙ্গিকটি বাংলা থিয়েটারের আঙ্গিনায় নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। *ম্যাকবেথ* নাট্য প্রযোজনার স্টেজ ম্যানেজার ছিলেন ধর্মদাস সুর। অজিত কুমার ঘোষ জানাচ্ছেন, 'তিনি বিখ্যাত চিত্রকর উইলিয়ার্ড সাহেবকে দিয়ে সমস্ত দৃশ্যপট অঙ্কিত করিয়েছিলেন' (*Bangla Nataker Prayog* 126)। এই অঙ্কনগুলি এতই নিখুঁত হয়েছিল যে জলরঙ্গে আঁকা ছবিগুলি যেন তেলরঙ্গে আঁকা বলে মনে হয়েছিল। ব্যোমকেশ মুস্তাফি *ম্যাকবেথের* ভোজনদৃশ্যের প্রশংসা করে বলছেন, '... ভোজনের টেবিল ও চেয়ারগুলির সহিত দৃশ্যটি যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। দীর্ঘগৃহ অঙ্কনে এইরূপ কৃতিত্ব আমরা বঙ্গীয় নাট্যশালায় আর কোথাও দেখি নাই' (D. Mukhopadhyay, *Bangiya Natyashalar Itihas* 52)। এমনকি রঙ্গালয়ের সাজসজ্জা সম্পন্ন করার জন্য গিরিশ ঘোষ পিম সাহেবকে নিযুক্ত করেন। স্টেজ ফার্নিচারও সরবরাহ করেন এই মিস্টার পিম। *দ্য ইংলিশম্যান* লেখে, 'A Bengali Thane of Cawdor is a living suggestion of incongruity; but the reality is an astonishing reproduction of the standard convention of the English Stage' (Yajnik 177)। ব্রিটিশ মঞ্চের অনুকরণ করে এমন জাঁকজমক পূর্ণ আড়ম্বর বাংলা থিয়েটার আর কখনো দেখেনি। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙালি দর্শক এই নাটকটি গ্রহণ করেনি। ভেঙ্গে পড়েছিলেন গিরিশ। আক্ষেপ করে লিখেছিলেন, 'নাটক দেখিবার যোগ্যতালাভে ইহাদের এখনও বহু বৎসর লাগিবে, --নাটক বুঝিবার সাধারণ দর্শক এখনও বাংলায় তৈয়ারী হয় নাই' (qtd. in A. Ghosh, *Bangla Nataker Prayog* 127। *ম্যাকবেথের* মতো এত জমকালো টেকনিক্যাল নাটক প্রথম অভিনয়ের এক সপ্তাহের মধ্যেই মুখ থুবড়ে পড়ে। 'মুকুল-মুঞ্জরা' নামের একটি হাল্কা নাটক শুরু করে দিতে হয় গিরিশ ঘোষকে। বিজ্ঞাপনে লেখেন, 'Sheer anxiety to appear before the public with new books by way of variety compels me to substitute Mukul Munjara for Macbeth on Sunday, notwithstanding the favourable reception of the latter' (qtd. in A. Ghosh, *Bangla Nataker Prayog* 129)।

আরও একজন অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির উদ্যোগকে প্রসঙ্গত উল্লেখ না করলে বাংলা নাট্যমঞ্চের একেবারে গোড়ার দিকের দৃশ্যভাবনা ও মঞ্চসজ্জার অধ্যায়টি অপূর্ণ থেকে যাবে। গিরিশ অর্ধেন্দু অমৃতলালের পরের প্রজন্মের উদ্যমী যুবক অমরেন্দ্রনাথ দত্তের নাটকে তারুণ্যের যে প্রতিফলন দেখা গেছে তার অনেকটাই নাট্য প্রযোজনার চিত্তাকর্ষক মঞ্চকৌশলের কৃতিত্ব। নাটককে তিনি ধীর সাবধানী সংযমী গতিতে দেখতে চাননি। বরং প্রবল গতি নিয়ে

ব্যবসায়িক নাট্য প্রযোজনায় দর্শকের প্রমোদপ্রিয়তাকে প্রশ্রয় দিতে নেমে পড়েছিলেন। আর সেই কাজে অন্যতম সহায়ক হয়েছিল তাঁর নাটকের মনোহর্ষক মঞ্চকলা। মঞ্চের গঠন, ব্যবহার, সাজসজ্জা ও অন্যান্য উপকরণ নিয়ে তিনি ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরিক্ষা করে গেছেন; চমক প্রদর্শনের চেষ্টা করে গেছেন। *ভ্রমর* ও *সীতারাম* নাটকে তিনি ঘোড়ায় চড়ে মঞ্চে ওঠেন। মঞ্চে সত্যিকারের কুকুর বেড়াল পাখি পায়রা তুলে আনেন (A. Ghosh, *Bangla Nataker Prayog* 158)। সত্যিকারের আসবাব পত্রও তিনি ব্যবহার করান। মঞ্চচমক সৃষ্টিতে তাঁর অন্যতম সহায় ছিলেন ধর্মদাস সুর। মঞ্চের আকাশে উড়ে যাওয়া, শূন্য থেকে দেবতার আবির্ভাব—সবটাই ধর্মদাসের কীর্তি। মঞ্চে সূর্যোদয় চন্দ্রোদয় ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুৎচমক সব ধরনের কলা কৌশলের ব্যবহার করেন অমরেন্দ্রনাথ। ক্যানভাসের ওপর আঁকা গোটানো দৃশ্যপট অভিনয় চলাকালীন অনেক সময় নড়ে যেত। সেই সমস্যা সমাধান করার জন্য তিনি কাট বোর্ডের সঙ্গে লাগানো ঠেলা সিন ও কাটা সিনের ব্যবহার করেন। এ ছাড়াও বারুণীর পুষ্করিণী দৃশ্যের বাস্তবতা তৈরির চেষ্টাটি ভীষণ রকম চমকপ্রদ (A. Ghosh, *Bangla Nataker Prayog* 159)। সার্ট ছিঁড়ে অমরেন্দ্রনাথ রোহিণীকে উদ্ধার করবার জন্য জলে ঝাঁপ দিতেন। এরপর রোহিণীকে নিয়ে যখন উঠতেন, তখন দেখা যেত, দুজনের কাপড় থেকে জল পড়ছে। অজিত কুমার ঘোষ লিখছেন, 'বোঝা যায় পুষ্করিণীর দৃশ্যসজ্জার সঙ্গে ফাঁদ দরজা (trap door) দিয়ে নিচে নেমে যাওয়া, অতিদ্রুত মঞ্চের তলায়...বস্ত্র পাশ থেকে সিক্ত করে দেওয়া প্রভৃতি কাজ সুকৌশলে সম্পন্ন হত' (*Bangla Nataker Prayog* 159)।এইরকম অসংখ্য মঞ্চক্রিয়ায় অমরেন্দ্রনাথ তাঁর নাট্যপ্রযোজনাগুলিকে সাজিয়ে তুলেছিলেন।

শুধু পেশাদারি মঞ্চ নয়; মঞ্চের মঞ্চসজ্জার মধ্যে দিয়ে বাস্তবকে চিত্রিত করে তোলার প্রবল আগ্রহ দেখা যায় উনিশ শতকীয় শখের থিয়েটারের নাট্যকর্মীদেরও। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির মঞ্চসজ্জাকর হরিশচন্দ্র হালদার বা অবনীন্দ্রনাথের গোড়ার দিকের কাজেও ইউরোপীয় বাস্তবতার দিকে গভীর ঝোঁক ছিল। হরিশচন্দ্র হালদার, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অথবা গিরিশ ঘোষ অমরেন্দ্রনাথ ও ধর্মদাস সুরদের কর্ম প্রচেষ্টা—সর্বত্রই ব্রিটিশ প্রভাবিত বাস্তববাদী শিল্পভাবনার এক গভীর প্রভাব লক্ষ্যণীয়। কোম্পানি পেইন্টিং-এর শিল্পীদের মতোই শেডিং পারস্পেকটিভ ও অন্যান্য নানান চমকপ্রদ কারিকুরি এবং উপকরণের ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে নাট্য শিল্পীদের ইউরোপীয় বাস্তববাদের প্রতি অকুণ্ঠ আকর্ষণ ও অনায়াস আত্মসমর্পনের প্রমাণই এ ক্ষেত্রে পরিগণিত হয়। শিল্পক্ষেত্রে এমন বাস্তব তৈরির করার এই প্রবাহে বাহিত হতে চাননি দেশীয় লোকসংস্কৃতির পটশিল্পীরা। নাট্যশিল্পীদের চাহিদা অনুসারে মঞ্চ

দৃশ্যগুলিকে ইউরোপীয় কায়দায় গড়ে তুলতে পারেননি তাঁরা। তাই তাঁরা বঙ্গরঙ্গমঞ্চে ব্রাত্য। আর এর প্রভাবে এই শিল্পমহল যে নাট্যসজ্জার আয়োজন করছেন, সেখানে ইউরোপীয় বাস্তবানুগ শিল্পচর্চার প্রভাব পড়তে থাকে। যদিও 'বাস্তব' বলতে এখানে বাস্তবের একটা মায়া বা ইল্যুশন তৈরির প্রয়াসের কথা বলা হচ্ছে। ইউরোপীয় বাস্তববাদের আক্ষরিক তাত্ত্বিক সংজ্ঞার সঙ্গে এই বাস্তবানুগ মঞ্চসজ্জার বিস্তর প্রভেদ ছিল বলেই মনে করা যায়।

ঠাকুরবাড়ির দৃশ্যসজ্জাঃ ইল্যুশনিস্ট ও শিল্পোত্তরের সমন্বয়

নিঃসংশয় চিত্তে ইউরোপীয় চিত্রশৈলীর প্রতি আনুগত্যের মোহ থেকে বাইরে দাঁড়িয়ে মঞ্চসজ্জাকে দেখতে চেয়েছিলেন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির শিল্পী গোষ্ঠীর একাংশ। প্রথম যুগের ইল্যুশনিস্ট মঞ্চসজ্জার আপ্রাণ প্রচেষ্টা থেকে সরে এসে ক্রমে ইঙ্গিতধর্মী ভাবগভীর মঞ্চায়নের দিকে মনোনিবেশ করতে চেয়েছিলেন তাঁরা।

ঠাকুরবাড়ির নাট্যচর্চার শুরুর দিকের মঞ্চভাবনা নিয়ে খানিকটা আলোচনা প্রয়োজনীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গবেষক রাজদীপ কোনারের মতে, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির প্রথম 'পার্ফর্মেন্স ফর্ম' হিসেবে যাত্রাকেই ধরা যায়। 'At the Jorasanko Thakurbari too, it was jatra which was first introduced as a performance form in the first half of the century' (Konar 9). যদিও বর্তমান গবেষক এই গবেষণার ভূমিকা অংশে পার্ফর্মেন্সের যে ব্যাখ্যা আলোচনা করেছেন, তাতে যাত্রাই ঠাকুরবাড়ির প্রথম পার্ফর্মেন্স ফর্ম, এ কথা বলা যাবে না। বর্তমান গবেষকের বিচারে, ঠাকুবাড়ির পরিবেশে আরও অনেক উপাদান আছে, যেগুলিকে আধুনিক যুগের 'পার্ফর্মেন্স' আলোচনার বৃহত্তর পরিসরে 'পার্ফর্মেন্স'- এর সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার কারণ আছে বলে মনে হয়। যেমন-প্রথম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে বৈষ্ণব ঠাকুরানিদের কথকতা বা শিক্ষাপ্রণালী নিয়ে; কিংবা জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির বাঈজিদের আসর বা মজলিসের আয়োজনগুলিকে বর্তমান গবেষক 'পার্ফর্মেন্সের' মধ্যে ধরতে চেয়েছে। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করার কারণ নেই যে, ঠাকুরবাড়ির নাট্য ঐতিহ্য আলোচনায় অন্যান্য প্রচলিত দেশীয় সাংস্কৃতিক উপস্থাপনাগুলি এবং বিশেষ করে যাত্রার প্রভাবের কথা বাদ দেওয়া যায় না। কোনার জানাচ্ছেন, '... jatra and the European mode of proscenium became the dual models of inspiration for the Thakurbari theatre' (15)। অর্থাৎ ঠাকুরবাড়ির নাট্য আয়োজনের ক্ষেত্রে শুরুর সময়ে যাত্রা এবং ইউরোপীয় ধরনের নাট্যসজ্জা উভয়েরই যথেষ্ট ভূমিকা আছে।

ঠাকুরবাড়ির থিয়েটারের আলোচনায় প্রথমেই আসে *নবনাটক*-এর নাম। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী মঞ্চস্থ হয় *নবনাটক*। এই নাটকের দৃশ্য সম্পর্কে ৮ জানুয়ারী ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে সোমপ্রকাশে লেখা হয়, '...নাট্যশালার প্রকৃত রীতিতে নির্মিত দ্রষ্টব্যগুলি সুন্দর বিশেষতঃ সূর্যাস্ত ও সন্ধ্যার সময় অতি মনোহর হইয়াছিল। অধিকতর আহ্লাদের বিষয় এই, এ সমুদায়গুলি এতদ্দেশীয় শিল্পজাত' (Hazra 171)। অর্থাৎ বাংলা নাট্যমঞ্চের দৃশ্যনির্মাণের 'প্রকৃত রীতি' নিয়ে সচেতনতা তৈরি হতে থাকছে সেই সময়। *সোমপ্রকাশ* পত্রিকার এই বিবরণীটির ব্যাখ্যায় নির্মল গুহ রায় লিখছেন:

> এই প্রথম একটি পত্রিকার বিবরণ থেকে স্পষ্ট যে, মঞ্চে আলোর ব্যবস্থা খুব সংযত হয়েছিল এবং যে ভাবেই হোক আলো কম বেশি করবার একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছিল, নইলে—'সূর্যাস্ত ও সন্ধ্যার সময় অতিমনোহর'—কথাটির উল্লেখ করত না... হয়তো বা রঙিন কাঁচ ব্যবহার করা হয়েছিল নইলে সূর্যাস্তের আলোর রঙ ও জ্যোতি এবং সন্ধ্যার আলো আঁধারের আবেশ সৃষ্টি হল কী প্রকারে? (Guha Roy 47)

যদিও তখন পর্যন্ত ইউরোপীয় ধরনের নাট্যসজ্জার উপযোগী আলো ও দৃশ্য সমন্বিত মঞ্চসজ্জার প্রকৃত রীতিটি ঠিক কীরকম তা নিয়ে সমাজে খুব একটা স্পষ্ট ধারণা তখনও গড়ে ওঠেনি বলে মনে হয়। অথবা 'প্রকৃত রীতি' অনুযায়ী মঞ্চসজ্জা তৈরি করার মতো কারিগরী সামর্থ্য তখনও বাংলা মঞ্চের কুশীলবদের ছিল না। কারণ তখনও নাটকের পটচিত্র অঙ্কনের জন্য তাঁরা দেশীয় পটুয়াদের ওপরেই নির্ভরশীল। বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়ের *জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি* জানাচ্ছে, 'তখনকার শ্রেষ্ঠ পটুয়াদিগের দ্বারা দৃশ্যগুলি অঙ্কিত হইয়াছিল' (B. K. Chatterjee 37)। ড্রপসিনে রাজস্থানের ভীমসিংহের সরোবর তটস্থ 'জগমন্দির' প্রাসাদের ছবি আঁকা হয়েছিল বলে জানা যায় (B. K. Chatterjee 104)।

পটুয়াদের আঁকা দৃশ্যপটগুলিকে বাস্তবসম্মত করে তোলার জন্য এই নাটকে মঞ্চপরিকল্পকদের অনেক প্রস্তুতি নিতে হয়েছিল:

> দৃশ্যগুলিকে বাস্তব করিতে যতদূর সম্ভব চেষ্টার কোনও ত্রুটি করা হয় নাই। বনদৃশ্যের সিনখানিকে নানাবিধ তরুলতা এবং তাহাতে জীবন্ত জোনাকি পোকা আঠা দিয়া জুড়িয়া অতি সুন্দর এবং সুশোভন করা হইয়াছিল। দেখিলে ঠিক সত্যিকারের বনের মতোই বোধ হইত। এই সব জোনাকি পোকা ধরিবার জন্য অনেকগুলি

লোক নিযুক্ত করিয়া তাহাদের পারিশ্রমিক স্বরূপ এক একটি পোকার দাম দুই আনা হিসাবে দেওয়া হইয়াছিল (B. K. Chatterjee 37)।

অর্থাৎ পটুয়ারা যে দৃশ্যাঙ্কন করছেন তাতে উদ্যোক্তাদের চাহিদা পূরণ হচ্ছে না। দৃশ্যকে 'যথাযথ' বাস্তবানুগ করতে তাঁদের আরও অনেক উদ্যম নিতে হচ্ছে। আরও অনেক অর্থব্যয় করতেও হচ্ছে। ইউরোপীয় বাস্তববাদী নাট্যসজ্জার প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরা বাস্তবের আরো কাছে পৌঁছতে চাইছেন। আরও মানানসই ও সত্য হয়ে উঠতে চাইছেন। জাতীয় শিল্পের গঠন পর্বে নাট্য শিল্পীদেরও জাতীয় হয়ে ওঠার উৎসাহ বেড়ে চলছে।

ঠাকুরবাড়ির বাস্তবানুগ মঞ্চসজ্জার আরও একটি বিস্তৃত বিবরণী দিচ্ছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যদিও পরবর্তীকালে ভারতীয় শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে তিনি কঠোর ইউরোপীয় বাস্তবতা থেকে সরে এসে চিত্রশিল্পে এক নতুন ধারার প্রবর্তন করেন। শিল্প ইতিহাসে এই ধারাকে 'বেঙ্গল স্কুল অফ আর্ট' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু তাঁর কৈশোরের নাট্য-অভিজ্ঞতায় সুস্পষ্টভাবে বাস্তববাদের স্মৃতি বিরাজ করছিল। রবীন্দ্রনাথের *বাল্মিকী প্রতিভা* নাটকের মঞ্চভাবনার একটি বর্ণনা করেছেন অবনীন্দ্রনাথ তাঁর *ঘরোয়া* রচনায়। অবনীন্দ্রনাথের কৈশোরের স্মৃতি থেকে যে বিবরণী পাওয়া যায় তা থেকে সেই সময়কার মঞ্চ-আয়োজনে বাস্তবের মতো মাঞ্চসজ্জার আয়োজনের বা ইল্যুশনিস্ট মঞ্চায়নের প্রবল প্রভাব নিঃসন্দেহে অতি মাত্রায় প্রকট হিসেবে ধরা পড়ে:

> মহাসমারোহে স্টেজ সাজানো হল। 'নিতুদা' নিলেন স্টেজ সাজাবার ভার। অনেক কারিকুরী করলেন তিনি স্টেজে। মাটি দিয়ে উঠোনের খানিকটা অর্ধচন্দ্রাকারে ভরাট করলেন। ... বনজঙ্গল বানালেন সেই মাটিতে। স্টেজে সত্যিকার বৃষ্টি ছাড়া হবে, দোতলার বারান্দা থেকে টিনের নল জোড়া চলে গেছে স্টেজের ভিতরে। ... পদ্মবন, শোলার পদ্মফুল, পদ্মপাতা বানিয়ে নেটের-মতো পাতলা গজের পর্দা পর পর পাঁচটা স্তরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। প্রথমটা বেশ ঝাপসা কুয়াশার মতো দেখাবে, পরে এক একটা পর্দা উঠে যাবে, ওপাশ থেকে আস্তে আস্তে আলো ফুটবে আর একটু একটু করে পদ্ম বনে সরস্বতী ক্রমশঃ প্রকাশ পাবে (*Gharowa* 117)।

এই অভিনয়ের কিছুদিন আগেই রবীন্দ্রনাথ ইংল্যাণ্ড গেছিলেন এবং নাট্যাভিনয় দেখেছিলেন। ফলে সে দেশের মঞ্চের বাস্তববাদী সাজসজ্জার একটা প্রভাব হয়তো তাঁর এই নাটকের মঞ্চ পরিকল্পনায় পড়েছিল বলে অনুমান করা যায়। এই নাটকের এই মঞ্চায়নটি দেখতে বড়লাট-পত্নী লেডি ল্যান্সডাউন ও ছোটলাট পত্নী লেডী এলিয়ট

এসেছিলেন। সেই কারণে তাঁদের মনোরঞ্জনের তাগিদে এই নাটকের ইল্যুশনিস্ট মঞ্চসজ্জা করা হয়েছিল বলে মনে করছেন নাট্যবিশেষজ্ঞ রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী (31)।

১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে *মায়ার খেলা* নাটকেও আমরা দেখি বাস্তবের ন্যায় মঞ্চসজ্জার প্রতি আকর্ষণ। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণির রচনায়, '... মায়াকুমারীদের হাতের দণ্ডের মুণ্ডে ইলেকট্রিক আলো জ্বলছিল আর নিবছিল, বোধ হয় বিলিতী পরীর অনুকরণে। তখন সব বিষয়ে বিলিতী অনুকরণটাই প্রবল ছিল' (36)। এই মঞ্চায়নের আরও খবর পাই সরলা দেবী চৌধুরাণীর লেখায়—'সেবার দাদা ও সুরেন স্টেজ ম্যানেজার ছিলেন। মায়াকুমারীদের মাথায় অলক্ষ্যে তারে বিজলীর আলো জ্বালানো তাঁদের একটি বিশেষ কারিগরি ছিল। আর সবাই অতি ভয়ে ভয়ে ছিল—পাছে, বিজলীর তার জ্বলে উঠে মায়াকুমারীদের shock লাগে' (59)।

মঞ্চসজ্জার আদি পর্বে মঞ্চায়নের মধ্যে দিয়ে বাস্তবের মতো ইল্যুশন তৈরি করার প্রতি এত নিবিড়তা নিঃসন্দেহে তাক লাগিয়ে দেয় ঠিকই, কিন্তু কিছু বছর পর থেকেই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির স্টেজ ক্র্যাফটে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনেন অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের মঞ্চচিন্তা। মঞ্চসজ্জার আধিক্য থেকে সরে এসে নিরাভরণ মঞ্চসজ্জার পথটি অবশ্যই তাঁদের একটি দার্শনিক সিদ্ধান্ত।

এই সূত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাটকের আলোচনা এই সূত্রে জরুরী। সেটি হল *বিসর্জন* (১৮৯০)। এম্পায়ার থিয়েটারে এই নাটকের দ্বিতীয় পর্যায়ের অভিনয়ের সময় (১৯২৩) গগনেন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথের মঞ্চশৈলী এই নাটকে বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। *প্রবর্ত্তক পত্রিকায়* মঞ্চসজ্জার বিবরণ বেরোয়—'...দৃশ্য একটি—ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দিরদ্বারের সম্মুখস্থিত চত্বর ও মর্মর সোপানাবলি; তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থানের চিত্র নাই, back cloth ঘন নীলবর্ণ—দিগন্ত বিস্তারী আকাশের মত। মন্দির বা মন্দির মধ্যস্থিত দেবীর মূর্ত্তি দর্শকের দৃষ্টির বাহিরে, কিন্তু তাহা কল্পনা-চক্ষুর বাহিরে নহে' (qtd. in R. Chakraborty 58)। অর্থাৎ বাস্তববাদী বা বলা ভালো ইল্যুশনিস্ট ধরনের বাইরে একটি ইঙ্গিতময় মঞ্চসজ্জার প্রয়াস করা হয়েছিল এই নাটকে। আরেকটি প্রতিবেদনে এই মঞ্চসজ্জার আরও বিস্তৃত আলোচনা পাই:

> ... the stage was draped throughout in different shades of dark blue, deepening as they receded into the background. There was no changing of scene; the blood-stained temple steps, designed in Cubist fashion, dominated the stage throughout, a lurid

red light marked the entrance to the Temple itself, invisible in the darkness beyond the wings... (R. Chakraborty 61)

নানান শেডের গাঢ় নীল রঙের কাপড় ধাপে ধাপে মিশে গেছে পশ্চাৎপটে। পুরো নাটকে কোথাও দৃশ্য পরিবর্তন হয় না। পশ্চাৎপটে কেবল কিউবিস্ট ধরনে আঁকা রক্তাক্ত সিঁড়ির ধাপগুলি দেখা যাচ্ছে। উইংসের ধারের লাল আলো মন্দিরের অভ্যন্তর হিসেবে সূচীত করছে। বিসর্জনের মতো গভীর ভাবোদ্দীপক নাটকের তেমনই গভীর ইঙ্গিতময় মঞ্চসজ্জাটি নিঃসন্দেহে নাটকের মূল ভাবের সহায়ক হয়ে উঠেছিল বলেই মনে হয়। গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ এই মঞ্চভাবনার মূল কাণ্ডারী ছিলেন। সহযোগিতায় ছিলেন নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর।

গগনেন্দ্রনাথের দৃশ্য ভাবনার আরও একটি বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেছেন রতন পারিমু। গগন ঠাকুরের মঞ্চ আয়োজন ও অঙ্কন ভাবনার আলোচনায় সেই বিশ্লেষণটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলছেন, ১৯১৬ থেকে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির বিচিত্রা গৃহে যে নাট্যচর্চা হয়েছিল, সেইখান থেকেই গগনেন্দ্রনাথের ইউরোপীয় কিউবিস্ট আর্ট-এর চর্চা শুরু। রতন পারিমুর মতে, ব্রিটিশ নাট্য নির্দেশক ও দৃশ্য সজ্জাকর গর্ডন ক্রেগ-এর মঞ্চসজ্জার ধরনটির গভীর প্রভাব দেখা যায় গগনেন্দ্রনাথের এই সময়কার অঙ্কন সমূহে (এই সূত্রে রতন পারিমুর গ্রন্থে প্লেট নম্বর ১৯০ ও ১৯৬ দেখা যেতে পারে)। গগনের কয়েকটি ছবিতে প্রসেনিয়াম থিয়েটারের আদল, যেমন- The Coming of the Princess ছবিতে (*Souvenir Volume two* 11); কেন্দ্রীয় চরিত্রের ওপর স্পট লাইটের প্রক্ষেপণ, যেমন- Rabindranath Tagore at the Calcutta congress ছবিতে (*Souvenir Volume two* 6) এবং সর্বোপরি ড্রিমল্যাণ্ডের মতো একটি ছবিতে একটি নাটকের মঞ্চসজ্জার ধরনে সমগ্র চিত্রটিকে সজ্জিত করার মধ্যে দিয়ে গগনের নাট্যচিন্তার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। এই সূত্রে চিন্তামণি করের ব্যাখ্যা, 'Stage and drama must have influenced his mind profoundly, as his later paintings show an effect of stage settings and an atmosphere charged with the expectancy of the theatre'. (*Souvenir Volume two* 2) The Coming of the Princess ছবিটি নিয়ে আলোচনায় রতন পারিমু বলছেন, একেবারে নাটকের মঞ্চের ধরনে আঁকা। 'In the middle is placed what seems to be the main character while the two doors in the back wall appear as part of the settings also to be used for entry and exit of actors. The vertical sections on either side clearly suggest lateral wings of the stage.

Devices borrowed from stage are the overhanging frontal panels and use of wings to create depth in planes' (Parimoo 103, Plate 197). গগনেন্দ্রনাথের একটি নাটক সম্বন্ধীয় স্কেচ-ও খুঁজে পাওয়া গেছে। সেই স্কেচটিতে কোনো একটি নাটক সম্পর্কিত বেশ কিছু নোট লেখা আছে। যদিও সেটি কোন্ নাটকের স্কেচ সে ব্যাপারে কিছু সূত্র পাওয়া যায়নি।

ঠাকুরবাড়ির নাট্যপ্রযোজনা প্রসঙ্গে গগনেন্দ্রনাথের নাট্য ভাবনা ও তার সঙ্গে তাঁর সৃষ্টিশীল শিল্পচেতনার ওতপ্রোত যোগাযোগের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক। পাশাপাশি, এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের মঞ্চভাবনাটি আলোচনা করাও খুব জরুরী। রবীন্দ্রনাথের লেখা *রঙ্গমঞ্চ* প্রবন্ধে তাঁর বাহুল্যহীন মঞ্চচিন্তার দর্শনগত দিকটি প্রতিফলিত হয়। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের গোড়ায় মঞ্চ বিষয়ক এই প্রবন্ধ তিনি লিখলেন। দুই বছর আগে পর্যন্ত যে মঞ্চ ঐতিহ্যকে তিনি সমর্থন জানিয়েছিলেন, এই প্রবন্ধে তার বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করলেন। এই সূত্রে অজিত কুমার ঘোষের নিরীক্ষণ, ' ...বোধহয় তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মভূমির উদার, উন্মুক্ত ব্যাপ্তি, প্রাকৃতিক পটভূমির চিত্রময়, বর্ণোজ্জ্বল, সজীব অস্তিত্ব, মঞ্চের সাজসরঞ্জাম ও উপকরণ জোগাড় করবার বাস্তব অসুবিধা এবং জটিল কলানির্ভর নাট্যপ্রয়োগের বহুব্যয়সাপেক্ষতা ইত্যাদি ভাবনা দ্বারা চালিত হয়ে প্রবন্ধটি তিনি লিখেছিলেন'*(Rangamanche Bangla Nataker Prayog* 187-188)। সুতরাং রঙ্গমঞ্চ সংক্রান্ত আলোচনায় অজিতের এই বিশ্লেষণকে বিবেচনায় রেখে প্রবন্ধটিকে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'কিন্তু ছবিটা কেন। তাহা অভিনেতার পশ্চাতে ঝুলিতে থাকে, অভিনেতা তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তোলে না; তাহা আঁকামাত্র; আমার মতে তাহাতে অভিনেতার অক্ষমতা কাপুরুষতা প্রকাশ পায়' (*Bichitra Prabandha* 74)। এই ভাবনার প্রতিফলন দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথের নাট্য রচনাতেও। *মুক্তধারা, রক্তকরবী, রথের রশি*--একের পর এক নাটকে নাট্যকার নির্দেশিত প্রতীকী মঞ্চসজ্জার উল্লেখ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের নিঃসশয় উক্তি, 'ভাবুকের চিত্তের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ আছে, সে রঙ্গমঞ্চে স্থানাভাব নাই। সেখানে জাদুকরের হাতে দৃশ্যপট আপনি রচিত হইতে থাকে। সেই মঞ্চ, সেই পটই নাট্যকারের লক্ষ্যস্থল, কোনো কৃত্রিম মঞ্চ ও কৃত্রিম পট কবিকল্পনার উপযুক্ত হইতে পারে না' (*Bichitra Prabandha* 76)। রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় কাব্যিক ভঙ্গিতে লেখা এই সুরের তুলির ছবি নিয়ে অজিত কুমার ঘোষের বাস্তবতা নির্ভর প্রশ্ন, 'ভালো কথা, কিন্তু তা হলে পথ, ঘাট, মাঠ, গুহাদ্বার এইসব দৃশ্যনাম দিয়েছেন কেন?' *(Rangamanche Bangla Nataker Prayog* 187-188)।

যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের এই মঞ্চচিন্তা হয়তো দার্শনিক চিন্তা প্রসূত। কিংবা অজিতের বিচার মতে প্রযোজনা সংক্রান্ত জটিলতা এড়ানোর এক পন্থা। কারণ যাই হোক না কেন, একটি কথা নিঃসন্দেহ যে উনিশ ও বিশ শতকীয় বাংলা থিয়েটার জগতের যে ইউরোপীয় আদলে বাস্তবের মাতো বা ইল্যুশনিস্ট মঞ্চসজ্জার ধরনের মঞ্চ সাজানোর প্রচলন শুরু হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর নাট্যকর্মীরা গোষ্ঠী তার বাইরে একটি স্বতন্ত্র পরিচয় নিয়ে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন। *ফাল্গুনী* নাটকের মঞ্চসজ্জা নিয়ে *ভারতী* পত্রিকায় **১৩২২** বঙ্গাব্দে বা **১৯১৫** খ্রিস্টাব্দে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা বিবরণী থেকে জানা যায়:

> দৃশ্যপট যা দেখানো হয়েছে তা ভূগোল পরিচয়ের কোনো পর্যায়ের সঙ্গেই মেলে না। ...নীল রঙের পর্দায় সবুজের আভা... গোটা কতক তারা দেখা যাচ্ছে ... একটুখানি চাঁদও দেখা দিয়েছে। দু-একটা গাছের ডাল মাথার ওপর ঝুঁকে রয়েছে, তার একটাতে একটি ঝুলানা বাঁধা। দু-একটা লতা লতিয়ে উঠেছে, উঁচু নীচু জায়গায় ফাঁকে ফাঁকে তৃণমঞ্জরী বসন্তের হাওয়ায় রঙ্গিন হয়ে উঠেছে। এর বেশী আর কিছু নয় (Hazra 176)।

অত্যন্ত সামান্য চিত্রায়ন দিয়ে দৃশ্যপটটিকে রাঙ্গিয়ে তোলা হয়েছে। অর্থাৎ বলা যেতে পারে, মঞ্চসজ্জা নাটকের বাস্তবতাকে ছুঁতে চাইছে না। তার লক্ষ্য নাটকের গভীর ভাবটি। দৃশ্যপটের উপস্থিতি নাট্যায়নকে বাস্তবতার ভারে ভারাক্রান্ত করবে না। সে শুধু বহন করবে নাটকের মূল বক্তব্যের দ্যোতনাটুকু। সম্ভবত এই ছিল ঠাকুরবাড়ির নাট্যাঙ্গনের মঞ্চ-আয়োজনের দার্শনিক ভাবনাটি।

এর পরবর্তী সময়ে **১৯১৭** খ্রিস্টাব্দে *ডাকঘর* নাটকটি অভিনয় করা হয় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে (A. Ghosh *Bangla Nataker Prayog* 208)। সেখানে কিন্তু অপেক্ষাকৃত ভারী সেট সেটিং-এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। মঞ্চসজ্জার নেতৃত্ব দিলেন গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নীল সাইক্লোরামা, তাতে একফালি চাঁদ। তার সামনে দরমার গ্রামীণ ঘর। দরজা জানলা কুলুঙ্গি। খড়ের চালা। খাট বিছানার ব্যবহার। পিতলের পাখির দাঁড়। একেবারে আদর্শ পাড়াগেঁয়ে ঘর। এই নাটকে প্রায় সম্পূর্ণতই বাস্তবের মতো বা ইলুশনিস্ট স্টেজ সেটিং-এর পথ অনুসরণ করলেন শিল্পীরা। গগনেন্দ্রনাথের জীবনকথায় মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় লিখছেন:

> অমন করে এর আগে কেউ স্টেজ সাজায় নি। এর আগে স্টেজ সাজানো হত সিন্ পেন্টিং করে। দৃশ্যগুলি পটের গায়ে এঁকে স্টেজে সাজিয়ে দেওয়া হত। ‘ডাকঘর’-এর বেলায় হল অনাড়ম্বরের চূড়ান্ত। সামনের

দিকটা শুধু একটা খড়ের চালের সম্মুখভাগ। সত্যিকারের খড়—কাপড়ের উপর আঁকা নয়। পিছনে শুধু নীল। দৃশ্যবদল বলে কিছু ছিল না। শেষ দৃশ্যে শুধু সেই নীলে কিছু তাঁরা ফুটেছিল। স্টেজের সামনে সাজানো ছিল গুচ্ছ গুচ্ছ রজনীগন্ধা (114)।

অর্থাৎ জোড়াসাঁকোর মঞ্চসজ্জাকরদের মধ্যে কখনো ইল্যুশনিস্ট অথবা কখনো বাস্তবোত্তর কিংবা কখনো একেবারে নিরাভরণ শূন্য-প্রায় মঞ্চ—সবকিছু নিয়েই প্রবল পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছিল।নাটক বিশেষে মঞ্চপরিকল্পক তার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতেন। শৈল্পিক সুষমা ও ভাবোদ্দীপক রুচিকে প্রাধান্য দিয়ে জোড়াসাঁকোর নাট্য প্রযোজনার দৃশ্য ভাবনা করা হত এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহই নেই। শুধুমাত্র চটকধারী মঞ্চকৌশল প্রতিষ্ঠা করার কোনো দায় বা প্রয়োজন তাঁদের ছিল না। তাঁরা নাট্যবস্তুকে অনুসরণ করে মঞ্চ পরিকল্পনা করেছেন। নাট্যভাব ও বক্তব্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে চালিয়ে গেছেন তাঁদের পরীক্ষা-নিরিক্ষা।

কিন্তু জোড়াসাঁকোর মঞ্চশিল্পী অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ বা অবনীন্দ্রনাথ বা গগনেন্দ্রনাথের এই প্রচেষ্টা নেহাতই উচ্চবিত্ত অন্দরমহলের শৈল্পিক প্রয়াস হিসেবেই সীমাবদ্ধ হয়ে রয়ে গেছিল। এই শিল্পভাবনার পেছনে কোনো ব্যবসায়িক চমক সৃষ্টির দরকার ছিল না। টিকিট বিক্রি করে নাট্যশালা চালাতে হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। উচ্চতর দার্শনিক মতাদর্শগত শৈল্পিক চেতনা থেকেই এই প্রয়াসগুলি সংঘঠিত হতে পেরেছে। কিন্তু কলকাতার সাধারণ রঙ্গালয়গুলির এই রকম শৈল্পিক কারুকাজের পরিসর ছিল না। থিয়েটার মঞ্চকে বাঁচাতে, আর্থিক লাভের পরিমাণ অব্যাহত রাখতে, পেশাদারি নাট্যকর্মী হিসেবে টিঁকে থাকতে আবেগপ্রবণ মধ্যবিত্ত নব্য ইংরেজি ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ যুবকদের বাস্তবের মতো নাট্য আয়োজনের আয়োজন করতেই হত। এছাড়া কোনো রাস্তা ছিল না। পরবর্তীকালে আবার অমরেন্দ্রনাথ দত্তের মতো ধনী ব্যক্তি যখন মঞ্চের ভার নিলেন, তখন সেই ইল্যুশনিস্ট মঞ্চভাবনার আরও প্রসার ঘটল। কারণ জনরুচি ও চাহিদাকে যথাসম্ভব পূরণ করার দায় নিয়েই মঞ্চ ভাবনার কাজ সারতে হত মঞ্চাধ্যক্ষদের। সেখানে যেমন পটুয়া শিল্পীর ঐতিহ্যবাহী স্টাইলাইজড অঙ্কনরীতির স্থান নেই, একইভাবে উচ্চবিত্ত শখের নাট্যশালার ভাবুক স্টেজ ক্রাফটের অবসর নেই। এই দুই প্রবল দূরবর্তী অঙ্কন ধারার মাঝে দাঁড়িয়ে নিজেদের মঞ্চভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে মধ্যবিত্ত পেশাদারি নাট্যশালা। সীমাবদ্ধতার মধ্যেই পরীক্ষা-নিরিক্ষা চালিয়েছে। নতুন মঞ্চ বানিয়েছে। চমকপ্রদ সিন সিনারি এঁকেছে। জনমনোরঞ্জনের কাজ করে গেছে।

শেষের কথা

বাংলা থিয়েটারের শুরু থেকেই মঞ্চের দৃশ্যপট নিয়ে সমালোচনা দেখা যাচ্ছে। এই মঞ্চসজ্জা করার জন্য প্রধানত ডাক পড়ত শহর ও শহরতলীর পটুয়া সম্প্রদায়ের মানুষদের। বাঙলার এই লোক সম্প্রদায়ের মানুষেরা তাঁদের চিত্রপ্রশিক্ষণের মধ্যে কখনো কোনো ইউরোপীয় বাস্তববাদী ঘরানার অঙ্কনরীতির শিক্ষা পাননি। তাঁদের রঙ তুলি দিয়ে পটের কাপড়ে চিত্র ফুটিয়ে তোলার যে বৈশিষ্ট্য দেখা যেত, সেই শিক্ষা প্রশিক্ষণ বা রুচিবোধ দিয়ে নব্য ইংরেজি ভাবধারায় পুষ্ট উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত বাঙালির শিল্পবোধকে আকর্ষণ করা যায়নি। নব্য শিক্ষিত নাট্যকর্মী চাইছে বাস্তবের মতো মঞ্চায়ন। এই সূত্রে বলা দরকার মঞ্চে বাস্তবতার আগমনের জন্য মঞ্চে মহিলা চরিত্রে মহিলাদের নিয়ে আসা হয়। মেয়ে চরিত্রে মেয়েদেরই ভালো মানায়, এমনটাই বক্তব্য ছিল মেয়েদের মঞ্চে আনার পক্ষে সওয়ালকারী নাট্যব্যক্তিদের। মেয়েদের মঞ্চে আসার অধ্যায়টিতে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। রিমলি ভট্টাচার্যের বিশ্লেষণটি মঞ্চে বাস্তবতার আগমনের বিষয়ে বিশেষ জরুরী হয়ে ওঠে। তিনি বলছেন, 'At the level of mimesis, women playing themselves were 'realistic' by their very presence on stage, according to the new norms of representation made visible in proscenium performance' (*Public Women* 305)। সমস্ত স্তরে নাট্য প্রযোজনাকে হয়ে উঠতে হবে 'বাস্তববাদী'। তা সে মঞ্চে মহিলা অভিনেত্রী আনাই হোক কি মঞ্চসজ্জার ক্ষেত্রেই হোক।হুবহু বাস্তবের প্রতিলিপি গড়ে তুলতে হবে মঞ্চে। অথবা নানান কারিগরি চমক ব্যবহার করে মঞ্চকে জাঁকজমকে ভরিয়ে তুলতে হবে। তার জন্য চাই নতুন ইউরোপীয় ঘরানার নাট্যসজ্জার নানা কারিগরি বিষয়ক জ্ঞান অথবা পারস্পেকটিভ রীতি অনুযায়ী অঙ্কনরীতির প্রশিক্ষণ। কিন্তু বাঙলার পটুয়ার সে শিক্ষা নেই। তার হাতের তুলি বা রঙ দিয়ে দৃশ্যপটের ওপর সেই রকম বাস্তবানুগ চিত্রায়ণ সম্ভবও নয়। কিংবা সাবেক কালের শিল্পরীতি অবলম্বন করে আধুনিক মঞ্চের চাহিদা অনুযায়ী নানান চমক সৃষ্টির ক্ষমতাও তাঁদের নেই। ফলে সমালোচিত হতে থাকল পটুয়ারা। বিরক্ত মধ্যবিত্ত ধীরে ধীরে নিজেই তুলি ধরল। মঞ্চসজ্জা করল। সরিয়ে দিল নিম্নবর্গকে।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকের বাংলা থিয়েটারের মঞ্চসজ্জার আলোচনায় খুব বেশি মঞ্চকৌশলের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ইংরেজি নাটকের অনুপ্রেরণায় গড়ে ওঠা বাংলা থিয়েটারের শুরুর দিকের সমালোচনা বা প্রতিবেদনে দৃশ্যপট বা সিন অঙ্কন সামান্যই উল্লেখ থাকত। অভিনেতা অভিনেত্রীর সাজগোজ রূপসজ্জা পোশাক আশাক আর

সঙ্গে নাটকের দৃশ্যপট নিয়ে দুই-এক কথা লেখা হত। কোথাও লেখা থাকত সিন আঁকা ভালো হয় নি। অথবা মনোহর বা সুন্দর। এই ধরনের উল্লেখগুলো থেকে মনে হয় বাংলা নাটকের দর্শক নাটকের মঞ্চসজ্জা নিয়ে তখনও তেমন সচেতন হয়ে ওঠেনি।

বরং বিশ শতকের গোড়া থেকে ধীরে ধীরে পেশাদারি রঙ্গমঞ্চে বেশ কিছু চমকপ্রদ মঞ্চ আয়োজনের কথা জানা যায়। নাট্যতাত্ত্বিক কিরন্ময় রাহা লিখছেন, ‘What engaged the stage designers more was the attempt to create ‘magical effects’. Thus we read of trap doors and diaramas, of seas turning into forests, of mechanical devices to represent mythical ages in plays...’ (72)। মঞ্চে আস্ত একটা রেলগাড়ি চালানোর মতো ঝুঁকিপূর্ণ মঞ্চভাবনার সাহস দেখায় বাংলা থিয়েটার। ‘পাছে অন্যের হাতে বিপত্তি ঘটে তাই ড্রাইভার সেজে গাড়ি চালাতে গেলেন যোগেন্দ্রনাথ মিত্র নিজে। সবাই অবাক। কিন্তু বিভ্রাট ঘটতেও দেরি হল না। ট্রেন তো বাঁশি বাজিয়ে স্টেজে ঢুকে পড়েছে। গল-গল বেরোচ্ছে ধোঁয়া। যাত্রী হলেন অর্ধেন্দুশেখর বা গাইকোয়াড়। ড্রাইভার যোগেন্দ্রনাথ নিজে। আর গার্ডসাহেবের ভূমিকায় অমৃতলাল। কিন্তু একি! এ যে ন যযৌ ন তযথৌ। গাড়ি যে নড়ে না। যোগেন্দ্রনাথ এটা নাড়েন, ওটা টেপেন—গাড়ি একেবারে নট্ নড়নচড়ন। গুঞ্জন উঠেছে দর্শক মহলে। অমৃতলালের ছিল দারুণ উপস্থিত বুদ্ধি। ঝট্ করে লাল পতাকাটা বের করে উড়িয়ে দিতে লাগলেন। আর গাড়ি যায় কি করে’ (B. B. Ghosh)।

বিশ শতকের এই মঞ্চসজ্জার জাঁকজমক শুরু হয় সম্ভবত পার্সি থিয়েটারের প্রভাবে। পার্সি থিয়েটার ১৮৫০ থেকে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষে অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল। পার্সি থিয়েটারকে ভারতের প্রথম আধুনিক বাণিজ্যিক থিয়েটার হিসাবে দেখা যেতে পারে। উপমহাদেশে ইউরোপীয় প্রযুক্তি, প্রাচুর্য এবং দেশীয় শিল্পকলাগুলির একত্রিত রূপ হয়ে উঠেছিল এই পার্সি থিয়েটার। সারা ভারতবর্ষে বাণিজ্যিকভাবে অত্যন্ত সফল একটি জায়গা করে নিয়েছিল এই থিয়েটার। নামটিই ইঙ্গিত দেয় যে, পার্সি জাতির মানুষেরাই এই থিয়েটারের প্রধান মালিক ছিল। পশ্চিম ভারতের পার্সি সম্প্রদায়ের মানুষেরা মূলত ব্যবসা বাণিজ্য করত। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে তারা পশ্চিম ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক শক্তি হয়ে ওঠে এবং সেই সময় তারা শিল্পসংস্কৃতি ক্ষেত্রে প্রচুর বিনিয়োগ করা শুরু করে। আর এই বিশাল অর্থনৈতিক বিনিয়োগের জন্যই তাঁদের প্রযোজিত নাটকে নানান চমকপ্রদ বিষয় দেখানোর বেশ সুবিধে হয়েছিল। রামায়ণ, মহাভারত, আরব্য রজনী, ভিক্টোরিয়ান মেলোড্রামা, শেক্সপীয়ারের ট্র্যাজেডি

কমেডি—সব ধরনের নাটকই পার্সি মঞ্চে স্থান পেয়েছিল। পার্সি নাট্যমঞ্চে ইউরোপীয় মঞ্চায়ন পদ্ধতি সুনিপুণভাবে অনুসরণ করা সম্ভব হয়েছিল।

প্রসেনিয়াম আর্চের মধ্যে দিয়ে নাটক দেখানোর ধরনটিকে হুবহু নকল করতে পেরেছিলেন এই পার্সি নাটকের কর্মীরা। ইউরোপীয় প্রসেনিয়াম নাটকের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুসরণ পার্সিরাই করতে পেরেছিলেন। শুরুর দিকে বাঁশের তৈরি অস্থায়ী মঞ্চের ভেতরে যে দৃশ্য-আয়োজন করা হত, তা নিঃসন্দেহে ভারতে প্রচলিত আর সমস্ত নাট্যমঞ্চের তুলনায় অনেক বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। সোমনাথ গুপ্তের স্মৃতিচারণা থেকে জানা যাচ্ছে, *নিউ অ্যালফ্রেড মণ্ডলির* রঙ্গমঞ্চটি প্রায় ৭০ ফুট চওড়া ও ৬০ ফুট লম্বা ছিল। দর্শকের বসার স্থানটি ছিল সুবিশাল, প্রায় ৬৯০০ বর্গফুট এলাকা জুড়ে (219)। ইউরোপীয় পারস্পেকটিভ রীতিতে আঁকা হত পার্সি থিয়েটারের পুঙ্খানুপুঙ্খ নিখুঁত দৃশ্যপটগুলি। এর আগে যা যা মঞ্চদৃশ্য আঁকা হয়েছিল, তার তুলনায় অনেক বেশি সত্য ও বাস্তবানুগ হয়ে উঠতে পেরেছিল পার্সি থিয়েটারের দৃশ্যপটগুলি। সাধারণত বন, বাগান, রাস্তা, প্রাসাদ এবং কখনও কখনও স্বর্গ আঁকা দৃশ্যপট দেখা যেত। এছাড়াও, প্রতিটি নাট্য সংস্থার নাটক অনুযায়ী নিজস্ব নির্দিষ্ট দৃশ্যপটও থাকত। প্রথমে, ইউরোপীয় শিল্পীদের দিয়ে দৃশ্যপট আঁকার কাজ করা হয়ত (S. Gupta 220)। তবে পরে, আর্ট কলেজগুলিতে প্রশিক্ষিত ভারতীয় চিত্রশিল্পীদের এই কাজের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছিল।

এই জাঁকজমকপূর্ণ বাণিজ্যিক থিয়েটারের বেশ অনেক কয়টি নাটক নিয়মিতভাবে কলকাতায় অভিনীত হয়েছিল। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত জানাচ্ছেন, উনিশ শতকের শেষ থেকেই কলকাতা শহরে পার্সি থিয়েটারের অভিনয় হত (Dasgupta 4: 227)। *ভিক্টোরিয়া পার্সি অপেরা কম্পানী, পার্সি এলফিন্সটোন ড্রামাটিক ক্লাব, পার্সি অ্যালফ্রেড থিয়েট্রিক্যাল কম্পানী*—এইরকম আরও বেশ কিছু পার্সি নাট্য সংস্থা কলকাতায় নিয়মিত অভিনয় চালাতেন। এইসব নাট্য প্রযোজনার চমকপ্রদ মঞ্চায়ন সম্পর্কে হেমেন দাশগুপ্ত লিখছেন:

> ...scenes and sceneries of the Parsee theatres were very gorgeous. Scenes for the Elphinstone (Theatre) were specially designed and painted by K. Husain Buksh of Lahore and the great transformation scenes in Bilwamangal e.g. when Srikrishna was born from lotus flower, His advent on the horizon, but his immediate metamorphosis

to a shepherd boy, Chintamoni's vision and Bhagirathi's sudden transformation into a human skeleton were really enchating' (Dasgupta 4: 232)

পার্সি নাটকের সবচেয়ে শক্তিশালী উপকরণই ছিল এই মঞ্চদৃশ্যায়নের চমকগুলি। নাটকের বিজ্ঞাপনেও সেই বিষয়গুলি উল্লিখিত হত (Yajnik 114)।

New Play! New Play!

AT THE

CORINTHIAN THEATRE

ETC.

THE LOVE STORY OF THE AGES

N A L AA N D D A M A Y A N T I

A Spectacle of Super-Extravagant Splendour

in Three Acts

etc.

With an All-Star Cast Featuring India's

Popular Stage-Star

MASTER MOHAN

in the principle role of 'Bidushak'

The Play is replete with gorgeous dresses, wonderful trans-

formation scenes and weird and enchanting effects. . . .

The entire gorgeous scenery designed and painted by

India's Greatest Living Artist

Mr. K. Hussain Buksh, of Lahore

The Sleepy Lotuses transforms themselves into Fairy visions.

The Vision of Princess Damayanti.

The bursting of a lotus and the appearance of Goddess

'Saraswati' therefrom.

The flight of the Swan.

The 'Swayambhara' of Damayanti.

Narad's descent from the clouds.

The miraculous appearance of Kali with the Flaming sword.

The transformation of five Nalas.

The transformation of 'Karkota' in a forest fire.

The Durbar-Hall of King Nala.

The transformation of seven Fairies, etc.

কলকাতার পার্সি মঞ্চের এই প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্যের ছাপ এসে পড়ে বাংলা মঞ্চে।পার্সি নাট্যকার 'আরাম'-এর লেখা 'বেনজির-বদ্রমুনীর' নাটকটি ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার *স্টার থিয়েটারে* বাংলায় অভিনীত হয়। নাটকটির নামটি পর্যন্ত একই রাখা হয়। শুধু ভাষা ছিল বাংলা এবং বাংলা গীতিনাটকের ভঙ্গীতে নাটকটি সম্ভবত পরিকল্পনা করা হয় (Rimli Bhattacharya *Public Woman* 298)। পাশাপাশি পার্সি থিয়েটারের প্রভাবেবাংলা থিয়েটারের কারিগরি বিদ্যারও প্রবল উন্নতি দেখা যায়। বাংলা মঞ্চের অভিনেতারা আকাশ থেকে থেকে নেমে এসে মাটির তলায় লুকিয়ে যেতে শুরু করে। *গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের হীরক-চূর্ণ* নাটকে যোগেন্দ্রনাথ মিত্রের পরিকল্পনায় মঞ্চে রেলগাড়ি চলা, মঞ্চে ট্রেনের ধোঁয়া ওঠা ও আলো চমকে ওঠা বা অমরেন্দ্রনাথের নাটকে মঞ্চে ঘোড়ায় চড়ে প্রবেশ করা, বিনোদিনীর ব্রিটানিয়া চরিত্রে ওপরের দড়ি বেয়ে মঞ্চে নেমে আসা ইত্যাদি মঞ্চ চমকের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। সেই সময়কার নাটকের মঞ্চসজ্জা নাটকের গভীর ভাবকে বহন করবার চেয়ে বেশি মনোযোগী হয়েছিল নানান ধরনের মঞ্চ চমকের উপাদান তৈরির দিকে। ক্রমাগত বাস্তব ও অতি বাস্তব নির্ভর মঞ্চব্যবস্থা করে দর্শকের মনোরঞ্জনের কাজ করে গেছে বাংলা পেশাদারি রঙ্গমঞ্চ।

পার্সি থিয়েটারের এই প্রবল প্রতিপত্তি বাংলা থিয়েটারের মঞ্চভাবনাকে আন্দোলিত করেছে। এই চমকসৃষ্টিকারী মঞ্চভাবনার এক অন্যতম সম্বল হয়ে উঠেছিল সেই সময়কার অত্যাধুনিক অঙ্কন পদ্ধতি। যদিও শুধু অঙ্কন নয়, সেই সময়কার ভাস্কর্য বা প্রতিমা নির্মাণের ক্ষেত্রেও নব্য ইউরোপীয় ভাবনার প্রকাশ হয়েছিল। আর উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই এই নতুন ধারার ভাস্কর্য পরিকল্পনার প্রভাবও এসে পড়েছিল বাংলা নাট্য মঞ্চভাবনার ওপর। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে কালিপ্রসন্ন সিংহের *বিদ্যোৎসাহিনী মঞ্চে বিক্রমোর্বশী* নাটকের অভিনয় হয়। সেখানে ভরতমুনি ও কালিদাসের কাল্পনিক দুটি পাথরের মুর্তি মঞ্চের ওপরে বসানো হয়েছিল। এই মুর্তি দুটি সম্পর্কে *হিন্দু পেট্রিয়ট* ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর লিখছে, 'The marble painting on the frontispiece was as neat as elegant, and the stone pictures of Bharata and Kalidasa, though mostly imaginary, were executed with so much nicety and taste that one was involuntarily reminded of the classic days of Greecian sculpture and painting' (qtd. in P. Das, *Banga Rangamancha O Bangla Natak* 51)।

উনিশ শতক থেকে বাঙালিদের মহাভারত রামায়ণ ও নানান হিন্দু উচ্চ সাহিত্যকে ভিত্তি করে নাট্যবস্তু আবর্তিত হত। অঙ্কন ও ভাস্কর্য শিল্পক্ষেত্রেও সেই একইভাবে উচ্চসাহিত্যের গল্প নিয়ে বাস্তববাদী ভাস্কর্য ও অঙ্কনের প্রবর্তন হল। রামায়ণ মহাভারত ও নানান পুরাণের বিষয়বস্তু অবলম্বন করে এতদিন লোকশিল্পের যে জটিলতাহীন শিল্পরীতির প্রচলন ছিল, সেই অভ্যাস থেকে সরে আসতে চাইল বাঙালী মধ্যবিত্ত শিল্পী দল। বাস্তববাদের আকর্ষণ তখন এতই প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, উচ্চসাহিত্যের বিষয়বস্তুকে ভিত্তি করেও তাঁরা বাস্তববাদী অঙ্কন ও ভাস্কর্য নির্মাণের প্রচেষ্টা শুরু করল। *হিন্দু পেট্রিয়ট* ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা মে লিখছে, 'Let our readers now consider what would be the effect of a body of artists [trained in the School] with high conceptions and a refined tastes modelling the idol-forms we worship' (qtd. in S. Banerjee *The Parlour and the Streets* 191)। পূজ্য দেবীমুর্তির গঠনে বাস্তবতার জোয়ার এসে লাগল। সেই বাস্তবের মায়া গড়ে তোলার ঢেউ এসে পড়ল বাংলা নাটকের মঞ্চসজ্জাতেও। নবীন বসুর থিয়েটারে সত্যিকারের আসবাব পত্র ব্যবহারের কথা বিচার করে মনে হয় নবীন বসু একটি বাস্তবের অনুরূপ মঞ্চায়নের প্রচেষ্টা থেকে এই পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। পরবর্তী কালের বাংলা থিয়েটারে সেই বাস্তবভিত্তিক নাট্য আয়োজনের আরও জনপ্রিয়তা দেখা যেতে লাগল। মঞ্চের সমস্ত

দৃশ্যগত ক্যানভাসটিকেই আপাদমস্তক ইউরোপীয় অনুকরণে সজ্জিত করে তুলতে চাইলেন নাট্যব্যক্তিরা। বিশ শতকের গোড়ার দিকে ক্রমে ক্রমে সেই ইল্যুশনিস্ট বা বাস্তবের মায়াসৃষ্টি করার ঝোঁক পরিবর্তিত হতে থাকল মঞ্চ চমক সৃষ্টির দিকে। নাটকের গভীর বস্তু ও দৃশ্যের চাহিদা অনুযায়ী মঞ্চসজ্জার আয়োজন করার থেকেও বেশি উদ্দেশ্য হয়ে উঠল নানান কারিগরি উপকরণ ব্যবহার করে নাটকের দৃশ্যায়নে প্রতি নিয়ত নতুন নতুন চমক তৈরি করা।

পাশাপাশি ঠাকুর পরিবারের মতো অপেশাদার মঞ্চ আয়োজনে জোর দেওয়া হচ্ছিল নাটকের গভীর ভাবের দিকেই। নাট্য চমক সৃষ্টি করে দর্শকদের তাক লাগিয়ে দেওয়ার তুলনায় নাটকের অন্তর্নিহিত ভাববস্তুকেই প্রাধান্য দিতে চেয়েছিলেন ঠাকুর বাড়ির শিল্পীরা। তাঁদের নিজেদের পরিসরে দর্শকদের তাক লাগানো মনোরঞ্জনের তেমন দায় ছিল না। ব্যবসায়িক স্বার্থ জড়িয়ে না থাকায় তাঁরা গভীর নাটকের গভীর দর্শনভিত্তিক মঞ্চসজ্জা করার অবকাশও পেয়েছেন এবং সেই বিষয়ে নিয়ত চর্চা ও প্রয়োগকলায় নিমগ্ন হতে পেরেছেন।

পেশাদারি মঞ্চের নাট্যকর্মীদের ইল্যুশনিস্ট বা বাস্তবের মায়া তৈরি করার শিল্পরীতি কিংবা ধনী গৃহের অপেশাদার নাট্যকলায় নতুন ভাবনির্ভর মঞ্চসজ্জার পরীক্ষা-নিরিক্ষা—কোনো জায়গাতেই স্থান হল না সাবেক ঘরানার নিম্নবর্গের পটুয়াদের। নাট্য চর্চার শুরুতে তাঁদের ডাক পড়েছিল ঠিকই। প্রিন্সেপের থিয়েটারে লোকশিল্পীর পুতুল-অভিনেতা নির্মাণ কিংবা নবীন বসু বা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গোড়ার দিকের নাটকে দেশী নামকরা পটুয়াদের আহ্বান করা হয়। কিন্তু দিন যত এগোতে থাকে, বাঙালি যত ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হতে থাকে, নাট্য শিল্পীরা যত ইউরোপীয় দৃশ্যসজ্জা ও মঞ্চসজ্জার ভাবনায় সচেতন হতে থাকে, ততই নাট্য আঙ্গিনা থেকে বাদ পড়তে থাকে লোকশিল্প ও তাঁদের শিল্পীরা। স্পষ্ট বিভাজনে বিভাজিত হয়ে যায় সমাজ। পটুয়ারা মোটামুটি অপরিবর্তিত ভাবেই বেঁচে থাকেন নিজেদের অঙ্কনরীতি নিয়ে; মধ্যবিত্ত নাট্যকর্মী মেতে থাকেন বাস্তবানুগ শিল্পচর্চার পরিসরে; আর উচ্চবিত্তের শখের থিয়েটার চলতে থাকে ভাবগভীর অতি ক্ষুদ্র স্বকীয় গণ্ডীতে।

মঞ্চসজ্জার ইতিহাসঃ বিকল্প রচনার সম্ভাবনা

বর্তমান অধ্যায়টির শেষে এ কথা পরিষ্কার যে, বাংলা নাট্য ইতিহাসে মঞ্চসজ্জার ব্যাপারে যেটুকু তথ্য পাওয়া যায়, তার মধ্যে থেকে একটি গভীর সমাজবিজ্ঞান ভিত্তিক পর্যালোচনা করার যথেষ্ট সুযোগ আছে। নাট্য ইতিহাস শুধু কবে কোন্ নাটক অভিনীত হয়েছিল, তার পরিসংখ্যান নয়। সমাজের বিভিন্ন ছোট-বড় ঘটনা, দেশের শাসকের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োগ, মানুষের রুচি-চাহিদা ও অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর নাটকের রূপ বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত

হতে থাকে। ধনীর বাড়ির চৌহদ্দি থেকে বেরিয়ে গণতান্ত্রিক মঞ্চ প্রতিষ্ঠার ঘটনা যেমন নাট্য ইতিহাসে স্থান পায়, তেমনই অভিনেতা-নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে নাট্য জগৎ কেমন ধীরে ধীরে নির্দেশক-নির্ভরতার দিকে পা বাড়িয়েছিল সেই বিবরণীও নাট্য ইতিহাস রচনার এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে থাকে। দেশের রাজনৈতিক ও আইনী ব্যবস্থার পরিবর্তনে নাটকের বিষয়বস্তুর বদল ঘটা যেমন নাট্য ইতিহাস লেখার এক অন্যতম সহায় হয়ে ওঠে, একইভাবে, কবে কোন্ অভিনেত্রী কোন্ রঙ্গালয়ে প্রথম অভিনয় করেছিলেন সে বর্ণনাও নাট্য ইতিহাসের পরিসরে এক বিশিষ্ট স্থান পায়।

কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে, বাংলা নাটকের প্রথাগত ইতিহাস চর্চায় কোনো সময়েই নাট্যদৃশ্যের বিবর্তনের ইতিহাসকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। নাটকের ইতিহাসের আকরগ্রন্থগুলিতে মঞ্চসজ্জার বিবরণগুলি নেহাতই নামমাত্র উল্লেখেই সমাপ্ত হয়। এর দুইটি কারণ থাকতে পারে। প্রথমত, নাট্য প্রযোজনার দৃশ্যায়নের বিস্তারিত তথ্য (বা ভিস্যুয়াল ডকুমেন্টেশনের) পাওয়ার অভাব। উনিশ ও বিশ শতকীয় সমাজে ফোটোগ্রাফির চর্চা অত্যন্ত সীমিত ছিল। ফলে বাংলা নাটকের দিকপালেরা যে যে নাট্য প্রযোজনাগুলি করেছিলেন, সেগুলির মঞ্চসজ্জা কেমন ছিল তা নিয়ে খুব কম তথ্যই পাওয়া যায়। কিন্তু প্রশ্ন এই, যেটুকু তথ্য পাওয়া যায় তার মধ্যে থেকেই কোনো ইতিহাস রচনার কাজ করা হয়নি কেন? সম্ভবত দ্বিতীয় কারণটি এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খানিক সহায়ক হতে পারে। দ্বিতীয় কারণটি মনে হয় এইরকম ভাবে ভাবা যেতে পারে—নাট্য ইতিহাস রচয়িতাদের মঞ্চসজ্জার প্রতি অনীহা ও সচেতনতার অভাব বাংলা নাট্য ইতিহাসে মঞ্চসজ্জার ইতিহাসকে এতটা অবাঞ্ছিত করে রেখেছে। নাট্য বিষয়ক আর্কাইভ ও আকরগ্রন্থগুলিতে মূল জোর দেওয়া হয়েছিল নাটকের টেক্সট ও বিষয়বস্তু নিয়ে। ব্রিটিশ শাসনে বাংলা নাট্যপ্রযোজনার শুরুতে ইংরেজি নাটকের অভিনয় করা, ক্রমে সংস্কৃত নাটক এবং আরও পরে মৌলিক দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটক বা পুরাণ-আশ্রয়ী ধর্মীয় নাটকের বিষয়বস্তুগুলি নিয়ে আলোচনা করতে ইতিহাসবিদ্রা বেশি মনোনিবেশ করেছেন। প্রকাশিত নাটক বা টেক্সট এবং সেই নাটকগুলির রচনাশৈলির বিশ্লেষণের দিকেই ইতিহাসকারদের মন নিয়োজিত থেকেছে। নাটকটির স্ক্রিপ্টের মধ্যে দিয়ে, তার সংলাপের মধ্যে দিয়ে যে সামাজিক সত্য উঠে আসছে, সেটুকু নিয়েই বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন অধিকাংশ নাট্য ইতিহাসবিদ্রা। ফলে নাট্য ইতিহাসের লিপিকরণকালে নাট্যপ্রযোজনাগুলির প্রযোজনাগত বৈশিষ্ট্যগুলি উপেক্ষিতই থেকে গেছে। উনিশ বিশ শতকের নাট্য সমালোচকও মঞ্চসজ্জা নামক ডিসিপ্লিনটি সম্পর্কে খুব বেশি ওয়াকিবহাল ছিলেন না। ফলে নাট্য প্রযোজনার সমালোচনা লিখতে

গিয়ে মঞ্চসজ্জাকে তেমন গুরুত্ব দেননি। আবার পরবর্তীকালের আধুনিক গবেষকরা মঞ্চসজ্জার তুলনায় টেক্সটটিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ায় মঞ্চসজ্জার বিষয়টি একেবারে প্রান্তিক থেকে গেছে।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই সূত্রে আলোচনা হওয়া অত্যন্ত জরুরী। নাট্যশিল্পী ও কলাকুশলীরা নাট্যপ্রযোজনার যে প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন, সে সব সম্পর্কে তাঁরা নিজেরা প্রায় কিছু লেখেননি। গেরাসিম লেবেদফ বা ধর্মদাস সুরের নাট্য প্রযোজনাগুলির আলোচনা করতে গেলে তাঁদের নিজেদের লেখা অথবা মঞ্চ পরিকল্পনার স্কেচগুলি নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বেশি দরকারী হয়ে পড়ে। নাটকের স্ক্রিপ্ট নির্বাচন করা থেকে শুরু করে তার অভিনয়, পোশাক, স্বরক্ষেপণ পদ্ধতি, সঙ্গীতের ব্যবহার, মঞ্চসজ্জার পরিকল্পনা, আলোক প্রক্ষেপন এই সমস্ত বিভাগ সম্পর্কীয় নাট্য-ব্যাকরণের যে শিক্ষা নাট্য কুশীলবরা পেয়েছিলেন, সেসব বিষয়ে লেখালেখি করার ব্যাপারে এই শিল্পী গোষ্ঠীর ছিল ব্যাপক অনীহা। শিল্পীরা নিজেরা লিখে রাখেননি কোনো নাট্য প্রযোজনার কলাকৌশলগত বিবরণী। একটি নাটকের দৃশ্য পোশাক আলোক সঙ্গীতের পরিকল্পনার পেছনে কী ভাবনা কাজ করত, সে ব্যাপারে সেই সময়কার শিল্পীরা কোনো তথ্য রেখে যাওয়ার কথা মনে করেননি। তাঁদের কর্মকাণ্ড ছিল মূলত সমসাময়িক দর্শককে অগ্রাধিকার দিয়ে। উত্তরসূরী নাট্যকর্মীদের জন্য তাই তাঁরা কোনো রচনা বা স্কেচ করে যাওয়ার পরিকল্পনা করেননি। গিরিশ বা অমৃতলালরা বিক্ষিপ্তভাবে নানা পত্র-পত্রিকায় যেসব লেখালেখি করেছেন, সেগুলি সাধারণত স্মৃতিকথার ধরনে লিখিত হয়েছে। তাতে নাট্যাধ্যক্ষ বা অভিনয়-অধ্যক্ষ বা মঞ্চাধ্যক্ষের শৈল্পিক নাট্য ব্যাকরণ ভিত্তিক আলোচনার তুলনায় নাট্যপ্রযোজনাগুলির অভিনয়ের স্থান-কাল-পাত্র বা তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে নাট্যপেশার লেনদেনের বর্ণনাই স্থান পেয়েছে। একটি নাটকের প্রযোজনাগত যেসব বিভাগ আছে, সেগুলির পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিষয়গুলি তাঁদের রচনাতে আলোচিতই হয়নি বা অতি স্বল্প পরিসরে আলোচিত হয়েছে। ফলে উনিশ বিশ শতকীয় বাংলা নাট্যদৃশ্য সম্পর্কে আধুনিক যুগের ধারণাগুলি থেকে গেছে খণ্ডিত।

অর্থাৎ যাঁরা বাংলা নাটকের ঐতিহাসিক বিবরণী লিখছেন, তাঁরা মঞ্চসজ্জার আলোচনাটি সামান্য উল্লেখ করেই দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁদের মঞ্চসজ্জা সংক্রান্ত লেখায় যেন কোনো মতাদর্শ বা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হচ্ছে না। নাটকের মঞ্চায়ন নিয়ে তাঁদের যেন তেমন কোন গভীর মনোযোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। অন্যদিকে নাটকের সঙ্গে সম্পৃক্ত নাট্যকর্মীদের মধ্যে সাধারণত মঞ্চসজ্জাকারী ব্যক্তিরা তাঁদের কাজ নিয়ে বিশেষ লিখে রাখতে চাইছেন না। টেকনিক্যাল কাজে পারদর্শী কোনো নাট্যকর্মী বিশেষ লেখালেখি করতে চাইছেন না। হয়তো

তাঁরা তাঁদের নিজেদের সৃজনশীলতা নিয়ে লেখার আত্মবিশ্বাস পাননি বলেই লেখেননি। সেক্ষেত্রেও তাঁদের মূল ভরসার জায়গাটা দলের অধ্যক্ষ অধিকার করে রেখে ছিলেন। নাটকের মঞ্চায়ন নিয়ে কোনো আলোচনা বা ভাবনার প্রতিফলন ঘটাতেও তাঁরা সেই অধ্যক্ষেরই মুখাপেক্ষী হয়ে থেকেছেন। এ ব্যাপারেও সেই নাট্যের অধ্যক্ষ বা অভিনয়-প্রশিক্ষকই মূল প্রশাসক হয়ে থেকে গেছেন। মঞ্চসজ্জার বিষয়ক পর্যালোচনাতেও যেন নাট্যগোষ্ঠীর অধ্যক্ষের বিচার সর্বোচ্চ মান্যতা পেয়েছে। মঞ্চসজ্জাকারীর নিজের তাঁর নিজস্ব সৃজনশীল কাজের গভীর বিশ্লেষণ করার কোনো কর্তৃত্ব নেই। তাঁর সেই আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠার পরিসর নেই।

এই সূত্রে ধর্মদাস সুরের আত্মজীবনীর ভূমিকায় গিরিশ ঘোষের লেখা একটি অংশ উল্লেখযোগ্য। ধর্মদাস নিজের রচনাটি গিরিশ ঘোষের কাছে সংশোধনের জন্য দিতে চেয়েছিলেন (Sur, 'Introduction')। অর্থাৎ নিজের কাজ নিজের জীবন নিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত লেখাটি সভ্য শিক্ষিত জগতের সামনে পরিবেশনের আগে একজন প্রতিষ্ঠিত প্রশাসকের শিলমোহর দিয়ে লেখাটির বৈধতা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন ধর্মদাস সুর। নিজের জীবন নিয়ে লেখাটি সরাসরি প্রকাশ না করে তার 'শুদ্ধিকরণের' দায়িত্ব তুলে দিচ্ছেন তাঁর অধ্যক্ষের হাতে।

তার মানে বোঝা যাচ্ছে, নাট্যপ্রযোজনা নিয়ে যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের নাট্যকর্মী হওয়ার প্রশিক্ষণ নেই। তাঁরা মূলত সাধারণ দর্শক বা সাংবাদিক বা চাকুরিজীবী বা নাট্য জগতের বাইরের মানুষ। আবার নাট্য জগতের শিল্পীরা যাঁরা নাট্য নির্মাণের মূল কাণ্ডারী, তাঁরা নিজেদের নাট্য প্রযোজনাগুলির প্রযোজনাগত টেকনিক্যাল আলোচনায় বিমুখ বা সেই বিষয়ে লেখার ব্যাপারে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী নন। ফলে নাট্য ইতিহাস গ্রন্থগুলিতে মঞ্চসজ্জার উল্লেখ থাকে না, বা এমন ভাবে উল্লেখ থাকে যেন বাংলা নাটক ছিল আপাদমস্তক জাঁকজমকহীন শুষ্ক সংলাপনির্ভর মঞ্চায়নমাত্র। ফলে আজকের নাটকের ছাত্ররা হয়তো মনে করেন, অতীতে বাঙালির নাটক ছিল নেহাতই সাদামাটা, অতীতের নাট্যকর্মীদের মঞ্চপ্রযুক্তির কোনো পাঠই হয়ত ছিল না। নাট্যমঞ্চে সচল ট্রেনের পরিকল্পনার কথা পড়ে আধুনিক নাট্যকর্মীদের ধারণা হয়, সেই পরিকল্পনা ছিল নিতান্তই অ্যামেচার কিছু প্রয়াস। অতীতের বাংলা নাট্য প্রযোজনাগুলির জাঁকজমকপূর্ণ পেশাদারি রূপটি একেবারেই গণ্য হয় না, বরং টেক্সট-এর গভীরতার বিশ্লেষণেই বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে আধুনিক গবেষক সমাজ।

বর্তমান অধ্যায়ের শেষে এ কথা বলা যায়, বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস রচনা করতে নাটকের মঞ্চসজ্জা সংক্রান্ত নথিগুলি নিঃসন্দেহে বিশেষ গুরুত্ব দাবি করে। মূল প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসের সম্পূরক হিসেবে নয়, মূল ইতিহাসের

ফাঁক ভরানোর জন্যও নয়- বাংলা থিয়েটারের মঞ্চসজ্জার ইতিহাস একটি সম্পূর্ণ বিকল্প ইতিহাসকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষমতা রাখে। প্রসেনিয়াম নাট্যমঞ্চের মূল ধারার ইতিহাস চর্চাতে এমন অনেক সত্য অধরা থেকে গেছে, যা নাটকের মঞ্চসজ্জার বিবর্তনের ইতিহাস বিবরণীতে অবশ্যই ধরা পড়ে। বাংলা থিয়েটারের মঞ্চসজ্জাকারী গোষ্ঠীর ক্রমবিবর্তন অবশ্যই এক নতুন শ্রেণীচেতনার দৃষ্টিকোণ তৈরি করে, যা প্রথাগত ইতিহাস বিশ্লেষণে ধরা পড়ে না বা তেমন গুরুত্ব পায় না। এই কারণে মঞ্চসজ্জার ইতিহাসকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে নতুন ইতিহাস রচনার কাজটি শুরু হওয়া দরকার। কিন্তু তার জন্য চাই স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণ। অবশ্যই এ কথা উল্লেখ্য, মঞ্চসজ্জার ইতিহাস যে বিকল্প ইতিহাসের পথ দেখায় সেই একইভাবে আলোকসজ্জা, সাজসজ্জা, মুখোশের ব্যবহার ইত্যাদি থিয়েটার-এর যাবতীয় সিনোগ্রাফির উপাদানগুলিও নাট্য ইতিহাস আলোচনায় স্থান করে নেওয়ার সম্ভাবনা বহন করতে পারে বলেই অনুমান করা যায়। বর্তমান গবেষণা সূত্রে থিয়েটারের আলোকসজ্জা সংক্রান্ত বেশ কিছু তথ্য আমি পেয়েছি। সেই তথ্যগুলি এই অধ্যায়ের শেষে উল্লেখ করে রাখতে চাই পরবর্তী কোনো গবেষণার স্বার্থে। যদিও এই ব্যাপারে গবেষণা করতে আরও গভীর মনোনিবেশ প্রয়োজন। আমার মঞ্চসজ্জার কাজের সূত্রে আলোকসজ্জার কিছু উদাহরণ পাওয়া। মনোযোগী গবেষক এই বিষয়ে আরও অনেক তথ্য পাবেন বলেই আমার ধারণা।

এই সূত্রে বিনোদিনীর রচনায় আলোকসজ্জার কিছু আলোচনা আছে। বিনোদিনী *আমার কথা ও অন্যান্য রচনা* -তে লিখছেন, 'তারপর আমরা সদলবলে লক্ষৌ যাত্রা করলাম ... সেখানে ছত্রমঞ্জিলে ধর্মদাসবাবু সিন খাটিয়ে এক রকম ক'রে ষ্টেজ সাজিয়ে নিলেন, সে বেশ দেখতে হয়েছিল ... মস্ত বড় এক বাড়ীর মধ্যে আমাদের ষ্টেজ বাঁধা হ'য়েছিল। চারদিকে গ্যাসের আলো জ্বলছিল, সমস্ত বাড়ীটা লোকে ভরে গিয়েছিল, অভিনয়ের সময় বেশ জমজম করতে লাগল' (97)। অর্থাৎ সেই সময় মঞ্চে আলোকসজ্জার মূল উৎস ছিল গ্যাস। মূলত গ্যাসের আলোতেই মঞ্চ আলোকিত করে তোলা হত, এমনটাই জানাচ্ছেন বিনোদিনী। অবনীন্দ্রনাথও তাঁর রচনায় আলোক-আয়োজন বিষয়ে লিখছেন তাঁর *ঘরোয়া* গ্রন্থে, 'তেতলার ছাদ চার দিকে রেলিং আর পিলপে দেওয়া, ঘেরা, তারই উপরে চালা বেঁধে স্টেজ তৈরি হল। তখন তো ইলেকট্রিক বাতি ছিল না, গ্যাসের বাতির ব্যবস্থা হয়েছে' (97)। এই গ্রন্থের আরও একটি স্থানে তাঁর বর্ণনা, 'তখন এ-রকম ইলেকট্রিক বাতি ছিল না, গ্যাস বাতি, কার্বন লাইটের ব্যবস্থা হল। লাল সবুজ মখমলের পর্দা দিয়ে স্টেজ সাজানো হল। এটা সেটা কিছুই বাদ নেই।কর্তাদাদামশায়ের খরচ—মনের সুখে

জিনিসপত্তর আনিয়ে সাজানো গোছানো গেছে' (118)। সূত্রগুলি থেকে বোঝা যাচ্ছে, থিয়েটারে আলোকসজ্জা ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা করার বেশ কিছু নিদর্শন অপ্রতুল হয়তো নয়।।

প্রশ্ন এই যে, আলো কি শুধু দৃশ্য-দেখানোর জন্য ব্যবহৃত হত? নাকি নাট্যমুহূর্ত তৈরি করতেও কিছু আলাদা পদ্ধতি নেওয়া হত? বিনোদিনী *আমার কথা*-য় লিখছেন,

> "সরোজিনী" নাটকের একটী দৃশ্যে রাজপুত ললনারা গাইতে গাইতে চিতারোহন করছেন। সে দৃশ্যটি যেন মানুষকে উন্মাদ করে দিত। তিন চার জায়গায় ধু ধু করে চিতা জ্বলছে, সে আগুনের শিখা দু'তিন হাত উঁচুতে উঠে লক্‌লক্ করছে। তখন ত বিদ্যুতের আলো ছিল না, ষ্টেজের ওপর ৪।৫ ফুট লম্বা টিন পেতে তার ওপর সরু সরু কাট জ্বেলে দেওয়া হ'ত ... গাইতে গাইতে চিতা প্রদক্ষিণ করছে, আর ঝুপ করে সেই আগুনের মধ্যে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে পিচকারী করে সেই আগুনের মধ্যে কেরোসিন ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, আর আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে ... (106)

বিনোদিনীর আলোকক্রিয়ার বিস্তারিত বর্ণনাটি আলোক গবেষণার প্রয়োজনীয় বেশ কিছু মূল্যবান তথ্যের জোগান দেয়।

অমৃতলাল বসুর *স্মৃতি ও আত্মস্মৃতি* গ্রন্থে আলোক-সরবরাহের ব্যাপারে কিছু বর্ণনা আছে। যেমন অমৃতলাল বলছেন, 'বর্তমান যুগে থিয়েটারের বড় বড় অভিনেতাদের মুখের উপর ইলেকট্রিক লাইট দেওয়া ফেসান হয়েছে, কিন্তু আমাদের সেকালে বাঙ্গালা লেখাপড়া করা, সুতরাং অশিক্ষিত, যাত্রাওয়ালারা আর্টের এই কদরটুকু জানতেন ; যাত্রা হ'লেই দু'জন মশালচি আনাতে হ'ত, তারা দু'দিক থেকে দু'টো জ্বলন্ত মশালের আলো প্রধান প্রধান গায়ক ও অভিনেতাদের মুখের সামনে ধ'রে থাকত' (125)। আলোচ্য মন্তব্যে 'বাঙ্গালা লেখাপড়া করা, সুতরাং অশিক্ষিত, যাত্রাওয়ালা'-দের আলোক-আয়োজন নিয়ে সম্ভবত সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের কিছু সুযোগ থেকে যাচ্ছে।

এরপর 'অশিক্ষিত যাত্রাওয়ালা'দের মশাল সরে গিয়ে গ্যাসের আলোর ব্যবহার শুরু হল বাংলা 'থিয়েটার'-এ। অনুমান করা যায়, গ্যাসের আলোর ব্যবস্থাপনা করতে হতো নাট্যকর্মীদেরই। কারণ, সেই সময়ের নাট্য-আয়োজনের বর্ণনায় অমৃতলাল জানাচ্ছেন, 'আমরা স্থির করিলাম যে ৭ই ডিসেম্বর রাত্রিতে আমাদের প্রথম অভিনয় এই ষ্টেজে করিতে হইবে। ধর্ম্মদাস ষ্টেজ করিয়া দিলেন; নোটিশ ও টিকিট ছাপান এবং গ্যাস ব্যবস্থার ভার নগেন্দ্রের উপর ন্যস্ত হইল' (*Smriti O Atmasmriti* 55)। এরপর অভিনয়ের দিনের ঘটনা বর্ণনায় করতে গিয়ে অমৃতলাল

বলছেন, '৭ই ডিসেম্বর, শনিবার ১৮৭২ খৃঃ অব্দ বাঙ্গালীর পব্‌লিক্ ষ্টেজের একটি স্মরণীয় দিন। অপরাহ্নকালেও আমাদের আয়োজন করা অনেক বাকী ছিল। অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া গ্যাস লাগাইয়া দিবার জন্য গৌরমোহন ধরকে রাজী করান হইল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে গ্যাস বসান হইল' (*Smriti O Atmasmriti* 55)। এই বর্ণনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, একটি নাট্য-আয়োজনে গ্যাসের আলোর জোগান পাওয়ার পদ্ধতি নিয়ে গবেষকের একটি আলাদা মনোযোগ প্রয়োজন আছে। সেই আলো মঞ্চে আনার যান্ত্রিক উপায় কী ছিল এবং কতক্ষণের জন্য সেই আলোর সরবরাহ থাকত, তার কোনো খরচ ছিল কিনা, এই গ্যাসের আলো ব্যবহারের জন্য তৎকালীন সরকার মহলে কিছু অনুমতি প্রার্থনীয় ছিল কিনা, সেক্ষেত্রে সেই প্রার্থনা কীভাবে কোথা থেকে মঞ্জুর করানো হত ইত্যাদি নানান প্রশ্নের উত্তর খোঁজার মাধ্যমে হয়তো নাট্য-ইতিহাসের একটি সমাজতাত্ত্বিক পরিসর খুলে যেতে পারে। আবার এই গ্যাসের আলো যে কত বড় বিপদ ডেকে এনেছিল, সে বিষয়ে অমৃতলালের বর্ণনাটি গুরুত্বপূর্ণ, 'আমি সেদিন ''কাম্যকাননে'র নায়করূপে অবতরণ করিয়াছি। ... অগ্নি চারিদিক হইতে আগুন! আগুন! ধ্বনি উত্থিত হইল ... বেশ দেখা যাইতেছে যে দেয়ালের গায়ে গ্যাস-বাক্সে চিমনি বসান হয় নাই; তাই উত্তাপের আধিক্য বশতঃ এই অগ্নিকাণ্ড হইয়া আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল' (*Smriti O Atmasmriti* 78)।

কিছু ক্ষেত্রে ফুটলাইটের ব্যবহারের কথাও জানা যাচ্ছে, সম্ভবত সেই গ্যাসের ফুটলাইটের অবস্থান থাকত মঞ্চের একেবারে সামনে, দর্শকের দিকেই। *আমার কথা* রচনাতেই বিনোদিনীর বিবরণী জানাচ্ছে, 'ক্রমে সেই দৃশ্যটা এল, রোগ সাহেব ক্ষেত্রমণিকে ধরে পীড়ন করছে ... সব সাহেবেরা উঠে দাঁড়াল, পেছন থেকে সব লোক ছুটে এসে ফুট-লাইটের কাছে জমা হতে লাগল- সে একটা কি কাণ্ড'! (99)। *আমার কথা*-তেই আরও একটি স্থানে বিনোদিনী জানাচ্ছেন, 'অভিনয় এত উৎকৃষ্ট হইত যে একদিন অভিনয়কালীন "ভৈরবাচার্য্য" যখন "সরোজিনী"কে বলি দিতে যায়, সেই সময় দর্শকবৃন্দ এত উত্তেজিত হইয়া পড়িয়া ছিল যে ফুটলাইট ডিঙ্গাইইয়া ষ্টেজে উঠিতে উদ্যত' (50)। অর্থাৎ থিয়েটার দেখে দর্শকের মধ্যে যখন যখন আন্দোলন উপস্থিত হচ্ছে কিংবা অভিনেতাদের সঙ্গে দর্শক সরাসরি ভাবমিনিময়ের চেষ্টা করছেন, তখন অনেক ক্ষেত্রেই যেন ঐ 'ফুটলাইট'-এর কেন্দ্রীয় অবস্থানের দর্শকের সমাগম হচ্ছে। অভিনেতারাও এমনকি দর্শকের সঙ্গে সরাসরি কোনো কথোপকথন করতে চাইলেও হয়তো ব্যবহৃত করতেন সেই 'ফুটলাইট'-এর আশপাশ। বিস্তারিত গবেষণার সম্ভাবনা হয়তো আছে এখানে।

মঞ্চের ফুটলাইটের উপস্থিতিটি যে নাট্যকর্মীদের কাছেও যে কতটা মায়া তৈরি করত তার প্রমাণ রেখেছেন বিনোদিনীর রচনায়। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখছেন, 'আজকালকার সব নতুন নতুন অভিনেতা, অভিনেত্রী, ... কত হাততালি, সোরগোল, হৈ-হৈ, সেই ফুটলাইট ... কত কথাই না মনে পড়ে! আমরাও তো। একদিন এমনি করে সাজতেম, সেই সেকালের মত দর্শক, সেই সেকালের মত রঙ্গসাথী, সেকালের সাজপোষাক, সেকালের নাটক, সেকালের গ্যাসের ফুটলাইট, সেকালের আবহাওয়া' (Dasi 80)।

মঞ্চের এই যান্ত্রিক উপকরণগুলি নাট্যকর্মীদের পার্ফর্মেন্সে কী আবেদন রাখে, কীভাবে তাঁদের অভিনয়কে প্রভাবিত করে, নাট্যমুহূর্ত রচনায় অভিনেতা ও দৃশ্যসজ্জাকরেরা কীভাবে অবদান রাখে, আধুনিক 'নাট্য ইতিহাস গবেষক'দের এই ব্যাপারে সচেতন হওয়ার সময় এসেছে। নাটকের সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি নাটকের মঞ্চায়ন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হলেই হয়তো নাট্য ইতিহাস রচনাটি পরিপূর্ণতা পায়। আর এই কাজে অবশ্যই অনেকটাই দায়িত্ব থাকে নাট্যকর্মীদের। কিন্তু নাট্য গবেষকদের এই বিষয়ে আরও সচেতন হওয়ার দরকার আছে। নাট্য গবেষকদের নাটকের প্রযোজনাগত প্রশিক্ষণ নেওয়া দরকার। তবেই তাঁরা নাটকের ইতিহাস রচনা করার সময় নাটকের সাহিত্যের বিশ্লেষণের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে নাটককে মঞ্চপ্রযোজনার প্রেক্ষিত থেকে বিশ্লেষণ করতে পারবেন। আর সেভাবেই নাট্য ইতিহাস সংক্রান্ত নানান গভীর তথ্য ও তত্ত্ব প্রতিফলিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। সমসাময়িক নাট্য প্রযোজনা সম্পর্কে নাট্যকর্মীদের লিখিত বা দৃশ্যায়িত বয়ানগুলিকে নাট্য ইতিহাসের প্রাধান্য দেওয়া প্রয়োজন। এবং পাশাপাশি নিজেদেরও নাট্যপ্রযোজনার মঞ্চসংক্রান্ত কলাকৌশল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া প্রয়োজন। স্থাপত্য বা ভাস্কর্যশিল্পের ইতিহাস লিখতে গেলে যেমন পাথর, মাটি বা ছেনি-হাতুড়ি সম্পর্কে যেমন হাতে কলমে শিক্ষার প্রয়োজন আছে, কিংবা প্রাচীন চিকিৎসাপদ্ধতি বিষয়ক ইতিহাস লিখতে বিজ্ঞানভিত্তিক শারীরবিদ্যার ধ্যানধারণা হওয়া প্রয়োজন, ঠিক সেইভাবেই নাটকের ইতিহাস লিখতে গেলে প্রযোজনাগত বৈশিষ্ট্যগুলিকে নাট্য ইতিহাসে প্রাধান্য দিতে হলে নাট্য গবেষকের অবশ্যই মঞ্চকলা সম্পর্কে অন্তত প্রাথমিক কিছু শিক্ষাগ্রহণ করা প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। তা না হলে নাট্য ইতিহাসে এই মঞ্চসজ্জা ও দৃশ্যসজ্জার বৈশিষ্ট্যগুলি অবনত থেকে যাবে আর নাট্য ইতিহাস সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থেকে যাবে বলে মনে হয়।

সিদ্ধান্ত

একটি বিকল্প পদ্ধতির সন্ধান

আমার গবেষণার কাজটি একটি নির্দিষ্ট অবিচ্ছিন্ন ধারায় ঘটনা পরম্পরা অবিকৃত রেখে সময়ক্রম অনুসারে ধারাবাহিকভাবে লিখিত গবেষণা নয়। আমার গবেষণার বিষয়গুলি আপাতভাবে পরস্পর বিচ্ছিন্ন। অধ্যায়গুলির মধ্যে কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। টুকরো টুকরো কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলাদা আলাদা ভাবে লেখা। একটি অধ্যায়ের সঙ্গে ক্রমান্বয় রক্ষা করে পরবর্তী অধ্যায় রচিত হয়নি। আবার পূর্ববর্তী অধ্যায় থেকে প্রাপ্ত অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতেও পরের অধ্যায়ের বিষয়টিকে বিচার করা হয়নি। প্রতিটি অধ্যায় এক একটি পৃথক স্বকীয়তায় অবস্থান করে। তাদের মধ্যে কোনো যোগসূত্রকারী অনুঘটক নেই। তারা কোনোভাবেই একে অপরের সঙ্গে কার্যকারণসূত্রে সম্পর্কিতও নয়।

এমন একটি গবেষণা কর্মের নির্দিষ্ট একটি সিদ্ধান্ত লেখা অবশ্যই জটিল কাজ। সেই কারণে অধ্যায়গুলির মতোই আপাতবিচ্ছিন্ন, স্বকীয়তাসম্পন্ন, টুকরো টুকরো অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য নিয়েই এই গবেষণার সিদ্ধান্তগুলিও গড়ে উঠবে। এই উদ্দেশ্যে বর্তমান অংশে আমার লেখা অধ্যায়গুলির সংক্ষিপ্ত সারাংশগুলি পরিবেশন করছি।

প্রথম অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়ে বাংলা নাট্যমঞ্চে মহিলাদের অবতরণের ঘটনাটিকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই বিষয়ে প্রথাগতভাবে যে ইতিহাস লেখা হয়েছে, তার বৈশিষ্ট্যগুলিকে নিয়ে এই অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আমি এই অধ্যায়ের প্রথম অংশে দেখাতে চেয়েছি, কীর্তন দল, ঝুমুর নাচ, বাউল গান, ভাদু উৎসব, টুসু গান, সূর্য ব্রত, নাচনী নাচ, ভাদুলি ব্রত কথা, খেমটির নাচ, তুঁষতুঁষালি ব্রত, ইতু পুজোর অনুষ্ঠান, মাঘমণ্ডল ব্রত, কথকতা, পাঁচালি গান—এরকম অসংখ্য লোক পরিবেশনায় নিম্নবর্গের মেয়েদের উল্লেখজনক উপস্থিতি ছিল। এই প্রেক্ষিতে আমি প্রশ্ন তুলেছি, এইরকম ভাবে মেয়েরা লোকশিল্পে ওতপ্রোত জড়িয়ে থাকার ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও, উনিশ শতকের থিয়েটারে মহিলা-অভিনেত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রে এত জল্পনা হয়েছিল কেন? এমনকি সেই সময়ে বা পরবর্তীকালে লিখিত ইতিহাসেও মেয়েদের মঞ্চে ওঠার ঘটনাটিকে কেন একটি ‘সাহসী’ বা ‘ঐতিহাসিক’ পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে?

যাত্রা, কথকতা, কবির লড়াই, কৃষ্ণমাহাত্ম্যসূচক পালাতে দীর্ঘকাল মেতে ছিলেন উচ্চবিত্ত বাঙালি, এমনটাই জানাচ্ছে ইতিহাসের আকরগ্রন্থগুলি। আর তার পাশাপাশি আমরা এমন তথ্যও খুঁজে পাচ্ছি যেখানে দেখা যাচ্ছে,

এইসব লোক অনুষ্ঠানে অনেক সময়েই মেয়েদের প্রভূত অংশগ্রহণ হয়তো থাকত। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত কলকাতা ও তার আশেপাশের বড়লোক বাঙালি বাড়িতে নিয়মিত যাত্রা পালা আয়োজন করার প্রচুর খবর পাওয়া যায়। কিন্তু এর পর থেকে পরিস্থিতি ক্রমশ পাল্টাতে লাগল বলেই জানা যাচ্ছে। উচ্চবিত্ত বাঙালি বাবু সম্প্রদায়ের মানুষেরা ইংরেজদের অনুকরণে জীবনযাত্রাপ্রণালী ও সংস্কৃতিচর্চা গড়ে তোলার উদ্যোগ নিল। আর সেই তাগিদ থেকেই অনেক কিছুর মতোই ইংরেজ সংস্কৃতির অনুকরণে গড়ে তুললেন থিয়েটার সংস্কৃতিকে।

ইংরেজি থিয়েটারের আদলে তৈরি করা হল উঁচু নাট্যমঞ্চ। দর্শকের থেকে দূরত্ব তৈরি করা হল। সাহেবদের অনুপ্রেরণায় নাট্য অভিনয়কলাকে একটি ‘বিশিষ্ট’ রূপ দেওয়ার চেষ্টা শুরু হল। যাত্রার অভিনয়ের মতো দর্শক ও অভিনেতার নৈকট্য আর থাকল না। সাধারণ মানুষের থেকে দূরে সরতে লাগল অভিনয়কলা। গরীব মানুষের ছোঁয়াচ এড়িয়ে, শুধুমাত্র বড়লোকদের মনোরঞ্জনের জন্য ও শাসক ইংরেজদের কাছে খানিক ‘রুচিশীলতা’ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হল। শুধু উঁচু মঞ্চ নয়; আরও একটি পদ্ধতি অবলম্বন করে সাধারণ মানুষের থেকে নিজেদের আলাদা করে তুলতে চাইল উচ্চবিত্ত বাঙালি। তারা ধ্রুপদী নাটকের অভিনয় শুরু করল। লোকনাটকের বিষয়গুলি সরিয়ে রেখে নাট্যমঞ্চে প্রধানত জায়গা পেতে থাকল ইংরেজ শেক্সপীয়ার বা ভারতীয় সংস্কৃত নাট্যকারেরা। আর এভাবেই সাধারণ বাঙালি নিম্নবর্গের মানুষ ও তাঁদের সংস্কৃতি থেকে উচ্চবর্গের সংস্কৃতিকে উচ্চাসনে বসানোর কাজ শুরু করল উচ্চবিত্ত। প্রকটভাবে বিভাজিত হতে লাগল উচ্চ ও নিম্নবর্গের সংস্কৃতিচর্চা। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, উচ্চ ও নিম্নের মধ্যেকার এই বিভাজন উনিশ শতকের আগে একেবারে ছিল না। কিন্তু উনিশ শতকে মূলত ইংরেজদের ধরনে গড়ে তোলার থিয়েটারের উদ্যোগ নেওয়ার মাধ্যমে মূলত হিন্দু বাঙালি উচ্চ ও মধ্যবিত্ত ইংরেজি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে নিম্ন সম্প্রদায়ের মানুষদের থেকে ‘নিজেদের’ সম্প্রদায়কে উচ্চাসনে বসানোর একটা প্রকট উদ্যোগ যেন চোখে পড়ে, এমনটা মনে করা হচ্ছে। উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণি ও ধর্মগত গোষ্ঠীর সংস্কৃতির মধ্যেকার এই বিভাজিতকরণের প্রক্রিয়ারই একটি অন্যতম হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ালো মেয়েদের নাট্যমঞ্চ থেকে বিতারিত করার উদ্যোগটি। থিয়েটার যেন আর যাই হোক লোকশিল্প নয়; এ এক ‘বিশেষ’ শিল্পমাধ্যম। নিচু তলার মেয়েরা লোককলার মতো নিচু কাজে অভিনয় করতে পারে। বিশেষ মানুষের বাড়ির মেয়েরা পড়াশোনা করে, নতুন ধারার সাহিত্য পাঠ করে, দেশের রাজনীতির কাজে পুরুষের সহযোগী হয়। কিন্তু জনসাধারণের সামনে উন্মুক্ত হয়ে ‘অভিনয়’-এর মতো নিচু কাজ করে না। লোক

সমাজে মেয়েরা মঞ্চে বিচরণ করতেই পারে, কিন্তু 'অ-সাধারণ' সমাজে তারা গৃহীত হয় না। সম্ভবত এমনটাই মনে করতে শুরু করলো 'থিয়েটার'-অনুরাগী সম্প্রদায়।

বাংলার উচ্চবিত্ত নাট্যমোদীরা তাঁদের নিজেদের বাড়ির মেয়েদের কেন মঞ্চে ওঠার অনুমতি দিলেন না এই জিজ্ঞাসা এসে যায়। নিচু জাতের নারীকে উচ্চবিত্তের নাট্যশালায় অভিনেত্রী হিসেবে নিয়োগ করার অনেক সামাজিক ঝুঁকি আছে, সেটা বোধগম্য। কিন্তু নিজের বাড়ির মেয়েকে কেন তাহলে এই কাজে উৎসাহিত করা হল না সে ধন্দও আধুনিক গবেষককে আলোড়িত করে। তাহলে তো নিচশ্রেণির 'দূষিত' মেয়েদের উপস্থিতির ভয় দূর হয়। আবার মহিলা চরিত্রে মহিলা অভিনেত্রীও পাওয়া যায়! উচ্চ ও মধ্যবিত্ত পরিবারের নিজের বাড়ির মেয়েদেরকে নাট্যশালায় স্থান দেওয়া হল না বলে ইতিহাসের ব্যাখ্যা জটিল আবর্তে পড়ে যায় বলে মনে হয়। এই প্রসঙ্গটি অনুধাবন করার জন্য উনিশ শতকীয় উচ্চবিত্ত সমাজে 'ভদ্রমহিলা' গড়ে তোলার যে প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল, তার প্রভাব আছে বলে আমি মনে করেছি। এই শিক্ষিত নতুন 'ভদ্রমহিলা', পড়াশোনা শিখছে, গান শিখছে, নতুন ধরনের সাজগোজ করতে শিখছে। কিন্তু নিম্নশ্রেণির মেয়েদের মতো সাধারণ মঞ্চে উঠে অভিনয় করছে না। যদিও এর ব্যতিক্রম আছে। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা অভিনয় করতে মঞ্চে উঠছে, এ তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, মৃণালিনী দেবী, কাদম্বরী দেবী বা প্রতিভা দেবী এরকম অনেক মহিলারাই ঠাকুরবাড়ির নাটকে অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা অভিনয় করেছিলেন ঘরোয়া পরিবেশে, ঘরের মানুষদের সামনে। কিছু ক্ষেত্রে দর্শকাসনে পারিবারের সদস্য ছাড়াও কিছু ব্যক্তি থাকতেন। কিন্তু সেক্ষেত্রেও তারা ছিলেন সেই অনুষ্ঠানের আমন্ত্রিত অতিথি। যেকোনো সাধারণ মানুষ চাইলেই এই নাটক দেখতে পারতেন না। 'অ-সাধারণ' মঞ্চে 'অ-সাধারণ' দর্শকের সামনে 'অ-সাধারণ' বাড়ির মেয়েরা অভিনয় করলে সমালোচনা তেমন হত না। সাধারণের প্রবেশ আছে যে নাট্যশালায় সেখানে মেয়েদের প্রবেশ নিষেধ।

আমার পর্যবেক্ষণ হল, নাট্যমঞ্চে মেয়েদের অভিনয় করাটা মূল সমস্যা নয়। সেক্ষেত্রে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির মেয়েরাও অভিনয় করার জন্য সমালোচিত হতেন। তা কিন্তু হচ্ছেন না। বরং অনেকক্ষেত্রে তাঁরা প্রশংসিতই হচ্ছেন। বড় বাড়ির মেয়ের অভিনয় দেখে তাঁকে রীতিমতো দেবীর সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, মূল সমস্যা অন্য জায়গায়। সমস্যাটা হল, নিচুতলার মেয়ে বা বিশেষত বারবণিতা গোষ্ঠীর মেয়েরা একটি 'বিকল্প পেশা' বা বলা ভালো একটি 'বাড়তি পেশা' হিসেবে এই থিয়েটার শিল্পকে নিতে চাইছিলেন। সেটাই প্রধান

সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সমস্যা সম্ভবত থিয়েটারে মেয়েদের নিয়ে তেমন নয়; সমস্যাটা কি তাহলে থিয়েটারের মতো ‘উচ্চশিল্প’-এ নিচুজাতের মেয়েদের প্রবেশ নিয়ে?

আমি এই অধ্যায়ে দেখাতে চেয়েছি, লড়াইটা হয়তো সমগ্র মহিলা সমাজের নয়। সূক্ষ্ম বিচার করে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, লড়াইটা আসলে ‘বারবণিতা’ গোষ্ঠীর। তাঁদের জীবনে’বাড়তি পেশা’ হিসেবে বাবুদের থিয়েটারপাড়ায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার লড়াই এটা। অথচ প্রতিষ্ঠিত বাংলা নাট্য ইতিহাসে এই বারবণিতা গোষ্ঠীর মেয়েদের নাট্য জগতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লড়াইকে সমগ্র নারী সমাজের লড়াই হিসেবে বর্ণিত করা হয়েছে। নিম্নশ্রেণির একটি মেয়ে উচ্চশ্রেণির শিল্পমাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইছে। নিম্নবর্গের মেয়েদের সংগ্রামকে অত্যন্ত অমনোযোগে একটি গোটা নারী সমাজের ছবি হিসেবে প্রতিফলিত করা হয়েছে। সন্তর্পণে ঢেকে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে তাঁর শ্রেণিগত অবস্থান। যে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে তাঁর নাট্য শিল্পের জগতে পা রাখা, সেই সামাজিক প্রেক্ষিতটিকে যথাসম্ভব আড়াল করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় Dominant History Writing-এ।

বারবণিতাদের দেহ ব্যবসার পাশাপাশি থিয়েটার যে একটিবাড়তি রোজগারের পথ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা বহন করতে পারে, সেই সত্যটি বিভিন্ন লেখায় সন্তর্পণে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে বলে আমি মনে করেছি। সমসাময়িক নানান রচনা ও পরবর্তী যুগের সমস্ত লেখাতেই এই প্রবণতা দেখা গেছে। সমস্ত বর্ণনা বা বিশ্লেষণেই অভিনেত্রীদের নিয়মানুবর্তিতা, কাজের প্রতি মনোযোগ, শেখার ইচ্ছে ও শৈল্পিক প্রতিভার দিকে নজর ঘুরিয়ে দেওয়ার একটি উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে। বেশিরভাগ অভিনেত্রীরা নিজেদের মূল পেশার পাশাপাশি থিয়েটারকেও একটি সমান্তরাল পেশা হিসেবে রাখতে চেয়েছিলেন। বেশ্যাবৃত্তির পাশাপাশি তাঁদের থিয়েটারে আসার অন্যতম মূল উদ্দেশ্য সেটাই ছিল। তাঁদের নিজেদের লেখাপত্রেও এই বিষয়টি তাঁরা কোনোভাবে লুকোবার চেষ্টাও করেননি। এ কথা সত্যি যে, থিয়েটারে এসে অনেক অভিনেত্রীরই মানসিক ও বৌদ্ধিক অনেক পরিবর্তন হয়েছে। জীবন, সমাজ, নারীর অধিকার সম্পর্কে নিঃসন্দেহে তাঁদের অনেক পূর্ব ধারণার পরিবর্তন এনে দিয়েছিল থিয়েটারের সহকর্মী ও শিক্ষকরা। কিন্তু আমাদের প্রতিষ্ঠিত নাট্য ইতিহাস তাঁদের জীবনের অতি সহজ বাস্তব দিকটিকে যথাসম্ভব আড়াল করে দিতে চাইল। ইতিহাসকারদের নিজেদের শ্রেণিগত অবস্থান ও মূল্যবোধ থেকে তাঁরা অভিনেত্রীর জীবনকে লিপিবদ্ধ করতে থাকলেন। পেটের তাগিদের মতো কোনো নিকৃষ্ট কারণে নয়, যেন মহত্তর শৈল্পিক উদ্দেশ্যেই বেশ্যাদের থিয়েটারে বিচরণ—এমনটাই প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করলেন ইতিহাসকাররা।

পাশাপাশি আরও একটি প্রবণতা এই সূত্রে উল্লিখিত হয়েছে। উনিশ বিশ শতকের শখের নাট্যশালা ও সাধারণ রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীদের জীবনপ্রবাহের সঙ্গে পরবর্তীকালের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে আসা অভিনেত্রীদের জীবনকে এক সূত্রে গ্রথিত করার একটা প্রয়াসও চোখে পড়ে। সেই ধারা মেনে আজকের নাট্যজগতের অভিনেত্রীদের জীবনধারাকেও সেই গোলাপসুন্দরী বা বিনোদিনী দাসীর জীবনসংগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে ফেলা হয়। কিন্তু এভাবে দু'টি আলাদা শ্রেণির অবস্থানকে মান্যতা না দিয়ে শুধুমাত্র 'নারীজাতি' নামের বৃহত্তর গোষ্ঠী হিসেবে যদি দুইটি নারীশ্রেণির সংগ্রামটিকে বিচার করা হয়, তাহলে আবারও একটি ঐতিহাসিক কদর্যতার সাক্ষী থেকে যাবে না কি আজকের নাট্য ইতিহাস রচনা? আমার গবেষণার এই অধ্যায়ে মেয়েদের মঞ্চে আসা নিয়ে যে নির্দিষ্ট ন্যারেটিভটি ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত, সেই ন্যারেটিভের মধ্যেকার এই ধরনের ভ্রান্তি বা ফাঁকগুলোকে নির্দেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়টি বাংলা থিয়েটারের বিদ্রোহী চরিত্রের প্রচলিত ইতিহাসটিকে নিয়ে কেন্দ্রীভূত। এই অধ্যায়ে আমি দেখাতে চেয়েছি, প্রথাগত ইতিহাসে বাংলা নাটকের একটি বিদ্রোহী, জেহাদী, দুঃসাহসী ইমেজ প্রতিষ্ঠিত আছে। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকারের নাট্য অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনটি প্রণয়ন হওয়ার সময় কলকাতার থিয়েটার জগতের প্রতিবাদী ভূমিকাটিকে নিয়ে প্রচুর গৌরবান্বিত লেখালেখি রয়েছে নাট্য কলকাতার থিয়েটারের বিপ্লবী মুর্তিটি দেখে, নাট্যকর্মীদের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদী সত্ত্বার মুখোমুখি হয়ে এবং একের পর এক দেশাত্মবোধক নাটকের জয়যাত্রায় দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্রিটিশ সরকার আশঙ্কিত হয়ে পড়েছিল, এমনটাই প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস চোখে পড়ছে নাট্য ইতিহাস সংক্রান্ত প্রচলিত রচনাগুলিতে। প্রচলিত ইতিহাস যাই হোক না কেন, বাংলা নাট্যশালার এই স্বাদেশিক ইমেজটি গড়ে ওঠার ইতিহাসটিকে আজকের যুগে দাঁড়িয়ে আরও একবার নতুন করে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। আর সেই প্রত্যাশাতেই এই অধ্যায়ের ভাবনা। এই অধ্যায়ে প্রশ্ন উঠেছে, নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইনের সমসাময়িক নাট্যচর্চার মধ্যে সত্যিই কতটা প্রত্যক্ষ বিপ্লবী মনোভাব উপস্থিত ছিল। নাট্য জগতের যে বৈপ্লবিক ইমেজটিকে আমরা প্রথাগত ভাবে চিনি, সেই ইমেজটি আদৌ সামগ্রিক নাট্য জগতের ছবি? নাকি এই ছবিটি আসলে একটি ছোট্ট জনগোষ্ঠীর বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন মাত্র?

উনিশ শতকের ইতিহাস ঘেঁটে জানা যাচ্ছে, ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে *ন্যাশনাল থিয়েটারের* পথ চলা শুরু হচ্ছে। জমিদারের বাড়ির আঙ্গিনা থেকে বেরিয়ে সাধারণ মানুষের জন্য খুলে যাচ্ছে থিয়েটারের দরজা। থিয়েটারের দর্শকের

গণ্ডী প্রসারিত হচ্ছে। ক্ষুদ্র পারিবারিক গণ্ডীর বাইরে এক বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি হচ্ছে থিয়েটারের মানুষদের। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের আগে থিয়েটার ছিল ‘পরিবারের গণ্ডী’র মধ্যে সীমিত। তার পরে কলকাতার নাগরিক সমাজের এক বিরাট অংশের কাছে নাট্যকর্মীদের যুগোপযোগী মতপ্রকাশের পরিসর খুলে যাচ্ছে। নাট্যমঞ্চের ক্ষেত্র থেকে সমাজ ও রাজনীতি নিয়ে মতামত রাখার প্রভূত সুযোগ এসে পড়ছে নাট্যকর্মীদের হাতে। আর তার ঠিক তিন বছরের মাথায় ব্রিটিশরাজ নাট্য অভিনয় নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি নতুন বিল নিয়ে আসছে। প্রতিহত করা হচ্ছে নাটকের রাজনৈতিক বীজটিকে। সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রথম নাটকটি মঞ্চস্থ হল*নীলদর্পণ*। ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল এই নাটকটি। নাটকটির ইংরেজি অনুবাদের জন্য মামলা হয়েছিল। কিন্তু ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে *ন্যাশনাল থিয়েটারের* মঞ্চায়নে সময় কোনো মামলার মুখোমুখি হতে হয়নি নাট্যকর্মীদের। এমনকি, মানহানিকর বলে সাব্যস্ত অংশ বাদ দিয়েই মঞ্চস্থ হয়েছিল এই নাটকের দ্বিতীয় অভিনয়। ফলে বোঝা যাচ্ছে, এই সময় পর্যন্ত নাট্যজগতের বিদ্রোহী রূপটি হয়তো প্রতিষ্ঠা পায়নি।

ব্রিটিশ সরকার বাংলা নাটকের ওপর আঘাত করলো সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা হওয়ার আরও তিন বছর পর। ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে। নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন এনে। বাংলা নাট্য ইতিহাসে এই সময়টিকে ঘিরেই সমস্ত বৈপ্লবিক দুঃসাহসিক বর্ণনা রয়েছে। এই ঘটনার প্রধান কাণ্ডারী হলেন, উপেন্দ্রনাথ দাস নামক এক উদ্যমী যুবা। উপেন্দ্রনাথের *শরৎ-সরোজিনী* ও *সুরেন্দ্র-বিনোদিনী* এই দুটি নাটক বিশ্লেষণ করলে নিঃসন্দেহে নির্ভীক দুঃসাহসিক উদ্যমের কথা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করলেন উপেন ও তাঁর সঙ্গীরা। অতীতের কাহিনীর ছায়ায় সমকালীন শাসকের সমালোচনা নয়; তাঁরা ইংরেজদের প্রকাশ্য সমালোচনা করে একেবারে সম্মুখসমরে আহ্বান জানালেন। নাটকের সংলাপের মধ্যে অত্যন্ত ঘন ঘন প্রত্যক্ষ ইংরেজ সমালোচনা বা ইংরেজ শাসকদের প্রতি বক্রোক্তি উল্লেখযোগ্যভাবে উপস্থিত। ইংরেজ শাসনের বিচারব্যবস্থার প্রতি সরাসরি অনাস্থা প্রকাশ করে গেছেন। তাঁর সমাজের তাঁর শ্রেণির অধিকাংশ মানুষ যেখানে আইনের সুশাসনের কামনা করে চলেছেন, উপেন সেই সময়ে দাঁড়িয়ে ইংরেজ বিচারব্যবস্থাকে নাট্যচরিত্রের সংলাপের মধ্যে দিয়ে বক্রোক্তি করছেন। বিচারালয় নিয়ে তাঁর নিজের রাজনৈতিক ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন নাটকের নায়ক সুরেন্দ্রের সংলাপের মধ্যে দিয়ে।

এইরকম বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন উপেনের পরবর্তী নাটকটি সরাসরি ইংরেজ রাজপুরুষ ‘প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্’-কে আক্রমণ করে লেখা। নাটকটির নাম *গজদানন্দ ও যুবরাজ*। এই নাটকটি মঞ্চস্থ হওয়ার পরেই বাংলা থিয়েটারকে

প্রতিহত করতে ব্রিটিশ সরকার আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই সময় নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার পরে উপেন নাটক বিষয়ক কিছু বক্তৃতার আয়োজন করতেন বলে জানা যায়। উপেনের ব্যক্তিজীবনের আলোচনা করে অনুমান করা যায়, সমাজসংস্কারক উপেন নাটক করতে এসেছিলেন সম্ভবত জনসংযোগ ও রাজনৈতিক গণচেতনা প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে, নাট্য আন্দোলনের আবেগ থেকে নয়। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মনে করা যায়, থিয়েটারে তাঁর মূল লক্ষ্য সম্ভবত ছিল প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক। সেই লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে হয়তো তিনি নাট্যমঞ্চের জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন বলে মনে হয়। সম্ভবত তাঁর নাট্যকর্মের উদ্দেশ্য মূলত সমাজসংস্কার; নাট্যকর্মকে তিনি পেশা বা নেশা হিসেবে প্রাধান্য দিতে তিনি নাটকচর্চায় আসেননি বলেই আনুমান করা যায়। ইংরেজদের বিরূদ্ধে প্রতিবাদ করতে ও সমাজের বিভিন্ন প্রগতিশীল কার্যকলাপে বারবার উৎসাহী হয়েছেন উপেন। আর সেই কারণেই উপেন্দ্রনাথ নাটককে তাঁর উদ্দেশ্যসাধনের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন বলেই মনে হয়। থিয়েটারে আসার আগের কর্মকাণ্ড বিচার করে আন্দাজ করা যায়, উপেন থিয়েটারের প্রতি আবেগ বা প্যাশনের তাড়নায় থিয়েটার জগতে যুক্ত হননি; তিনি মূলত প্রত্যক্ষ রাজনীতিবিদ্। থিয়েটার ছিল সম্ভবত তাঁর প্রয়োজনের উপকরণমাত্র।

এই কারণে বাংলা থিয়েটারের এই পর্বে যে মামলা মোকদ্দমা ইত্যাদি ঘটেছিল, তা একান্তভাবেই একটি সীমিত সময়ের মুষ্টিমেয় জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড হিসেবে বিচার করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। এই ঘটনার পরবর্তী সময়ের নাট্যধারার সঙ্গে এই সময়ের রাজনীতির তেমন কোনো সরাসরি সুদৃঢ় সম্পর্ক নেই বললেই চলে। শুধু শিল্পের আঙ্গিনায় নয়, থিয়েটারের আবেদনটি ছিল রাষ্ট্রবিরোধী রাজনৈতিক এবং তার বিরুদ্ধে যে যে রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল সেগুলি সবকটিই বিশেষভাবে সীমিত কিছু মানুষের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক পদক্ষেপ বলেই মনে করা যায়।

সেই কারণে তৎকালীন প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করা দরকার। তার মানে এ কথা বলা হচ্ছে না যে, এই ঘটনা বাদ দিয়ে বাংলা থিয়েটার জগতে যা যা নাট্যপ্রযোজনা হয়েছে, তাদের কোনো রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য নেই। শুধু নাটক নয়, যে কোনো পার্ফর্মেন্সের ইতিহাসেরই কোনো না কোনো রাজনৈতিক ভিত্তি অবশ্যই থাকে।কিন্তু আলোচ্য ঘটনার প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক চরিত্রের সঙ্গে সেইসব পরোক্ষ রাজনীতি বা আপাত-নিষ্ক্রিয় রাজনীতির বৈশিষ্ট্যগুলিকে একই আধারে ব্যাখ্যা করা যায় কিনা,সে ব্যাপারে প্রশ্ন আসে।

কিন্তু আমাদের প্রচলিত নাট্য ইতিহাসের নানান প্রত্যক্ষ রাজনীতি ক্ষেত্র বহির্ভূত ঘটনাবলীর মাঝে এই ঘটনাটি-যেটি সরাসরি রাজনৈতিক ক্ষেত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়- সেই ঘটনাটিকে অন্য নাট্য আলোচনার সঙ্গে একই প্রবাহে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে এই রকমের একটি বিশেষ রাজনৈতিক বিষয়টিকে সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় কিনা, সে বিষয়ে প্রশ্ন জাগে। উপেন ও তাঁর সমর্থক সমাজদরদী মানুষদের এই রাজনৈতিক সক্রিয়তার সঙ্গে সাধারণ নাট্যশিল্পীদের মনন ও গতিবিধিকে মিলিয়ে ফেললে ইতিহাস সীমাবদ্ধ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থেকে যায় বলে মনে হয়। যেহেতু কিছু বিশেষ নাটক ঘিরেই এত ঘটনা ঘটেছিল, তাই নাট্য ইতিহাসে এর উল্লেখ অবশ্যই থাকবে। কিন্তু এই ঘটনার মূল্যায়ন করার সঠিক ক্ষেত্র হয়তো প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক অঙ্গন। উপেন ও তাঁর সহায়কদের এই রাজনৈতিক কর্মতৎপরতাকে সাধারণ নাট্য জগতের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে মিশিয়ে বর্ণনা করে নাট্য জগতের বিপ্লবীয়ানার খ্যাতি প্রতিষ্ঠা করা গেছে ঠিকই; কিন্তু তাতে ইতিহাস রচনায় যে সীমাবদ্ধতা ঢুকে পড়েছে, তা ইতিহাস কথনে সীমাবদ্ধতা তৈরি করে ফেলছে বলে মনে হয়।

উনিশ শতকের বাংলা থিয়েটার জগতের কর্মকাণ্ডের মধ্যে এই ঘটনাটি ছাড়া আর কোনো উল্লেখযোগ্য প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক পদক্ষেপ চোখে পড়ে না। জমিদারের তত্ত্বাবধানে যে নাটক হত, তাতে রাষ্ট্রবিরোধী কোনো বক্তব্য প্রকাশের উপায় প্রায় ছিল না বললেই চলে। জমিদারের অঙ্গন পেরিয়ে অপেক্ষাকৃত গণতান্ত্রিক অঙ্গনে আসার পরেও বাংলা নাটকের জগতের মানুষদের মধ্যে তেমন কোনো সংগ্রামী চেতনার উদাহরণ খুঁজে পাওয়া গেল না বলেই মনে করা যায়। এই ঘটনার পর থেকে বাংলার নাট্য প্রবাহে মূলত ধর্মীয় ও পৌরাণিক নাটকই চলতে থাকল। নিষ্প্রভ হয়ে গেল থিয়েটারের প্রত্যক্ষ সমসাময়িক রাজনীতিভিত্তিক চরিত্রটি। সেই কারণে বোধহয় বাংলা থিয়েটার জগতের বৈপ্লবিক ইমেজ নিয়ে লিখতে গিয়ে এই নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন হওয়ার সময়কার এই রাজনৈতিক ঘটনাকে ব্যবহার করা ছাড়া গবেষকদের আর কোনও উপায় থাকলো না। এই ঘটনাকেই নাট্যকর্মীদের একত্রিত প্রতিবাদী দুঃসাহসিক কাণ্ড বলে প্রতিষ্ঠা করা হল। এই ঘটনাই উনিশ শতকের নাট্য জগতের সংগ্রামী ও সাহসী চরিত্র প্রতিষ্ঠার প্রতীক স্বরূপ ব্যবহার করা শুরু হল।

এই ঘটনা ঘটাকালীন প্রত্যক্ষ নাট্যকর্মীদের অধিকাংশই নিশ্চুপ ছিলেন বলে জানা যাচ্ছে। উপেনের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে অমৃতলাল বসু বা সুকুমারী দত্তের মতো মুষ্টিমেয় কিছু নাট্যকর্মী ছাড়া আর কোনো বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তির অংশগ্রহণের খবর পাওয়া যায় না। অমৃতলাল বা সুকুমারী ছাড়া তৎকালীন আর কোনো প্রথিতযশা নাট্যশিল্পীর তেমন

কোনো ভূমিকাও চোখে পড়ে না। মঞ্চশিল্পী ধর্মদাস সুরের আত্মজীবনীতে এই ঘটনার উল্লেখ থেকে মনে হয়, এই ঘটনায় ধর্মদাসের একটি প্রত্যক্ষ সমর্থন ছিল। কিন্তু সেই সময়কার মূল নাট্যতারকারা সেই সময়ে নিশ্চুপ থেকেই নিজেদের নিরাপদ রাখতে চেয়েছিলেন বলে মনে হয়। শুধু তা-ই নয়, এই ঘটনার কয়েক বছর পর থেকেই ব্রিটিশ রাণী ও সরকারের প্রতি প্রশস্তিমূলক একের পর এক নাটক প্রযোজনা করেছিল বাংলার নাট্যসংস্থাগুলো। ব্রিটিশ শাসনের প্রতি চরম ভক্তি দেখিয়ে 'রয়্যাল' উপাধি পাওয়ার মতো ঘটনাও দেখা গেছে। কিন্তু উপেন্দ্রনাথ দাসের উদ্যোগে বাংলা নাট্যশালার সংগ্রামী রূপটি প্রায় বিস্মৃত হয়ে যায় পরবর্তী নাট্য পরম্পরায়। এই কারণে, নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন লাগু হওয়ার সময়টিকে নিয়ে নাট্য ইতিহাসে গৌরবমূলক ন্যারেটিভ প্রচলিত থাকলেও এই কর্মকাণ্ডটি একান্তভাবে মুষ্টিমেয় কিছু রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন মানুষের উদ্যোগ হিসেবে ধরাই উচিত, এটাই আমার পর্যবেক্ষণ। এই ঘটনার ভিত্তিতে সমগ্র নাট্য জগতের জেহাদি রূপটি প্রতিষ্ঠা করাটা, প্রচলিত ইতিহাসের একটি ফাঁক হিসেবে মনে করা যেতে পারে, এই কথাটিই নির্দেশ করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। নাট্য জগতের নির্ভীক ইমেজটিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রচলিত ইতিহাসে নাট্যজগতকে যেভাবে একটি বৃহত্তর ক্যাটেগরি হিসেবে ধরা হয়, যেভাবে সমগ্র নাট্যজগতের একটি বিরাট পরিপূর্ণতাসম্পন্ন গরিষ্ঠতার ছবি বর্ণনা করা হয়, এই অধ্যায়ে সেই বিষয়টির একটি দিককে নির্দেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

এই অধ্যায়ে ভারতের জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে বাংলা নাট্যমঞ্চের ঐতিহাসিক দেশপ্রেমী নাটকের জোয়ারটিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অধ্যায়ের প্রথম ভাগে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের স্বরূপ ও সেই সময়কার 'হিন্দুত্ব'-এর ভাবনাটির বিকাশ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। উনিশ শতকের শেষ থেকে হিন্দু জাগরণ ও হিন্দু নির্মাণের যে কার্যাবলী শুরু হয় এবং জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেম, স্বাদেশিকতার ভাবনায় যেভাবে এই 'হিন্দুত্ব'-এর ধারণাগুলি প্রবিষ্ট হতে থাকে, সেই বিষয়গুলি নিয়ে এই অংশে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই আন্দোলনে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষদের অংশগ্রহণের সমস্যা ও শ্রমিকশ্রেণী বা নিম্নবর্গের মানুষের অবহেলিত হওয়ার মতো বৈশিষ্ট্যগুলিকেও সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই সূত্রে 'নতুন হিন্দু' গড়ে তোলার উদ্যোগের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নেশন' ও ধর্ম সংক্রান্ত স্বতন্ত্র ভাবনাগুলিকেও উল্লেখ করা হয়েছে।

এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় ভাগে, রাজনীতি ক্ষেত্রের ধর্মচিন্তা ও জাতীয়তাবাদের বৈশিষ্ট্যের নিরিখে বিশ শতকীয় নাট্যজগতের কর্মসূচীগুলিকে নিরীক্ষণ করা হয়েছে। বাংলা নাটকের দেশহিতবাদী ভাবনার ইঙ্গিত উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই দেখা যাচ্ছে। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে *ওরিয়েন্টাল থিয়েটারের* ইতিহাসটি এই সূত্রে উল্লিখিত হয়েছে। বাঙালি ছাত্রদের দ্বারা সংগঠিত নাট্যশালাতে বাংলা ভাষায় নাটক করা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। এই বিতর্ক থেকেই বাংলার নাট্যশালায় স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমী প্রবণতাকে লক্ষ্য করা যায়, এ কথা বলা যায়। কিছুকাল পরে মধুসূদন দত্তের *রিজিয়া* নাটকটি নিয়ে প্রভূত মতান্তর, দলাদলি, তর্ক-বিতর্ক উঠে এসেছিল। মুসলমান চরিত্র নিয়ে নাটক লেখার জন্য মধুসূদনকে যে সংগ্রাম করতে হয়েছিল, সেই ঘটনার মধ্যে দিয়েই সমসাময়িক সমাজের জাতীয়তাবাদী বৈশিষ্ট্যগুলিকে নির্দেশ করা যায়। সেই বৈশিষ্ট্যগুলি পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যেও প্রবাহিত ছিল। যদিও উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত 'স্বদেশী', বা 'জাতীয়তাবাদী' বলতে ঠিক কী বোঝায়, সেই ভাবটি মানুষের মনে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। স্বাদেশিক চেতনার আদর্শ রূপটি কেমন হবে সেই সচেতনতা আরও কিছুকাল পরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে শুরু করেছিল।

উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে বিশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত সময়ে বাংলায় প্রভূত ঐতিহাসিক নাটক লেখার প্রচলন ঘটে। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে নাট্য অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন লাগু হওয়ার পর থেকেই বাংলা নাটক ধর্মীয় ও পৌরাণিক নাট্য প্রযোজনা করে গেছে পরবর্তী কয়েক দশক ধরে। এই সময়ের নাট্য গতি বিশ্লেষণ করে অনুমান করা যায়, আপাত 'রাজনীতিহীনতা'র রাজনীতিকে বেছে নিয়েছিল বাংলার থিয়েটার জগত। প্রশ্ন আসে, তাহলে কি ইংরেজ সরকারের শাসননীতির ব্যাপারে একেবারে নিঃশব্দ অবস্থানটিগ্রহণ করে নিতে চেয়েছিল বাংলা নাটক? উনিশ শতকের শেষ ভাগে অসংখ্য ধর্মীয় পৌরাণিক নাটকের ভক্তিরসে গা ভাসিয়ে চলতে থাকল নাট্যস্রোত। তথ্যপ্রমাণের ওপর ভিত্তি করে অনুমান করা যায়, এই 'নিরপেক্ষ' রাজনীতির, বা বলা ভালো 'প্রত্যক্ষ রাজনীতি এড়িয়ে চলার রাজনীতি'র ধারাটি আরো পরবর্তীকাল অবধি বয়ে নিয়ে যাওয়ার সহায়ক হয়ে উঠেছিল বাংলা ঐতিহাসিক নাটক।

উনিশ শতকের একেবারে শেষভাগ থেকে শুরু হল বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের জয়যাত্রা। সেই ঐতিহাসিক নাটকগুলি বস্তুত উপেন্দ্রনাথ দাসের করা প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক নাটক অনুসারী নয়। বরং এগুলিকে সেই সময়কার যুগের উপযোগী সামাজিক চাহিদার যোগান হিসেবে দেখাই বাঞ্ছনীয়। উনিশ শতকের শেষ থেকে একটির পর একটি দেশপ্রেমিক ঐতিহাসিক নাটক প্রযোজিত হয়। কোথাও সরাসরি ইংরেজ সমালোচনা না করে মুসলমান শাসকের

সমালোচনার আড়ালে সমসাময়িক রাজনীতিকে প্রতিফলিত করার উদ্যোগ নিয়েছিল এই ঐতিহাসিক নাটকগুলি। নতুন ভাবধারায় স্ফুরিত বাঙালি তথা দেশবাসীর আধুনিক জাতীয় বীরের রূপটি কেমন হবে, তার কর্মধারা কেমন হবে, তার শরীর মনের প্রকৃতি কেমন হওয়া উচিৎ, তার নৈতিক চরিত্র কেমন হবে, তার সামাজিক কর্তব্য কী হবে, তাই নিয়ে গোটা শিক্ষিত সম্প্রদায় ভাবনা শুরু করেছিল সেই সময়ে। এই দেশীয় জাতীয় বীর ছিলেন হিন্দু শৌর্যের প্রতীক এবং তার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো দস্যু বা হামলাকারী খলনায়কটি হয়ে উঠল মুসলমান অত্যাচারী কোনো রাজা। সমাজের চাহিদা অনুযায়ী সেই আদর্শ জাতীয় বীরের সন্ধানে একটার পর একটা জাতীয়তাবাদী নাটক প্রযোজিত করতে থাকল বাংলা নাট্যসমাজ। যদিও কিছু মুসলমান বীরকে নিয়েও নাটক লেখা হয়েছিল। যেমন- *মীর কাশিম* বা *সিরাজদ্দৌল্লা*। সেখানেও কিন্তু সমসাময়িক জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে মুসলমান সমাজকে যে কূটনৈতিক কারণে আহ্বান করতে হয়েছিল, সেই পথ অনুসরণ করেই বাংলার নাট্যসমাজে মুসলমান বীরকে স্থান দেওয়া হয়েছিল। রাজনীতি ক্ষেত্রের বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাংলা নাট্যমহলে মুসলমান বীরকে স্থান দেওয়াও একটি 'হিন্দু জাতীয়তাবাদী' কূটনৈতিক সিদ্ধান্ত ছিল বলে মনে করা যেতে পারে।

বিশ শতকের শুরু থেকে বাংলা থিয়েটার জগৎ অত্যন্ত সতর্কভঙ্গিতে নাট্য প্রযোজনা করতে থাকল। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি সংগ্রামের ডাক তারা দিল না। বরং তারা অতীত শাসককে উদ্দেশ্য করে সমসাময়িক সমাজের নানান চাওয়া-পাওয়ার প্রতিফলন ঘটালো। তবুও ইংরেজ সরকার ক্ষুব্ধ হল। বাজেয়াপ্ত করল কিছু নাটক। কিন্তু আগেরবারের নাট্য নিয়ন্ত্রণ ও এইবারের নাট্য নিষেধাজ্ঞার একটি বড় পার্থক্য দেখা গেল। ১৮৭৬-এর নাট্য নিয়ন্ত্রণের পর বাংলা নাটক ভীত হয়ে রাজনৈতিক বা সামাজিক নাটক করা বন্ধ করে পৌরাণিক নাটক বেছে নিয়েছিল। নাটকের একটা মোড় ঘুরে গিয়েছিল। কলকাতার থিয়েটারে যে নতুন পর্যায়ের নাট্যচেতনার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছিল। অবাক করা বিষয় হল, এইবারের বাজেয়াপ্ত নাটকগুলি নিষিদ্ধ হওয়ার পরেও অভিনীত হতে থাকল।

১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় শাসকবিরোধী নাটক বন্ধ করতে ইংরেজ সরকার নাট্যকর্মীদের গ্রেপ্তার করেছে। এমনকি, অভিনয় চলাকালীন তাঁদের তুলে নিয়ে গিয়ে জেলে পাঠানো হয়েছে। দীর্ঘদিন তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা চলেছে। সেই ঘটনার সূত্রেই অত্যন্ত তৎপর হয়ে ইংরেজ সরকার নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইনটিও প্রণয়ন করেছেন। ঘটনার গভীরতা এতই প্রবল ছিল যে তার পর থেকে প্রায় দুই দশক বাংলা রাজনৈতিক নাটক সাহস করে মাথা তুলে দাঁড়াতে

পারেনি, ধর্মীয় নাটক মঞ্চস্থ করেই বাংলা থিয়েটার জগত আত্মরক্ষা করেছে। কিন্তু এইবারের বিদ্রোহী নাটক বা নাট্যকার বা নাট্যব্যবস্থাপক কেউই ইংরেজ সরকারের কাছে তেমন বিপজ্জনক হয়ে উঠল না। তাঁদের নিয়ে সরকারের তেমন কোনো উৎকণ্ঠা হয়তো ছিল না। অনুমান করা যায়, আগেরবার ইংরেজদের তৎপরতার একটা অন্যতম কারণ ছিল এই যে, বাংলা নাটকে কিছু রাজনৈতিককর্মী ও তার সহযোদ্ধা কিছু নাট্যকর্মীরা একত্রিত হয়ে সরাসরি তৎকালীন ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে আঙ্গুল তোলে; কোনো ঐতিহাসিক কাহিনির প্রেক্ষিতকে ব্যবহার করে তাঁদের নাট্যবস্তু সংঘঠিত হয়নি। এক যুগের অরাজকতা বর্ণনায় আরেক যুগের রাজপাটের অব্যবস্থাকে আশ্রয় করে নাট্যকাহিনি বোনা হয়নি। তাই হয়তো সেই নাটকের আবেদন ছিল জোরালো।

কিন্তু এবারের নাটক, অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষভাগের ঐতিহাসিক নাটক? তা সে যতই ইতিহাসের আড়াল নিয়ে রাজনৈতিক হয়ে উঠুক না কেন, ইংরেজ সরকারের কাছে সম্ভবত তেমন ভয়ংকর হয়ে ওঠেনি, বা উঠতে চায়নি।এবারের নাটক বোধহয় কেবল সাধারণ অনুসরণকারী হতে চেয়েছিল; যুগের অনুসরণকারী; সমাজের অনুসরণকারী; দর্শকের অনুসরণকারী। সে হয়তো বা দর্শককে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো কোনো ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে চায়নি। দর্শক যে পথে হাঁটছে, হাঁটতে চাইছে, সেই পথেই সঙ্গ দেওয়ার কাজ করতে চেয়েছে নাট্যজগত। আর তার পাশাপাশি নজর রেখেছে তার মুনাফার অঙ্কেও। এইবারের স্বদেশী-রাজনৈতিক নাটকের সঙ্গে নাট্যকার বা নাট্যকর্মীর তেমন কোনো জোরদার আন্তরিক সংযুক্তি নেই, এমনটাই মনে হয়। দেশবাসীর 'জাতীয়তাবাদী' চেতনা স্ফূরণের দিনে বাংলা নাটকের কর্মী ও কর্মচারীরা স্বাদেশিক ভাবধারায় হয়তো তেমন মেতে ওঠেনি। আন্দাজ করা যায়, সে মূলত অর্থনৈতিক লাভের কথা মাথায় রেখেছে। তার ব্যবসায়িক স্বার্থ চরিতার্থ হয়েছে, ইংরেজ সরকার তেমন ক্ষুব্ধও হয়নি, আবার জাতীয়তাবাদী উদ্যমে হাজিরা দেওয়াও অনায়াস হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ের মূল বক্তব্যটি এইভাবেই পরিবেশিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলা নাট্য ইতিহাসের প্রচলিত ধারায় নাট্য প্রযোজনাগুলির মঞ্চসজ্জা বা দৃশ্যসজ্জার বর্ণনার কোনো স্থান হয়নি। নাট্য ইতিহাসের বইগুলিতে নাটকের মঞ্চনির্মাণ প্রসঙ্গে কোনো আলোচনা নেই বললেই চলে। একথা ঠিক যে, উনিশ বিশ শতকের নাটকগুলির মঞ্চ প্রযোজনা সম্পর্কে বিশেষ কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। নাটকগুলির টেক্সটগুলি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং কবে কোন নাটক অভিনীত হয়েছিল সেসব বিবরণী পাওয়া যায়। কিন্তু

নাটকগুলির মঞ্চসজ্জা কেমন ছিল, সে বিষয়ে খুবই কম তথ্য মেলে। কিন্তু যেটুকু তথ্যও মেলে, সেগুলোর থেকেও কোনো মূল ধারার ইতিহাস খুঁজে আনার কোনো চেষ্টা প্রায় হয়নি বললেই চলে। প্রথমে সাদামাটা দৃশ্য নির্মাণ ও ক্রমে বিদেশী প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্তিতে বাংলা নাটকের মঞ্চভাবনা কেমন ভাবে বিবর্তিত হতে থেকেছে, তা নিয়ে বাংলা নাট্য ইতিহাস একেবারে নিশ্চুপ থেকেছে। চতুর্থ অধ্যায়ে তাই এই উনিশ বিশ শতকের নাট্যমঞ্চভাবনা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আমার নাট্য বিষয়ক গবেষণাটি ভীষণভাবে interdisciplinary স্বভাববিশিষ্ট। অর্থাৎ নানান আলাদা আলাদা বিষয়ক্রমের মধ্যে পারস্পরিক লেনদেনের মাধ্যমে এই গবেষণাটি লিখিত হয়েছে। মঞ্চসজ্জা বিষয়ক এই অধ্যায়ে আমার গবেষণার interdisciplinary ধরনটি সবচেয়ে বেশি প্রযুক্ত হয়েছে। উনিশ বিশ শতকীয় নাটকের মঞ্চসজ্জা বিষয়ে যেহেতু খুবই সীমিত কিছু তথ্য পাওয়া যায়, তাই এই অধ্যায়টি লিখতে গিয়ে আমায় চোখ রাখতে হয়েছে তৎকালীন অন্যান্য কিছু বিদ্যাশৃংখলার (discipline) বিবর্তনের গতিতে। আমি এই প্রসঙ্গে কলকাতার অধিবাসী ব্রিটিশদের জীবন, তাঁদের সংস্কৃতি, তাঁদের বানানো কলকাতা শহর, তাঁদের আঁকা কলকাতার ম্যাপ সবকিছুকেই আমার আলোচনার পরিসরে আনতে হয়েছে। বাংলা নাট্যশালার মঞ্চসজ্জার প্রকৃতিকে জানতে কলকাতা শহরের ব্রিটিশ অধিবাসীদের পরিচালিত নাট্যশালায় মঞ্চপরিকল্পনার দিকে আমি নজর করার চেষ্টা করেছি। উইলিয়াম প্রিন্সেপের পরিচালিত নাট্য প্রযোজনার মঞ্চসজ্জায় ব্রিটিশ অঙ্কনশৈলীর ‘পারস্পেকটিভ’ ড্রয়িং-এর বিশেষ প্রভাব দেখা যাচ্ছে। মনুষ্য অভিনেতার শরীরের পাশে বাঙালি লোকশিল্পীর বানানো বিভিন্ন মাপের শোলার পুতুলকে দাঁড় করিয়ে পারস্পেকটিভ-এর ধারণাটি প্রতিষ্ঠা করার পদ্ধতিটি নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ। মানুষ ও পুতুলের পারস্পরিক অবস্থানে দূরের ও কাছের জিনিস দেখানোর ধরনটি থেকে সেই সময়ের মঞ্চ আঙ্গিনায় অঙ্কনশিল্পের কি প্রচণ্ড প্রভাব ছিল, সে ব্যাপারে সহজেই আন্দাজ পাওয়া যায়।

এর পরের অংশে গেরাসিম লেবেদফের পরিচালিত নাটকের মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ সজ্জা নিয়ে যেটুকু তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, সেই তথ্যগুলিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বাংলা ভাষায় অভিনীত প্রথম নাটকটি রাশিয়ান ব্যক্তি গেরাসিম লেবেদফের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। সেই নাটকের মঞ্চশালাটি বেঙ্গলি স্টাইলে সজ্জিত হয়েছিল বলে জানা যায়। এমনকি তাঁর নাটকের তৃতীয় অভিনয়ের প্রেক্ষাগৃহ ও মঞ্চের পশ্চাৎদৃশ্যপট ও পার্শ্বপটগুলি বাঙালি কায়দায় আঁকার জন্য চিত্রশিল্পী নিয়োগের কথাও জানা যায়। লেবেদফের নাট্য প্রযোজনার বিশ্লেষণের পরের অংশে জায়গা নিয়েছে

নবীন বসু নামের এক বাঙালির এক অভিনব নাট্য উদ্যোগের বিশ্লেষণ। নবীন বসুর উদ্যোগে তৈরি হওয়া নাটকে এক নবধারার নাট্য পরিকল্পনার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলে মনে হয়। তিনি নাটকের একেক দৃশ্য জমিদার বাড়ির একেক স্থানে অভিনয় করার ব্যবস্থা করলেন, কিছু দৃশ্যপট বানালেন দেশীয় শিল্পীদের দিয়ে। নাটকের টেক্সট হিসেবে নিলেন ভারতীয় সংস্কৃত একটি নাটক, *বিদ্যাসুন্দরের* কাহিনী। আবার বিদেশ থেকে আনলেন মঞ্চসজ্জাসামগ্রী।

ব্রিটিশ নাট্য পরিকল্পক উইলিয়াম প্রিন্সেপ, রাশিয়ান নাট্য উদ্যোগী গেরাসিম লেবেদফের নাট্যসজ্জায় কিংবা ভারতীয় নাট্য উদ্যোগী নবীন বসুর মঞ্চসজ্জার ভাবনায় ভারতীয় ও ইউরোপীয় অঙ্কনসংস্কৃতির মিশ্রণে এক স্বতন্ত্র নতুন ধারার অঙ্কনশৈলী দেখা গেছিল বলে আমার পর্যবেক্ষণ। এই নতুন ধারার সংকরায়িত অঙ্কনশৈলীটির বৈশিষ্ট্যগুলিকে বুঝতে সেই সময়ের কলকাতার অঙ্কনকলার জগতের বিবর্তনগুলিকেও আমার গবেষণার পরিধির মধ্যে নিয়ে আসতে হয়েছে। এই কারণেই এই অধ্যায়টি বিশেষভাবে আন্তঃবিষয় স্বভাবে রচনা করতে হয়েছে। এই অধ্যায়ে শুধুমাত্র থিয়েটার জগতের তথ্যবিন্যাসের আমার গবেষণা কেন্দ্রীভূত হয়নি। থিয়েটারের পাশাপাশি এক অন্যতম স্থান নিয়েছে ঔপনিবেশিক চিত্রকলার ঐতিহাসিক বিবরণীটি। চিত্রকলা জগতের এই ঐতিহাসিক বিবরণীটি পর্যবেক্ষণ করার জন্য আমি বিশেষভাবে তপতী গুহ ঠাকুরতা, সুমন্ত ব্যানার্জী, রতন পারিমুর মতো বিশিষ্ট চিত্রকলা গবেষকদের গবেষনাকর্মে প্রতি কৃতজ্ঞ।

এই বিশিষ্ট মানুষদের বিশ্লেষণের আলোয় আমি বর্তমান অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে দেখতে পেয়েছি, আঠেরো শতকের শেষভাগ থেকে কলকাতার শিল্পসমাজ ‘শিল্পী’ ও ‘কারিগর’—এই দুই বিভাগে ভাগ হয়ে যেতে শুরু করেছিল। উচ্চবিত্তের শিল্পে মনোনিবেশ করতে সমর্থ হয়েছিলেন যে শিল্পীরা, তাঁরাই প্রকৃত ‘শিল্পী’হয়ে উঠলেন। বাকি নিম্নবিত্ত শিল্পীসম্প্রদায়কে ধরা হল Artisan বা কারিগর হিসেবে। ইউরোপীয় ঘরানার পার্স্পেকটিভ রীতিটির প্রভাব পড়তে থাকল ভারতীয় শিল্পী মহলে। মুঘল দরবারের শিল্পীদের উত্তরসূরীরা ইংরেজ কোম্পানীর হয়ে আঁকা শিখতে শুরু করেছিল ব্রিটিশ আমলের গোড়া থেকেই। কিন্তু শত প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও বাংলার লোকশিল্পীরা বিশেষত কালিঘাটের পটশিল্পীরা নিজেদের শিল্পকলায় ইউরোপীয় প্রভাবকে প্রায় ঢুকতেই দিল না। পার্স্পেকটিভ রীতির নামমাত্র প্রভাব পটশিল্পে পড়লেও বিষয় নির্বাচনে বা অঙ্কন শৈলী—কোনো ক্ষেত্রেই ইউরোপীয় বাস্তববাদী অঙ্কনরীতিতে পটুয়ারা প্রভাবিত হতে চাননি।

অঙ্কনশিল্পের ইতিহাসের সামাজিক বিশ্লেষণ করলে যে শ্রেণিসংঘর্ষের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তারই প্রভাব এসে পড়ে বাংলা নাট্য মঞ্চের মঞ্চসজ্জার ইতিহাসে। সাধারণ রঙ্গালয়ের সময় থেকে ধীরে ধীরে বাংলা নাট্য প্রযোজনাগুলি থেকে বাদ পড়তে থাকল দেশীয় শিল্পীরা। তাঁদের অঙ্কন শিল্প তেমন 'রুচিশীল' হয়ে উঠতে পারল না, তাঁদের পুরোনো উপকরণে আঁকা রঙ ও তুলি তেমন 'ভালো' ছবি এঁকে উঠতে পারল না। তাঁদের সাবেক কালের অঙ্কন রীতি, অঙ্কন উপকরণে মন ভরল না ইউরোপীয় পার্স্পেকটিভ ড্রয়িং-এর স্বাদ পাওয়া নাট্য কুশীলব ও দর্শকদের। ক্রমে নাট্যমঞ্চে জায়গা করে নিতে থাকল ইউরোপীয় মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহের বৈশিষ্ট্যগুলি। এমনকি পার্শি থিয়েটারের প্রবল ঝাঁ চকচকে মঞ্চসজ্জারও চমক এসে লাগল বাংলা মঞ্চে। এই পরিস্থিতিতে নিঃশব্দে বাংলা মঞ্চ থেকে প্রস্থান নিতে হল নিম্নবর্গের শিল্পীকূলকে।

সহজেই বোঝা যাচ্ছে, বাংলা নাটকের মঞ্চদৃশ্যকে বিবেচনা করতে গেলে উনিশ বিশ শতকীয় কলকাতার সমাজের শ্রেণীভেদ ও রাজনৈতিক শ্রেণীসংগ্রামের নিরিখে বিশ্লেষণ করা জরুরী হয়ে পড়ে। কলকাতার নাট্যমঞ্চে শুরুর দিন থেকে দেশীয় শিল্পীদের উপস্থিতি ও ক্রমে সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় ঘরানার শিল্পীদের মঞ্চ দখলে ন্যারেটিভটি বাংলা নাটকের মূলধারার ইতিহাসে জায়গা করে উঠতে পারেনি। বাংলা নাট্য মঞ্চসজ্জা নিয়ে এই গবেষণাটি শুধুমাত্র নাট্য গবেষণার একটি অংশ হিসেবে নয়, মূল প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসধারার একটি বিকল্প সন্ধান হয়ে ওঠার সম্ভাবনা বহন করে। মঞ্চসজ্জার লেন্স দিয়ে উনিশ বিশ শতকীয় সমাজটিকে পর্যবেক্ষণ করলে ঐতিহাসিক সমাজটি সম্পর্কে নিঃসন্দেহে একটি নতুন বিবৃতি পরিলক্ষিত হয়। এই নতুন ন্যারেটিভ শুধু নাট্য ইতিহাসের পরিসরে সীমাবদ্ধ থাকে না। মূল ধারার ইতিহাসকে একটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার সুযোগ ঘটায়।

পরিশেষে আমি বলতে চেয়েছি, নাট্য ইতিহাস বিশ্লেষণের জন্য শুধু নাটকের সাহিত্য বা স্থান-কাল-পাত্রের তথ্যাবলী নিয়ে আলোচনা করলে চলবে না। এর পাশাপাশি নাটকের মঞ্চায়নের বৈশিষ্ট্য নিয়েও মনোনিবেশ করা দরকার। তাহলেই নাট্য ইতিহাস রচনাটি পরিপূর্ণতা পাবে। আর এই কাজে অবশ্যই অনেকটাই দায়িত্ব থাকে নাট্যকর্মীদের। নাট্য গবেষকদের এই বিষয়ে আরও সচেতন হতে হবে। দরকারে, নাট্য গবেষকদের হাতে কলমে নাটকের প্রশিক্ষণ নিতে হবে। তবেই তাঁরা নাটকের ইতিহাস রচনা করার সময় নাটকের সাহিত্যের বিশ্লেষণের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে নাটককে মঞ্চপ্রযোজনার প্রেক্ষিত থেকে বিশ্লেষণ করতে পারবেন। আর সেভাবেই নাট্য ইতিহাস সংক্রান্ত নানান গভীর তথ্য ও তত্ত্ব প্রতিফলিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

বর্তমান গবেষণার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

আমার গবেষণার স্বল্প পরিসরে নাট্য ইতিহাসের বেশির ভাগ দিক নিয়েই আলোচনা করার সুযোগ হয়নি। দু'শো বছরের বেশি সময় ধরে বিস্তৃত নাট্য ইতিহাসের মাত্র কয়েকটি পর্ব নিয়েই আমার কাজটুকু চলেছে। তাই এই গবেষণায় আলোচনা করা হয়নি, এমন ক্ষেত্র নাট্য ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া অতি সহজ। সেই সবধরনের প্রসঙ্গেই নতুন করে ভবিষ্যতে কাজ করার পথ আছে। এমনকি, এই গবেষণাটিও কোনো সামগ্রিকতা বা সম্পূর্ণতা দাবী করে না। যে যে প্রসঙ্গে এই গবেষণা সন্দর্ভে আলোচনা করা হয়েছে, সেই প্রসঙ্গগুলি সম্বন্ধেও নতুন করে আলোচনা সম্ভব। ইতিহাসে এই বিষয়গুলি নিয়ে যা যা তথ্য আছে, সব কিছু এই গবেষণায় বিশ্লেষণ করা হয়নি। আর্কাইভে প্রাপ্ত সমস্ত তথ্যসামগ্রীকে ভিত্তি করে যে এই নিবন্ধ রচিত হয়েছে, এমন কথাও বলা হচ্ছে না। কোনো সামগ্রিকতার দাবি এই গবেষণা করে না।

আসলে এই গবেষণাটিকে প্রথাগত গবেষণা প্রক্রিয়ার বাইরে একটি ভিন্নতর গবেষণা প্রক্রিয়া হিসেবে গ্রহণ করলে যুক্তিসঙ্গত হবে বলে আমার ধারণা। এই সূত্রে আরও একবার উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্তমান নাট্য গবেষণাটি কোনো নতুন কথা বলতে চায়নি। এই গবেষণা একটি বিকল্প দৃষ্টিতে পুরনো ইতিহাসকে দেখতে চেয়েছে মাত্র। বাংলার নাট্য ইতিহাস বিষয়ক যে যে আকরগ্রন্থগুলি অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত সেইগুলির দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেই এই গবেষণার কাজ এগিয়েছে। সেই আকরগ্রন্থগুলি আমায় তথ্যের সরবরাহ করছে, প্রশ্ন করার অনুপ্রেরণা জাগিয়েছে, প্রচলিত ঐতিহাসিক ন্যারেটিভটি সম্পর্কে আমায় অবগত করেছে। এই প্রতিষ্ঠিত শক্তিশালী ঐতিহাসিক আখ্যানটিকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে আমার সুশীলকুমার মুখার্জীর *The Story of Calcutta Theatres*, বিশিষ্ট নাট্য গবেষক শংকর ভট্টাচার্যের *বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান*, দর্শন চৌধুরীর *বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস*ভীষণ ভাবে কাজে লেগেছে। পাশাপাশি, বেশ কিছু মৌলিক তথ্যসামগ্রী আমার খুব কাজে লেগেছে। যেমন- গেরাসিম লেবেদফের লেখা *কাল্পনিক সংবদল* নাটকটি, Lt. Col. Mark Wood-এর আঁকা কলকাতার ম্যাপটি, সুকুমারী দত্তের লেখা *অপূর্ব্বসতী নাটক*, উপেন্দ্রনাথ দাসের *শরৎ-সরোজিনী* বা *সুরেন্দ্র-বিনোদিনী* নাটক, মধুসূদন দত্তের লেখা বেশ কিছু চিঠিপত্র আমার গবেষণায় করে উল্লেখ্য, *রঙ্গমঞ্চ, নাচঘর, ছায়া ও ছবি, নাট্যমন্দির, রূপ ও রঙ্গ* নামের নাট্য বিষয়ক পত্রিকাগুলি এবং *অমৃতবাজার পত্রিকা, সমাচার চন্দ্রিকা, হিন্দু পেট্রিয়ট, হিন্দু পাইয়োনিয়ার, এডুকেশন*

গেজেট, ক্যালকাটা গেজেট, ঈস্ট ইণ্ডিয়ান, এশিয়াটিক জার্নাল, দ্য স্টেটস্টসম্যান, দ্য ইংলিশম্যান এরকম বিভিন্ন সংবাদপত্র ও পত্রিকায় প্রকাশিত নাটকের বিজ্ঞাপন ও সমালোচনাগুলি আমায় গবেষণার কাজে খুব সাহায্য করেছে।

আমার ধারণা, এই গবেষণাটিকে কোনো পরীক্ষার ফলাফল না ভেবে, এটিকে একটি পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। তাই এই পদ্ধতিটিকে অবলম্বন করে ভবিষ্যতে নাট্য ইতিহাসের যেকোনো পরিধি বা যেকোনো ক্ষেত্রকে পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। গতানুগতিক ইতিহাসকে প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে ধরে নিয়ে নতুন তথ্য সামগ্রীর সন্ধান করাটা ইতিহাস গবেষণা করার একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি। অথবা, মূল ধারার ইতিহাসের যে আখ্যানটি বহুকাল যাবৎ প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে, তার বিশ্লেষণ করে একটি ঘটনা বা পরিস্থিতি সম্পর্কে যে পুরনো ব্যাখ্যাগুলি প্রতিষ্ঠিত আছে, তার নবতর বিশ্লেষণ করাটাও একটি বহুল প্রচলিত গবেষণা পদ্ধতি। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসের ভিত্তি যে উপকরণগুলি সেই উপকরণগুলিকে প্রশ্ন করার পদ্ধতিটিকে অবলম্বন করে এই গবেষণার কাজই করা হয়েছে। অর্থাৎ ইতিহাসের সত্য প্রতিষ্ঠার যে মূল অবলম্বন আর্কাইভ, সেই আর্কাইভে প্রতিষ্ঠিত তথ্যসামগ্রীর মধ্যেকার ফাঁক বা নৈঃশব্দ্যকে নির্দেশ করার চেষ্টা হয়েছে এই কাজে। যা আর্কাইভে আছে বা যা ইতিহাস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত আছে, তা কেন আছে? আর যা নেই, অথচ থাকতে পারত, তা কেন নেই এই বিতর্কটিকে মাথায় রেখেই গবেষণাটি করা হয়েছে।

তাই এই পদ্ধতিতে বাংলা নাট্য ইতিহাসের সমস্ত পর্বগুলিকেই বারবার খুঁটিয়ে দেখা যেতে পারে। যা নেই, যা প্রচলিত ইতিহাসে স্থান পায়নি, সেই প্রশ্নের সন্ধান করা যেতে পারে; লেখা যেতে মূল ধারার ইতিহাসের বিকল্প নানান আখ্যান। ইতিহাস হয়ে উঠতে পারে বিভিন্ন আখ্যান নির্ভর। স্থান পেতে পারে বিভিন্ন বিচার-বিশ্লেষণ। অসংখ্য তার দৃষ্টিকোণ, বিচিত্র তার গতিপথ। স্থান পেতে পারে বিভিন্ন বিচার-বিশ্লেষণ। ইতিহাসের মূল ধারার আখ্যান হিসেবে জায়গা করে নেওয়ার সুযোগ পেতে পারে বিজিতের স্বরও।যদিও এ কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসের মূল ভিত্তিটিকে সমূলে অস্বীকার করতে চাইছে না এই গবেষণা। কেবল প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসের কিছু কিছু যৌক্তিক খামতিকে নির্দেশ করতে চেয়েছে। মূল ভিত্তির সঙ্গে সম্পূর্ণত অসম্মতি দর্শানোর জন্য এই গবেষণা নয়, বরং প্রতিষ্ঠিত কাঠামোর একটি গঠনমূলক রাজনৈতিক সমালোচনা আহ্বানের উদ্দেশ্যে এই গবেষণার পরিকল্পনা করা হয়েছে, একথা বলাই বাহুল্য।

সংযোজনী ১

১৮৭৬-এর নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন

ACT NO XIX of 1876 (16th December, 1876)

AN ACT FOR THE BETTER CONTROL OF PUBLIC DRAMATIC PERFORMANCES

Preamble

Whereas it is expedient to empower the Government to prohibit public dramatic performances which are scandalous, defamatory, seditious or obscene; it is hereby enacted as follows:--

Short title Local extent

1. This act may be called the Dramatic performance ACT, 1876. It extends to the whole of British India.

Magistrate defined

2. In this act `Magistrate' means, in the presidency towns, a Magistrate of police, and elsewhere the Magistrate of the District.

Power to prohibit certain dramatic performances

3. Whenever the Local Government is of opinion that any play, pantomime or other drama performed or about to be performed in a public place is—

a. of a scandalous or defamatory or

b. likely to excite feelings of disaffection to the Government established by law in British India, or

c. likely to deprave and corrupt persons present at the performances,

the Local Government, or outside the presidency-towns and Rangoon the Local Government or such Magistrate as it may empower in his behalf, may, by order prohibit the performance.

Explanation: Any building or en closure to which the public are admitted to witness a performance on payment of money shall be deemed a 'public place' within the meaning of this section.

Power to serve order of prohibition, penalty for disobeying

4. A copy of any such order may be served on any person about to take part in the performance so prohibited, or on the owner or occupier of any house, room or place in which such performance is intended to take place; and any person on whom such copy is served, and who does, or willing permits, any act in disobedience to such order, shall

be punished on conviction before a Magistrate with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine, or with both.

Power to notify Order

5. Any such order may be notified by proclamation, and a written or printed notice thereof may be struck up at any place or places adapted for giving information of the order to the persons intending to take part in or to witness the performances so prohibited.

Penalty for disobeying prohibition

6. Whenever after notification of any such order—

a. takes part in the performances prohibited thereby or in performance substantially the same as the performance so prohibited or

b. in any manner assists in Conducting any such performances, or

c. is in wilful disobedience to such order present as a spectator during the whole or any part of any such performance, or

d. being the owner or occupier, or a being the owner or occupier, or having the use of any house, room or place, opens, keeps or uses the same for any such performance, or permits the same to be opened, kept or used for any such performance,

Shall be punished on conviction before Magistrate with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine, or with both.

Power to call for information

7. For the purpose of ascertaining the character of any intended public dramatic performance, the Local Government or such officer as it may specially empower in this behalf, may apply to the author, proprietor, or printer of the drama about to be performed, or to the owner or occupier of the place in which it is intended to be performed, for such information as the Local Government or such officer thinks necessary.

XI. V of 1860

Every person so applied to shall be bound to furnish the same to the best of his ability, and whoever contravenes this section shall be deemed to have committed an offence under section 176 of the Indian Penal Code.

Power to grant warrant to police enter and arrest and seize

8. If any Magistrate has reason to believe that any house, room or place is used, or is about to be used, for any performance prohibited under this Act, he may, by his warrant, authorise any officer of police to enter with such assistance as may be requisite, by night or by day, and by force, if necessary, any such house, room or place, and to take

into custody all persons whom he finds therein, and to seize all scenery, dresses and other articles found therein, and reasonably suspected to have been used, or to be intended to be used for purpose of such performance.

Saving of prosecutions under penal code, sections 124A and 294, XIV of 1863

9. No Conviction under this Act shall bar a prosecution under section 124A or section 294 of the Indian Penal Code.

10. Whenever it appears to the Local Government that the provisions of this section are required in any local area, it may declare, by notification in the local official Gazette, that such provisions are applied to such area from a day to be fixed in the notification.

Power to prohibit dramatic performance in any local area, except under licence.

On an after that day, Local Government may order that no dramatic performance shall take place in any place of public entertainment within such area except under a licence to be granted by such Local Government, or such offices as it may specially empower in this behalf.

A copy of any order under this section may be served on any keeper of a place of public entertainment; and if thereafter he does or willingly permits any act in disobedience to such order, he shall be punishable on conviction before a Magistrate with imprisonment for a term which may extend to three months or with fines or with both.

Power exercisable by Governor General

11. The Powers conferred by this Act on the Local Government may be exercised also by the Governor General in Council.

Exclusion of Performance at religious festivals

12. Nothing in this Act applies to any jatras or performances of a like kind at religious festivals. (Bandyopadhyay, N. 373)

সংযোজনী ২

‘সুরেন্দ্র-বিনোদিনী’ মামলার রায়

Before Mr. Justice near and

Mr. Justice Maltby

THE QUEEN V. UPENDRANATH DOSS

AND ANOTHER

Dated March, 9. 16 and 20, 1876

Act X of 1875 (High Court's Criminal Procedure Act), S. 147— case transferred to High Court—Notice to Prosecutor Penal Code, ss. 292 and 294—specific charge—Procedure on Transfer to High Court.

In an application for the transfer of a case under S. 147, Act X of 1875 in which the prisoner has been convicted and is undergoing imprisonment, it is in the discretion of the court to order, for sufficient prima facie cause shown, that the case be removed, without notice to the Crown.

Semble—A charge under ss. 292 and 294 of the Penal Code should be made specific in regard to the representations and words alleged to have been exhibited and uttered, and to be obscene; and the Magistrate, in convicting, should in his decision state distinctly what were the particular representations and words which he adjudged to be obscene within the meaning of those sections. Where no such specific decision has been given, the High Court, where the case has been transferred under S. 147 of Act X of 1875, may either try the case de novo, or dismiss it on the ground that the Magistrate has come to no finding on which the conviction can be sustained.

The prisoners had been charged with offences under ss. 292 and 294 of the Penal Code, and had been on conviction sentenced by the Magistrate for the Northern Division of Calcutta to one month's simple imprisonment. On Their application to the High Court, Phear made an ex-parse order under S. 147 of Act X of 1875, removing the case to the High Court and allowed the release of the prisoners on bail under S. 148. The case now came on for hearing.

Mr. Branson, Mr. Ghose and Mr. Palit appeared for the prisoners.

The Standing Counsel (Mr. Kennedy) for the Crown.

Mr. Branson contended that the conviction could not be sustained, first on account of the vagueness of the charge, in as much as it did not specify the nature of the crime-charged, secondly, that the prisoners had committed no offence under ss. 292 and 294; and Thirdly, that the evidence did not justify the conviction. He also contended that the Magistrate had no power to dispose of the case......summarily.

The Standing Counsel raised an objection to the older made removing the case to the High Court, in as much no notice thereof had been given to the Crown. The Court offered to adjourn the case if the Crown required time to enable them to proceed with it, but the Standing Counsel said he thought an adjournment was unnecessary. He then contended that the Magistrate had power to try, and dispose of, the case summarily, and that on the evidence the conviction ought to be upheld. After hearing Mr. Branson in reply, the Court took time to consider its judgment, which, on a subsequent day, was delivered by–

PHEAR, J.-This case now comes before us by reason of its having been removed to this Court from the Court of the Magistrate of Calcutta, Northern Division, by an order made under S. 147 of the High Court Criminal Procedure Act.

The learned Standing Counsel, on behalf of the Crown, objected that the order bad been irregularly made because the Crown was not served with notice of the application for it, and was not given an opportunity of being heard upon that application. We are of opinion, however, that when, as in the present case, a conviction has been arrived at by the Magistrate, and the petitioner is actually suffering imprisonment thereunder, it is within the discretion of this Court to order for sufficient prima facie cause shown, on the application of the prisoner, that the case be removed, without notice to the Crown. We intimated our readiness to give time to the Standing Counsel, if he required it, for the purpose of this hearing, but he said he was quite prepared to go on with the case without delay.

The charge preferred against the petitioners and some other person, upon which they were tried by the Magistrate appears in the Court-book, which the Magistrate has sent up to us, in the following words:—

'Defendants are charged with having, on 1st March, at Beadon Street in Calcutta exhibited to public view certain obscene representations. Defendants are further charged with having at the time and place aforesaid uttered or recited certain obscene words to the annoyance of others: ss. 292 and 294 of the Penal Code'; and the original Order for conviction made and signed by the Magistrate after hearing the evidence given on both sides appears to have been as follows :- 'Defendants (2) and (3) Upendranath Doss and Omritolal Bose'

(the two petitioners to this Court) 'are found guilty under ss. 292 and 294 of the Penal Code and sentenced to surfer imprisonment for one month'.

The scope of each of the two sections, 292 and 294, of the Penal Code is wide: and it is much to be regretted that the charge against the prisoners was not made specific in regard to the representations and words alleged to have been exhibited and uttered, and to be obscene, before at least the accused persons were called upon to answer it. And it was certainly very important, both in the interest of the accused persons, and of the public, that the Magistrate, in his decision of the matter, should have stated distinctly what were the particular representations and words which he found in the evidence the convicted persons had exhibited and uttered, and which he adjudged to be obscene within the meaning of these sections.

Had the case remained as the Magistrate's book represents it, we should have been reduced to the alternative of either practically trying the case de novo or of dismissing it, upon the ground that the Magistrate had come to no finding upon which his conviction could be sustained. Fortunately, however, since the conviction has been impeached by the making of the application for the removal of the case of this Court, the Magistrate has formally drawn up his specific findings of fact, and his order thereon, and we may now safely assume that this document disclaim all that in the opinion of the Magistrate is established by the evidence against the petitioners within the scope of ss. 292 and 294 of the Penal Code. (After going through the specific findings of the Magistrate his Lordship found that the evidence was not sufficient to justify tee/the findings of fact arrived at by the Magistrate, and that the words and passages were not obscene within the meaning of ss. 292 and 294 & continued:) It thus appears to us that the grounds upon which the

Magistrate has placed his conviction in this case fail: and we can discover in the evidence no other ground upon which it could legally be supported. It follows that the conviction must be quashed, the sentence set aside, and the petitioners released from the obligation of their recognizances.

Conviction quashed.

Attorney for Crown: The Government Solicitor, Mr. Sanderson.

Attorney for the defendants: Baboo G. C. Chunder. (Bandyopadhyay. Rabindranath, 216)

সংযোজনী ৩

ন্যাশনাল অ্যাটলাস এণ্ড থিমেটিক ম্যাপিং অর্গানাইজেশন থেকে প্রকাশিত ১৭৮৪ ও ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দের

Lt. Col. Mark Wood-এর আঁকা কলকাতার মানচিত্র।

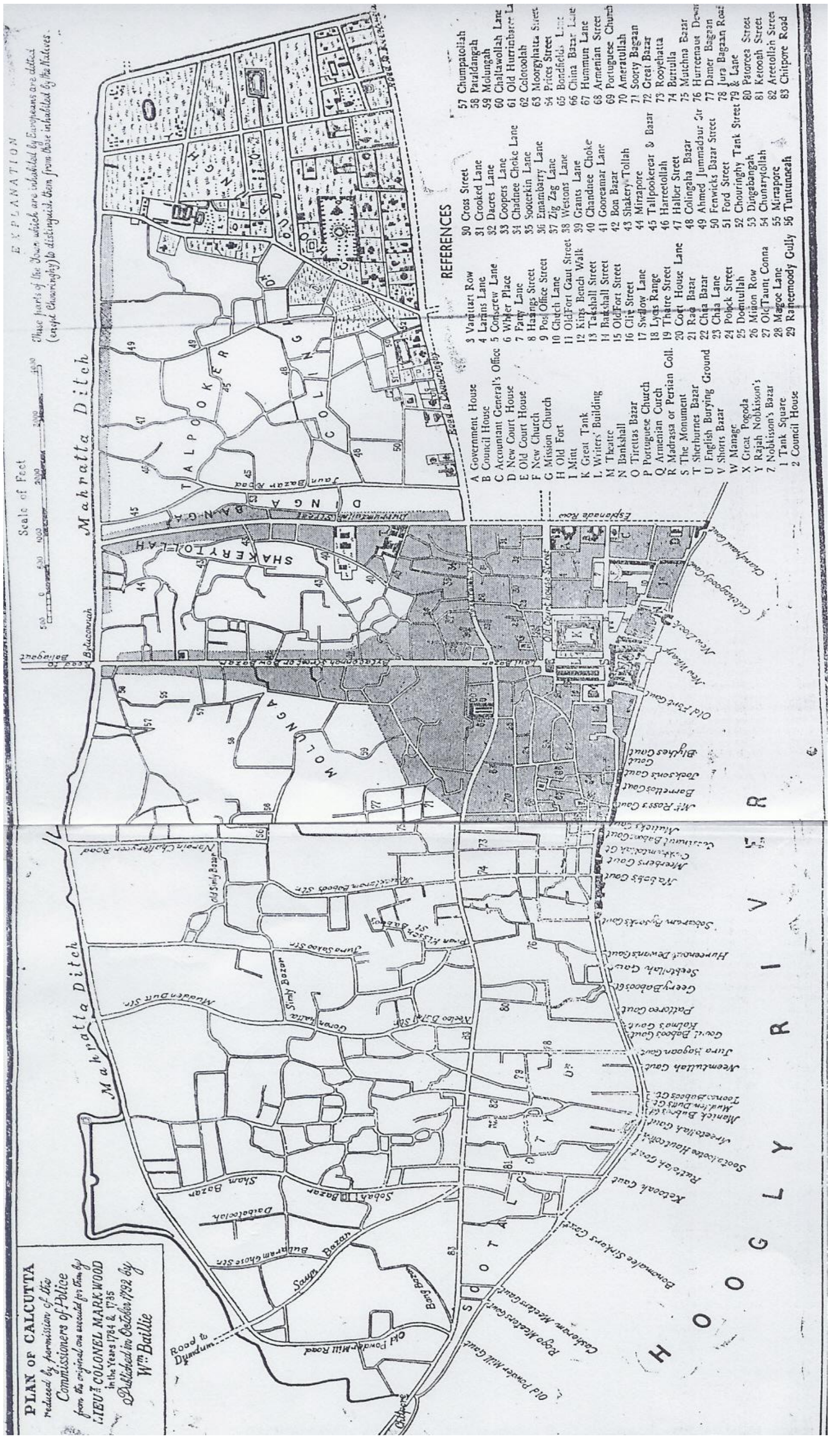

সংযোজনী ৪

উইলিয়াম প্রিন্সেপ (১৭৯৪-১৮৭৪)-এর আঁকা ব্রিটিশদের চৌরঙ্গি থিয়েটারের ছবি।

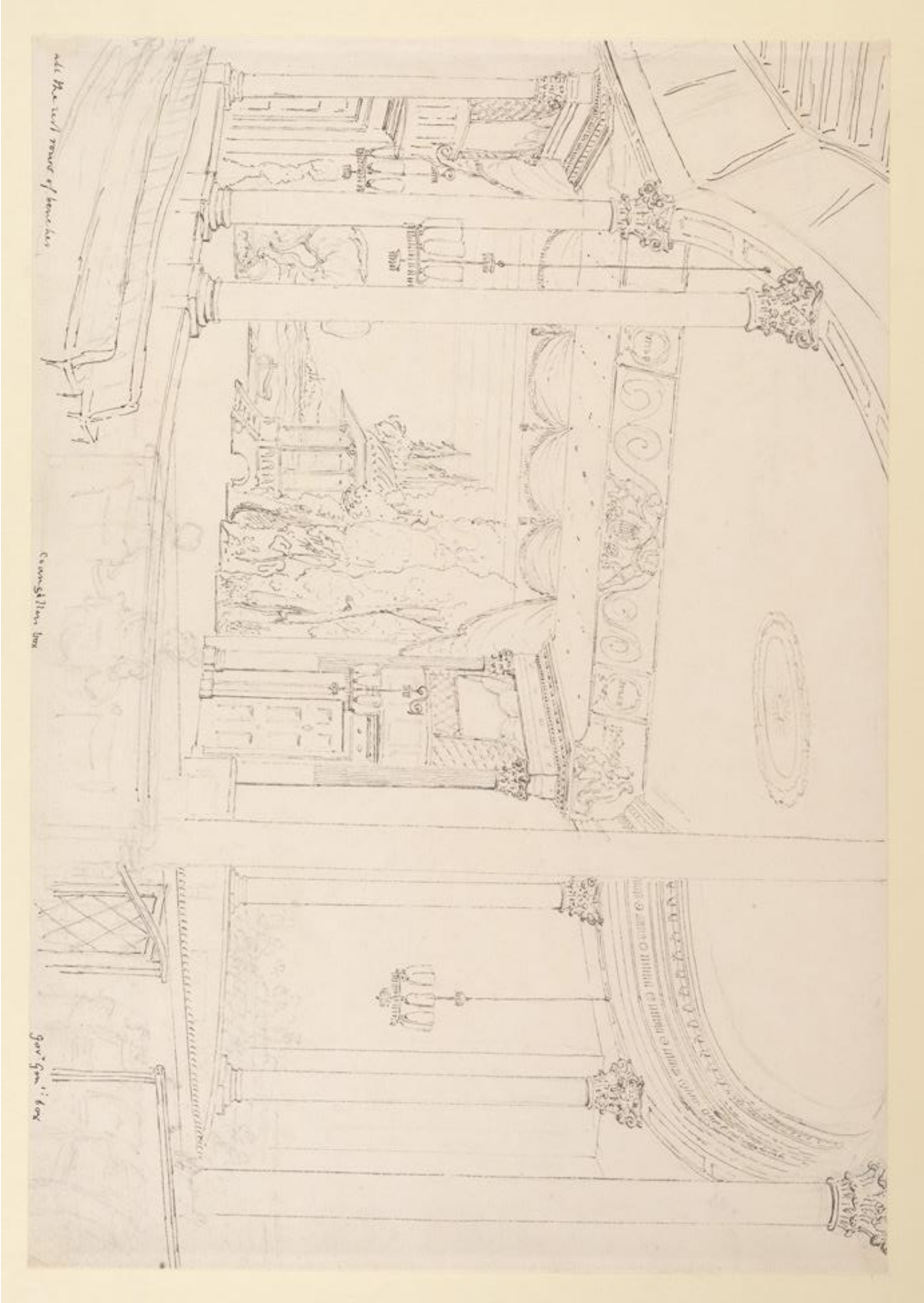

গ্রন্থপঞ্জী

(সব গ্রন্থের নাম খুঁজে পাওয়ার সুবিধের জন্য লেখকের নাম অনুসারে বর্ণানুক্রমিকভাবে English হরফে লেখা হল)

Anderson, Benedict. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Verso, London & New York, 2006.

Ahmed, Sayed Jamil. *Acinpakhi Infinity: Indigenous Theatre of Bangladesh*. University Press Ltd., Dhaka, 2000.

--. "Female Performers in the Indigenous Theatre of Bangladesh." *Infinite Variety: Women in Society and Literature*, edited by Firdous Azim, and Niaz Zaman, University Press, Dhaka, 1994, pp. 263-281.

__. "Footprints of the 'Outliers': Female Performers in Colonial Eastern Bengal". *Women Performers in Bengal and Bangladesh: Caught up in the Culture of South Asia (1795-2010s)* edited by Manujendra Kundu, Oxford University Press, Oxford, 2023, pp. 61-83.

Bandyopadhyay, Nirmal. *Unish Shataker Bangla Sadharan Rangalay: Itihas Jatiyatabad Samajjiban*. Saptarshi Prakashan, Kolkata, 2018.

Bandyopadhyay, Rabin. *Abidyaparar Abhinetri*. Fatikjal Prakashani. Calcutta, 2006.

Bandyopadhyay, Rabindranath. *Natya Niyantran O Bangla Nataker Eksho Bachhor*. Calcutta, 1995.

Bandyopadhyay, Shibaji. *Alibabar Gupta Bhandar*. Gangchil, Calcutta, 2009.

Banerjee, Brajendranath. *Bangiya Natyshalar Itihas: 1795 -1876*. 2nd ed., Bangiya Sahitya Parisad Mandir. Calcutta, 1346 BS/1939.

--. *Bengali Stage: 1795-1873*. Ranjan Publishing House, Calcutta, 1948.

--. *Sahitya Sadhak Charitmala*. vol. 28. Bangiya Sahitya Parisad, Calcutta, 1350 BS/1943.

Banerjee, Jayantanuj. *Dharma O Pragati*. Ananda Publishers Private Ltd., Calcutta, 2014.

Banerjee, Sumanta. *Dangerous Outcast: The Prostitute in Nineteenth Century Bengal*, Seagull Books, Calcutta, 1998.

--. *The Parlour and the Streets: Elite and Popular Culture in Nineteenth Century Calcutta*, Seagull Boooks, 1989.

--. *Unish Shataker Kolkata o Saraswatir Itar Santan*. Anushtup, Calcutta, 2008.

--. ‘The 'Beshya' and the 'Babu': Prostitute and Her Clientele in 19th Century Bengal.’ *Economic and Political Weekly*, Mumbai, vol. 28, no. 45, 1993, pp. 2461–2472. JSTOR, www.jstor.org/stable/4400383. Accessed 2 Oct. 2020.

--. “Marginalisation of Women’s Popular Culture in Nineteenth-century Bengal”. *Recasting Women: Essays in Colonial History*, edited by Kumkum Sangari and Sudesh Vaid. Kali for Women, New Delhi, 1997, pp. 127-179.

--. *Under the Raj: Prostitution in Colonial Bengal*, Monthly Review Press, New York 1998.

Banerjee, Trina Nileena. *Performing Silence: Women in the Group Theatre Movement in Bengal*. Oxford University Press, London, 2021.

--. “Text and Present: Thinking about ‘Liveness’ in Performance Studies”. *Literature and Other Arts*, edited by Debashree Dattaroy, Epsita Halder, Samantak Das, Jadavpur University Press, Kolkata, 2023.

Basu, Amrita Lal. *Smriti O Atmasmriti*, edited by Dr. Arunkumar Mitra, Sahityalok, Kolkata, 1982.

--. *Nautchghar*, no.14. 23 Shraban 1331 BS/ 1924.

Basu, Bishnu. *Babu Theatre*. Pratibhash. Calcutta, 1986.

--. ‘Bangla Proscenium Theatre: 1795 Theke 1944.’ *200 Bochhorer Bangla Proscenium Theatre*, edited by Ganesh Mukhopadhyay, Biswakosh Parisad, Calcutta, 1997, pp. 11-21.

Basu, Jogindranath. *Michael Madhusudan Duttar Jibancharit*. Dey’s Publishing, Calcutta, 1399 BS/1993.

Basu, Manmatha Mohan. *Bangla Nataker Utpatti O Kramabikash*. University of Calcutta, Calcutta, 1948.

Basu, Sisir. *Eksha Bachharer Bangla Theatre*. vol. 1. Navana, Calcutta.

Bhaba, Homi. K. *The Location of Culture*. Routledge, London and New York, 1994.

Bhadra, Goutam and Partha Chatterjee, editors. *Nimnabarger Itihas*. Ananda Publishers Private. Ltd., Calcutta, 2012.

Bhadra, Goutam. “Kathakatar Nana Katha.” *Nimnabarger Itihas,* edited by Goutam Bhadra and Partha Chatterjee, Ananda Publishers Private. Ltd., Calcutta, 2012. pp. 191-257.

Bhattacharya, Ashutosh. *Banglar Lok-Sahitya*. Calcutta Book House, Calcutta, 1957.

Bhattacharya, Gouri Shankar. *Bangla Lokanatya Samiksha.* Rabindra Bharati University Publication, Kolkata, 1367 BS/ 1960.

Bhattacharya, Prabhatkumar. *Bangla Natake Swadeshikatar Prabhab: 1800-1914.* Sahityashree, Calcutta, 1989.

Bhattacharya, Ramkrishna. *Bangalir Notun Atmaporichay*, Ababhash, Kolkata, 2005.

Bhattacharya, Rimli. *Public Women in British India: Icons and the Urban Stage.* Routledge India, 2018.

--, translator. *My Story and My life as an Actress.* By Binodini Dasi, Kali for Women, New Delhi, 1998.

--. "'Public Women': Early Actresses of the Bengali Stage—Role and Reality." *India International Centre Quarterly*, vol. 17, no. 3/4, 1990, pp. 142–169. JSTOR, www.jstor.org/stable/23002458. Accessed 2 Oct. 2020.

Bhattacharya, Sadhan Kumar. *Nataker Rupriti O Prayog.* Jatiya Sahitya Parisad, Calcutta, 1369 BS/ 1962.

Bhattacharya, Shankar. *Bangla Rangalayer Itihaser Upadan: 1872-1900.* West Bengal State Book Board, Calcutta, 1982.

--. *Bangarangamancha O Ardhendushekhar.* Sanskrit Pustak Bhandar, Calcutta. 1398 BS/1991.

Bhattacharya, Tapodheer, "Bangabhanga Theke Deshbhag: Itihasher Tragic Ullash." *Parikatha*, vol. 7, no. 2, 2005. pp. 113-123.

Bidyabinode, Kshirodoprasad. *Alibaba.* Gurudas Chattopadhyay and Sons, Calcutta, BS 1333/ 1897.

Brandon, James. R., and Martin Banham, editors. *The Cambridge Guide to Asian Theatre.* Cambridge University Press, Cambridge, 1997.

Burton, Antoinette. *Dwelling in the Archive: Women Writing House, Home and History in Late Colonial India.* Oxford University Press, Delhi. 2003.

Carlson, Marvin. *Performance: A Critical Introduction.* Routledge, London and New York, 2001.

Chakraborty, Dipesh. *Monorather Thikana.* Anushtup, 2019.

--. “Shorir, Samaj O Rastra: Ouponibeshik Bharate Mahamari O Janasangskriti.” *Nimnabarger Itihas,* edited by Goutam Bhadra and Partha Chatterjee, Ananda Publishers Private. Ltd., Calcutta, 2012. pp. 161-180.

Chakraborty, Oishika. *Kolkatar Nach Somokalin Nagarnritya*. Gangchil, Kolkata, 2019.

Chakraborty, Rudraprasad. *Rangamancha O Rabindranath: Samakalin Protikriya*. Ananda Publishers Private Ltd. Calcutta, 1995.

Chatterjee, Partha. *The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories.* Princeton University Press, New Jersey, 1993.

--. “Rabindrik Nation Ki?”. *Praja O Tantra*. Anushtup, Calcutta, 2016, pp. 73-112.

--. “Itihaser Uttaradhikar”. *Itihaser Uttaradhikar*. Ananda Publishers Private Ltd., Calcutta, 2012, pp. 131-170

--. “Amader Adhunikata”. *Itihaser Uttaradhikar*. Ananda Publishers Private Ltd., Calcutta, 2012, pp. 171-185.

--. “Transferring a Political Theory: Early Nationalist Thought in India.” *Economic and Political Weekly*, Mumbai, vol. 21, no. 3, 1986, pp. 120-128.

--. *The Politics of the Governed: Reflections on Popular Politics in Most of the World.* Columbia University Press, New York, 2004.

--. *Janopratinidhi*. Anushtup, Kolkata, 2013.

Chatterjee, Shibabrata. Natyaoitijhya O Laghu Natak. University of Burdwan, Burdwan, 2005.

Chatterjee, Sudipto. *The Colonial Staged: Theatre in Colonial Calcutta*, Seagull Books, London, 2007.

Chattopadhyay, Bankimchandra. “Banglar Itihas Sambandhe Koyekti Katha.” *Bankim Rachanabali.* vol. 2. Sahitya Samsad, Calcutta, 1371 BS/1964.

Chattopadhyay, Basanta Kumar, *Jyotirindranather Jibansmriti*. Subarnarekha, Calcutta, 2002.

Chattopadhyay, Goutam. “Bharater Jatiya Sangrame Shramik Andoloner Dharar Gurutwa,” *Arekrakam*. 8th yr., no. 6, 2020, pp. 53-58.

Chattopadhyay, Khagendranath. *Rangamancha*. Shraban 1317 BS/1910.

Chattopadhyay, Sarat Chandra. “Satya O Mithya.” *Sarat Sahityasamagra*. Ananda Publishers Private Ltd., Calcutta, 1392 BS/1985.

Chowdhurani, Indira Debi. *Rabindrasmriti.* Viswabharati, Calcutta, 1367 BS/1960.

Chowdhurani, Sarala Debi*. Jibaner Jharapata.* Sahitya Samsad, Calcutta, 1879.

Chowdhury, Ahindra. *Bangla Natya Bibardhane Girish Chandra.* Bookland Private Ltd., Calcutta, 1365 BS/1958.

Chowdhury, Darshan. *Bangla Theatreer Itihas*. Pustak Biponi, Calcutta, 1995.

--. *Unish Shataker Natyabishay*. Pustak Biponi, Calcutta, 1985.

Das, Krishnabhamini. *Englande Bangamahila.* Stree, Kolkata, 1996.

Das, Pulin. *Perscecution of Drama and Stage*. M. C. Sarkar and Sons Private Ltd., Calcutta, 1986.

--. *Banga Rangamancha O Bangla Natak, 1795-1920*. vol. 1, M. C. Sarkar & Sons Private Ltd., 1963.

Das, Turna. "Lebedeff-er Samaye Banglar Natya Sangskriti." *Kathakata-1: Banglar Samaj O Sangskriti*, edited by Ratnavali Chattopadhyay & Kaushik Saha. Setu Prakashani, Calcutta, 2015, pp. 317-325.

Das, Upendranath. *Sarat-Sarojini*, Calcutta, 1283 BS/1876.

--. *Surendra-Binodini*. G. P. Roy & Co., Calcutta, 1287 BS/1880.

Dasgupta, Hemendranath. *The Indian Stage*. Metropolitan Printing & Publishing House Ltd., Calcutta, 1934.4 vols.

Dasi, Binodini. *Amar Katha O Onyanyo Rachana*, edited by Soumitra Chattopadhyay and Nirmalya Acharya. Subarnarekha Private Ltd., Calcutta. 1422 BS/2015.

Deb, Chitra. *Thakurbarir Andarmahal*. Ananda Publishers Private Ltd., Kolkata, 2016.

Debi, Swarnakumari. "Amader Grihe Antahpur Shikkha O Tahar Sangskar." *Pradip Monthly Quarterly*, Bhadra, 1306 BS/ 1899.

Deen, Selim Al. *Madhyajuger Bangla Natya*. Hawladar Prakashani, Dhaka, 1994.

Derrida, Jacques. "Archive Fever: A Freudian Impression." Diacritics, vol. 25, no. 2 1995, pp. 9-63.

Dey, Amalendu. *Bangali Buddhijibi O Bichhinnotabad*, Pashchimbanga Rajya Pustak Parsad, Calcutta, 1991.

Dutta, Amar. *Unish Shataker Muslim Manas O Bangabhanga*, Progressive Publishers, Calcutta, 1995.

Dutta, Amlan. *Shanti Swaraj Sanskriti*. Ananda Publishers Private Ltd., Calcutta, 2001.

Dutta, Madhusudan. 'Rizia'. Madhusudan Rachanabali. Haraf Prakashani. Calcutta. 1371 BS/1964.

Dutta, Mahendranath. *Kalikatar Puratan Kahini O Pratha*. 2nd ed., Mahendra Publishing Committee, Calcutta, 1975.

Dutta, Sukumari. *Sukumari Dutta O Apurba Sati Natak*, edited by Bijit Kumar Dutta, Pashchimbanga Natya Akademy, 2015.

Dutta, Utpal. *Tiner Talwar*. Jatiya Sahitya Parisad, Calcutta, 1407 BS/2000.

Elam, Keir. *The Semiotics of Theatre and Drama.* Routledge, London and New York, 1987.

Fajal, Abul. *Samaj Sahitya Rashtra*. Gatidhara, Dhaka, 2013.

Gaganendranath Tagore Souvenir, vol. 2, Academy of Fine Arts, Calcutta, 1957.

Gangopadhyay, Abinashchandra. *Girishchandra*, edited by Swapan Majumder, Dey's Publishing, Calcutta, 1927.

Gangopadhyay, Mohan Lal. *Gaganendranath*. Mitra & Ghosh Publishers Private Ltd., Calcutta, 1380 BS/1973.

Geertz, Clifford James. *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. Basic Books, New York. 1973.

Ghosh, Ajit Kumar. *Thakurbarir Abhinoy*. Rabindra Bharati Society, Calcutta, 1988.

--. *Rangamanche Bangla Nataker Prayog*. Dey's Publishing, Calcutta, 1994.

--. *Bangla Natyabhinayaer Itihas*. Sahityaloke, Calcutta, 1998.

Ghosh, Alokkumar. "Bangabhanga: Bangalir Dui Adhyay." *Parikatha*, vol. 7, no. 2, 2005. pp. 59-69.

Ghosh, Barid Baran. "Bangarangamanche Pratham." File no. C/F 289. Natyashodh Sangsthan, Calcutta.

Ghosh, Binoy. *Samayikpatre Banglar Samajchitra*. vol. 2. Bikshan Granthan Bhavan, Calcutta. 1260 BS/1853.

Ghosh, Girish Chandra. *Girish Rachanabali*. vol. 1, Sahitya Samsad, Calcutta, 1944.

--. *Girish Rachanabali*. vol. 3, Sahitya Samsad, Calcutta, 1946.

--. *Sirajuddaula*, edited by Khetra Gupta, Sahitya Prakash, Calcutta. 1973.

--. *Bangiya Natyashalar Natachuramani Swargiya Ardhendusekhar Mustafi*. Minerva Theatre, Calcutta. 1315 BS/1908.

--. *Abu Hosen*. Gurudas Chattopadhyay and Sons, Calcutta, BS 1332/ 1896.

Ghosh, Manmohan. *Natyasastra*. Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1951.

Golwalkar, M. S. *We Or Our Nationhood Defined*. Bharat Prakashan Mahal, Nagpur, 1947.

Goswami, Prabhatkumar. *Deshatmabodhok O Oihashik Bangla Natak*. Pustak Bipani, Calcutta, 1385 BS/1978.

Guha Roy, Nirmal. "Manche Bibartan". *Jogsutra Patrika*. October-December 1992.

Guha, Nikhilesh. "Swadeshi Andoloner Sheemabaddhata, Punarbibechana." *Parikatha*, vol. 7. no. 2, 2005. pp. 124-133.

Guha, Ranajit. "Neel-Darpan: The Image of a Peasant Revolt in a Liberal Mirror." *Journal of Peasant Studies*, vol. 2, no. 1, 1974, pp. 1-46.

Guha-Thakurta, Tapati. *The Making of a New 'Indian' Art: Artists, Aesthetics and Nationalism in Bengal, c.1850-1920*. Cambridge University Press, Cambridge, 1992.

Gupta, Debnarayan. *Aksho Bachhorer Natya Prasanga*. Sahityalok, Calcutta, 1389 BS/1982.

--. *Banglar Nat-Nati*, vol. 1, Sahityalok, Calcutta, 1959.

Gupta, Khetra. *Bangla Nataker Alochona*, vol. 1, Grantha-nimay, 1369 BS/1962.

--. Introduction. *Sirajuddaula*, by Girishchandra Ghosh, Sahitya Prakash, Calcutta, 1973.

Gupta, Somnath. *Parsee Theatre: Udvab Aur Vikash*. Lokbharati Prakashan, Allahabad, 1981.

Guptoo, Sarvani. "Theatre and the Society: The Response of Bengali Society to the Actress in Public Theatre in the Late 19th to Early 20th Century India." *Global Media Journal*-India Edition, Winter Issue, vol. 4, no. 2, 2013, pp. 1-10.

Hasan, Jahirul. "Bangabhanger Muslim Dik." *Parikatha*, vol. 7, no. 2, 2005, pp. 70-95.

Hazra, Nirod Baran. *Manche Drishyapat Nirman O Byabohar*. Pashchimbanga Rajya Pustak Parsad, Calcutta, 1991.

Iravati. *Performing Artistes in Ancient India.* D.K. Printworld (P) Ltd., New Delhi, 2003.

Islam, Aminul. *Rabindranather Musalman Charcha*. Deep Prakashan, Kolkata, 2019.

Jahan, Fairooz. 'Marginal Women: Independent Earners in Colonial East Bengal'. *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Hum.)*, vol. 63, no. 2, 2018, pp. 139-162

Jardine, Lisa. “Unpicking the Tapestry: The Scholar of Women’s History as Penelope Among Her Suitors.” *The Routledge Reader in Gender and Performance*, edited by Liza Goodman and Jane de Gay. Routledge, London and New York, 2002, pp. 29-34.

Jeffrelot, Christophe. *Hindu Nationalism: A Reader*. Princeton University Press, New Jersey, 2009.

Joyce, Patrick. “The Politics of the Liberal Archive.” *History of the Human Sciences*, vol. 12, no. 2, 1999, pp. 35-49.

Kar, Shishir. *British Shashone Bajeyapta Bangla Boi*. Ananda Publishers Private Ltd., 1988.

Konar, Rajdeep. *To Stage or Not to Stage Tagore: Performing Tagore’s Plays.* Routledge, London and New York, 2023.

Lal, Ananda, editor. *Indian Drama in English: the Beginnings*. Jadavpur Univesity Press, Kolkata, 2019.

--. *The Oxford Companion to Indian Theatre*. Oxford University Press, India, 2004.

Lebedeff, Herashim. *A Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialects*, Firma KLM Private Ltd., Calcutta, 1960.

--. *Kalpanik Sangbadal*, edited by Madanmohan Goswami, University of Jadavpur, Calcutta, 1963.

Losty, J. P., *Calcutta: City of Palaces*. The British Library, London and Arnold Publishers, New Delhi, 1990.

Macaulay, Thomas Babington. *Minutes on Indian Education*. Victoria Institution, Calcutta, 2007.

Maitra, Amit. *Rangalaye Banganoti*. Ananda Publishers Private Ltd., Kolkata, 2004.

Mamoon, Muntasir. *Unish Shataker Dhakar Theatre*. Shilpa Kala Academy, Dhaka, 1979.

--. “Dhakar Peshadari Theatre.” *Bangla Peshadari theatre: Ekti Itihas.* Natyachinta Foundation, edited by Rathin Chakraborty. Calcutta, 2002, pp. 125-133.

--. “Unish Shatake Bangladesher Theatre.” *Bangladesher Theatre*, edited by Nripendra Saha, Karuna Prakashani, Calcutta, 2000, pp. 25-41.

Mamud, Hayat. *Gerasim Liebedeff.* Paschimbanga Natya Academy, Calcutta, 1995.

Maudud, Abdul. *Madhyabitto Samajer Bikash: Sangskritir Roopantor.* Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka, 1982.

Mayo, Katherine. *Mother India.* Blue Ribbon Books, New York. 1931.

Mehta, Tarla. *Sanskrit Play Production in Ancient India.* Motilal Banarsidass Publishers, New Delhi, 1999.

Metcalf, Thomas R. "Architecture and the Representation of Empire: India, 1860-1910." *Representations*, no. 6, 1984, pp. 37–65. JSTOR, www.jstor.org/stable/2928537. Accessed 2 Oct. 2020.

Mitra, Amal. *Kolkatay Bideshi Rangalay.* Prakash Bhaban, Calcutta. 1374 BS/1967.

Mitra, Ashok. *Bharater Chitrakala*, vol. 2, Ananda Publishers Private Ltd., 1996.

Mitra, Dinabandhu. *Neel-Darpan.* Modern Book Agency Private Ltd., Calcutta, 1957.

Mitra, Sanat Kumar. *Sahitya-Tika.* Pustak Bipani, Calcutta, 1991.

Mukherjee, Apareshchandra. *Rangalaye Trish Batsar.* Papirus, Kolkata, BS 1346/ 1939.

Mukherjee, Sushil Kumar. *The Story of the Calcutta Theatres (1753-1980).* K. P. Bagchi and Company, Calcutta, 1982.

Mukhopadhyay, Baidyanath, editor. *Samsad Bangla Natya Abhidhan.* Sahitya Samsad, Calcutta, 2000.

Mukhopadhyay, Dhananjay. *Bangiya Natyashalar Itihas*, edited by Bishnu Basu, Pashchimbanga Natya Academy, 1998.

--. "Bangiya Natyashalar Itihas." *Rangamancha.* Shraban, 1317 BS/1910.

--. "Bangiya Natyashalar Itihas." *Rangamancha.* Ashwin-Kartik, 1317 BS/1910.

Murshid, Golam. *Ashar Chhalane Bhuli: Michael Jibani.* Ananda Publishers Private Ltd., Calcutta, 1997.

--. Madhur Khonje: *Michaeljibani Punarnirmaner Nepathya Kahini*, Abasar Prakashana Sangstha, Dhaka, 2007.

Nandy, Ashish. *The Intimate Enemy: Loss and Recovery of Self under Colonialism.* 2nd ed., Oxford University Press, Delhi, 2009.

Narayan, Kirin. "How Native is a 'Native' Anthropologist?" *American Anthropologist*, vol. 95, no. 3. 1993, pp. 671-686.

Nora, Pierre. "Between Memory and history: Les Lieux de Memoire." *Representations*, no. 26, University of California Press. 1989, pp. 7-24.

Oldenburg, Veena Talwar. "Lifestyle as Resistance: The Case of the Courtesans of Lucknow, India." *Feminist Studies*, vol. 16, no. 2, 1990, pp. 259–287. JSTOR, www.jstor.org/stable/3177850. Accessed 2 Oct. 2020.

Osborne, Thomas. "The Ordinariness of the Archive." *History of the Human Sciences*, vol. 12, no. 2, 1999, pp.51-64.

Pal, Prafulla Chandra. *Pracheen Kobiwalar Gaan*. Calcutta University, Calcutta. 1958.

Panikar, K. N. "Culture and Communalism." *Social Scientist*, vol. 21, no. 3/4, 1993, pp. 24–31. JSTOR, www.jstor.org/stable/3517629. Accessed 2 Oct. 2020.

Parimoo, Ratan. *The Paintings of the Three Tagores: Abanindranath, Gaganendranath Rabindranath*. Maharaja Sayajirao University of Baroda, 1973.

Paul, Bipin Chandra. *Nabajuger Bangla*. Jugajatri. 1362 BS/1955.

Phelan, Peggy. "Ontology of Performance: Representation without Reproduction." *Unmarked: The Politics of Performance*. Routledge, London & New York. 1993, pp.146-166.

Pinney, Christopher. *Photos of the Gods: The Printed Image and Political Struggle in India*. Oxford University Press, 2004.

Postlewait, Thomas. *The Cambridge Introduction to Theatre Historiography*. Cambridge University Press, Cambridge, 2009.

Rag, Pankaj. "Indian Nationalism 1885-1905: An Overview." *Social Scientist*, vol. 23, no. 4/6, 1995, pp. 69–97. JSTOR, www.jstor.org/stable/3520216. Accessed 2 Oct. 2020.

Raha, Kiranmay. *Bengali Theatre*. National Book Trust, New Delhi, 1978.

Roy, Dwijendra Lal. *Mebar-Patan*. Gurudas Chattopadhyay & Sons, Calcutta, 1356 BS/1949.

--. *Dwijendra Rachanabali*, vol. 1. Sahitya Samsad, Calcutta. 1370 BS/ 1963.

Roy, Prafulla Chandra. *Achajya Prafulla Chandra Rayer Prabandha O Baktritabali*. Chakraborty, Chatterjee & Company Ltd., 1334 BS/1927.

Roy, Tapti. *Print and Publishing in Colonial Bengal: The Journey of Bidyasundar*. Routledge, India, 2019.

Roychowdhury, Subir. *Bilati Jatra Theke Swadeshi Theatre*. Dey's Publishing Private Limited, Calcutta, 1999.

Rubin, Don. *World Encyclopedia of Contemporary Theatre.* vol. 5, Asia/ Pacific, Routledge, London and New York, 2005.

Sanyal, Koushik. *Manchasajja Drishyasajja*. Ganaman Prakashan, Calcutta, 2006.

Sarkar, Pabitra. *Natmancha Natyarup*. Proma, Calcutta, 1388 BS/2008.

Sarkar, Sumit. "The Kalki-Avatar of Bikrampur: A Village Scandal in Early Twentieth Century Bengal". *Subaltern Studies* VI. Oxford University Press, Delhi, 1989, pp. 1-53.

--. *Adhunik Bharat (1885-1987).* K. P. Bagchi & Company, Calcutta, 1960.

Savarkar, V. D. *Hindutva: Who is a Hindu.* Hindi Sahitya Sadan, New Delhi, 2012.

Schechner, Richard. *Performance Studies: An Introduction*. 3rd ed., Routledge, London and New York, 2013.

Schneider, Rebecca. 'Archives Performance Remains'. Performance Research, vol. 6, no. 2, 2001, pp. 100-108.

Sen, Samita. *Women and Labour in Late Colonial India: The Bengal Jute Industry*. Cambridge University Press, Cambridge, 1999.

Sen, Sukumar. *Bangla Sahityer Itihas*, vol. 2 & 3. Ananda Publishers Private Ltd., 1401 BS/1994.

Sengupta, Badhan. *Indubala*. Mousumi Prakashani, Calcutta,

Shastri, Shibnath. *Atmacharit*. Dey's Publishing, Calcutta, 2003.

--. *Ramtanu Lahiri O Tatkaleen Banga Samaj*. New Age Publishers Private Ltd., Calcutta, 2003.

Shome, Nagendranath. *Madhu-Smriti*. Bidyadaya Library Private Ltd., Calcutta, 1396 BS/1989.

"Shikkhita Sampradayer Asha O Dukkher Katha." *Tattwabodhini Patrika*. vol. 12, part 4, no. 562, 1890, pp. 28-32.

Sur, Dharmadas. *Atma-Jibani*. Abhinetri Sangha Natyatsab Patrika, Calcutta, 1973.

Tagore, Rabindranath. "Rangamancha." *Bichitra Prabandha*. Viswabharati, Calcutta, 1355 BS/1948.

গ্রন্থপঞ্জী Page | 320

--. "Swadeshi Samaj." *Rabindra Rachanabali*, vol. 13. Government of West Bengal, Calcutta, 1990, pp. 43-76.

--. "Hindumusalman." *Rabindra Rachanabali.* vol. 13. Government of West Bengal, Calcutta, 1990, pp. 671-673.

Taylor, Diana. *Translating Performance.* Modern Language Association, New York, 2002, pp. 44-50 URL: http://www.jstor.org/stable/25595729

Thakur, Ababnindranath and Rani Chanda. *Gharowa.* Viswa-Bharati, Calcutta, 1905.

--. *Jorasankor Dhaare.* Viswa-Bharati, Calcutta, 1906.

Tod, James and William Crooke. *Annals and antiquities of Rajasthan, or The Central and Western Rajput States of India.* 3 vols., Oxford University Press, London, 1829.

Varadpane, M. L. "Religion and Theatre." *Sangeet Natak Akademi*, New Delhi, Vol. 53-54, 1979.

Vatsyayan, Kapila. *Traditional Indian Theatre: Multiple Streams.* National Book Trust, New Delhi. 2005.

Vidyabhushan, Upendra Nath. *Tinkori, Binodini O Tarasundari.* Akkhor Prakashani, Calcutta. 2014.

Yajnik, R. K. *The Indian Theatre: Its Origin and Its Later Development Under European Influence.* George Allen and Unwin Ltd, London. 1933.

Zakaria, Saymon. *Bangladesher Lokanatak: Bishay O Angik Baichitra.* Bangla Academy, Dhaka. 2008.

Zarrilli, Phillip B, et al. *Theatre Histories: An Introduction.* 2nd ed., Routledge, New York and London. 2010.

Turna Das 11.07.24

(গবেষকের স্বাক্ষর)